শ্রীম-কথা

স্বামী জগন্নাথানন্দ

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে

অবতরণিকা

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ধর্ম্মজগতের অতুলনীয় গ্রন্থ। উহার অমর লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয় 'শ্রীম'—এই ছদ্মনামে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনের শেষার্দ্ধে বহু শত তরুণ ও পরিণত বয়স্ক ভক্ত তাঁহার পূত সঙ্গ লাভ করিয়া ও তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই বহুজনহিতায় সেই সকল কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, স্বামী জগন্নাথানন্দ, তখন বয়সে নবীন হইলেও, মাষ্টার মহাশয়ের কিছুকিছু অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাই এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীম অধিকাংশ সময় তাঁহার গুরুদেবের স্মৃতি লইয়াই কাটাইতেন। তাঁহার উপদেশগুলি কত মর্ম্মস্পর্শী ও ধর্ম্মজীবন যাপনের পক্ষে কতদূর সহায়ক, তাহা সুধী পাঠকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। মাষ্টার মহাশয়ের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত ভাবের সমষ্টি ছিলেন। তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের জীবনে ঐ সকল ভাবের কতকগুলি সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের উপদিষ্ট "নারদীয় ভক্তির" বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থেও আমরা তাহার পরিচয় পাই। আবার আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবনে আমরা ঠাকুরের "শিবজ্ঞানে জীব সেবা"র মহান আদর্শটি মূর্ত্তিমান দেখি। অধিকারী ভেদে উভয়ই পথ। উহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

'শ্রীম' সংসারে থাকিয়াও ত্যাগের আদর্শকে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতেন। তাঁহার সংস্পর্শে অনেক যুবক সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া জীব-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। এই জড়বাদের যুগে "শ্রীম-কথা" বঙ্গীয় নরনারীগণের হৃদয়ে ত্যাগ ও ঈশ্বর প্রেমের বীজ বপন করুক এবং তাহাদের সুপ্ত আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলুক।

বেলুড় মঠ
২৫শে পৌষ, ১৩৪৮।

নিবেদক—
মাধবানন্দ

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীম-জীবনকথা	১
ডায়েরী পড়া, পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বাভাস	৩১
উত্তম বৈদ্য—হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর	৩২
বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ	৩৩
গায়ত্রীর অর্থ—সাধুরাই শ্রেষ্ঠ মানব	৩৬
আশ্চর্য্য বস্তু	৩৭
অনৈশ্বর্য্যের ভাব—গিরিশ ঘোষ	৩৮
দেহতত্ত্ব	৩৯
আদ্যাশক্তি—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। যোগগম্য	৪০
যোগাবস্থা	৪১
ঠাকুরের অবস্থা, আশুতোষ চৌধুরী—great man (মহৎ লোক) কে ?	৪২
বদরিকার ছবি, প্রার্থনার শক্তি—আমি কর্ত্তা,	৪৪
অবতার সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তগৃহে	৪৫
কাঞ্চনের টান, সাধু ও গুরুর আদর্শ,	৪৭
স্বপাকের প্রয়োজনীয়তা	৪৮
খাদ বিনে গড়ন হয় না, স্যার আশুতোষ	৪৯
ঋগ্বেদের ঋষি, কামজয়	৫০
উৎসব ও ভগবৎ স্মৃতি,	৫১
বিপদ ও ভগবান, পাণ্ডবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে চিনেছিলেন	৫২
বৈষ্ণব—দীনতা—প্রসাদ, পিসিমার গল্প	৫৪
রজ্জুতে সর্পভ্রম	৫৬
কৃপার অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব, লীলা অচিন্ত্য	৫৭
পিতামাতা ও সন্তানদের ভক্তি শিক্ষা	৫৮
শুদ্ধ দৃষ্টি—Highest Ideal (শ্রেষ্ঠ আদর্শ)	৬০
কেশবের সহিত—Spiritual position (আধ্যাত্মিক স্থান)	৬১
মায়ার মুখোস	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রভু জগদ্বন্ধু, দেহাত্মবোধ—কর্ত্তাভজা—চৈতন্যদেব—নিত্যানন্দ	৬৫
ঠাকুর নিজেকে নিজে চিনেছিলেন, নারীর লজ্জা, ব্রজমোহন ও ঠাকুর	৬৭
দুর্দ্দান্ত ছেলে, শরীর অনিত্য	৬৮
অবতারদের অবস্থা—যথার্থ পণ্ডিত, আলিবাবা	৭০
কর্ত্তা না হলে কাজ চলে না, আশীর্ব্বাদ	৭১
সাধু মাহাত্ম্য	৭২
পোষ্টাপিস, বিরাট	৭৩
ক্রাইষ্টকে দেখেছি, মহাত্মা গান্ধী	৭৪
বৈষ্ণব সাধু বাসুদেব বাবা	৭৫
শোক ও স্নেহ কাটবার ব্রহ্মাস্ত্র, সিদ্ধ	৭৬
অহেতুকী ভক্তি	৭৭
গজমোক্ষণ—জগন্নাথ—মাহেশ	৭৮
ধ্রুব চরিত্র, ব্যাকুলতা—ভক্ত বৎসল ঠাকুর, ভক্তি উপহার	৮০
শ্রীমন্ত সওদাগর	৮১
সাধুর আলাদা শরীর, মার কথামৃত শ্রবণ	৮৩
ভিক্ষা	৮৪
শ্রীবুদ্ধ	৮৬
শরীর যন্ত্রবিশেষ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি	৮৭
আমি আমার, রাম—কৃষ্ণ—ব্যাস	৮৮
ঠাকুর ও হীরানন্দ	৯০
ঠাকুর ও ছোকরা ভক্ত, সৃষ্টি,	৯৩
সাধু ও দেবতা, শ্রীচৈতন্য, নিরালম্ব ভাব	৯৪
ঠাকুরের উৎসবের তালিকা	৯৬
যার পেটে যা সয়	৯৭
আশ্রম, জীবরূপী মীন	৯৮
চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম, স্বামীজীর শ্লোক	১০০
নিম্ন অধিকারী	১০১
সাধু ভক্তি	১০২
ঈশ্বরের ইচ্ছা ভক্ত লীলাতে যোগ দিব, জনৈক ভক্তকে উপনিষদ পড়ানো	১০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূজোর বাজার	১০৪
নমাজ	১০৫
শাস্ত্র রহস্য	১০৬
মহামায়ার খেলা, সৃষ্টির রহস্য	১০৭
সেতু—পরমাত্মার ধ্যান	১০৮
বালকবৎ অবস্থা	১০৯
ঠাকুরের গায়েব রং	১১০
অন্তর্যামী পুরুষ	১১১
ঠাকুর ভুল ধরতেন না	১১২
অক্ষব পুরুষ	১১৪
আঙ্গুর ফল টক	১১৫
বন্ধন ও মুক্তির কারণ মহামায়া	১১৬
ঠাকুর ও ব্রাহ্ম সমাজ	১১৮
অধিকারী ভেদে উপদেশ	১১৯
সাধুসঙ্গে মনেব বল আসে	১২০
চণ্ডী—ঈশ্বরলীলা, জ্ঞানযোগ—মৈত্রেয়ী সংবাদ	১২১
লীলা যেন বায়স্কোপের ছবি	১২৩
হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন	১২৪
শ্রবণ মনন, ধ্যানের অধিকারী সকলে নয়	১২৫
ভক্ত হবি ত বোকা হবি কেন ?	১২৬
ধ্যান যোগ, নিরালম্ব উপনিষদ	১২৭
রাসদর্শন	১২৮
ছোট নরেন ও ঠাকুর, কর্ম্ম না করলে জ্ঞান হয় না, শব সাধন	১২৯
সঙ্গ ও সংস্কার	১৩০
ব্রাহ্মণ, সংহার কালী, যোগীর কর্ম্ম	১৩১
উৎসাহ চাই	১৩২
কমলেশ্বরানন্দের সহিত শাস্ত্র বিচার	১৩৩
বাবুরাম মহারাজের ভালবাসা	১৩৫
ত্রৈলঙ্গ স্বামী	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাজযোগ ও আচার	১৩৮
সমগ্র পৃথিবী তীর্থ, লীলা সত্য	১৩৯
ব্রহ্মানন্দই শ্রেষ্ঠ, তীর্থদর্শন, গুরুনিন্দা	১৪০
দেবেন মজুমদার ও গিরিশ ঘোষ	১৪১
স্বামীজীর তপস্যা লোকশিক্ষার জন্য, আত্মারাম, রূপ ও জীব গোস্বামী, জীবে দয়া	১৪২
শ্রীকৃষ্ণের সমদৃষ্টি	১৪৩
কীর্তিমান পুরুষের বাক্য	১৪৪
ঈশ্বরের লক্ষণ, সকাম ও নিষ্কাম ভক্ত—সাধুসঙ্গে ঈশ্বর বশীভূত	১৪৫
রাম মারলে কে আর রাখবে, কর্ম্মযোগী গান্ধী	১৪৯
দুষ্ট লোকদের খাওয়াতে নেই, শ্রেয়: ও প্রেয়:	১৫০
টাকার অপর দিক, পাকা খেলোয়াড়, কুঁড়ের কর্ম নয়	১৫১
গোপীদের প্রেম	১৫২
ঠাকুরের সার্কাস দর্শন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা	১৫৩
তপস্যা চাই, বৈশম্পায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য	১৫৪
বাবুরাম মহারাজ, পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা	১৫৫
মুটেদের পঞ্চায়তি, পুতুলনাচ, গেরুয়া অসহ্য	১৫৬
বুড়ী ছুঁলে খেলা শেষ, তীর্থরাজ, কর্ম্মক্ষয়ে ভগবান দর্শন	১৫৭
সাধুরও সাধুসঙ্গ প্রয়োজন, তিনি কি লাউ কুমড়ো ফল দেন ?	১৫৮
মহামায়ার কাছে চালাকি ? নিজের বুদ্ধিতে তাঁকে বুঝবার জো নেই	১৫৯
প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক, সেই এক গামছা কাঁধে দাঁড়িয়ে	১৬০
উত্তম অধিকারী, তালে তালে পড়ছে না—গীতা উপনিষদ	১৬১
কথামৃত	১৬২
রামকমলের গান ও ব্যাকুলতা	১৬৩
কামারপুকুরে ঠাকুর ও হৃদয়, যে যত বুঝবে সে তত এগিয়ে যাবে,	১৬৪
দত্তাত্রেয় ও ত্রিগুণাতীত অবস্থা	১৬৫
তারা ও রামচন্দ্র	১৬৬
গাছতলা—মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিত্যকর্ম্ম ও ব্যাকুলতা	১৬৭
বিড়াল তপস্বী	১৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুরু-ভক্তি—ভয় নেই	১৭২
সাধুরাই প্রেমের অধিকারী, প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি	১৭৪
সাধুদের থাক আলাদা, মাস পয়লা, ক্ষীরোদ ও সুবোধ	১৭৬
চৈতন্যদেবের অবস্থা	১৭৭
তিন রকম সাধু	১৭৮
নচিকেতা	১৭৯
পুরুষ প্রকৃতি, ঠেকে শেখা—দেখে শেখা	১৮০
বিদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রভাব	১৮১
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, কর্ম্ম ও আদেশ	১৮২
ভক্তদের প্রতি টান, গুরু	১৮৩
পৃথিবীর মহাশ্চর্য্য—অবতার	১৮৪
শাস্ত্র চিনিতে বালিতে মেশানো, মানব-জন্ম ও মুক্তি	১৮৫
জানকীবাবুর সঙ্গে	১৮৬
নদের গৌরাঙ্গ—সেই আমি	১৮৭
যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ	১৮৯
নির্জ্জনপ্রিয়তা	১৯২
ছেলে ধরা	১৯৩
দান	১৯৪
আর কিছুই সাধ নেই	১৯৫
লীলা—নিত্য ও অনিত্য	১৯৬
প্রেমের লক্ষণ	১৯৭
আমার আমার করতে নেই	১৯৮
কালী কম্বলীওয়ালা	১৯৯
জপ ও হাজরা, দর্শন	২০০
গুরু ও শিষ্যের দুর্ব্বলতা	২০১
বহুবিধ ভজনানন্দ	২০২
দেহ মন্দির, বিভিন্ন থাকের সাধু	২০৩
গৌরাঙ্গ ও রামকৃষ্ণ	২০৪
ধর্ম্ম ও গ্লানি, নিষ্কাম কর্ম্ম সার্ব্বজনীন	২০৬
ব্রহ্মাস্ত্র	২০৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ	২০৮
অবতারের দুটি দিক, নিষ্কাম কর্মের উদাহরণ	২০৯
দুরকম আমি, সাধুসঙ্গ ও ফটো	২১০
ক্রাইষ্টের উপদেশ	২১১
রসকে মেথর, একি ভাষ্যের কর্ম্ম, এক সূত্রে জগৎ গাঁথা, ক্যাণ্ট ও শুদ্ধ বুদ্ধি	২১২
যীশুখ্রীষ্ট ও ঠাকুরের প্রচারে ভেদ	২১৪
সমোহহং সর্ব্বভূতেষু, উপেন্দ্র দেব	২১৫
স্বাধীন ইচ্ছা, ক্যাণ্ট, হেগেল ও উপনিষৎ	২১৬
ছেলেবেলায় ভগবৎ দর্শন, অবতারের প্রয়োজন	২১৭
ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য—গুরুসেবা, মাতৃভাব ও সাধুসঙ্গ	২১৮
সুবর্ণ সুযোগ, অন্তর্জ্জপ ও প্রার্থনা	২১৯
বিশ্বাস, চরণদাস বাবাজী, কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর পীঠস্থান	২২০
সখীচাঁদবাবু ও সকাম কর্ম্ম	২২১
নিজের সমাধান আগে	২২২
মন স্থির করা	২২৩
এদেশ ত্যাগের—পাশ্চাত্য ভোগের, ক্রাইষ্ট অবতার	২২৪
সাধুসঙ্গে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায়, নিষ্কাম কর্ম্ম—ঘুমিয়ে মশা তাড়ানো	২২৬
নিরর্থক কিছু নেই, মহাকর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ, আমিটা কেন	২২৭
তিনটি ত্যাগ	২২৮
ভক্তজন্য শরীর ধারণ, বেঁচে থাকা শুদ্ধ সংস্কার বাড়াবার জন্য	২৩০
ব্যাকুলতা, হয় সাধুসঙ্গ নয় নিঃসঙ্গ	২৩১
শঙ্করাচার্য্য, গরীবের সেবা	২৩২
ঠাকুরের কাম-কাঞ্চন ত্যাগ কাব্যকথা নয়	২৩৩
ক্রাইষ্ট ও ঠাকুর অভেদ	২৩৪
বলি আটকে গেলে আর বলি দিতে নেই	২৩৫
ভক্তের জাতিভেদ নেই	২৩৬
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি	২৩৭
লেখা কাগজে আর লেখা চলে না, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন	২৩৮
লেখাপড়া, সাধুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি	২৩৯
নূতন ব্রহ্মচারীদের সমাজে মেশা উচিত নয়	২৪০

বিষয় | পৃষ্ঠা

মেয়েদের সকাম ভক্তি, সাধুর থাক, ২৪১
রাক্ষসীর গল্প, ঠাকুর ও নারায়ণ শাস্ত্রী ২৪২
ভোগ থাকতে ক্রাইষ্টকে বোঝা যায় না, সংসার চক্র, এ-যুগে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগ সোজা ২৪৩
বক্তৃতার পূর্ব্বে নির্জ্জনে বসে চিন্তা, ভগবান যোগক্ষেম বহন করেন ২৪৫
বুদ্ধের দয়া, নীচেকার অহং, ঠাকুরে ষোল আনা ২৪৬
ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য ২৪৭
অনন্ত সমুদ্র—অন্ত কোথায় ২৫১
ঠাকুর মান অপমানের অতীত, অবতারের আসা কেন ২৫৩
এ সময় না হলে ত্রিশ জন্মেও হবে না ২৫৪
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উদারতা ২৫৫
দুঃখ ও বৈরাগ্য ২৫৬
সাধুসঙ্গ ২৫৭
কেনোপনিষৎ ২৬০
পাতঞ্জলে মহাপুরুষের ধ্যান, ভিক্ষা উচ্চাধিকারীর জন্য গুরু অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু ২৬১
নাগ মহাশয়ের উৎসবে ২৬২
উৎসব—ব্রাহ্মসমাজে ও গুরুদ্বারে, মনোরথ ২৬৩
গেরুয়া দেখলে লোকে অবাক হয় কেন? ২৬৪
অজগর বৃত্তি, গুরুর আদেশ ২৬৫
সব ঈশ্বরের অধীন ২৬৬
অবতারকে ধরা কঠিন ২৬৭
গীতার অধিকারী হিসাবে ব্যবস্থা ২৬৮
বোম্বাই ও দেশী আম, ভক্তেরা অবতারের প্রতীক্ষায় থাকেন, বদ্রীকা পথের—সাধু ২৬৯
গুরুই পথ-প্রদর্শক ২৭০
জাতবিচার, কচ, এর ভিতরে কেউ আছে ২৭১
ঠাকুরের আরত্রিক, ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ, মা সব দেখিয়ে দিতেন ২৭২
সকলের দান গ্রহণে অসমর্থ, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, শরীর ধারণ তপস্যার জন্য ২৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধের অন্ন	২৭৪
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, সন্ন্যাস আশ্রম উচ্চ ভূমি	২৭৫
মহামায়ার প্রভাবে সংসার স্থিতি	২৭৬
ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ, তিনি কথা কন, আশ্রম ও সাধুসেবা	২৭৭
শক্তির এলাকা, মন-দর্পণে লীলা প্রতিবিম্ব	২৭৮
কর্ম্মফল, ডুব দেরে মন কালী বলে, রোক চাই	২৮০
ঈশ্বরেচ্ছা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য, দেহ ও দেহী	২৮২
সংযমীর রোক, আমি কর্ত্তা মিথ্যা কথা	২৮৩
স্বামীজীর কর্ম্ম ব্যবস্থা কেন	২৮৪
হিজিবিজি কর্ম্ম, গুপ্ত রিপু	২৮৫
চাতুর্বর্ণ, বিষে বিষক্ষয়	২৮৬
কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ	২৮৭
হাঙ্গামার ভয়ে কর্ম্মত্যাগ	২৮৮
শোকে সান্ত্বনা	২৮৯
সাধু জগদ্‌গুরু	২৯০
সংসারীর কর্ত্তব্য	২৯১
স্বামীজীই প্রথম রামকৃষ্ণ-পূজা প্রবর্ত্তন করেন, তপস্যা না থাকলে রামকৃষ্ণকে বুঝা যায় না	২৯২
মা কালীর লীলা	২৯৩
মৃত্যু-চিন্তা	২৯৫
কপিল, সাংখ্য, গুরু	২৯৬
কর্ম্মকাণ্ড, জ্যোতিষের মধ্যে অনন্তের ধ্যান	২৯৮
স্বপ্নাদেশে ঘটস্থাপন	২৯৯
মৈত্রেয়্যুপনিষদ	৩০০
প্রশংসা সাধনের বিঘ্ন	৩০১
শ্রীম স্কুলবাড়ীতে আসিয়া ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন	৩০২
শরৎ মহারাজ	৩০৩
নিষ্কাম কর্ম্ম, মন্ত্র, গুরু, প্রার্থনা	৩০৪
স্থিতপ্রজ্ঞ	৩০৭
বিদ্যাসাগর, প্রকৃতিভেদে উপদেশ,	৩০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুক্তাহারবিহার, নায়েব হওয়া ভাল নয়	৩০৯
বাহির ও ভিতর বাড়ী	৩১০
ভগবান ভক্তির বশ, ভবানীপুর হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন	৩১১
শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা	৩১৩
সিদ্ধাই থাকলে তাঁকে লাভ করা যায় না, শিখিধ্বজ ও চূড়ালা	৩১৪
মনুষ্যদেহে অবতার ছাড়া গতি নাই	৩১৫
যোগাবস্থা	৩১৬
ভিক্ষাচর্য্য	৩১৭
নানাভাবে শুদ্ধি, পরচর্চ্চা	৩১৮
ক্রাইষ্ট ও চৈতন্যদেব	৩১৯
যোগীর অনুভব ও লক্ষণ	৩২০
তীব্র বৈরাগ্য	৩২১
প্রকাশের তারতম্য, ঈশ্বর কর্ত্তা কারয়িতা	৩২২
বদ্ধ ও মুক্তপুরুষ	৩২৪
দাস্যভাব নিয়ে থাক	৩২৫
পদব্রজে তীর্থ	৩২৬
নানাবস্থায় নানা গান	৩২৭
নিষ্কলঙ্ক শ্রীরামকৃষ্ণ	৩২৯
আবৃত্তি ও নিবৃত্তি	৩৩০
জগদ্ধাত্রীর স্তব	৩৩১
কাজের আঁটা	৩৩৪
সন্ধ্যা হইয়াছে	৩৩৭
কর্ম্মের ভয়ে বৈরাগ্য	৩৩৮
বৃদ্ধ সাধুদের সঙ্গে	৩৩৯
শিবু দাদার সঙ্গে	৩৪২
দেহতত্ত্ব—আত্মা ও শক্তি	৩৪৪
অবতার চেনা বড় শক্ত	৩৪৫
সমাধির পর তৎস্মৃতি, ভক্তজব	৩৪৬
তৈত্তিরীয় উপনিষদ	৩৪৯
যোগীপুরুষ	৩৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
তীর্থ স্বভাব বদলে দেয়	৩৫৪
টাকা পড়ে থাকলেও স্পর্শ করতে নাই	৩৫৫
সাধুর নির্জ্জলা একাদশী—এগিয়ে যাও	৩৫৬
মা এখানে নেই, কর্ম্মশেষই সন্ন্যাস	৩৫৭
নানক, ঈশ্বর আনন্দ দিচ্ছেন	৩৫৮
মহাপুরুষগণের অধ্যবসায়	৩৫৯
নূতন মানুষ, ব্রহ্মচর্য্য পালন	৩৬০
স্বপ্রকাশ শিব	৩৬১
যতদিন শরীর ততদিন কর্ম্ম, সাধুর সাধুসঙ্গ	৩৬২
গাছের উপরের ফল ও নীচের ফল, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে	৩৬৫
সমাধ্যায়ী ও ঠাকুর, কথামৃতের মণি	৩৬৬
মুড়ি মিছরীর একদর	৩৬৭
সমাধিবান পুরুষের লক্ষণ—হৃদয় ও ঠাকুর	৩৬৮
শিক্ষকতা	৩৭৩
মহৎ লোক	৩৭৪
বরাহনগর মঠে ব্যাকুলতা	৩৭৫
প্রসাদ মাহাত্ম্য	৩৭৬
ঠাকুরের শেষ অবস্থা	৩৭৮
সেবা—রসিক মেথর	৩৭৯
সদ্গুরু, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য	৩৮০
শরীরে অবস্থা—যন্ত্রী	৩৮১
সাধুদের আচরণ	৩৮২
অন্তরঙ্গ—অহৈতুকী কৃপা	৩৮৪
স্বামী অভেদানন্দ ও রাখাল মহারাজ	৩৮৬
স্বামীজীর কীর্ত্তন, মুসলমান ভক্তসঙ্গ	৩৮৭
সমাধিতত্ত্ব লোকান্তর	৩৮৮
ধ্যান মানে কি? শুকদেব	৩৮৯
কর্ম্মফল, কমললোচন	৩৯০
ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ,	৩৯২
ঋষভদেব	৩৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্ব্ব সংস্কার	৩৯৪
বৈদ্যরূপে ভগবান	৩৯৬
অনিত্যতা বোধে ত্যাগবুদ্ধি, তীর্থে সত্ত্বগুণ	৩৯৭
নাগমহাশয় চরিত	৩৯৯
অমৃতের অধিকারী	৪০০
গুরু অসম্ভবকে সম্ভব করান, প্রতাপ রুদ্র	৪০১
মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ, আগে নিজে মানুষ হওয়া : আগে তাঁর পূজো	৪০২
কৌতূহল, অবতার অধিকারী হিসাবে বলেন	৪০৩
স্বাধীনতা	৪০৪
কঠোপনিষৎ শ্রেয়ের পথ	৪০৫
অহিংসা	৪০৬
স্ত্রীর জন্য সন্তানে টান	৪০৭
টাকা থাকলেই অনর্থ	৪০৮
দেবমন্দিরে প্রণামী	৪০৯
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি নাগমশায়	৪১০
অর্থ—সার্থক সদ্ব্যয়ে	৪১২
মহামায়াঃ তপঃ	৪১৩
উপলব্ধির তর-তম, নিত্যানন্দ প্রচারক	৪১৪
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান, অবতারের দুঃখ	৪২৪
অবতার আমড়াগাছকে আমগাছ করতে পারেন	৪২৫
অবতার কালভেদে অনেক. অতিন্দ্রিয় লোক	৪২৬
অবতার, বাবুরাম মহারাজ—অহৈতুকী ভালবাসা	৪২৭
আগে ঠাকুরের ধ্যান	৪২৮
আশ্রম মানুষের জন্য, মানুষ আশ্রমের জন্য নয়, ডাক্তার বিপিনবাবু	৪২৯
সুরেশ মিত্র. কলির ব্যবসা	৪৩১
জীবন্মুক্ত	৪৩২
দার্জ্জিলিঙে, ব্রহ্মচারীদের বেড়া দিয়ে রাখতে হয়	৪৩৩
সকলেই মহামায়ার বশ, লোকশিক্ষার পূর্ব্বে কঠোর তপস্যা	৪৩৪
জপ, মৃত্যুর পর	৪৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঠাকুরের একখানি ছবি, দেবাসুর ও ঋষিদের লক্ষ্য, জগৎপালন কর্ম্ম-ফলানুযায়ী	৪৩৬
নবঋষি মণ্ডল, শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্	৪৩৭
গুরুই সচ্চিদানন্দ, আশ্রমের কাজ শেষে নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা	৪৩৮
গুরুভক্তি ও উপমন্যু	৪৩৯
মহম্মদের প্রেম	৪৪০
অবতার হয়ে অসংখ্য জগতের খবর নিচ্ছেন, অবতারের পথ সরল পথ	৪৪১
অতুলনীয় প্রেম, পরনিন্দা, অসহিষ্ণুতা	৪৪২
মায়ার পারের খবর তর্কাতীত বিচার ও হরিমহাবাক্য	৪৪৩
তীর্থমাহাত্ম্য	৪৪৫
কর্ম্ম রহস্য, ভারত পুণ্যভূমি	৪৪৭
জীবনপথের শেষ	৪৪৮
চিরজীবী	৪৪৯
অবতার ও সর্ব্বত্যাগীর দল, অবতার বিষয়বুদ্ধির অগম্য	৪৫০
গেরুয়ার অধিকারী কে ? সাধুর কাজ	৪৫১
সংসারীর কর্ত্তব্য, গুরুশক্তি, গোপী প্রেম	৪৫২
সাধু কারুর তোয়াক্কা রাখে না	৪৫৪
অবতারের লোক ব্যবহার—পোড়াদড়ি	৪৫৫
অস্পৃশ্যতা, বিধবা বিবাহ, মাধুকরী	৪৫৬
প্রণবে অধিকার, মহাভাব	৪৫৭
গিভ্ এণ্ড টেক্	৪৫৮
বিকারের রোগী	৪৫৯
ঈশ্বর কত ভাবে দেখেন, সকলের কারণ পরমাত্মা	৪৬০
শরণাগতি মানে তাঁর সঙ্গে যোগ, মড গোস্বামী	৪৬১
স্বামীজীর কথা কাটবার যো নেই	৪৬৫
আগে সাধুসেবা	৪৬৬
দয়া ও মায়া, অবতার মায়াতীত	৪৬৭
প্রজারঞ্জন রামচন্দ্র	৪৬৮
সংহার, শ্রবণের অধিকারী	৪৬৯

শ্রীম—(মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

শ্রীম-জীবনকথা

যখন কাল প্রবাহে সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন অমিত কল্যাণগুণ-সম্পন্ন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপ্তকাম ভগবান ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য লীলাসহচরগণের সহিত ধরায় অবতীর্ণ হন এবং নিজ জীবনে সত্য, দয়া, ঈশ্বর-প্রেম, ত্যাগ ও তপস্যাদি দিব্য কীর্ত্তিসমূহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জনসাধারণকে সেই পথে প্রবর্ত্তিত করেন। শুদ্ধ সংস্কার-সম্পন্ন পার্ষদগণ তাঁহার অলৌকিক গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতি সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকেই জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া লোক মধ্যে তাঁহার মহিমা, সাধনের গূঢ় রহস্য, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির প্রচার করেন ও দেহান্তে তাঁহারই পাদপদ্মে বিলীন হন।

পিতৃপরিচয়

এইরূপ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভাগমনের অষ্টাদশ বর্ষ পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই, বাঙলা ১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ়, শুক্রবার শতভিষা নক্ষত্র, শ্রীনাগ পঞ্চমী দিবসে তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ মহেন্দ্রনাথ বা মাষ্টার মহাশয় কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাসের লেনে জন্মগ্রহণ করেন। উহার কিছু দিন পরে তাঁহার পিতা সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের একখানি বাড়ী ক্রয় করেন। অদ্যাবধি সেই (১৩.২ নং) বাড়ী বর্ত্তমান এবং উহা ঐ অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। মহেন্দ্রনাথের পিতার নাম শ্রীমধুসূদন গুপ্ত ও মাতার নাম শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী। মধুসূদন যেমন ধার্ম্মিক, সরল ও অমায়িক স্বভাব ছিলেন, মাতা স্বর্ণময়ী দেবীও সেইরূপ ঔদার্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা ছিলেন। মধুসূদনের চার পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ তৃতীয় পুত্র। কথিত আছে বহুদিন যাবৎ শিবারাধনার ফলে তিনি এই পুত্রটিকে লাভ করেন। সেই জন্য এই কুমার পিতামাতার বিশেষ স্নেহভাজন ছিল, এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত, শান্ত স্বভাব ও প্রিয়দর্শন বলিয়া পাড়ার সকলে তাহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

স্মৃতিশক্তি

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি অতি শৈশবের কথাও স্মরণ করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একদিন তিনি নৌকা যোগে মাতার সহিত মাহেশের রথ দেখিতে যান। ফিরিবার পথে সকলে দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীদেবীকে দর্শনের জন্য চাঁদনী ঘাটে নামিলে, বালক অকস্মাৎ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে এবং কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। তখন কে যেন আসিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া বালকের রোদন থামিয়া যায় এবং সে অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীম ভক্তদের কাছে বলিতেন, "হয় ত বা ঠাকুরই হবেন। কেন না তার কিছু দিন (চারি বৎসর) আগে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালী বাড়ী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ঠাকুরই তখন মা কালীর পূজক পদে রয়েছেন।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "একবার আমি মায়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে গিয়েছি। বয়স তখন পাঁচ বৎসর হবে। বাড়ীর প্রকাণ্ড ছাদ থেকে অনন্ত আকাশ দেখে অবাক হয়ে রইলাম। মনে অনন্তের ভাবের উদ্দীপন হয়েছিল।" আরও এক বার বলেন, "ছেলেবেলায় বৃষ্টি হলেই ছাদে গিয়ে ভিজতাম। কেউ কোথাও নেই, নীরব নিস্তব্ধ, ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে, অনন্ত আকাশের জলধারায় দাঁড়িয়ে থাকতাম।" বৃষ্টির সময় এক অসীম অনন্তের অপূর্ব্ব-ভাব তাঁহার মধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিভোর করিয়া দিত। তিনি আরও বলিতেন, "যখন ছেলেবেলায় মার সঙ্গে কালীঘাটে যেতাম, সেখানকার পাঁঠা বলি দেখে মনে হত বড় হলে বলি তুলে দেব। পরে যতই বয়স হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিরোধ করবার কারও সামর্থ্য নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ও হচ্ছে।"

আশৈশব তাঁহার পিতামাতার প্রতি অনুরাগ ও গুরুভক্তি কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার স্ববর্ণিত একটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের কুলপুরোহিত একবার আসেন। তাঁকে দেখলেই মনে হত ইনি সরল, উদার ও নির্লোভ। সত্যই ব্রাহ্মণ অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি এসে আমাদের রোয়াকে (ঠাকুরবাড়ীর প্রবেশ পথে যে রোয়াক আছে তাহাতে) বসলেন। তখন আমার দশ বছর বয়স হবে। মহাভারতে পড়ে-ছিলাম গুরুকে ভক্তি করতে হয়, পূজো করতে হয়। তাঁকে দেখেই ঐ কথা

মনে পড়ায় পা ধোয়ার জল, গামছা, আসন প্রভৃতি দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি কিন্তু ওদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না, উদাসীন ভাবে বসে রইলেন।”

দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা

মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালে হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করতেন। তখন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও দেবদেবীর স্তোত্র প্রভৃতি অনুরাগের সহিত পাঠ করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহার দেব দ্বিজ ও গুরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। স্কুলে যাইবার ও তথা হইতে ফিরিবার পথে তিনি ঠনঠনের ৺শীতলা মাতার মন্দিরে প্রণাম করিতে কখনও ভুলিতেন না। ঐ মন্দির বর্ত্তমানে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে অবস্থিত। কখনও কখনও তিনি ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে যাইয়া দেবীর সম্মুখে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন এবং ৺দুর্গাপূজার সময়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া মায়ের সম্মুখে বসিয়া পূজা পাঠ প্রভৃতি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতেন।

ছেলেবেলা হইতেই তিনি পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব, এবং সাধু সঙ্গ ভালবাসিতেন। বারুণী, দশহরা, রথযাত্রা, রাসপূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ পর্ব্বদিনে তিনি উৎসব দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন এবং কখনও মাতার সহিত, কখনও বা একাকী যাইয়া উহাতে যোগদান করিতেন। এই সংস্কার মহেন্দ্রনাথের মনে এত দৃঢ় হইয়াছিল যে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ঐ সকল উৎসব দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। তিনি নিজে না যাইতে পারিলে ভক্তগণকে পাঠাইয়া তাঁহাদের মুখ হইতে ঐ সকলের বিবরণ শুনিয়া তবে শান্ত হইতেন। বলিতেন, “বন্ধুরা গেলে আমাদেরও কিছু তীর্থের ফল লাভ হয়।” বিশেষতঃ পূত সাধু-সঙ্গ লাভ কিম্বা সাধুদের প্রসঙ্গ হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। বাল্যাবধি কামিনী কাঞ্চনত্যাগী সাধুদের চরিত্র ও উচ্চ আদর্শই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু ছিল।

মহেন্দ্রনাথ দৃঢ় শরীর, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পবিত্রতা ও অদ্ভুত মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষা কালে তিনি প্রায়ই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; এফ-এ পরীক্ষায় গণিতের কোন একটি বিভাগে উপস্থিত না হইয়াও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং ১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। স্কুল ও কলেজে

পড়িবার সময় তাঁহার পাঠে অনুরাগ ও পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বিষয় জানিবার প্রবল আগ্রহ ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি পাশ্চাত্যদর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় আয়ত্ত করেন। পরবর্ত্তী কালে কোন ঐতিহাসিক গবেষণামূলক বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় এই সব কত আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম।" তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশটি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং উহার কতক অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

ঋষিদের ভাবে অনুপ্রাণিত

কলেজে অধ্যয়ন কালে পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেও, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, ভট্টিকাব্য, মনুসংহিতা, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রাচ্য সাহিত্য এবং জ্যোতিষশাস্ত্রও তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হয়। পাশ্চাত্য ভাব তাঁহার জীবনে কখনও গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ যৌবনেও আধ্যাত্মিকতাই তাঁহার জীবনের মূল প্রবাহ ছিল। তিনি ভক্তদের নিকট বলিতেন, "কলেজে পড়বার সময় কুমারসম্ভবে মহাদেবের ধ্যানের বর্ণনা পড়ে খুব আনন্দ হত। কবি লিখেছেন, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ যাতে না হয় সেইজন্যে নন্দী শিবের কুটীরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাঁহাতে সোনার বেত নিয়ে ও ডান হাতের তর্জ্জনী ঠোঁটের ওপর রেখে অনুচরগণকে এবং বনের বৃক্ষ, পশু, পক্ষী সকলকে যেন ভয় দেখিয়ে বলছেন,—কেউ যেন কোন চপলতা বা শব্দ বা বিঘ্ন না করে। কেউ যদি করে, তাহলে সে উপযুক্ত শাস্তি পাবে। তাঁর ভয়ে গাছপালা ছবির মত, পাখীরা বোবার মত, জীবজন্তু শান্তভাবে, আর ভ্রমরগুলো নীরব হয়ে রইল।

"লতাগৃহদ্বার গতোঽথ নন্দী
বাম প্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলি সংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥ ৪১
নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে॥" ৪২ (কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ)

আবার বলিতেন যে কলেজে শকুন্তলা নাটকের কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণনা

পাঠ করিয়া তাঁহার মনে ঋষিদের কথা উদয় হইয়া তাঁহাকে তন্ময় করিয়া রাখিত। তাঁহার অন্তর সেই সময় ঋষিদের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি ও কারুণ্য রসে সর্ব্বদা আপ্লুত থাকিত। তিনি ভট্টিকাব্যের নিম্নোক্ত অংশটি উল্লেখ করিতেন—রাম ও লক্ষ্মণ তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিবার পর, বিশ্বামিত্র যখন যজ্ঞরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিজ আশ্রমে আনিলেন, তখনকার আশ্রমের বর্ণনায় আছে যে বৃক্ষলতাগুলিও যজ্ঞের ধূমে কজ্জলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।

"অথালুলোকে হুত ধূমকেতু
শিখাঞ্জন স্নিগ্ধ সমৃদ্ধ শাখম্।
তপোবনং প্রাধ্যয়নাভিভূত
সমুচরচ্চারু পতত্রি শিঞ্জম্॥ (ভট্টি, ২।২৪)

কলেজে পড়িবার সময় তিনি চৈতন্যচরিতামৃত বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। চৈতন্যদেবের ত্যাগ ও অতীন্দ্রিয় ঐশী প্রেম তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। পরবর্ত্তী কালে জনৈক ভক্তকে তিনি বলিয়াছিলেন, "চৈতন্যচরিতামৃত পড়। ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি পাগলের মত ঐ বই পড়তাম।" তিনি মনুসংহিতার সাধারণ নিয়মগুলি যথাযথভাবে পালন করিতেন। আইন পড়িবার সময় মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি তাঁহাকে পড়িতে হয়। একজন ভক্তকে আইন পড়িবার কথায় বলিয়াছিলেন, "practice (ওকালতি) কর আর না কর, আইন পড়। কারণ তাতে ঋষিদের আচার ব্যবহার নিয়ম কানুন অনেক জানতে পারবে।"

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মহেন্দ্রনাথ অদ্ভুত শুভসংস্কার লইয়া জন্মিয়াছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহার মন প্রাণ সদাই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইত। আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব তত্ত্বে পৌঁছিবার জন্য তাঁহার মন কিরূপ সচেষ্ট থাকিত তাহার পরিচয় তাঁহার নিজের কথা হইতেই পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে বিপদে, আপদে, রোগে, শোকে, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে ভুলিতেন না। কাতর ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাই তাঁহার একমাত্র বল ছিল। তাঁহার বাল্যকালের একদিনকার ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার আশ্বিনে-

ঝড়ের* কথা মনে আছে?" একবার আশ্বিন মাসের এক ভীষণ ঝড়ে যখন গাছপালা ঘড় বাড়ী সব ভূমিসাৎ হইতেছিল তখন মহেন্দ্রনাথ একাকী ঘরের কোণে বসিয়া একাগ্রমনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পরবর্ত্তী কালে ভক্তদের নিকট শ্রীম বলিতেন, "যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান অথবা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, সংস্কারবান পুরুষেরা তাদের কথায় হাসেন।"

হৃদয়বত্তা

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা তাঁহার সহজাত সংস্কার ছিল। উত্তরকালে যখনই জগতে কোন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন হইয়াছে তখনই তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেন। সেই সময় তাঁহার আহার কমিয়া যাইত; মাত্র জীবনধারণোপযোগী আহার করিতেন। কোনও ভাল জিনিষ মুখে দিতে বা ভাল বিছানায় শয়ন করিতে পারিতেন না। দুঃখ করিয়া ভক্তদের কাছে বলিতেন, "আহা! তারা কি কষ্টেই না জীবন যাপন করছে; অনাহারে শীতে কতই না দুঃখ ভোগ করছে! আমরা ত দিব্যি খেয়ে দেয়ে বেড়াচ্ছি। তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দেখি।" যে বৎসর (১৯২৪) যুক্তপ্রদেশের লছমন ঝোলা, হৃষীকেশ, কন্খল প্রভৃতি অঞ্চল জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়, তিনি লোকের দুর্দ্দশায় সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং সতত তাহাদের সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। দুই মাস কাল ক্রমাগত তাহাদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলিতেন। একদিন কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে যাইতে একজন ভক্তকে বলিলেন, "বলত আমি কি চিন্তা করছি।" ভক্তটি উত্তর দিলেন, "আপনি ঠাকুরকে চিন্তা করছেন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "সেই হৃষীকেশের কথা ভাবছি।" ডাক্তার ভক্তদের বলিতেন, "গরীব দুঃখীদের কেউ দেখবার নেই। কেউ তাদের খবর নেয় না। আপনারা তাদের কাছ থেকে ফি ত নেবেনই না বরং নিজেদের পকেট থেকে কিছু দিয়ে সাহায্য করবেন।" গরীব দুঃখী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিজেও তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একটি মুসলমান অনাথালয়ের ছাদ চাপা

* ১৮৬৪ খৃঃ ৫ই অক্টোবর তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৯।১০ বৎসর হইবে।

পড়িয়া অনেকগুলি মুসলমান ছাত্র মারা যায়। তিনি যখন এই কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে কী যে বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। সেই রাত্রে শুধু একটু দুগ্ধ পান করিয়াই রহিলেন। পরদিন সকালে নিজে স্থানটি দেখিতে গিয়া পিতামাতার মত শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মপর ভেদ ছিল না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি শিখ সকলের প্রতিই তাঁহার সহানুভূতি ছিল, সকলকেই তিনি ভালবাসিতেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে কোন স্থান হইতে কোন দুঃসংবাদ শুনিলেই তাঁহার হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিত। এই জন্য ভক্তগণ ও বাড়ীর লোকেরা তাঁহাকে কোন দুঃসংবাদ জানাইতেন না। ১৯২৪ সালে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের স্কুলবাড়ীর সম্মুখে মোটর চাপা পড়িয়া একটি ছেলে মারা যায়। তাহার পিতামাতা তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের কান্না দেখিয়া মহেন্দ্রনাথও অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কাহারও কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইলে অমনি তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, সত্যই যেন তিনি অন্তরে তাহার পীড়া অনুভব করিতেছেন। সময়ে সময়ে শোক চাপিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন।

> ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
> মষ্টর্দ্ধি যুক্তামপুনর্ভবং বা।
> আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহভাজা-
> মন্তঃ স্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
>
> (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১।১২)

রন্তিদেব পরদুঃখে কাতর হইয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে ভগবান! আমাকে এই বর দাও যেন আমি সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের দুঃখ ভোগ করিতে পারি এবং তাহারা যেন দুঃখ রহিত হয়।" এই সকল মহাপুরুষকে না দেখিলে ঐ শাস্ত্রোক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইত। মানব এমন এক অবস্থায় পৌঁছায় যেখানে তাহার সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান চলিয়া যায়, সকলকেই সে আত্মীয়-স্বজন বলিয়া মনে করে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, "ঈশ্বর দর্শন হলে সকল জীবের প্রতি প্রেম হয়।" তিনি বলিতেন, "যতক্ষণ 'আমি' 'আমার', ততক্ষণ দুঃখ বোধ থাকবেই। পরের দুঃখ দেখে যারা সহানুভূতি প্রকাশ করে না, তারা আবার মানুষ!"

বিবাহ

কলেজে পড়িবার সময় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। তাঁহার বয়স তখন আঠার কিম্বা উনিশ হইবে। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের ভগ্নী সম্পর্কীয়া শ্রীযুক্ত ঠাকুর চরণ সেনের কন্যা শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন। মহেন্দ্রনাথের ন্যায় নিকুঞ্জ দেবীও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বিশেষ ভাবে ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। যখনই ঠাকুর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, তেলিপাড়া* কম্বুলিয়া টোলায় তাঁহাদের ভাড়াটিয়া বাটীতে আসিয়াছেন তখনই তিনি স্বহস্তে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছেন। ঠাকুর ইঁহাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং একবার শিবপূজা করিবার উপদেশ দেন। ১৮৮৬ সালে ১৭ই এপ্রিল নিকুঞ্জ দেবী যখন পুত্রশোকে উন্মাদিনী প্রায় হন, তখন ঠাকুর নিজ শ্রীহস্তে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এবং বিশেষ মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে ঠাকুর যখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্যানে ছিলেন, সেই সময় নিকুঞ্জ দেবী তথায় উপস্থিত থাকিলে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী তাঁহার হাতে দিয়া ঠাকুরের পথ্যাদি পাঠাইতেন। তিনিও অতি সন্তর্পণে উহা ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার বসিবার আসন, খাবার জল প্রভৃতি দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীকে নিজের মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। পরবর্ত্তী কালে যখনই সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও কোলাহল তাঁহার অসহ্য হইত, তখনই তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে ছুটিয়া যাইতেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া অন্তরের সকল অশান্তি দূর করিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর দেশ জয়রাম বাটীতে গিয়াও কিছু দিন ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেন। এই ভাবে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ক্রমে তাঁহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার ভক্তির আকর্ষণে কখন কখন তাঁহাদের গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ীতে পক্ষাধিক অথবা মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া যাইতেন। সে

---

* ১৮৮৪, ২০শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার উত্থান একাদশীর দিন প্রথম ঠাকুর এই বাড়ীতে শুভাগমন করেন।

সময় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের পূজাদি মাতাঠাকুরাণীই নিজ হস্তে করিতেন।

শিক্ষকতা

বিবাহের পর মহেন্দ্রনাথ অধিক দিন আর পড়াশুনা করিতে পারেন নাই। বিদ্যার্জ্জনে বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও অর্থাভাব বশতঃ আইন পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য সওদাগরি আপিসে কিছুদিন কার্য্য করেন। মাষ্টার মহাশয়ের পিতাও সেই আপিসে কার্য্য করিতেন। কিন্তু এই কর্ম্ম তাঁহাকে বেশীদিন করিতে হয় নাই, কারণ ঠাকুর তাঁহার জীবনের অন্যগতি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। প্রথমে তিনি নড়াইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় অত্যল্প কালের মধ্যেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার পড়াইবার রীতি একটু নূতন ধরণের ছিল। তিনি পাঠ্য বিষয়টি এত সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে ছাত্রগণ উহা সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইত। তাহাদের নিকট কোন্ অংশটি দুর্ব্বোধ্য হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিতেন এবং তাহাদের মনের ভাব বেশ ধরিতে পারিতেন। তিনি ক্লাসে আসিবা মাত্রই ছাত্রগণ পাঠে অবহিত হইত। অধ্যাপনা কালে তিনি ধীর গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন। তাঁহার অভিনব শিক্ষাপ্রণালী ও বিদ্যাবত্তার জন্য স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। অনেকে অধিক বেতনে তাঁহাকে নিজেদের কলেজে বা স্কুলে অধ্যাপক বা প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। এইরূপে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত কলিকাতার সিটি ও রিপণ কলেজিয়েট স্কুল, মেট্রোপলিটান্ (মূল ও শাখা), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, এরিয়ান, মডেল প্রভৃতি বহু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সিটি, রিপণ প্রভৃতি কলেজে তিনি ইংরাজী, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। কখনও কখনও একই কালে দুইটি কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। কর্ম্মস্থলে যাইবার সময় তিনি পাল্কী ব্যবহার করিতেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তিনি শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান শাখা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীযুত রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামী), বাবুরাম (প্রেমানন্দ স্বামী),

সুবোধ (সুবোধানন্দ স্বামী), পূর্ণ ঘোষ, বিনোদ, বঙ্কিম (জনৈক ছাত্র), তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ঐ সময়ে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এইজন্যই ছাত্রগণ ও ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে 'মাষ্টার মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে কখনও 'মাষ্টার' নামে অভিহিত করিতেন।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও মহেন্দ্রনাথ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিতে বিরত হন নাই। বাল্যকাল হইতেই যে ধর্ম্ম সংস্কার তাঁহার মধ্যে ছিল তাহা কখনও প্রবল ভাবে, কখনও বা মৃদু ভাবে প্রকাশ পাইত।

ব্রাহ্মসমাজ—কমল কুটীরে

ঠাকুরের কাছে যাইবার পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। এই সময়ে পাশ্চাত্য দর্শনাদি পড়িয়া নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। কারণ ঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে বিশ্বাস?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "নিরাকার—আমার এইটি ভাল লাগে।" ব্রাহ্ম নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিবার জন্য তিনি কমল কুটীরে যাইতেন। কেশবচন্দ্রের উপাসনা কালে গম্ভীর ভাবদ্যোতক প্রার্থনা মন্ত্রগুলি মহেন্দ্র-নাথের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিত। কেশব যখন ঈশ্বরীয় ভাবে ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন তখন তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনায় শ্রোতৃমণ্ডলী একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। তিনি যখন অপূর্ব্ব বাগ্মিতা সহকারে কোনও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বা কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল এক অলৌকিক দিব্য ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। সেই সময় মহেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এক আদর্শ পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। উত্তরকালে ভক্তদের নিকট মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ওঃ! তাঁকে যে এত ভাল লাগত ও দেবতা বলে মনে হতো তার কারণ তিনি তখন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন এবং ঠাকুরের অমৃতময় উপদেশগুলি তাঁর নাম উল্লেখ না করে প্রচার করছেন।"

দর্শন

যাহা হউক, মহেন্দ্রনাথের জন্মাবধি এতাবৎ কাল পূর্ব্ব পুণ্য সংস্কারের প্রভাবে কখন তর্কশক্তির প্রাবল্য, কখন বিদ্যোৎসাহ, কখন দেবভক্তি,

কখনও বা সাকার মূর্ত্তিতে নিষ্ঠা, কখনও বা নিরাকারে অনুরাগ প্রকাশ পাইত। ক্রমে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল রহস্তময় এই মায়ারাজ্যের সহিত মহেন্দ্রনাথের পরিচয় হইতে লাগিল। যত দিন যাইতে লাগিল ততই সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ও আত্মীয়দের উৎপীড়নে তাঁহার অন্তরের সুপ্ত ঐশীশক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আত্মীয়দের পরস্পর বিবাদে মর্ম্মাহত হইয়া একদিন তিনি স্বার্থময় সংসারে বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র বোধ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন এবং বরাহনগরের শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র কবিরাজের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক কিরূপে এই সংসার হইতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সংসারের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশান্তি প্রভৃতি কেবল উহার অসারতা অনিত্যতা সম্যক উপলব্ধি করাইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। কারণ অভাব ও রোগশোকে কাতর হইলেই মানব ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈরাগ্যবান মহেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়া কালের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একদিন তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার জীবনের আশ্রয় ও শান্তিদাতার সন্ধান পাইলেন। ঐ বৎসরের (১৮৮১) ফাল্গুন মাসের রবিবার মার্চ্চ মাসে যখন প্রকৃতি নব-পল্লবে সজ্জিত হইতেছে এমন সময় তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে বেড়াইতে আসিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

তাঁহার মনে হইল, সেখানে যেন সর্ব্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে এবং মূর্ত্তিমান শুকদেব যেন ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছেন। সুন্দর দেবালয়, সন্ধ্যারতির মধুর শব্দ, পার্শ্বে কলকলনাদিনী জাহ্নবী এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এমনটি ত আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার দেবালয়, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষরাজি এমন কি প্রতি ধূলি কণা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট মধুময় বোধ হইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যেন প্রতিক্ষণে তাঁহার মনের অন্ধকার ও সর্ব্বপ্রকার সংশয় দূরীভূত হইতেছে। তিনি যেন নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন এতাবৎকাল হৃদয়ে যে ত্যাগের আদর্শ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন তাহা আজ বাস্তবরূপে তাঁহার সমক্ষে বিদ্যমান। তাঁহার অশান্ত ও ভারাক্রান্ত হৃদয় শান্ত ও লঘুভাব ধারণ করিল। শ্রীগুরুর কৃপা হইলে জগতে অসাধ্য

বস্তু কী আছে ?

তিনি পূর্ণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী এই সদানন্দ মহাপুরুষের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল ততই যেন তাঁহাকে নূতন নূতন ভাবে বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সংসর্গে তাঁহার জ্ঞান-নেত্র যেমন উন্মীলিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে দর্শনাবধি মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ে এক দিব্য উন্মাদনা আসিয়াছে, প্রাণে কী এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। গৃহে ফিরিয়াও নিস্তার নাই—সর্ব্বদা ঠাকুরের অলৌকিক ত্যাগ, বালসুলভ সরলতা, অতুলনীয় ঈশ্বর প্রেম, অদ্ভুত নিরভিমানতা, অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর এবং মুহুর্মুহু সমাধি তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। কখন দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, কখন তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিবেন—অহর্নিশি তাঁহার এই চিন্তা। অবসর পাইলেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে ছুটিয়া যান। এত আকর্ষণ যে শরীরের কথা মনেই থাকে না। বৈশাখ মাস, প্রচণ্ড রৌদ্র, যানবাহন নাই, তথাপি পদব্রজেই শ্যামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত—কে যেন টানিয়া লইয়া যায়। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর মহেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঠাকুর বলিতেন, "তাইত, আমার এ বাবাই শুধু নয়। এর মধ্যে (নিজেকে দেখাইয়া) কী একটা আছে যার টানে ইংলিশ ম্যানরা (ইংরেজী শিক্ষিতেরা) পর্য্যন্ত ছুটে আসে।"

গুরু-শিষ্য

মহেন্দ্রনাথ যতই তাঁহার দিব্য স্পর্শ এবং পরম প্রেমের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ধারণা হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে ইনিই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়, ভব সাগরের কাণ্ডারী একাধারে মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা। শিষ্যের এইরূপ একান্ত অনুরাগ দেখিয়া ঠাকুরও আধ্যাত্মিক রাজ্যের গভীর তত্ত্ব সকল তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেন। তিনি নানা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে—এ সব ত জানি।"[১] "সাদা চোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গ দেখেছিলাম তার মধ্যে

১। কথামৃত, চতুর্থভাগ, নবম খণ্ড। চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তোমায় যেন দেখেছিলাম।"[২] "তোমার সময় হয়েছে। পাখী ডিম ফোটাবার সময় না হলে ডিম ফোটায় না। যে ঘর বলেছি তোমার সেই ঘরই বটে।"[৩] "তোমায় চিনেছি—তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন, এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র।"[৪] আর একবার বলেন, "তোমার এখানকার প্রতি এত টান কেন? কলকাতায় অসংখ্য লোকের বাস, তাদের কারও প্রীতি হলো না, তোমার হলো কেন? এর কারণ জন্মান্তরের সংস্কার।" ঠাকুর তাঁহাকে উচ্চাধিকারী সংস্কারবান্ পুরুষ জানিয়া যথাবিধি সাধন প্রণালী শিখাইতে লাগিলেন। কিরূপে সাকারে মন স্থির করিতে হয় এবং কিরূপে নিরাকারের উপাসনা করিতে হয়, কি প্রকারে দাসীর মত সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরে মন প্রাণ অর্পণ করা যায়, কিরূপে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়, তৎসমস্তই তিনি একে একে দৃষ্টান্ত সহকারে মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন। সে সকল "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তিনি যখন সাধনার উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিলেন, ঠাকুরও তাঁহাকে আরও উচ্চস্তরে পৌঁছাইবার জন্য নিজের সাধনা কালে উপলব্ধ নানাবিধ ঈশ্বরীয় দর্শনের কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতেন। কোন্ পথে কোথায় কিরূপ বিঘ্ন আছে তাহাও বলিয়া দিতেন।

ঠাকুর চির পরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন। যখনই তাঁহার মধ্যে কোনও কিছু অন্যায় দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইতেন, তখনই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া সাবধান করিয়া দিতেন। তাঁহার ঐরূপ অহৈতুকী ভালবাসা পাইয়া মহেন্দ্রনাথ নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। তিনি ঠাকুরের প্রত্যেক কথাটি জীবনে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিতেন; অন্যের কথা তাঁহার ভাল লাগিত না। নীরবে ঠাকুরের কাছে বসিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতেন। ঠাকুর যেখানে যেখানে যাইতেন তিনিও তথায় উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা আদেশ করিতেন আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায় মহেন্দ্রনাথ তাহা সম্পাদন করিতে আপ্রাণ যত্ন করিতেন। ক্রমে ঠাকুরের

২। কথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ, একাদশ খণ্ড। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৩। কথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ, একাদশ খণ্ড। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪। কথামৃত, চতুর্থভাগ, অষ্টম খণ্ড। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কথাবার্ত্তা ও আচার ব্যবহার, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী, উদার আধ্যাত্মিক ভাব ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি মহেন্দ্রনাথের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। সময়ে সময়ে পক্ষাধিক বা মাসাধিক কাল তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরুর পাদমূলে বাস করিয়া অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ঈশ্বর লাভের জন্য তাঁহার ঐরূপ ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন, "দেখ, সময় হলেই পাখী ডিম ফুটায়।"

এইরূপ দিনের পর দিন, মাসের পব মাস গুরু শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। শিষ্যও ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে এই মহাপুরুষের সঙ্গে জগতের আর কাহারও তুলনা হয় না। ইনি কৃপা করিয়া না বুঝাইলে কাহারও ইঁহাকে বুঝিবার সাধ্য নাই। এরূপ ত্যাগ তপস্যা, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, ঈশ্বরীয় প্রেম, পবিত্রতা ও সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক উদারতা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঐশ্বর্য্য বিহীন মহাপুরুষেরা সংসারে এরূপ ছদ্মবেশে আগমন করেন যে তাঁহাদেব ধরিবার, ছুঁইবার সাধাবণের উপায় নাই। ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য শ্রীভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, এই শাস্ত্র বাক্যে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী কালে মাষ্টার মহাশয় ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরকে দেখেই রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব ও ক্রাইষ্ট প্রভৃতি যে অবতার তাতে আব সন্দেহ বইল না।"

উপযুক্ত অধিকারী পাইলেই সদ্‌গুরু তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ শিষ্য মধ্যে সংক্রমিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসান, কত মনের কথা কহিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। মহেন্দ্রনাথের ন্যায় আধার পাইয়া ঠাকুর সাধনার কোন গুহ্য কথাই তাঁহার নিকট অপ্রকাশ রাখেন নাই। ঠাকুর তাঁহার পাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন,— কেবল মহেন্দ্রনাথের নিজের জন্য নহে, জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতে তাঁহার বাণী প্রচারের জন্য। ঠাকুর তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দি... তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন কিনা, তাহা তিনি নিজে... যদি কোথাও ত্রুটি দেখিতেন, সংশোধন করিয়া... কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত ঠাকুর তাহা কৌশলে...

...আত্মীয়, ভব সাগরের
এইরূপ একান্ত অনুরাগ
...ল তাঁহার নিকট প্রকাশ
...দেখ, তোমার ঘর, তুমি কে,
তোমার পরে কি হবে—এ
...গ দেখেছিলাম তার মধ্যে

মাষ্টার মহাশয় বাল্যকাল হইতেই লাজুক... মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে চাহিতেন না। যাহ... সেই জন্য ঠাকুর একদিন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের (... তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তর্ক করি...

কাহার কি মনোভাব তাহা জানিবার ইহাও ঠাকুরের একপ্রকার রীতি ছিল। আর একদিন গান গাহিতে আদিষ্ট হইয়া মহেন্দ্রনাথ লোকের সম্মুখে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ও স্কুলে দাঁত বার করবে আর এখানে গান গাইতেই যত লজ্জা।" এই ভাবে অহৈতুক ভালবাসায় কখনও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া, কখনও জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করিয়া, কখনও বা অন্য উপায়ে মাষ্টার মহাশয়ের দুর্ব্বলতাগুলি দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী করিতে সচেষ্ট হইতেন। তিনি কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেন, "মাষ্টার এখন আনন্দ পেয়েছে।" আবার কখনও কখনও বলিতেন, "এঁর সখী ভাব।"

মাষ্টার মহাশয় ও নরেন্দ্রনাথ

ক্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মাষ্টার মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল। পরবর্ত্তী কালের কথোপকথনের মধ্য দিয়া আমরা দেখিয়াছি তিনি স্বামীজীকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন। স্বামীজীও যে মাষ্টার মহাশয়কে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কখনও কখনও স্বামীজী নিজের গোপনীয় আধ্যাত্মিক অনুভবসকল প্রাণের আবেগে তাঁহার নিকট বলিয়া ফেলিতেন। যখন তাঁহার পিতৃবিয়োগে অন্নকষ্ট উপস্থিত, কোথাও চাকরি খুঁজিয়া পাইতেছেন না, বন্ধুবান্ধবেরাও দুর্দ্দিন দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন তখন মাষ্টার মহাশয়ই মেট্রোপলিটান স্কুলে তাঁহাকে শিক্ষকতার কর্ম্ম জোগাড় করিয়া দেন; অবশ্য নানা কারণে উহা স্থায়ী হয় নাই। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" তৃতীয় ভাগ ত্রয়োবিংশ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে ঐ সময় জনৈক বন্ধু নরেন্দ্রনাথকে একশত টাকা দেন, যাহাতে তাঁহার বাড়ীর তিন মাসের ব্যবস্থা হইতে পারে; ঐ বন্ধুটি কথা তাঁহার ভা[illegible] [illegible]ই। নরেন্দ্রনাথের (পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ) অভাব পান করিতেন। ঠাকু[illegible]দাই লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার মায়ের কাছে তিনি থাকিতে চেষ্টা করিতেন। বলিয়া দিতেন যেন তাঁহার নাম না করা হয়; নচেৎ ন্যায় মহেন্দ্রনাথ তাহা স[illegible]দিবেন।

[illegible] বিজয় করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন, যখন [illegible] যখন তাঁহার ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র মুদ্রা আসিতে [illegible] মাষ্টার মহাশয়ের অদ্ভুত প্রীতির কথা ভুলেন নাই। [illegible]ত্রে লিখিয়াছিলেন, "মাষ্টার মহাশয়, আমি এখন

২। কথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ, [illegible]
৩। কথামৃত, দ্বিতীয়ভাগ, [illegible]
৪। কথামৃত, চতুর্থভাগ, [illegible]

ভিক্ষা করিয়া খাইতেছি। আমাকে কিছু ভিক্ষা দিবেন ?" কী অপূর্ব্ব ত্যাগ! ঐ সময় স্বামীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বিশেষভাবে ঠাকুরের কথাই পাড়িতেন।

গুপ্ত যোগী

ঠাকুরের অপূর্ব্ব বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া মাষ্টার মহাশয় একদিন তাঁহাকে বলেন, "সন্ন্যাস-জীবনই শ্রেষ্ঠ। যাঁরা অন্তঃ সন্ন্যাস ও বহিঃ সন্ন্যাস করতে পারেন, তাঁরাই মহাভাগ্যবান।" ঠাকুর তাহাতে বলেন, "মনে ত্যাগ হলেই হলো, অন্তঃ সন্ন্যাসই সন্ন্যাস। সংসার-কারাগার থেকে মুক্ত হলেই হলো। কেরাণী জেলে গেলে জেল থেকে বেরিয়ে কি ধেই ধেই করে নাচবে ? গুপ্ত ও ব্যক্ত দু রকম যোগী আছে ; গুপ্ত যোগী সংসারে থাকতে পারে।" এইরূপে ঠাকুর কখনও সাক্ষাৎভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে তাঁহাকে লোক শিক্ষার জন্য গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে আদেশ করেন। আবাল্য তাঁহার মধ্যে যে গুরুভক্তির বীজ নিহিত ছিল এক্ষণে উহা সুযোগ পাইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি গুরুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিলেও দৈনন্দিন জীবনে ঠাকুরের প্রত্যেক কথাটি এমনভাবে পালন করিতেন যে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। সংসারে থাকিয়া মানুষের এরূপ অবস্থা হইতে পারে ইহা কল্পনারও অতীত। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ভক্ত ও সাধু সঙ্গে অবিরল ভগবৎ প্রসঙ্গ, নির্লিপ্ত হইয়াও খুঁটিনাটি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান, গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসীর উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং উদারতা, সমত্ব, সর্ব্বভূতে প্রেম প্রভৃতি গুণসমূহ তাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

গুণগ্রাহিতা

মহেন্দ্রনাথ কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কাহারও মধ্যে একবিন্দু গুণ থাকিলে তাহাকে তিনি সিন্ধু করিয়া দেখিতেন। "পোকাটির পর্য্যন্ত নিন্দা না করিতে" তিনি চেষ্টা করিতেন। যদি কেহ কাহারও সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করিত, অমনি মাষ্টার মহাশয়, "মঙ্গলময় ভগবান মঙ্গল করিয়াছেন" বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে। জনৈক ব্রহ্মচারী ভিক্ষায় বাহির হইয়া পিপাসার্ত্ত হন। তিনি একজনের নিকট জল চাহিলে, সে ব্যক্তি জল দেওয়া দূরে থাকুক,

শ্রীম-লিখিত ডায়েরির এক পৃষ্ঠা

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চতুর্থ ভাগ একত্রিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

তাঁহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। ব্রহ্মচারী আসিয়া সমস্ত ঘটনাটি শ্রীমর নিকট বিবৃত করিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি ত তার দোষ দেখছ, আমি কিন্তু অন্য রকম দেখছি। তোমাকে ভাল জল খাওয়াবেন বলে ঈশ্বরই তার মুখ দিয়ে ঐ রকম বললেন। হয়ত সেখানকার জল দূষিত ছিল এবং তোমার তাতে অনিষ্ট হত। তুমি ত তা জান না, কিন্তু ভগবান জানেন। তিনি যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য করে থাকেন।" এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রেই তিনি লোকের গুণ দেখিবার চেষ্টা করিতেন এবং পরিশেষে দোষ বলিয়া কিছুই তাঁহার আর দৃষ্টিগোচর হইত না।

সংসারের যাবতীয় রোগ-শোকাদি বিপদ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উহাতে বিচলিত না হইয়া ঐ সকলের মধ্যে মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা হস্তই দেখিতে পাইতেন। তিনি বলিতেন, "গুরুর কৃপা আছে। সংসারে চৈতন্য হবার জন্যই দুঃখ কষ্ট দিচ্ছেন।" তাঁহার জিহ্বা ভগবৎ প্রসঙ্গে, তাঁহার হস্ত দেব সেবা, গুরু সেবা, সাধু সেবা বা ভক্ত সেবায়, তাঁহার পদযুগল তীর্থ ভ্রমণে নিযুক্ত থাকিলে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "ভগবান ইন্দ্রিয় দিয়েছেন নানাভাবে তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য, দেহসুখ ভোগ করবার জন্য নয়।" কেহ কোনও তীর্থ হইতে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট হইতে তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও প্রসাদ ধারণ করিয়া উৎফুল্ল হইতেন। এমন কি হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া ৺পুরীধাম হইতে আগত যাত্রীগণের নিকট হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ চাহিয়া লইতেন। সকলকে তীর্থ দর্শন, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিবার জন্য তিনি কিরূপ উৎসাহ দিতেন তাহা বর্ণনা করা যায় না।

তীর্থ দর্শন

মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটী এবং উহাদের নিকটবর্ত্তী শিহড়, শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে অসুস্থ সেই সময় মাষ্টার মহাশয় কামারপুকুর যাত্রা করেন। প্রথম দর্শনে তাঁহার মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক গল্প বলিতেন। সঙ্গে গরুর গাড়ী থাকা সত্ত্বেও বর্দ্ধমান হইয়া অধিকাংশ রাস্তা তিনি পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যেতে যেতে শুনলাম সে পথে এক জায়গায় ডাকাতের ভয়। সঙ্গে অনেক টাকা আছে মনে করে ডাকাতরা একবার

একটি যুবককে মেরে দেখে, তার কাছে চারটি পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তারা তার দেহটা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে চলে যায় এবং যাবার সময় নাকি তারা সেই চারটে পয়সা তার বুকের ওপর রেখে দিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে ভয়ে ভয়ে চললাম। কয়েকদিন পরে কামারপুকুরে এসে পৌঁছুলাম। একজন ছেলেকে ভোরের বেলা জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন ঘড়িতে কটা বেজেছে?" সে বলল, "আড়াইটে।" আমি হাসতে লাগলাম। পাড়াগাঁয়ের লোকরা ঘড়ির ধার ধারে না। তিনি আরও বলেন, "সেই সময় চোখে কে যেন নূতন অনুরাগের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল। সবই ঠাকুরের সঙ্গে জড়িত দেখতাম। যাকে দেখতাম তাকেই প্রণাম করতাম। দূর থেকে কামারপুকুর দর্শন করেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি।" এ রাস্তা দিয়ে ঠাকুর কতবারই না গিয়াছেন। তাঁহার পদধূলি সর্ব্বত্র রহিয়াছে। তাঁহার বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া তাঁহার শরীর আনন্দে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইত। তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কি করে গেলে ডাকাতের দেশে? আমি ভাল হলে এক সঙ্গে যাব।" ঠাকুরের শরীর যাইবার পরও শ্রীম কামারপুকুরে আট নয় বার গিয়াছিলেন। আমাদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন, "একবার মনের অবস্থা এমন হল যে ভাবলাম এখন থেকে কামারপুকুরেই বাস করতে হবে। সেখানে থাকার সব তোড়জোড় হতে লাগল; তারপর ভাবলাম যে একবার মাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি বলেন। তাঁকে সকল কথা বলায় তিনি হেসে বললেন, "বাবা, ও জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো ওখানে থাকতে পারবে না। পাড়াগাঁ ম্যালেরিয়ার জায়গা, কি করে থাকবে। তখন ওখানে বাসের ইচ্ছা ত্যাগ করলাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবৎকালেই মহেন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিংএ হিমালয় দর্শন করিতে যান। সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে ঈশ্বরের স্মরণ হওযায় ভাবাবেশে আপনা-আপনি তাঁহার চক্ষে জল আসে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?"

ঠাকুরের অদর্শনের পর মাষ্টার মহাশয় পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। কাশীতে শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে কিছু মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিলে, তিনি বালকের মত সন্দেশের চেঙ্গড়াটি লইয়া লুকাইতে থাকেন। ঐ সময়

কাশীর শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর সহিতও তাহার সাক্ষাৎ ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। অযোধ্যায় তিনি শ্রীযুত রঘুনাথ দাস বাবাজীরও দর্শন লাভ করেন।

১৯১২ সালে ৺দুর্গাপূজার পর তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কলিকাতা হইতে কাশীধামে গমন করেন। তথায় কিছুদিন বাস করিয়া বৎসরাধিক কাল নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। এই যাত্রায় হৃষীকেশে ও স্বর্গাশ্রমে ভিক্ষান্নভোজী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের সহিত একত্রে চার পাঁচ মাস কাল কুটীরে অবস্থান করেন। তাঁহার আবাল্য সাধু হইবার বাসনা ও সাধু সঙ্গে থাকিয়া সাধন ভজন করিবার ইচ্ছা এইরূপে কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি আশৈশব গভীর রাত্রে অথবা একাকী নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডল দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। স্বর্গাশ্রম বনজঙ্গল সমাকীর্ণ পার্ব্বত্য নির্জ্জন স্থান, তদুপরি সম্মুখে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জাহ্নবী, আবার চতুষ্পার্শে সংসারে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীবৃন্দ অহরহঃ ব্রহ্মচিন্তায় ও উপনিষাদি শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন—এই সকল দৃশ্য তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক নবীন ভাবের উদ্দীপনা জাগাইয়া দিত। উত্তরাখণ্ডের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ঘনীভূত আধ্যাত্মিকতায় তিনি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে প্রথমে তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেই চাহেন নাই। ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়েছিল, এখান থেকে মানুষ কি করে ফিরে যায়।" কিন্তু কিছুদিন থাকার পর বঙ্গে ঠাকুরের লীলাভূমির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হয়। মাষ্টার মহাশয় বলেন, "স্বর্গাশ্রমে থাকার সময় একদিন লছমন ঝোলায় বেড়াতে গিয়ে এক সাধুকে পুলের ওপর জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে দেখে জিজ্ঞাসা করি, 'মহারাজ, আপনি এখানে কি করছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'মা গঙ্গার পবিত্র বায়ু সেবন করছি।' এই পবিত্র বায়ু সেবন করলেও মানুষ পবিত্র হয়ে যায়।"

মাষ্টার মহাশয় যে কুটীয়ায় ছিলেন তাহার পাশে পাহাড় হইতে একটি ঝরণা প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কখনও কখনও গভীর রাত্রে বন্য হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সেই জল পান করিতে আসিত। এই জন্য মাষ্টার মহাশয় অধিক রাত্রে উঠিলেই একটি লণ্ঠন জ্বালিয়া রাখিতেন। তিনি কনখলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে কিছু দূরে, গঙ্গার ধারের একটি কুটীয়াতেও মাসাধিক কাল বাস করিয়াছিলেন। তখন পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন। তাঁহার সহিত একত্রে ভ্রমণ ও ঠাকুরের বিষয়ে আলাপ আলোচনাদিতে মাষ্টার মহাশয় দিনাতিপাত

করিতেন। তাঁহার কনখলে যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীস্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেখানে প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা করেন এবং ঐ উপলক্ষে অনেক সাধু ও গরীবকে খাওয়ানো হয়। ইহার পর তিনি বৃন্দাবনে গিয়া ঝুলন দর্শন করিয়াছিলেন। সেখানকার "রাসধারীর গান" তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। ইহাদের কৃষ্ণ সুদামার পালা তিনি দেখিয়াছিলেন এবং অনেক সময় কৃষ্ণ সুদামার গল্প ভক্তদের নিকট করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মাষ্টার মহাশয়কে আইন পরীক্ষার পূর্ব্বেই (১৮৭৫ বা ৭৬ সালে) অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। তদবধি ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি নানাস্থানে শিক্ষকতা করেন। ঐ বৎসর তিনি নকড়ি ঘোষের পুত্রের নিকট হইতে ঝামাপুকুরের মর্টন ইনষ্টিটিউসনটি ক্রয় করেন। এই স্কুল কিছু দিন পরে ৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। স্কুলটির এত সুনাম হইয়াছিল যে বহু ছাত্র তথায় পড়িতে আসিত এবং এক বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় দুইটি বাড়ীর প্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রকাশ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে Gospel of Sri Ramakrishna (রামকৃষ্ণের উপদেশ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯০৭ সালে উহা গ্রন্থের রূপ লাভ করে। এদিকে ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে মাষ্টার মহাশয় বাঙ্গালায় ঠাকুরের "কথামৃত" লিখিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ১৯০২ সালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কর্তৃক প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ক্রমে ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় ভাগ, ১৯১২ সালে তৃতীয় ভাগ এবং ১৯১৬ সালে চতুর্থভাগ প্রকাশিত হয়। "কথামৃত" লেখা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়রী লেখবার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভাল বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতাম, তখনই বিশেষ ভাবে লিখে রাখতাম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্ত্তা হত, বার, তিথি, নক্ষত্র তারিখ দিয়ে ডায়রীতে লিখে রাখতাম।" নিজ মহিমা প্রচারের জন্য ঠাকুরই যেন ঐ গুণটি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নতুবা এই ঘোর জড়বাদ ও সংশয়ের যুগে কে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিত?

"কথামৃত" জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে এক অক্ষয় কীর্ত্তি। উহা সাহিত্য হিসাবে যেমন বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ তেমনি ভাষার দিক দিয়া [illegible]। উহা একদিকে যেমন গম্ভীর জ্ঞানরাশিতে পরিপূর্ণ [illegible] অপর দিকে অসাম্প্রদায়িক ও

সার্ব্বজনীন। ইহার মধ্য দিয়াই আমরা দেখিতে পাই ঠাকুর কি ভাবে নীতি ও অনুষ্ঠানের, বেদ পুরাণ ও তন্ত্রের, কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ও রাজ-যোগের এবং দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের সামঞ্জস্য করিতেন। ইহাতে ঠাকুরের অলৌকিক প্রত্যক্ষগুলি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ স্থান পায় নাই বলিলেই হয়। "কথামৃত" কেবল বঙ্গদেশের চিন্তাভাণ্ডারকেই চিরসমৃদ্ধিশালী করে নাই সমগ্র জগৎকেও উহার অংশী করিয়াছে। যোগী, ভোগী, সংসারী, মুমুক্ষু, সাধক, সিদ্ধ, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী সকলেরই অবস্থা উহাতে বর্ণিত হওয়ায় প্রত্যেকেই ইহাতে আপন অন্তরের প্রতিচ্ছবি ও প্রশ্নের সমাধান দেখিতে পান। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরের সামনের বারান্দায় তিনি একদিন বৈকালে বসিয়াছিলেন এমন সময় মাষ্টার মহাশয় কয়েকজন ভক্তসহ সমস্ত মন্দিরে প্রণামাদি করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি মাষ্টার মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বের এক চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "মাষ্টার মশায়, আপনি কি অদ্ভুত 'কথামৃত'ই লিখেছেন! তাতে কী যে মোহিনী শক্তি আছে তা মুখে বলে শেষ করা যায় না। যে পড়ে, সেই অবাক হয়ে যায়। 'কথামৃত' পড়েই অধিকাংশ লোক সাধু হতে আসে। লোকে বলে, 'এ রকমটি আর কোন যুগেই হয় নি।' অপর কেউ যদি এ রকম "কথামৃত" লেখবার চেষ্টা করে ত সেটা নকল হবে, আসল আর হবে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি নই, আমি নই; তিনি তিনি। তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নিয়েছেন।"

"কথামৃত" প্রকাশিত হইবার পর দেশ-বিদেশ হইতে শত শত লোক ঠাকুরের কথা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতেও ভক্তেরা আসিতেন। ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁহার ক্লান্তি বা সময়াসময়ের বিচার ছিল না। যখন যিনি উপস্থিত হইতেন মাষ্টার মহাশয় তাহারই সহিত ধর্ম্মালোচনায় মাতিয়া উঠিতেন। অতি দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। সকলের কাছেই সেই অমৃতময় রামকৃষ্ণ কথা কহিতেন। সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ভালবাসা ও অকৃত্রিম স্নেহদৃষ্টি ছিল। ৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরখানি ও উহার সম্মুখস্থ ছাদটি যেন তপোবনে পরিণত হইয়াছিল। ছাদের এক পার্শ্বে টবেতে তুলসী ও ফুলের গাছ ছিল এবং

উপরে সুনীল অনন্ত আকাশ। সেখানে বসিলে মহানগরীর জন-স্রোত বা কোলাহলের সহিত কোনও সম্পর্ক থাকিত না। অন্যূন বিশ বৎসর কাল মাষ্টার মহাশয় সেইখানে বসিয়া অবিরাম ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য জীবন ও বাণী শুনিয়া অবাক হইয়া থাকিতেন ; কাহারও মুখে অন্য কথা বা মনে অন্য চিন্তা থাকিত না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত যাঁহারা তাহার সংস্পর্শ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, যেমন ছোট নরেন, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, অক্ষয়, দমদম মাষ্টার (যজ্ঞেশ্বর) ও হরিপদ—তাহারা এই স্কুলবাড়ীতে মাষ্টার মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। তিনিও তাহাদের সঙ্গে ঠাকুরের পুরাতন কথা আলোচনা করিয়া আনন্দ করিতেন। এতদ্‌ভিন্ন বেলুড় মঠের পুরাতন সাধু ও ব্রহ্মচারীদেরও এই বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। সরস্বতী পূজোপলক্ষে তাঁহাদের অনেকে এখানে সমবেত হইতেন।

সাধু ও ভক্তগণকে তিনি আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা অল্প বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিত, তাঁহাদিগকে মাতা যেমন পুত্রকে ভালবাসে সেইরূপ ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় ঠাকুরের কথা বলিয়া তাহাদিগকে ত্যাগের পথে প্রবর্ত্তিত করিতেন। "ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য আর সব গৌণ উপায় মাত্র"—এই উপদেশ বাক্যটি তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত। সাধনের যে সকল অন্তরায় আছে সেগুলি তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। প্রেমময় ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার বদনমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিত। তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়া অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। যে কেহ তাঁহার নিকট কিছু ধর্ম্মকথা শুনিবার বাসনা করিয়া গিয়াছেন, কেহই বিফল হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না সত্য, কিন্তু সকলের হৃদয়ে রামকৃষ্ণ-ভাবে সিক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

নিরভিমানতা

মাষ্টার মহাশয় খুব চাপা লোক ছিলেন। সহসা তাঁহার ভাব বুঝা বড় কঠিন হইত। কিছু বলিতে হইলে পরোক্ষ ভাবে ঠাকুরের নাম করিয়া বলিতেন। কোন ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া বলা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

তিনি নিজে যেরূপ দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বলিতেন। তাঁহার আদৌ অহংকার ছিল না। 'আমি' 'আমার' বলিলে পাছে অহংকার ভাব আসে সেইজন্য বহুবচনের প্রয়োগ করিতেন অথবা কর্ত্তৃপদ উহ্য রাখিতেন। তাঁহার বাড়ীর চলিত নাম ছিল "ঠাকুর বাড়ী"—কেহ উহাকে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিত না।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দের আগ্রহে মাষ্টার মহাশয় কখনও কখনও পাঁচ ছয় মাস কাল ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে অবস্থান করিতেন। তিনি সেখানে থাকিলে তথায় ভক্তের হাট বসিয়া যাইত। যদি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্কুলবাড়ীতে দুই একদিনের জন্য যাইতেন, আশ্রমবাসীগণকে বলিতেন, "আমি এখানে খাব না। এক ভক্তের বাড়ী যাচ্ছি সেখানে খাব।" তাঁহার এইরূপ নিরহঙ্কার ভাব ছিল। "কথামৃতে"ও তিনি মাষ্টার, মণি, মোহিনী-মোহন বা একজন ভক্ত, এই সকল ছদ্ম নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। উদ্দেশ্য, যাহাতে ঠাকুরের কথাগুলিই জনসাধারণে প্রচারিত হয় এবং নিজে গুপ্ত থাকিয়া যান। অবশ্য কিছু দিন পরেই ঐ নাম-রহস্য ভক্তদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে। ঠাকুর তাঁহার জাতি, বিদ্যা ধন বা গুণের অভিমান একেবারে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছিলেন।

গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি ভালবাসা

স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরটিতে তিনি একাকী থাকিতেন। সেই ঘরে পূজ্যপাদ স্বামীজী, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতির ফটো দেওয়ালে ঝুলানো থাকিত এবং তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিতেন। সকল গুরুভ্রাতার সঙ্গেই তিনি সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখিতেন ও তাঁহাদের সংবাদ লইতে ভুলিতেন না। কোন গুরুভ্রাতা অসুস্থ হইয়াছেন শুনিলে, হয় নিজে দেখা করিতে যাইতেন অথবা দূরে হইলে পত্রাদির দ্বারা সংবাদ লইতেন। ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শেষ অসুখের সময় মাষ্টার মহাশয় প্রত্যহ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট হইতে আসিয়া সেখানে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতেন। যেদিন মহারাজের শরীর ত্যাগের সংবাদ পাইলেন, সেদিন দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন; সমস্ত দিন আহার বা কাহারও সহিত দেখা করেন নাই। সন্ধ্যার সময় দরজা খুলিয়া যখন ভক্তদের কাছে আসিলেন, তখনও নিজেকে সামলাইতে

পারিতেছেন না ; চক্ষে জল ও মুখে কথা নাই—হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পরদিন ব্যাকুল ভাবে পদব্রজে মহারাজের ভক্তগণের গৃহে গমন করিলেন, যদি তাঁহাদের দেখিয়া ও তাঁহাদের নিকট হইতে মহারাজের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া হৃদয় কিছু শান্ত হয়। এইরূপ দিনের পর দিন তিনি ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতির বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

আর একদিন বৈকালে স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরে গদাধর আশ্রম হইতে আগত জনৈক সাধুকে দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন এবং গদগদ চিত্তে তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, তোমায় এক অদ্ভুত জিনিষ দেখাব।" এই বলিয়া মহারাজের ফটোখানি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন ও গাহিতে লাগিলেন—

"উদ্ধব রে তুই কিনা কৃষ্ণসখা মথুরাতে
শ্রীবৎস চিহ্ন নাই তোর বক্ষেতে॥" ইত্যাদি

গাহিতে গাহিতে প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সকল গুরুভ্রাতার প্রতি এইরূপই প্রেম ছিল।

অনিত্যতা বোধ

সংসার অনিত্য, সকল বস্তুর উপরই মৃত্যুর ছাপ রহিয়াছে, সবই দুদিনের জন্য. এইরূপ বোধ ও মৃত্যুচিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক ছিল। যদি কখনও কাহারও মৃত্যুসংবাদ পাইতেন, অমনি তাঁহার বৈরাগ্য দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইত। বলিতেন, "মিশরে পুরাকালে নরবলি দেওয়ার প্রথা ছিল। বলি দেওয়ার আগে লোকটাকে সাত দিন নানা রাজকীয় ভোগে রাখা হত। কিন্তু সে জানে যে সাত দিন পরে তার মরণ অবশ্যম্ভাবী, সে কি কোন ভোগ করতে পারে ? সেই রকম মৃত্যু-চিন্তা থাকলে কখনও বেতালে পা পড়ে না, বা কোনও জিনিষে আসক্তি আসে না।"

সংসারের ভার লইয়া থাকিলেও পাছে কাহারও হৃদয়ে ব্যথা লাগে, এই ভয়ে তিনি কাহাকেও রূঢ় কথা বলিতেন না, অথবা কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। কেহ অন্যায় করিলেও বলিতেন, "যার যে রকম স্বভাব ঈশ্বর দিয়েছেন, সে তাই করছে। মানুষের আর দোষ কি ?" এমনই তাঁহার মধুর স্বভাব ছিল। স্বাবলম্বী হওয়া তাঁহার জীবনের যেন ব্রত ছিল। নিকটে বহু ভক্ত ও ভৃত্যবর্গ থাকিলেও কাহারও নিকট হইতে সেবা লইতে চাহিতেন না। তিনি আটাত্তর বৎসর মানব শরীরে ছিলেন। শেষ অবস্থায়

যখন হাতের স্নায়ুশূলে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তখনও নিজে কাপড়ের পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক দিতেন। ভক্তেরা কেহ সেবা করিতে চাহিলে প্রত্যাখ্যান করিতেন, বলিতেন, "আমি নিজেই করে নেব।" কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিলে অসহ্য বোধ করিতেন। বলিতেন, "Mutual admiration (পরস্পর প্রশংসাবাদ) রেখে দাও।"

গৃহে থাকা কালে তিনি প্রাতে, স্নানান্তে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ধ্যানে বসিতেন। যখন নির্জ্জনে থাকিতেন তখন সর্ব্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। সংসারে থাকিয়াও তিনি অহরহ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে ডুবিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি গৃহী নামে মাত্র ছিলেন, পরন্তু তাহার অন্তরাত্মা পরবর্ত্তীকালে ঈশ্বরে সমাহিত থাকিত। "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" (মুণ্ডক, ২।২।৫) এই শ্রুতিবাক্যটি যেন তাঁহাতে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। শাস্ত্র বলিতেছেন—

কৃষ্ণো ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ।
বশিষ্ঠঃ কর্ম্মকর্ত্তা চ পঞ্চৈতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভোগী, শুকদেব ত্যাগী, জনক ও রামচন্দ্র রাজা এবং বশিষ্ঠ কর্ম্ম-কর্ত্তা হলেও সকলে সমান জ্ঞানী।

নির্জ্জনপ্রিয়তা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঠাকুরের উপদেশাবলীর অনুসরণে মহেন্দ্রনাথের উহা স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাকে কষ্ট করিয়া কিছু করিতে হইত না। ঠাকুরকে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে তিনি তদ্গত প্রাণ হইয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "গৃহে থাকলেও মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যেতে হয়।" তাই সত্তর বৎসর বয়েসও তিনি মাঝে মাঝে একান্ত স্থানে যাইতেন। নির্জ্জন প্রান্তর সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট লোভনীয় ছিল। ১৯২৩ সালে মিহিজামে নয় মাস কাল এবং ১৯২৫এর শেষভাগে ৺পুরীতে চার মাস কাল তিনি নির্জ্জন বাস করেন। ঐ সময় তিনি সর্ব্বদা ধ্যান ভজনে রত থাকিতেন।

উপনিষদের ঋষি

বৃক্ষরাজি দেখিলেই তাঁহার ঋষিদের কথা মনে পড়িত। বিশাল বনানী, গগনচুম্বী হিমালয়, অপার সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা মণ্ডল

এবং দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখিলেই তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন হইতেন। সর্ব্বভূতময় হরির চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় তন্ময় হইয়া যাইত। ঋষিদের ভাব আপনাতে আরোপ করিবার জন্য তিনি কখনও হবিষ্যান্ন ভোজন, কখনও পর্ণকুটীরে বাস, কখনও বা একাকী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিতেন। ১৯২৩ সালে মিহিজামে পাকাবাড়ী থাকিলেও তিনি খড়ের ঘরে নয় মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। ভক্তেরা কিন্তু পাকাবাড়ীতেই ছিলেন। বর্ষাকালে মেঘ ও বিদ্যুৎ দেখিয়া এই শ্লোকটি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন,—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ (কঠ ২।৩)

বলিতেন, "আপিসের বাবুরা যেমন পান চিবুতে চিবুতে আপিসে যায়, কখন নিজেদের কাজে অবহেলা করে না—সেই রকম।" প্রভাতের সূর্য্য দেখিলেই তাঁহার হৃদয় এক অলৌকিক ভাবে পূর্ণ হইয়া যাইত। তৎক্ষণাৎ গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিতেন, আর বলিতেন, "ঋষি সূর্য্যের ভেতরে জগৎ প্রসবিতাকে দর্শন করেছিলেন বলে তাঁর মুখ থেকে গায়ত্রী বার হয়েছিল। ঋষিরাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে তিনিই সকলকে চালাচ্ছেন। তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।"

তিনি যখন কোন উপনিষদ্ পড়িতেন বা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, ঠিক যেন শ্বেতশ্মশ্রু, সৌম্যবপু, প্রশান্ত ললাট কোন বৈদিক ঋষি তাঁহার মুখ দিয়া বেদ উচ্চারণ করিতেছেন। সপ্ততিপর বৃদ্ধ হইলেও মনে হইত যেন তিনি সদানন্দ বালক। ধনী-নির্ধন, মূর্খ-বিদ্বান, পাপী-তাপী সকলকেই তিনি আদর করিয়া তাহাদের নিকট ভগবৎকথা বলিয়া যাইতেন।

বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় বার গার্গী প্রশ্নকে (৩।৮) তিনি অতি উচ্চ অবস্থা দ্যোতক বলিয়া বর্ণনা করিতেন। মানব-জ্ঞানের যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই ছিল গার্গীর প্রশ্নের বিষয়। এক একদিন উপনিষদের ব্যাখ্যায় তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে আর অধিক পাঠ চলিত না। ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে একদিন সাদা-স্কুলবাড়ীতে (ছাত্রাধিক্য বশতঃ যে বাড়ীটি ভাড়া লওয়া হইয়াছিল) বসিয়া বৃহদারণ্যকোপনিষদের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ শুনাইতে শুনাইতে তিনি এমন মগ্ন হইয়া গেলেন যে বইখানি রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কাছের একজন ভক্ত অনেকক্ষণ বাতাস করিবার পর তবে তিনি কথা কহিতে পারেন।

শেষ কথা

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভের পর তিনি পঞ্চাশ বর্ষ কাল জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তাঁহারই চিন্তায় বিভোর হইয়া যাপন করেন। এই প্রাণারামের পাদপদ্মে তিনি তাঁহার বিদ্যাবত্তা, যশ, মান সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরই তাঁহার জ্ঞানদাতা, ভক্তিদাতা, শান্তিদাতা ছিলেন। মোক্ষপ্রদ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীগুরুদেবের নামে তাঁহার কী উল্লাস, কী আনন্দ ছিল! নিদ্রা, ক্লান্তিবোধ বা শরীরের দিকে দৃক্‌পাত ছিল না। একমাত্র সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ময় শ্রীগুরুদেবের কথাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহারই নাম করিতে করিতে মহেন্দ্রনাথ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন, ১৩৩৯ সাল, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ফলাহারিণী কালিকাপূজার পরদিন সকালে সাড়ে ছয়টার সময় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্ব রাত্রি নয়টায় পঞ্চম ভাগ "কথামৃতের" প্রুফ দেখা শেষ হয়। তাঁহার হাতের স্নায়ুশূলের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতঃকালে, "মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও"—বলিতে বলিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হইলেন। অপরাহ্ণ চারিটার সময় গঙ্গাতীরে কাশীপুর শ্মশানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থানের দক্ষিণে তাঁহার পূত-শরীর সৎকার করা হয়। শত শত ভক্ত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত ছিলেন। এখন সেই স্থানে ভক্তগণ একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-কথা ১ম খণ্ড

॥ ৯ ॥

সন ১৩৩১, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ, ২০শে মে।
স্থান—স্কুলবাড়ী। মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসন,
৫০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডায়েরী পড়া

শ্রীম সকালে স্কুলবাড়ীর চারতলায় শয়নঘরে বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলে তাঁহাকে বলিলেন, "কি গো, কেমন আছ? এইখানে বস।" ভক্তটি গত রাত্রে দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সেখানে থাকেন ও শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিতেছেন, "দক্ষিণেশ্বরে থাকবে অতি দীন-হীন ভাবে। যদি কেউ ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, বলবে, 'আমি কি জানি? এই মাত্র বলতে পারি, ঈশ্বর আছেন। তাও শোনা কথা।' কারুকে সেখানে থাকতে বলবে না। একলা একলা থাকবে।"

শ্রীম নিজের পুরানো ডায়েরী দেখিতেছিলেন। উহা অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর বলছেন, 'শুধু দর্শন নয়, আমার সঙ্গে কথা কয়েছে।' লাটু মহারাজ সকাল সকাল উঠতে পারতেন না বলে ঠাকুর তাঁকে বকে-ছিলেন। তা বাপ ছেলেকে ভাল করবার জন্য বকে না? ঠাকুরের বকুনি খেয়ে সয়েছিলেন বলেই ত তিনি এত বড় মহাপুরুষ হলেন। এই দেখ দুখানা বই বেরিয়েছে 'সৎকথা'*।"

পরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বাভাস

এই সময় ছোট জিতেন আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম—ঠাকুরের এত বড় ব্যামো, তবু 'মা' 'মা' করে পাগল!

ঠাকুরের অসুখের সময়ের সেই উৎকট যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া শ্রীম কাঁদিতেছেন। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

---

* পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, ইহাতে সেই সকল ও অন্যান্য কথা আছে।

শ্রীম—(গদগদস্বরে) তিনি জানতে পেরেছিলেন যে শরীর থাকবে না। এত বড় অসুখেও ভক্তদের জন্য চিন্তা। তাদের জিজ্ঞাসা করছেন, "খেয়েছ ?" তার পরদিন ঠাকুর মৌনী হয়ে রইলেন। দেখলেন, সব মায়া। কার সঙ্গে আর কথা কবেন ? প্রতাপ ডাক্তার এসে আশ্বাস দিলেন, 'ও সেরে যাবে।' কীর্ত্তন শুনে ঠাকুরের সমাধি। মধ্যে মধ্যে হাসি।

উত্তম বৈদ্য—হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর

বৈকাল পাঁচটার সময় বড জিতেনবাবু ও তাঁহার বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষ আসিয়াছেন। শ্রীম ছাদে ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—(পঞ্চাননবাবুর প্রতি) কোথায় থাকেন ?

জিতেনবাবু—আপনাকে দর্শন করবেন বলে অনেক দিন ধরে বলছিলেন, কিন্তু এতদিন হয়ে ওঠে নি। আজ জোর করে এসেছেন। অনেক পড়াটড়া আছে। ঈশ্বরে মনও আছে।

পঞ্চাননবাবু—মন থাকলে কি হবে ? কাজে করলে তবে ত।

শ্রীম—তিন রকম বৈদ্য আছে—অধম, মধ্যম ও উত্তম। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ওষুধ গিলিয়ে দেয়। ঠাকুর বলতেন, "যারা আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাদের এখানে আসতেই হবে।" তাদের আসতে দেরী দেখে বলতেন, "মা, কই তোমার শুদ্ধ ভক্তেরা এখনও ত এল না।" মৌমাছির এমনি স্বভাব ফুলের গন্ধ পেলে আপনিই আসে।

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহাদিগকে মাসিক "বসুমতী"তে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে তাহাই পড়িতে দিয়া নীচে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পঞ্চাননবাবুর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম—আপনি গদাধর আশ্রমের কাছেই থাকেন। আশ্রমে যান না কেন ?

পঞ্চাননবাবু—কাছে বলেই যাওয়া হয় না, দূরেই ভাল।

শ্রীম—যা বলছেন। বেদে বলছে, 'হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর', তবুও জীব বাইরে ছুটে ছুটে বেড়ায়। মায়াতে দেখতে দিচ্ছে না।'—আপনারা "বসুমতী"তে বঙ্কিম চাটুয্যের সঙ্গে ঠাকুরের কথা পড়লেন। ঠাকুরের কথা নষ্ট হবার যো নেই, অক্ষয় হয়ে থাকবে। যেমন দেখুন, বেদ এখনও রয়েছে। ঠাকুর দেহত্যাগ করেছেন সাঁইত্রিশ বছর হল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম পঞ্চাননবাবুর সহিত আরও কিছুক্ষণ কথা কহিয়া ধ্যান করিতে গেলেন। ভক্তেরাও ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে শ্রীম ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ

শ্রীম—কলেজ স্কোয়ারে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। সেখানে বুদ্ধদেবের উৎসব হয়। বুদ্ধদেব গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই গাছতলায় বসে তাঁর নির্ব্বাণ লাভ হয়েছিল কিনা, তাই প্রেম হয়েছে। ঠাকুর যখন পঞ্চবটিতে যেতেন তখন পঞ্চবটীকে নমস্কার করতেন। বলতেন, "এখানে ঈশ্বরীয় চিন্তা, ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন অনেক হয়েছে।"

এই সময় পুলিনবিহারীবাবু ও তাঁহার বন্ধু ডাক্তার শশিকুমার আসিলেন।

শ্রীম—আসুন, আসুন, বসুন। আমাদের বুদ্ধদেবের কথা হচ্ছিল। বুদ্ধদেব গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছু মুখ দিয়ে বলতে পারছেন না—প্রেম হয়েছে। যেমন, বোবা স্বপন দেখে কিছু বলতে পারে না, বা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল, আর কোনও খবর দিতে পারলে না।

পুলিনবাবু—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গেও ঠাকুরের এই সব কথা হয়েছিল। ব্রহ্ম যে কি তা কেউ মুখে প্রকাশ করে বলতে পারে না।

শ্রীম—বুদ্ধদেবের অহিংসা, দয়া এবং সকলের প্রতি প্রেম দেখে স্বামীজী তাঁকে বড় ভক্তি করতেন। ঠাকুর বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "বুদ্ধদেব ভগবানকে বোধে বোধ করেছিলেন—বুদ্ধদেব অবতার।" ঠাকুর যেকালে বলে গেছেন, তখন আমাদের মানা উচিত। সকলে কি অবতারকে ধরতে পারে? বেগুনওয়ালা হীরার বদলে বড় জোর ন সের বেগুন দিতে পারে। জহুরীই কেবল ঠিক ঠিক দাম দিতে পারে।

ইহা বলিয়া তিনি বেগুনওয়ালার গল্পটি তাঁহাদিগকে শুনাইলেন।

শ্রীম—গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে ধরতে পেরেছিলেন। ঠাকুরের কাছে যাবার আগে তিনি অনেক নাড়াচাড়া করেছিলেন—রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, চৈতন্যদেব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখেছিলেন। আগে থেকেই এই সব চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছিল, তাই অত সহজে ধরতে পেরেছিলেন।

পুলিনবাবু—"কথামৃতে" এক কথাই বার বার লেখা হয়েছে।

শ্রীম—তা থাকবে না? যার সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে তা না লিখলে

লোকে কি করে বুঝবে? যেমন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল, তা যদি সব না লেখা হয়, তাহলে সকলে কি করে বুঝবে যে এইসব কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছিল? হৃদয় একবার ঠাকুরকে বললেন, "মামা, সব কথা একবারে বলে ফেল না।" ঠাকুর তার উত্তরে বললেন, "তোর কি তাতে? আমি এক কথা হাজার বার বলব।"

পুলিনবাবু—ঠাকুরের কাছ থেকে একটি জিনিষ কেউ আদায় করতে পারেন নি—মৃত্যুর পর কি হয়?

শ্রীম—তাঁকে কি কেউ ধরতে পারে? তাঁর এক বিন্দুতে আমাদের সিন্ধু! তিনি যেটুকু দিয়ে গেছেন লোকে সেইটুকুই বড় ধরতে পেরেছে? কেন, ওকথা তিনি বঙ্কিমবাবু, কেশববাবুকে ত বলেছেন?

পুলিনবাবু—ঠিক করে বলেন নি; কুমোরের কাঁচা হাঁড়ির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

শ্রীম—বিকারের রোগী কত কি বলে। মানুষ কি বুঝবে? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? ঠাকুর বলতেন, "জানতে চাই না, মা, কেন বিচার করাও?" বিচার করে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে দেখতে পাওয়া যায় না। যে ঠিক দেখেছে সেও কিছুই বলতে পারে না।

একজন ভক্ত—গিরিশবাবু ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তুমি কে গো?"

শ্রীম—তা আপনার লোককে অমন বলা চলে।

পুলিনবাবু—ইনি আমার বন্ধু—নাম ডাক্তার শশিকুমার। এঁর পত্নী-বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীম—আহা! ঠাকুর ছোকরাদের ডেকে বলতেন, "দেখ্, বিয়ে করিস নে। এঁর (শ্রীমর) এই বিপদ তোদের শিক্ষার জন্য।* সবাইকে সব কথা তিনি বলতেন না। যারা অন্তরঙ্গ, কেবল তাদেরই বলতেন। যে তাঁর কাছে গেছে সে কত বড় মহৎ লোক!

পুলিনবাবু ও তাঁহার বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম—একজন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার কিসে হয়?" ঠাকুর তাকে বললেন, "তুই খুব কাঁদতে পারিস, নির্জ্জনে, গোপনে, সাইন

* মাষ্টার মহাশয়ের সন্তান-সন্ততি মারা যাওয়ায় তিনি এই কথা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

বোর্ড না মেরে ?" একজন ঠাকুরকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর চিন্তা করবার জন্য তিনি গঙ্গার ধারে একটা ঘর করেছেন। ঠাকুর তা শুনে তাঁকে নিষেধ করলেন। নির্জ্জনে গোপনে সাধন ভজন করতে হয়, কেউ যাতে টের না পায়।

"ঠাকুরকে মেয়েমানুষ স্পর্শ করলে শিঙ্গি মাছের কাঁটা বেঁধার মত যন্ত্রণা বোধ করতেন। টাকা ছুঁতে পারতেন না।"

শ্রীমর ইচ্ছানুসারে মাখনবাবু হারমোনিয়াম সহযোগে "গীতাবলি" হইতে গান গাহিতেছেন।

"জয়রাম বাটী আসিয়ে এবার
কত মতে কর পতিতে উদ্ধার। ইত্যাদি

"জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎ সার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।" ইত্যাদি

"অরূপ সায়রে লীলা লহরী, উঠিল মৃদুল করুণা বায়।
আদি-অন্ত-হীন অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানব কায়।" ইত্যাদি

শ্রীম—আহা, এ গান যে রচনা করেছে সে ধন্য! এতে এপার-ওপারের সেরা কথা রয়েছে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২ ॥

২১শে মে, বুধবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বৈকাল প্রায় পাঁচটা। জয়রাম বাটী হইতে সিহোড়ের এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—আপনি ঠাকুরকে কবার দেখেছেন ?

ভদ্রলোক—তিন বার। আমাদের বাড়ীতেও ঠাকুর এসেছিলেন এবং

খেয়েছিলেন। হৃদয় মুখুজ্যের বাড়ীতেও একবার গান শুনতে তিনি গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে চিনেও চিনতে পারি নি। দক্ষিণেশ্বরেও দর্শন করতে গিয়েছিলাম। তখনই কেবল তাঁকে চিনতে পেরেছিলাম।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোকটি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইল। শ্রীম ছাদে চেয়ারের উপরে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের পর স্তব পাঠ করিতেছেন—

"ও সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমঽস্তুতে ॥" (চণ্ডী ১১।৯)

এইবার নিজে সুর করিয়া গান করিতেছেন—

"এস মা, এস মা, ও হৃদয় রমা, পরাণ পুতলী গো।
(মম) হৃদয় আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো ॥
(আমি) আছি জন্মাবধি তোব মুখ চেয়ে, ধরি এ জীবন কি যাতনা সয়ে
(তাত তুমি জান মা, অবোধ সন্তানেব দুঃখ)
(মম) হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহাতে গো ॥"

গায়ত্রীর অর্থ। সাধুরাই শ্রেষ্ঠ মানব

এইবার ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ আসিয়া জুটিতেছেন।

(শ্রীম—আমরা তাঁর (জগৎজননীব) স্তন পান করছি। ঋষিরা নির্জ্জনে গিয়ে তাঁরই চিন্তা কবতেন। তাঁরা চিন্তা কবতে করতে স্পষ্ট দেখেছিলেন যে তিনিই মন বুদ্ধিকে চালাচ্ছেন। তাই তাঁদের মুখ থেকে গায়ত্রী মন্ত্র বার হয়েছিল। গায়ত্রীর মানে যিনি আমাদেব বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন, তাঁকেই আমরা ধ্যান করি। তা হলেই দাঁড়াল ঠাকুর যা বলে গিয়েছেন, "তিনিই সব করাচ্ছেন।")

"দেখ না তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে আলো ও উত্তাপ দেবার জন্য রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আমরা দেখে অবাক! লোকের চৈতন্য হবার জন্য তিনি সাধুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরাই Highest men (শ্রেষ্ঠ মানব)। সাধুরাই তাঁকে বেশী ধরতে পারেন। তাঁরা সোজা পথে উঠেছেন। তাঁরাই ভগবানকে লাভ করতে পারেন। সাধুদের ভগবান লাভের পর আর থাকবার কি দরকার? তবে কিছু সৎকর্ম্ম করবার জন্য তাঁরা দেহ রাখেন।"

বড় জিতেন—এই যে সব সাধুরা আসেন—এঁরা কি সকলেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ নিয়ে আছেন?

শ্রীম—এঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। কত বড় ত্যাগ! সব ছেড়ে ছুড়ে রয়েছেন। চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন। সংসারীরা কলঙ্ক সাগরে মগ্ন হয়েও আবার কলঙ্ক অর্জ্জন করছে। শেষে বলে উঠবে, "ত্রাহি মাং মধুসূদন।" সাধুরা যদি অন্যায়ও করে তবু আবার ঝেড়ে ফেলতে পারে। সৎসঙ্গে যেটুকু ভাব পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ। একটু একটু মধু আহরণ করে কলসীতে রাখতে হয়। যদি কলসী ভরা মধু একবারে পাওয়া যায় তা হলে আর অন্যখানে যাবারই দরকার হয় না। ছুটোছুটি করবার আর কি দরকার? তাঁকে পাবার জন্যই অন্তরে ব্যাকুলতা। তাঁকে পেলে সবতাতেই আনন্দ। ব্যাকুল হলেই তিনি জানতে পারেন। কেউ মুখে বলতে পারছে না বলেই কি তার ক্ষুধা পায়নি? তিনি ত অন্তর্যামী। পিঁপড়ের পায়ের নূপুর ধ্বনিও তিনি শুনতে পান।

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' (কঠউ, ১।২।১৯)

তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম, মহান হতেও মহত্তর।

'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম (গীতা ১০।১৫)

হে পুরুষোত্তম! তুমি নিজেই নিজেকে জান।

বড জিতেন—আমরা বড়ই দুর্ব্বল।

শ্রীম—তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, 'আমায় শক্তি দাও'।

আশ্চর্য্য বস্তু

বড় জিতেন—মুখ থেকে আবোল-তাবোল বেরোয়।

শ্রীম—কলসী পূর্ণ হলে আব শব্দ থাকে না। কাঁচা ঘিয়ে লুচি ছাড়লে ছ্যাঁক কলকল করে। কথা কবার কি দরকার? বসে বসে তাঁর মাই খাও। আগাগোডা তাঁর মাই খাওয়া, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত। দেখনা এই শরীর মায়ের পেটে এক বিন্দু জল থেকে গড়েছেন। এ থেকে আর আশ্চর্য্য কি আছে? মায়ের পেটে সাধারণ জিনিষ থেকে মাংসপিণ্ড হয়। তাই থেকে হাত, পা, চোখ, নাক, কান প্রভৃতি কত কি হয়। তার গড়নও যেমন আশ্চর্য্য, আবার ভাঙ্গনও তেমনি। যেমন গিন্নী ছেলেকে মাই দিচ্ছে। যেই ছেলে কাঁদলে অমনি দিলে এক চড়। চড় খেয়ে ছেলেটা যেন মরেই গেল। আবার তার এমনি শক্তি যে মাই দেওয়া মাত্র ফের যেন বেঁচে উঠল। দেখাচ্ছে তিনি-ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠাকুরও বলতেন, "বাবু, 'আমি কে' অনেক খুঁজলাম। শেষে দেখি তিনিই বসে আছেন।" আবার

একদিন বললেন, "এই শেষ কথা—মা আর আমি। একটির দ্বারা প্রাণরূপে চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন আর একটিকে তাঁকে ভালবাসার জন্য রেখেছেন।" এই বলিয়া শ্রীম গান ধরিলেন—

"অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তর যামিনী।
কোলে করে আছ মোরে দিবস রজনী॥
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি।
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী॥ ইত্যাদি

"গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কত ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণকে এক একবার দেখতে পেতেন না। আমরা এমন কি ভাগ্য করেছি যে তাঁকে সর্ব্বদা দেখতে পাব? তাঁর কাছে যে গেছি এই আমাদের ভাগ্য।"

অনৈশ্বর্য্যের ভাব। গিরিশ ঘোষ

"ঠাকুরের এই ত ঐশ্বর্য্য। মাত্র ছ টাকা মাইনে, দেশে আত্মীয়েরা খেতে পাচ্ছে না। তবু ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধাভক্তি ছাড়া মার কাছে আর কিছু চাইবার জো নেই। যাঁরা ঠাকুরকে ঐশ্বর্য্যহীন দেখেও তাঁর কাছে যেতেন, ঠাকুব কি তাঁদের আপনার লোক বলবেন না? সংস্কার না থাকলে কি কেউ যায়? অন্য লোকের ভালই লাগবে না। অধর সেন অফিস থেকে এসে মুখে জল দিয়ে দু তিন টাকা গাড়ী ভাড়া দিয়ে ঠাকুরের কাছে যেতেন। আমিও ঐ রকম মাঝে মাঝে গেছি।

"যে হীরা মাণিক নিয়ে নাডাচাডা করেছে, সেই ত তাদের চিনতে পারে। গিরিশ ঘোষ এসেই ঠাকুরকে চিনেছিলেন। চিনবেন না? আমরা শুনেছি, ছেলেবেলায় তিনি হবিষ্যি করতেন। বলতেন, 'ঈশ্বর যদি বলেন তা হলে শুনব।' রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বন করে নাটক লিখেছিলেন। যখন "চৈতন্যলীলা" নাটক অভিনয় করেন, সেই সময় ঠাকুর গিয়ে পড়লেন। তার কিছু দিন পরে গিরিশবাবু ঠাকুরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'কবিরা যেমন লিখে থাকে, আমিও সেই রকম লিখেছি।' তাতে ঠাকুর বললেন, 'তুমি বোঝ না, তোমার ভেতর ভক্তি ছিল।'

"শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, 'উদ্ধব, তুমি একবার গোপীদের খবর নিয়ে এস। আমি কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত বলে খবর নিতে পারি নি। আমার যখন কোনও ঐশ্বর্য্য ছিল না, তখন তারা আমাকে অনেক ভালবেসেছে। এখন

আমি যাকে ইচ্ছা রাজা করছি, এখন সকলেই মানবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? তাদের ভালবাসার ঋণ আমি কোনও দিন শোধ করতে পারব না!' এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন। প্রেমের শরীর কি না?"

রাত প্রায় দশটা হইয়াছে। ভক্তেরা একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল কয়েকজন রহিয়া গেলেন।

॥ ৩ ॥

২২শে মে, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। ফুলবাড়ী

বৈকাল পাঁচটায় ফুলবাড়ীর ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন, এমন সময় ডাক্তার অঘোরবাবু ও তাঁহার শ্যালক আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

দেহতত্ত্ব

শ্রীম—(শ্যালকের প্রতি) এঁর যোগীর চক্ষু।

ডাক্তার—ছেলে বলা থেকে সৎসঙ্গ পেয়েছে। এই বয়সে খুব করেছে। আমি কিছুই পারলাম না। ইন্দ্রিয় সংযম না হলে কিছু হল না।

শ্রীম—যে যে-থাকের লোক, তাকে তিনি তেমনি ভাবে রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, তবু তাদের ভোগের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

"এই দেহেতে Heart (হৃৎপিণ্ড), Lungs (ফুসফুস), কত কি তিনি করেছেন। আপনি ডাক্তার—দেহের তত্ত্ব ভাল বুঝতে পারেন।"

ডাক্তার—কিছুই বুঝতে পারি না। ভগবানই সর্ব্বদা রক্ষা করেন। মানুষ কিছুই করতে পারে না। আমার একবার ব্যায়াম করতে করতে ঠাণ্ডা লেগে কাসি হয়েছিল। সেই কাসি কিছুতেই সারে না। আমার স্ত্রী আমাকে শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে যায়। তাঁর কাছে আমার দীক্ষা হয়। কিছু দিন পরে ঐ কাসি সেরে যায়।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা দুই জনে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা

হইয়াছে। শ্রীম ধ্যান করিবার জন্য নিজের ঘরে যাইলেন। ভক্তেরা একে একে আসিতেছেন। ধ্যানের পর শ্রীম ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে ভক্তদের বলিতেছেন, "বসে বসে মায়ের (জগন্মাতার) দুধ খাও।"

(ছোট জিতেনের প্রতি) "ওকে কি রকম দেখলে?"

ছোট জিতেন—তাঁর বড়ই দুঃখ। ঐ ছেলের জন্য বিয়ে করেন নি।

শ্রীম—(চেয়ারে বসিয়া) সাধে কি লোকে পরকালের কথা জিজ্ঞাসা করে? দুটি মা-মরা ছেলে এসেছিল। আমি তাদের বললাম, "মা তোমাদের দেখতে পাচ্ছেন। তিনি ভগবানের কাছে গেছেন। আমরাও সেখানে গেলে তাঁকে দেখতে পাব।" অমনি তাদের ষোল আনা বিশ্বাস হয়ে গেল। তখন আর আমায় ছাড়ে না। বালকের বিশ্বাস কি না?

("বড়রা বিচার করে। আমাদের অত খবরে কাজ কি? জন্মাবার আগে কি ছিলাম তার খবর নেই, আবার মৃত্যুর পর কি হবে তারও খবর নেই। তাঁর হাতের যন্ত্র—ঠিক যেন বাঁশীর মত। বাঁশীকে বাজালে বাজে, না হলে পড়ে থাকে।) দিনাজপুরের ডাক্তার অঘোরবাবু এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'দেহের তত্ত্ব কিছু বোঝবার জো নেই।' হাওয়া, খাদ্য, মস্তিষ্ক, রক্ত চলাচল—এই সব দিয়ে তিনি কথা বলাচ্ছেন। যোগীরা অনাহত শব্দ শুনিতে পায়।

"পরমহংসদেব অমুকখানে এসেছেন শুনলেই ভক্তরা ছুটে যেত। তাদের বলতে হত না।"

আদ্যাশক্তি—সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম। যোগগম্য

স্কুলবাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটি ঘরে বৈষ্ণবরা কীর্ত্তন করেন। সেখান হইতে কীর্ত্তন ও খোলের শব্দ আসিতেছে। শ্রীম তাহা শুনিয়া বলিতেছেন, "নবদ্বীপের উদ্দীপন হচ্ছে।" আবার বলিতেছেন, "যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি রূপে রয়েছেন। তাঁকেই আমরা পূজো করি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার দিয়ে আমরা ব্রহ্মের একটা দিক মাত্র দেখতে পাচ্ছি, অন্য দিকটা দেখতে পাচ্ছি না। ঋষিরা যোগবলে ওপারের খবর জানতে পেরেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'সব চৈতন্যময় দেখছি—মাটি, হাড়, মাংস পর্য্যন্ত।' এই যে বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে, তাও সেই আদ্যাশক্তি রয়েছেন বলে। যদি বল, এ সব ত চলেছে, কিন্তু ভগবান কোথায়? তার উত্তরে বলা যায়, যিনি চালাচ্ছেন তিনিই ভগবান।"

যোগাবস্থা

"ভগবান দর্শন হলে আত্মা আলাদা শরীর আলাদা হয়ে যায়। যোগীরা মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁরা মৃত্যুকে ভয় করেন না। রোগকে ডরান না। তাঁরা ভাবেন, এসব দেহের ধর্ম্ম। শরীর থাকলেই লাগবে। ঠাকুর শেষ অসুখে বলতেন, 'বড় লাগছে।' কাঁদতেন, কিন্তু মাকে ছাড়েন নি। নাপিত কামাতে এসেছে, ঠাকুর তাকে বললেন, 'থাম, আমি একটু ভগবানের চিন্তা করে নেই।' ঐভাবে শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে তারপর কামাতে বসলেন।

"সব তিনিই করছেন। যোগীরা দেখেন ছাদে উঠেও যা এখানে থাকলেও তাই। সমাধি অবস্থায় তাঁকে বোধে বোধ করছেন, আর সমাধি থেকে নেমে এসে দেখেন তিনিই সব হয়ে আছেন। তাই তাঁরা মহাযোগে থাকেন।"

এইবার শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন—

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপম্।" ৬০॥
"সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥' ৬১॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৩ উঃ)

আবৃত্তির পর বলিতেছেন, "তাঁকে সকলে ধরে আছে, তিনি কাউকে ধরে নেই।"

আবার গাহিতেছেন—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" ইত্যাদি

গান শেষ হইল। রাত্রি প্রায় দশটা, ভক্তরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২৩শে মে, শুক্রবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সন্ধ্যার সময় শ্রীম চারতলার ঘরে চৌকির উপর বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে সুর করিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া তারপর গান গাহিতেছেন—

"মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
(যত) বিষয় মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে ॥" ইত্যাদি

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীম ছাদে আসিয়া মাদুরের উপর বসিলেন। চক্ষুতে প্রেমাশ্রু। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন।

ঠাকুরের অবস্থা

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) ঠাকুর 'মা' 'মা' করে রাতদিন পাগল। মার সঙ্গে কথা কইতেন, মুহুর্মুহুঃ সমাধি হত। কাপড় বগলে করে বেড়াতেন। বঙ্কিম বাবু প্রভৃতিকে বললেন, "কেউ কেউ বলে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে পাগল হয়ে যায়। বলি, চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়?" 'ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কইতেন,' একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। তিনি বলতেন, "বিশ্বাস করলে হয়ে যাবে।" মান, সম্ভ্রম, দেহসুখ, প্রতিষ্ঠা কিছুই চাইতেন না। তাঁর আদেশ হলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। একথা কেই বা শোনে?

বড় জিতেন—তাঁর দর্শন হলে সব বিশ্বাস হয়। মহাপুরুষ হাত ধরে থাকলে কিছুর ভয় থাকে না।

শ্রীম—তাঁর মহামায়ায় ঢেকে রেখে দেয়। এক দিক হল ত আর এক দিক হল না—কাজ-কর্ম্ম করতে পারল না। ঠাকুর বলতেন, 'অতি গুহ্য কথা, বলতে দিচ্ছে না, মুখ চেপে ধরে।'

আশুতোষ চৌধুরী। Great man (মহৎ লোক) কে?

বড় জিতেন—আজ হাইকোর্টের জজ আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যু হল। খুব ভাল লোক ছিলেন। দানটান করতেন। সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

শ্রীম—শুনেছি মৃত্যুর সময় নাম জপ করেছিলেন। আগে আমরা মনে করতাম হাইকোর্টের জজ খুব মহৎ লোক। কিন্তু তা নয়। কি নিয়ে থাকে?

ঘোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি ঘোড়। আমি একবার হাইকোর্টে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একজন উকিল আমাকে বললে, "আপনি এখানে এসেছেন কেন? যত সংসারী লোকের আড্ডা।" হাইকোর্টে একবার এক সাঁওতাল সাক্ষী দিচ্ছিল। জজ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বয়স কত?" সাঁওতাল বললে, "এত জান, আর আমার বয়সটা জান না?" যে বোঝে যে এটা অন্যায় কাজ, তবুও ছাডবে না, তাকে কি করে বলব মহৎ লোক। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আমি এত দিগ্বিজয় করলাম, কিছুই থাকবে না। কিন্তু ক্রাইষ্ট যা করে গেছেন তাই থাকবে।" অবতার যখন আসেন তখন তিনি বললে লোকে শোনে। তা না হলে লেকচার দাও, দুদিন শুনবে, পরে লোকে ভুলে যাবে। আব্রাহাম ল্যাজারাসকে বলেছিলেন, "তোমার কথা কেউ শুনবে না। বিশ্বাস করবে না যে মৃত্যুর পর তুমি শরীর ধারণ করে বলছ।"

এবার গান গাহিতেছেন—

"কেমনে রাখিবি তোরা তারে লুকায়ে।
চন্দ্রমা তপন তারা তাঁহার আলোকে ভায়॥" ইত্যাদি
"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী॥" ইত্যাদি

শ্রীম—এই যে আঁধাবে ধ্যান এটা তন্ত্রের কথা। নিবিড় আঁধার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ঋষিরা অন্ধকারে নির্জ্জনে গিয়ে ঈশ্বব চিন্তা করতেন।

নলিন—একজন হরিপ্রসন্ন মহারাজকে (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আঁধার ভাল না চাঁদ ভাল?" তিনি বললেন, "চাঁদ ভোগের জন্য, আঁধার যোগের জন্য।"

শ্রীম—আহা, আহা! কী কথা! পাখীর বাসা ভেঙ্গে দিলে সে যেমন আকাশে উড়ে বেড়ায় তেমনি যোগী চিদাকাশে বিচরণ করে।

॥ ৫ ॥

২৪শে মে, শনিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বদরিকার ছবি

বৈকাল বেলা পাঁচটা। শ্রীম স্কুলবাড়ীর দোতলার বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। কাছে অনেকগুলি ভক্ত। ছোট জিতেন একটি আংটি শ্রীমকে দিয়াছেন। উহাতে চার ধাম দেখা যায়।

শ্রীম—এই আংটিতে চার ধাম দেখা যায়।

জিতেন—আমরা কুড়ে, যেতে ত পারব না। তাই এতেই আমাদের হয়ে গেল।

শ্রীম—ঠাকুরের হত।—একজন বদরিকার ছবি দেখাচ্ছিল। এক ভক্ত তাকে চারটি পয়সা দিলে। ঠাকুর বললেন, "টাকা দে, টাকা দে। এত বড় বদ্রিনারায়ণ দেখালে। টাকা ত কিছুই নয়।"

প্রার্থনার শক্তি। আমি কর্ত্তা

"তারপর আমাদের বললেন, 'রোক চাই। ভ্যাদভেদে হলে চলবে না।' যেমন কেউ কেউ বলে,—'যা হয় ভগবান করবেন।' প্রার্থনা করতে হয়। তা হলে শক্তি দেবেন।"

"কি করে বলে, 'আমি কর্ত্তা'? একটু হাওয়া না হলে প্রাণ আঁটুপাটু করে। অন্ন না হলে মন বুদ্ধি চলে না। সব সময়ই বাইরের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবু বলে, 'আমি কর্ত্তা।' কি অজ্ঞান! কুটুমদের কত করে খাওয়ায়, কিন্তু চাকরদের অসুখ হলে দেখে না।"

জিতেন—আমি বাড়ীতে ঢুকে দেখি কতকগুলি মেয়েছেলে একটু মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'সে কি হয়?' তাদের লুচি মধু দিলাম, তারা খেয়ে আনন্দ করে চলে গেল।

শ্রীম—ঠাকুর বলেছিলেন, "তাদের জানাবে যেন কত আপনার লোক, কিন্তু অন্তরে জানবে এরা আমার কেউ নয়।" আশ্রমে থাক, গৃহে থাক, যেখানেই থাক জানবে ভগবানই আপনার। একদিন তিনি বললেন,

"আমার এখন কাউকে ভাল লাগছে না।" (কেউ বলে, "আমার বন্ধু প্রায় রোজই আমার কাছে আসেন।" বন্ধু আসুক, কিন্তু মেয়েমানুষ যেন কাছে না আসে।) নির্জ্জনে গোপনে আন্তরিক ভাবে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেনই। একি মানুষ কিছু করছে।

অবতার সর্ব্বজ্ঞ

"শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর, এঁরা এ সব কি করে জানলেন। তাঁরা মানুষের প্রকৃতি বোঝেন। তাই তাঁরা আগে থেকে বলে দিয়েছেন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি করেছেন; তিনি আর বলবেন না?

"মা ঠাকরুণ দেশে যাবেন। সমাধিবান পুরুষ (ঠাকুর) সব বলে দিলেন। বললেন, 'পাড়ার লোকদের সঙ্গে ভাব রাখবে। কারু অসুখ করলে কাউকে দিয়ে খবর নেবে।' শ্রীকৃষ্ণকে দেখুন, বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে কত ভালবাসা, কত প্রেম। যখন মথুরা গেলেন সব ভুলে গেলেন। মথুরা থেকে দ্বারকা, দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্র চলে গেলেন। একেবারে নির্লিপ্ত। কি অদ্ভুত শক্তি!"

ভক্তগৃহে

সন্ধ্যার পর শ্রীম স্কুলবাড়ীর ছাদে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। আরও অনেকে তথায় উপস্থিত।

শ্রীম—ঠাকুর এক ভক্তের বাড়ী গিয়েছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা তাঁকে প্রণাম করবার পর ঠাকুর ভক্তকে বললেন, "দেখ গৃহস্থের যেমন বার বাড়ী ও অন্দর মহল থাকে তেমনি থাকবে। আমায় দেখছ ইন্দ্রিয় জয় করেছি, তা বলে কি সকলে তা করেছে? ইন্দ্রিয় জয় করা কি আমার সাধ্য? মা টেনে রেখে দিয়েছেন তাই।" সন্ন্যাসী নারীর চিত্রপট দেখবে না, গৃহস্থ-বাড়ীতে থাকবে না। ভিক্ষার জন্য ঘোরা বরং ভাল।

"ঠাকুর নিজে গল্প করতেন, 'আমি যখন বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে বললেন—'এ উন্মত্ত হ্যায়।' ঠাকুরের যখন প্রথম দর্শন হল মাকে বললেন, 'মা, এই কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে আমার শরীর থাকবে না।' মা বললেন, 'জগতের মঙ্গলের জন্য কিছুদিন থাক। শুদ্ধ ভক্ত আসবে, তাদের নিয়ে বেশ থাকবে।' ঠাকুর বলতেন, 'কুঠিতে উঠে চেঁচিয়ে ডাকতুম কে কোথায় আছিস আয় রে।'

"একদিন বলেছিলেন, 'একবার বকুলতলায় আমার কাম হল।' রোগ, শোক, দারিদ্র্য সব পেয়েছেন। সব অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। অন্য লোকের মত নয় ত। তারা আবোল তাবোল বকে। যেমন যেতে যেতে বললে, 'নর্দ্দমায় একটা ইলিশ মাছ দেখলাম।' (সকলের হাস্য)। তাঁর এক একটি কথা হৃদয়ে বিঁধে রয়েছে। আবার বলতেন, 'কি বললুম বল ত?' কেশব সেনের লেকচার শুনে যখন লোক সব ফিরছে, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতাম, 'কেমন লেকচার হল?' তারা বলত, 'বেশ লেকচার দিয়েছে। খুব ভাল বলেছে।' আবার যখন জিজ্ঞাসা করা হত, 'কি বল্‌লে?' তখন বলত, 'আমার মনে নেই।' ঠাকুর বলতেন, 'লোকমান্যের মুখে ঝাঁটা মারি।' 'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা।' বড বড় লোকেরা এসব বলে গেছেন। তাঁর মত এমন কথা কোথাও শুনি নি—'Never man spake like this man.'

"ঠাকুরের কাছে 'দেবী চৌধুরাণী' পড়া হচ্ছিল। গীতার কর্ম্মযোগের কথা। তিনি শুনে বললেন, 'গীতার কথা কাটবার যো নেই, কিন্তু ভক্তির কথা ত বলে নি।' যার যেটা ত্রুটি আছে সব ধরতে পারতেন। একদিন বললেন, 'কর্ম্ম ত্যাগ করার জো নেই। নিশ্বাস ফেলাও কর্ম্ম।' কর্ম্ম ত্যাগ মানে সমাধি। পাণ্ডবদের বললেই হত, 'গাছতলায় গিয়ে থাক।' তারা ক্ষত্রিয়, তাদের কিছু কর্ম্ম করতে হবে, সেই জন্য আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম্ম করবার উপদেশ দিলেন। তাঁকে ডাকতে থাকলে তিনি কর্ম্ম কমিয়ে দেবেন। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।' যেমন লোকের শোক ক্রমে ক্রমে চলে যায়। শোক বেশীদিন থাকে না। এইখানে এই রাস্তায় একটি ছেলে মোটর চাপা পড়ে মারা গেল। দেখে কাঁদলাম। কতদিন সেই শোক রইল। দিনকতক পরে আবার কম পড়ে গেল। ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিচার কি করব? আমি দেখতে পাচ্ছি।' তিনি বলতেন, 'মানুষের ভুল-ভ্রান্তি আছে, তাঁকে আন্তরিক ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সব ধর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যায়, যদি আন্তরিক হয়।'

"বিজয় গোস্বামী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কি দেখছেন—সাকার না নিরাকার?' ঠাকুর বললেন, 'ও সবে তোমার কাজ কি? সাইন বোর্ড না মেরে তাঁকে কেঁদে কেঁদে বল। তিনি জানিয়ে দেবেন।' স্বামীজী তাঁকে স্তব করেছেন, 'তুমি সগুণ, তুমি নির্গুণ।' যেমন—

'খণ্ডনভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।'

"স্বামীজী সাহেবদের কিছু কর্ম্ম করতে বলেছেন। যারা রজোগুণী তাদের কর্ম্ম না করলে, চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হলে, অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না।

"শেয়ালের গর্ত্তে ভেড়ার নাদি থাকে, সিংহের গর্ত্তে হাতীর মুক্তা থাকে।"

॥ ৬ ॥

২২শে মে, সোমবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

কাঞ্চনের টান

বৈকাল সাড়ে ছটায় শ্রীম দোতলায় বসিয়া জনৈক বিশিষ্ট লোকের সম্বন্ধে কথা বলিতেছেন। বৃদ্ধ বয়সে ওকালতি করিতে গিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার শরীব ত্যাগ হইয়াছে।

শ্রীম—টাকার বেশী লোভ করতে নেই। মাছ যেমন আধার খেতে এসে প্রাণ হারায়। ভাল মন্দ বিচাব সকলের সব সময় থাকে না, সেইজন্য ছেলেবেলা থেকে গুরুর দরকার। গুরুই ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় বলে দেন। ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন যে আন্তরিকভাবে মহামায়ার কাছে প্রার্থনা করতে হয়, "যেন তাঁর ভুবনমোহিনী মায়ায় আমরা মুগ্ধ না হই।"

সাধু ও গুরুর আদর্শ

"যারা কেবল ঈশ্বর চায় তাদের অত টাকা পয়সার দরকার কি? তিনি একজনকে বলেছিলেন, 'একটি মাটির ঘর রইল, সেখানে বসে ঈশ্বর চিন্তা করবে। একবেলা শাকান্ন, আর একবেলা বাতাসা ভিজিয়ে খেলেই হল।' এখন চারিদিকে গুরু ও সাধুরা শিষ্যদের ত্যাগ না শিখিয়ে আরও প্রবৃত্তির রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ঠাকুর বলতেন, 'হেগো গুরু, তার পেদো চেলা।'

"একদিন স্বামীজী টেরি কেটে ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন। ঠাকুর হাত দিয়ে তাঁর টেরি ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমরা ত পৃথিবীর কোনও ভোগ নিতে আসি নি।' প্রভু যীশুর কাছে একজন লোক গিয়ে বললে,

'প্রভু, আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই যাব এবং আপনার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকব। প্রভু তাকে বললেন, 'শেয়ালের থাকবার গর্ত্ত আছে, পাখীর থাকবার বাসা আছে কিন্তু আমার তাও নেই।'

এই সময় একটি বালক সেখানে প্রবেশ করিল। শ্রীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কজন সাধুকে প্রণাম করলে?" পূর্ব্বদিন বসুমতী আপিসে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠের সাধুদের ও ভক্তদের সমাগম হইয়াছিল। বালকটি সকল সাধুর নিকটে যাইতে পারে নাই বলায় শ্রীম তাহাকে বলিতেছেন, "পা না স্পর্শ করেও মনে মনে প্রণাম করলে চলে। ঠাকুর একবার একজন ভক্তকে দেখে বিষ্ণুভাবের উদ্দীপন হওয়ায় বলেছিলেন, 'দেখ, আমার পূজো করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ফুল থাকলে পূজো করতাম।' তার পরেই আবার বললেন, 'মানস পূজাও হয়'।"

স্বপাকের প্রয়োজনীয়তা

জনৈক ভক্তকে শ্রীম বলিলেন, "আপনি নিজে কুকারে রেঁধে খাবেন। আমাকে ঠাকুর একদিন খেয়ে উঠে বললেন, 'পাতের ভাতগুলো কুকুরকে দাও। তাঁর আজ্ঞানুযায়ী কুকুরকেও দিলাম এবং নিজেও দুটি খেলাম। খেয়ে বাসন মাজছি, এমন সময় ঠাকুর দেখে বললেন, 'বাঃ, বেশ করেছ। এই ধর, তুমি বিদেশে গেছ, চাকর বাকর নেই, তখন তুমি কার খোসামোদ করবে। আমিও দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রেঁধে খেতাম'।"

পরে কথা প্রসঙ্গে শ্রীম বললেন, "একদিন ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ উস্কে দিচ্ছিলাম, ঠাকুর বললেন, 'ঐ হাতটা প্রদীপে ধর; শুদ্ধ হয়ে যাবে।' একদিন তিনি জিনিষ কিনতে দিয়ে বললেন, 'তুমি নিজে কিনবে, তা হলে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং এখানকার কথা অনেকদিন মনে থাকবে'।"

বৈকালে শ্রীম মা কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ঐ সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে গল্প করিতেছেন, "আমার হঠাৎ বৈরাগ্য এল, তাই মা কালীকে দর্শন করতে গেলাম। কিন্তু আবার যেকে সেই। ঠাকুর বলতেন, 'বেশ জল দেখা যাচ্ছিল, আবার পানা এসে ঢেকে ফেললে, এমনি তাঁর মহামায়া।' ছাগল যখন বলি হয় তখন 'ম্যা' 'ম্যা' করে। কিন্তু অন্য ছাগলগুলো, যারা ঘাস খাচ্ছিল, তারা একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার খাওয়ায় মন দেয়।"

বড় জিতেন—আপনার সেরূপ নয়।

শ্রীম—না, না, আপনি বুঝছেন না। তাঁর কাছে কি চালাকি চলে!

॥ ৭ ॥

১০ই জুন, মঙ্গলবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বৈকাল আন্দাজ পাঁচটার সময় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কর্ম্মচারী যোগিন বাবু ও তাঁহার পুত্র আসিয়াছেন। যোগিনবাবু ভক্ত লোক। কোনও অন্যায় কার্য্য দেখিতে পারেন না। এজন্য মধ্যে মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার মতান্তর হয়। তিনি শ্রীমকে ভক্তি করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসেন। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের স্থান বলিয়া তিনি অল্প বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীম ইঁহাদিগকে দেখিয়া দোতলার ঘরে বসিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কথা হইতে লাগিল। কাছে আরও কয়েকজন ভক্ত আছেন।

খাদ বিনে গড়ন হয় না

শ্রীম—(যোগিনবাবুর প্রতি) ওখানে থাকলে খাঁটি সোনা হলে চলবে না। কর্ম্মচারীরা হিসাবের গোলমাল করবেই। যেখানেই তীর্থস্থান, সেখানেই কর্ম্মচারীরা এরকম করে থাকে। খাদ দিলে তবে গডন হয়। আপনার কর্ত্তব্য যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে সেখানে ছাতি ধরা ও ঠাকুরের নাম করা। কেউ যদি তাঁর আদেশ পায় তাহলে কর্ম্ম করতে পারে। যেমন যীশু খ্রীষ্টকে লোক বোঝাতে লাগল, "প্রভু, যাবেন না, আপনাকে মারবার জন্য লোকে ষড়যন্ত্র করেছে।" তখন তিনি বললেন, "না, আমার পিতা আমাকে যা বলেছেন তাই করছি।" কারু কথা শুনলেন না। শেষে ক্রুশ-বিদ্ধ হলেন। ওদের শিক্ষার জন্য দেহ দিলেন। আপনি দেহ দিতে পারেন ?

যোগিনবাবু—হাঁ, অবশ্য পারি।

শ্রীম—রোক আছে।

তারপর বলিতেছেন, "এখন আপনার বৃদ্ধ বয়স, কোনখানে বসে তাঁর চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কারু কথায় থাকবেন না।"

স্যার আশুতোষ

সন্ধ্যার পর শ্রীম স্কুলবাড়ীর ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন। কাছে ভক্তেরা উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) এখন স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির গুণের কথা শুনতে পাচ্ছি। সব লোক তাঁর জন্য কাঁদছে আর বলছে, "তিনি সকলের বাড়ীর খবর নিতেন। তাঁর অধীনে যারা কর্ম্ম করত তাদের এবং গরীব দুঃখীদের তিনি বাপ মা ছিলেন।" এমন না হলে মানুষ! যার রোগ শোক হয়েছে, তার খবর না নিয়ে কেবল ষোলআনা কাজ আদায় করে নেবে, সে আবার মনিব!

সুখলাল—দয়া করেও যে তাদের মন পাওয়া যায় না?

শ্রীম—তা হোক। দয়া ঈশ্বরের। নিষ্ঠা রাখতে হবে। একজনের কাছে ঠকাও ভাল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত লোকে কত কি বলেছে; কই তিনি কি দয়া ছেড়েছেন! একজন লোক তাঁকে বললে, "আপনাকে অমুক লোক নিন্দা করেছে।" তাতে তিনি বললেন, "আমি কি তার কোন উপকার করেছি?"

"সাধুদের আলাদা কথা। তাঁদের শত্রু মিত্রে সমান ভালবাসা। সাধুরা কারু উপকাব করে তার প্রতিদান চান না এবং কেউ শত্রুতা করলে তাব প্রতিকার করেন না। নাগমশায় মুটেব ঘাম পডছে দেখে তাকে হাওয়া করতেন।"

"সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় লোক কোথায় পাবে? আমাদের দরোযান তিন বার বললে, 'অসুখ হয়েছে, ব্যাম হয়েছে, কাজ কবতে পারব না।' সেই আবার বললে, 'আমার কুড়ি টাকা মাইনের চাকবি হয়েছে।' আমার তখন খুব রাগ হল। আমায় একজন বুঝিয়ে দিলে, 'ও গবীব, তিন টাকা পাবার জন্য মিথ্যা কথা কয়েছে তা কি হয়েছে। বাবুবা যে কত কি করছে, তাদের তুমি কিছু করতে পারছ?' আমার তখন চৈতন্য হল।

"আর একজন আমাকে শিক্ষা দিয়েছিল। একটি বিডালকে খাইয়ে দাইয়ে বড় করা হয়েছিল। বড হয়ে পাখী মারলে। তখন আমার তার ওপর রাগ হল। স্কুলের একজন ছাত্র বললে, 'স্যার, ওর ওপর রাগ করছেন কেন? যার যেমন স্বভাব সে তেমনি করবে, যাকে যেমন ঈশ্বর গডেছেন।' তাই ঠাকুর কাউকে কিছু বলতেন না। উঃ, দরকারের জন্য সব করে; স্বভাবের বশেও করে।

ঋগ্বেদের ঋষি; কামজয়

"ভিতরে কিছু বদরস জমে আছে, কিছু মাটি চাপা আছে। বদরস জমে

রয়েছে বলে কাম হয়। ঋগ্বেদে দেখলাম, এক ঋষি বলছেন, 'সমস্ত দিন তার চিন্তা করলাম, আবার রাত্রে একি হল।'

"ঠাকুর বলতেন, 'ভগবানকে দর্শন করলে কাম চলে যায়।' তখন শুদ্ধ মন হয়। পুরুষকারও তিনি—'পৌরুষং নৃষু।' বেদান্তবাদীদের মেয়েমানুষের দিকে নজর যাচ্ছে কিন্তু জোর করে চোখ ফিরিয়ে নেবে—চাইবে না। এ হচ্ছে বিচারের পথ। ঠাকুর বলতেন, 'তাঁকে জানলে ইন্দ্রিয় সংযম আপনি হয়ে যায়। যেমন কারু পুত্রশোক হয়েছে, সে দিন আর সে আমোদ আহ্লাদ কিছু করতে পারে না।'

স্বামীজীর তখন ব্যাকুল অবস্থা—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। একদিন ঠাকুর কাশীপুর বাগানে তাঁকে বললেন, 'কই, তুই এগজামিন (পরীক্ষা) দিবি না? স্বামীজী তখন বললেন, 'একটা ওষুধ পেলে বাঁচি যা খেয়ে সব পড়া ভুলে যেতে পারি'।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর কিছুক্ষণ কথামৃত পাঠ হইল। তার পর অধিকাংশ ভক্ত প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৮ ॥

১১ই জুন, বুধবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

উৎসব ও ভগবৎ স্মৃতি

বৈকাল সাড়ে চারটা। কয়েকজন উৎকলবাসী ভক্ত মধ্যে মধ্যে শ্রীমর কাছে আসেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনেন। ইঁহাদের মধ্যে গোপাল নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আগামী কল্য দশহরা; গোপালের দক্ষিণেশ্বর যাইবার ইচ্ছা।

শ্রীম—(গোপালের প্রতি) একলা একলা যেতে হয়। দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাবে। কালকে দশহরা; সেখানে পূজো দেখবে। হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, "কি করে সর্ব্বদা আপনাকে স্মরণ থাকে?" রামচন্দ্র বললেন, "উৎসব দেখলে আমাকে মনে পড়বে।" তাই পর্ব্ব উৎসবে যোগ দিতে হয়।

বিপদ ও ভগবান

কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে কুন্তীদেবীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। কুন্তদেবী বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, আমার পুত্রেরা বিষ প্রয়োগ, জতুগৃহ দাহ, হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসের হাত হইতে তোমার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি পাশা ক্রীড়া কালে কৌরব সভায় ও যুদ্ধস্থলে মহারথীদিগের অস্ত্র হইতে এবং অন্য নানা বিপদে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। সম্প্রতি তুমি অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি হইতেও আমাদিগকে রক্ষা করিলে। হে জগদ্‌গুরু, প্রার্থনা, যেন নিয়তই আমাদের বিপদ ঘটে ; তাহা হইলেই তোমার দর্শন পাইব। তোমার দর্শনে জীবকে আর জন্ম-মরণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, ইত্যাদি।"

শ্রীম—কুন্তী বলছেন, "পাণ্ডব ও যদুকুলের প্রতি আমার যে স্নেহ তা কেটে দাও এবং তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।" আরও বলছেন, "আমাদের সর্ব্বদা বিপদ হোক তা হলে তোমার দর্শন পাব।"

সন্ধ্যার পরে চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন ; কাছে ভক্তগণ।

পাণ্ডবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে চিনেছিলেন

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) একজন ওড়িয়া ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, "কাল দক্ষিণেশ্বরে যাব ?" আমি বললাম, "যাবে না ! কালকে সেখানে কত লোক পূজো করবে দেখবে।"

"কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, প্রকৃতির পার, আদি পুরুষ। কেবল মায়ায় আমাদের কাছে মানুষরূপে নিজেকে দেখাচ্ছ, বাস্তবিক তুমি তা নও।' ওঃ ! তারাই তাঁকে চিনেছিল। তাই গীতাতে আছে—

'ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥' (গীতা ৪।১৪)

—আমাকে কর্ম্মে লিপ্ত করতে পারে না, আমার কর্ম্মফলে স্পৃহা নেই, এইভাবে যে আমাকে জানে, সে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না। তারও ঐ রকম অবস্থা হয়।

"ঠাকুর বলতেন, 'পরমহংস বালক, তার মা চাই।' শ্রীকৃষ্ণ এত বিপদেও বালক। অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে বললেন, 'এইবার কর্ণকে লাগাও।

তার রথচক্র মাটিতে বসে গেছে, এই সময়। মনে করে দেখ, সে তোমাদের কত কষ্ট দিয়েছে।"

"আমরা মৃত্যুর জন্য এত ভাবছি কেন? আমরা মনে করছি, মৃত্যু যেন একটা বজ্রাঘাত। কিন্তু তাঁর সবতাতেই আনন্দ। আনন্দে সৃষ্টি, আনন্দে পালন, আনন্দে সংহার করছেন। 'চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।' ভগবদ্দর্শন হলে কর্ম্মফলের পারে যায়।

"সে অবস্থার কথা মুখে বলতে পারা যায় না। 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে আর খবর দিলে না।' পরে, 'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি'—এই গানটি গাহিয়া বলিতেছেন, "তা না হলে কর্ম্ম রেখে দেন।"

"কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির কেবল বলতে লাগলেন, 'অনেক পাপ করেছি।' ভীম বললেন, 'কেন? শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন, আমি করিয়েছি, তখন আবার পাপ কি?' যুধিষ্ঠির কিন্তু তা শুনলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কর্ম্ম বাড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'অশ্বমেধ যজ্ঞ কর'।"

রাত্রি হইয়াছে। এইবার ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১২ই জুন, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

আজ দশহরা। বৈকাল ৪টার সময় শ্রীম ঠাকুর বাড়ী হইতে স্কুল-বাড়ীতে আসিয়া দোতলায় জনৈক ভক্তকে বলিতেছেন, "কই তুমি গঙ্গাস্নানে গেলে না? আমি গিয়েছিলাম। বহু লোকে স্নান করছে দেখলে এবং বহু লোক নাম করছে দেখলে, ঠাকুরের ভাব হত। ওতে শক্তিসঞ্চার হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, 'গঙ্গাজল স্পর্শ কর, ওতেই হবে, স্নান নাই বা করলে'।"

এমন সময় ফকিরবাবু আসিলেন ও প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি বালক ও বালকের মামা আছেন। ফকিরবাবু পূর্ব্বে এই স্কুলে মাষ্টারী করিতেন।

শ্রীম—(মামার প্রতি) এই ছেলেটার খালি গা যে?

মামা—আপনাকে দর্শন করতে এসেছে।

শ্রীম ছেলেটিকে কাছে বসাইয়া তাহার বাড়ীর সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করিলেন ; তারপর বলিলেন, "এর সংস্কার আছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে নিয়ে যেও। এরা সদ্‌বংশে জন্মেছে। আহা, ঘেমেছে, একটু হাওয়াতে বসাও।"

সন্ধ্যার পর শ্রীম চারতলার ছাদে মাদুরে বসিলেন। ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত আছেন। একজন বৈষ্ণব শ্রীমকে প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিতে যাইতেছেন।

বৈষ্ণব—দীনতঃ—প্রসাদ

শ্রীম—(বৈষ্ণবের প্রতি) ওটা করবেন না। 'তৃণাদপি সুনীচেন'—ও থাক। ঠাকুর বলতেন, "এর দেহের ভেতরে ভগবান আছেন", সেজন্য আসনে বসাতে হয়। যে কালে এত ভক্তি করছেন, তখন কথা শুনতে হয়।

"ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একজনকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি সেই প্রসাদ না খাওয়াতে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'ওকে কেউ ধাক্কা মারতে মারতে বের করে দেয়!' ওমা, কয়েক দিন পর দরোয়ানের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। সেই দরোয়ান তাকে ধাক্কা মারতে মারতে ফটকের বার করে দেয়। গুরুজন যা দেন তা নিতে হয়। প্রসন্ন হয়ে যা দেন, সেই হচ্ছে প্রসাদ।"

অমূল্যবাবুকে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ছাপান একটি গান গাহিতে বলিলেন। গানের পর শ্রীম বলিতেছেন, "আহা, সেখানে কতকাল হল ঠাকুর গিয়েছিলেন!"

এইবার মঠের কথা হইতেছে।

পিসিমার গল্প

অমূল্য—সুধীর মহারাজের সঙ্গে মঠের পণ্ডিত মশায়ের কথা হচ্ছিল!

শ্রীম—কি কথা বলুন।

অমূল্য—পণ্ডিতমশায় বলছিলেন, "তাঁর (ঠাকুরের) অলৌকিক ভাব। সে সব যখন পড়ি, মাথা হেঁট করতে হয়।" উত্তরপাড়ার পণ্ডিতের কথায় বললেন, "তাঁকে ঠাকুর আকর্ষণ করেছিলেন। শক্তিধর পুরুষ না হলে কি

এত লোক যায়! সকলকে আকর্ষণ করেছিলেন।"

শ্রীম—ঠিক বলেছেন। পিসিমা যা বলেছিল তাই দাঁড়াল। আমি যখন পুরীতে ছিলাম তখন চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি এক পিসিমার গল্প বলেছিলেন। পিসিমা রোজ তুলসীতলায় প্রণাম করেন এবং মালা জপ করেন। ভাইপো তাঁকে বলছে, "রোজ তুলসীতলায় কি ঢিপ্ ঢিপ্ কর?" পিসিমা বললেন, "বাছা, আমিত এত লেখাপড়াও জানিনে, এ-লে, বি-এ পাশও করিনি; ঢিপ্ ঢিপ্ না করে কি করি।" ভাইপো যখন বি-এ পাশের পর বিবাহ করে সংসারের ধাক্কা খেতে লাগল, তখন তার পিসিমার কথা স্মরণ হল। বুঝলে, পিসিমাই ঠিক বলেছিলেন—ঢিপ্ ঢিপ্ করাই সার। সব ভোগান্ত না হলে সে কথা ধরবার শক্তি আসে না। কারু এক জন্মে, কারু ত্রিশ জন্মে হয়। ঠাকুর বলতেন, "শুনে রাখা ভাল।" একটু ঘোরা ভাল; তা হলে তাঁর কথায় দৃঢ় ধারণা হবে। যিনি ভগবান দর্শন করেছেন, তাঁর কথা আমাদের শোনা উচিত। অবতার বা সাধুরা যা বলেছেন, তাই শোনা উচিত। তা না হলে উপায় নেই। অবতারকে কি সকলে ধরতে পারে? তাঁর কথা চারিদিকে ছড়ান রয়েছে। ক্রাইষ্ট বললেন, "যাঁরা সংস্কারবান তাঁরাই ধরতে পারেন। He that hath ears to hear, let him hear." (Mathew)

"ঠাকুর বলতেন, (নিজেকে দেখাইয়া) 'আমি খাইনি, ইনি খেয়েছেন'। মথুরবাবু বললেন, বাবা, তোমার অহঙ্কার নেই, তুমি কেন বল? যাদের অহঙ্কার আছে তারা বলুক গে। তুমি ত বালক'।"

ডাক্তার—যে যা বলে তাই শুনবে?

শ্রীম—বালক কি সকলের কথা শোনে? এ বোকা বালক নয়, মা সর্ব্বদা সঙ্গে আছেন।

"এ আমি দ্বারা কি বিচার করবে? এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে? ফাটাচটা আরসিতে কি ঠিক প্রতিবিম্ব পড়ে?"

॥ ৬০ ॥

১৩ই জুন, শুক্রবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

শ্রীম বিশ্রামের পর বৈকালে চারতলার ছাদে পায়চারি করিতেছেন, এমন সময় কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের পাচক লক্ষ্মণ আসিয়া প্রণাম করিল।

শ্রীম—কেমন, তোমাদের আশ্রমে সকলে ভাল আছেন ত ?

লক্ষ্মণ—না, কাল রাত্রে সাধু ও ব্রহ্মচারীরা ছাদে শুয়েছিলেন। ভোরে একজন মহারাজ ঠাট্টা করে বললেন, 'সাপ, সাপ।' তাই হৈ চৈ পড়ে গেল। তাঁদের মধ্যে একজন নূতন ব্রহ্মচারী ঘুমের ঘোরে দৌড়ে দোতলায় নেমে আসছিলেন। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে নাকে ও মুখে খুব আঘাত পেয়েছেন। এখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

শ্রীম—(আশ্চর্য্য হইয়া) শাস্ত্রে আছে, 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'; এ ঠিক তাই। এই যে সংসার এও ঠিক এই রকম ভ্রম। এই ভ্রম থেকেই ভয়, দেহের সুখ, দুঃখ, জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু। বাস্তবিক ভগবান ছাড়া কিছুই নেই।

পরে একজনের হাতে চারিটি আম দিয়া বলিলেন, "যাও সাধুকে দেখে এস।"

বৈকাল ৪টা। শ্রীম ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতেছেন, "আজ বৃষ্টি হওয়ায় পশু-পক্ষী, গাছ-পালা সকলেরই আনন্দ, উপনিষদে আছে, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু প্রভৃতি তাঁর আদেশে নিজের নিজের কাজে ছুটে বেড়াচ্ছে। যেমন আপিসের বাবুরা পান চিবুতে চিবুতে ছুটাছুটি করে।"

সন্ধ্যার সময় শ্রীম সেখানেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত।

রজ্জুতে সর্পভ্রম

শ্রীম—(ধ্যানের পর) আজ শুনলাম, অদ্বৈত আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী ঘুমের ঘোরে 'সাপ' 'সাপ' শুনে ভয় পেয়ে দোতলায় নেমে আসতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

"ভ্রমেতে কি না হয়। যত কিছু দুঃখ, সব ভ্রম থেকেই হয়। ঠাকুর বলতেন, 'তিনিই এই ভ্রম রেখে দিয়েছেন।' যিনি এই ভ্রম দিয়েছেন তাঁকে

ডাক, তাঁর শরণাগত হও, তাহলে তিনি এই ভ্রম তুলে নেবেন। তাঁর কৃপা চাই।"

জনৈক ভক্ত—তিনি একটু কৃপা করুন না।

শ্রীম—যার ক্ষিদে পেয়েছে সে কখনও এমন কথা বলে না, খেয়ে দেয়ে আরাম চেয়ারে বসে 'একটু কৃপা হোক না' বললে হয় না। ঠাকুর মার জন্য কত কষ্ট করেছেন, পঞ্চবটীতে পড়ে কত দিন-রাত কেঁদে কেঁদে বলেছেন, "মা, একটা দিন চলে গেল, এখনও তোর দর্শন হল না?"

ভক্ত—আমাদের নিবেদন করা রইল, যাতে তাড়াতাড়ি হয়।

শ্রীম—ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন, "তুই ভগবানের জন্য কাঁদতে পারিস?"

ভক্ত—যিনি কৃপা করছেন তিনি আর একটু কৃপা করতে পারেন না?

কৃপার অধিকারী

শ্রীম—অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে এই রকম বলেছিলেন এবং বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। দর্শন করে কিন্তু ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। হার্ট ফেল করে আর কি! বিকারের রোগী এক জালা জল খেতে চাইছে। একটু জল মুখের কাছে ধরলেই আর খেতে চাইবে না। দুমাস হয়ত বিষয় কর্ম্ম ভুলেই রইল। আবার সময় হল ত তাস খেলতে আরম্ভ করলে।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব

কথাবার্ত্তার পর শ্রীম একজনকে ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন! শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদের শেষ অংশ পড়া হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন, "উদ্ধব, সাত দিনের মধ্যে দ্বারকাপুরী সমুদ্রের জলে প্লাবিত হইবে। আমিও স্বধামে চলিয়া যাইব। আমি যে কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলাম তাহা সমস্ত শেষ হইয়াছে"—ইত্যাদি।

লীলা অচিন্ত্য

শ্রীম—(পাঠ শ্রবণের পর) তাঁর লীলা অচিন্ত্য। কেউ তাঁকে সম্পূর্ণ জানতে পারে না। তিনি যতটুকু বুঝিয়ে দেন, মানুষ ততটুকুই বুঝতে পারে। যে বলে, আমি জানি, সে জানে না। যে বলে, আমি জানি না, সে একটু জানে।

'যস্যা মতং তস্য মতম্, মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥' (কেনোপনিষৎ)

"একজন সাহেব বলেছিল, 'এ জগতের চেয়ে ভাল জগৎ আমি তৈরী করতে পারতাম।' লজ্জা করে না! নিজের মাপকাটি দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যাওয়া! চাঁদবালিতে জাহাজ যাচ্ছিল; তাতে অনেক লোক ছিল। কোন কারণে জাহাজ ডুবে যায় ও সব লোক মারা যায়। তখন কেউ কেউ ঠাকুরকে বলেছিল, 'ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর, এত লোককে মেরে ফেললেন! এত যে তাদের কাতর প্রার্থনা, একটুও শুনলেন না!' ঠাকুর শুনে বললেন, 'আচ্ছা, ঈশ্বর যদি এর চেয়ে তাদের ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে থাকেন? তা হলে কি হবে?' তাঁর কথা শুনে সকলেই চুপ করে রইল। মানুষ কতটুকু দেখতে পায়? যেটুকু সামনে সেইটুকু। অতীতও দেখতে পাচ্ছে না, ভবিষ্যৎও নয়।

"এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? তাঁর অনন্ত লীলা। এই যে এক একটি নক্ষত্র, ওগুলি এক একটি সূর্য্য। তার চার দিকে এই রকম এক একটি জগৎ ঘুরছে।

"একটু জল না পেলে প্রাণ যায়, আর বুদ্ধি বেরোয় না। ঠাকুর বলতেন 'যখ লোকে ঘুমোয়, তখন তার গায়ে পেচ্ছাব করে দিলেও সে টের পায় না।' আবার বলে আমি জ্ঞানী।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা হইয়াছে। অধিকাংশ ভক্তই প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১১ ॥

১৪ই জুন, শনিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

পিতামাতা ও সন্তানদের ভক্তি শিক্ষা

আজ শনিবার, অনেক ভক্ত আসিতেছেন। দোতলার ঘরে ভাটপাড়ার ললিত রায় ও ভোলাবাবু বসিয়া আছেন। শ্রীম তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় পাঁচটা।

শ্রীম—(ললিতবাবুর প্রতি) বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ঠাকুরের সেবা

শেখাতে হয়। ঠাকুর ঘর ধোয়া মোছা, পূজার বাসন মাজা, ধূপ-ধুনা দেওয়া, ঠাকুরকে ফুল, মালা, চন্দন দিয়ে সাজান, এই সব কাজ গুরুজনের শেখান উচিত। ঠাকুর সংসারীদের জন্য কত ভাবতেন, এখনও ভাবছেন।

“বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ীতে একদিন একটি ছেলেকে দেখে ঠাকুর বললেন, ‘এ অবিদ্যার ছেলে।’ আবার দেখ, নরেন্দ্রের জন্য কত ভাবনা। তাঁর জন্য কাঁদছেন, তাঁকে দেখে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। তিনি যে তাঁর ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন।

“কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর যখন অসুস্থ, একদিন নরেন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে উপস্থিত। রাস্তায় কোথায় তাঁর চটি জুতা পড়ে রইল। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন, ‘তুই এগজামিন দিবিনি?’

“মহাপুরুষদের সঙ্গে থাকলে আপনিই ত্যাগ হয়ে যায়। ঠাকুর কখনও বলেন নি, ‘তুমি পড়া ছেড়ে দাও’।”

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম ললিতবাবুকে গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তিনি “মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি” ইত্যাদি স্তব পাঠ করার পর গান হইতে লাগিল—

“বিকল্পবিহীন সমাধিবিলীন,
ব্রহ্মে চির দিন তোমারি আসন।” ইত্যাদি
“কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে
ভবেতে আনিয়ে ভাবালি আমায়।
না জানি সাধন না জানি পূজন
বিষয়-বিষ ভোজন করে প্রাণ যায়॥
কাতরেতে তাই ডাকি ভবদারা
কখন আছি কখন যেতে হবে তারা;
এ দেহ সন্দেহ ত্বরায় দেখা দেও,
রসিকের এ দেহ জলবিম্বপ্রায়॥”

শ্রীম অমূল্যবাবুকে বলিলেন,—“আপনার একটি গান হোক না।”
তিনি গাহিলেন—

“মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামা পদ নীল কমলে।” ইত্যাদি
“গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।” ইত্যাদি
“শ্যামা ধন কি সবাই পায়”। ইত্যাদি

গানের পর অমূল্যবাবু ভাগবত হইতে একাদশ স্কন্ধের যদুকুল ধ্বংস ও

কলিযুগের বর্ণনা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠান্তে রাত্রি অধিক হওয়ায় ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১২ ॥

১৫ই জুন, বুধবার ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

শুদ্ধ দৃষ্টি—Highest Ideal (শ্রেষ্ঠ আদর্শ)

সকাল প্রায় আটটা। শ্রীম দোতলার বেঞ্চিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানের পর ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—(শান্তির প্রতি) তুমি আদি (ব্রাহ্ম) সমাজে যাও ত? গেলে আমার কাছ থেকে শুনে যেও। (শচীনের প্রতি) আই, এস্-সি পাশ করলে এবার বি-এ পাশ কর। তা না হলে মঠে নেবে না। স্বধীর মহারাজ পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হেমেন্দ্র মহারাজকে মঠে নিতে চান নি। এখন তিনি বিদ্যাপীঠ করেছেন। (শ্রীশের প্রতি) পিতা মাতা আছেন?

শ্রীশ—না।

শ্রীম—দক্ষিণেশ্বরে যাও ত?

শ্রীম—দক্ষিণেশ্বরে যাই, কিন্তু মঠে যেতে তত ইচ্ছা করে না।

শ্রীম—সে কি? কারু ওপর অভিমান করতে নেই। সাধুরা কত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, কত বড় ত্যাগ! যেমন দেশী আম আর বোম্বাই আম। কাঁচা অবস্থায় দেখতে একই রকম, কিন্তু পাকলে দেশী আম টক লাগে। যেমন পোলাও হচ্ছে বিশ জনের জন্য; যদি আরও দশ জন আসে তাহলে অন্য কম দামের চাল তাতে ছেড়ে দিলে সেই পোলাওই থাকে। সেই রকম অসাধু সাধুসঙ্গ করলে সাধু হয়ে যায়।

শ্রীশ—আমি মন্দ, তাই ভাল লোকের দোষ দেখি।

শ্রীম—তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, 'আমাকে গুণগ্রাহী করে দিন।' চৈতন্য-দেব গাধার পিঠে গৈরিক বস্ত্র দেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন। তাঁর **highest ideal** (শ্রেষ্ঠ আদর্শের) এর কথা মনে পড়ে গেল কিনা।

কেশবের সহিত—Spiritual position (আধ্যাত্মিক স্থান)

শ্রীশ—ঠাকুর আপনাকে বলেছিলেন না, "কেশব সেনের কাছে যত লোক যায়, এখানে তত নয় ?"

শ্রীম—হাঁ ; আমি তাতে বলেছিলাম, "তাঁর কাছে ঐহিক লোকেরা যায়।" ঠাকুর শুনে বললেন, "ঠিক, ঠিক, অনেক ঐহিক লোক যায়।" এক-দিন কেশববাবু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি, আমার ক আনা জ্ঞান হয়েছে ?" কেশববাবু বললেন, "আমি আর আপনার সম্বন্ধে কি বলব !"

"ঠাকুর তবু 'বলনা' এইরূপ জেদ করায় কেশববাবু বললেন, 'আপনার ষোল আনা জ্ঞান হয়েছে। ঠাকুর শুনে বললেন, 'না, তোমার কথা বিশ্বাস হল না। নারদ, শুকদেব এঁরা যদি বলতেন, তা হলে বিশ্বাস হত।' তিনি কি কেশবকে অপমান করলেন ? তা নয়। এইটুকু জানিয়ে দিলেন যে যারা মান, যশ, ইন্দ্রিয়সুখ নিয়ে থাকে, তারা বুঝতে পারে না। তাঁর spiritual positionটা (আধ্যাত্মিক স্থান) ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন।

শ্রীশ—আমার শক্তি জাগ্রত হয় না কেন ?

শ্রীম—তোমার দীক্ষা হয়েছে ; সাইনবোর্ড না মেরে গোপনে জপ কর।

শ্রীশ—নির্জ্জন কোথায় পাব ?

শ্রীম—এত বড় রাত আছে, ছাদ আছে।

শ্রীশ—কি করে ব্যাকুলতা আসে ?

শ্রীম—সাধুসঙ্গ করতে করতে আসে। এখানে মধ্যে মধ্যে আসবে। তোমাকে কৌশল বাতলে দেব। তুমি গীতা পড় না ? গীতাতে আছে, "স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমাসীত, ব্রজেত, কিম্ ?" (গীতা ২।৫৪)।

শ্রীশ—আগে পড়তাম, এখন পড়ি না।

শ্রীম—নিয়ম করে পড়তে হয়, ত্যাগীর মুখ থেকে শুনতে হয়। পরের দোষ দেখা তোমার উচিত নয়। তোমার গুরুকরণ হয়েছে। তোমার কর্ত্তব্য, বসে বসে নাম করা ও গুরুর উপদেশ মত কর্ম্ম করা। ঠাকুর বলতেন, "গুরু যদি ভার নেন, ত ভাবনা কি ?"

এইবার শ্রীশ যাইবেন। পথে একটি হাসপাতালে শ্রীমর পরিচিত দ্বারকা বাবাজী নামে একজন বৈষ্ণব অসুস্থ অবস্থায় রহিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীশকে বলিলেন, "তাঁহার খবর লইয়া

সম্বাদ দিতে। তাঁহাকে একখানি পোষ্টকার্ড দিয়া বলিতেছেন, "ধনুকে দুটো ছিলে থাকা উচিত ; একটাতে না হয় অন্যটায় হবে।"

বেলা দশটা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মায়ার মুখোস

বৈকাল পাঁচটা। শ্রীম দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন।

শ্রীম—(জনৈক ভক্তের প্রতি) এই সংসার মানুষকে জড়িয়ে রেখেছে। তিনিই মায়ার মুখোস পরে রয়েছেন—মুখোস পরে ভয় দেখাচ্ছেন, পাছে কেউ চিনতে পারে। যেমন একটি ছেলে মুখোস পরে অপরকে ভয় দেখাচ্ছে ; কিন্তু যদি কেউ চিনে ফেলে, 'ওরে, তুই হরে'—হরে তখন মুখোস খুলে দৌড় মারে। তাঁকে জানতে পারলে এদিকের কর্ম্ম শেষ হয়ে যায়। এমন অবস্থা আসে যখন মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে পড়ে ; একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

এইবার গান গাহিতেছেন—

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে," ইত্যাদি।

"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়," ইত্যাদি।

"মন মজরে শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়।
সাধে কি ভোলানাথের মনপ্রাণ ভুলে যায়॥
গগনেতে এক চন্দ্র, মায়ের পদনখে কোটি চন্দ্র।
ধরতে সেই পূর্ণচন্দ্র, তৃষিতের প্রাণ সদা ধায়॥"

"মনেরি বাস- , শ্যামা শবাসনা, শোন মা বলি," ইত্যাদি।

"দুর্গে এবার কর এ দীনের উপায়।
এ .দহ পঞ্চত্বকালে দেহাত্মা যেন মিশায়॥" ইত্যাদি।

॥ ১৩ ॥

১৯শে জুন, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

প্রভু জগদ্বন্ধু

বেলা দুইটা। শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী নবদ্বীপ। তিনি একজন বৈষ্ণব এবং প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্ত।

দেবেন্দ্র—আপনার প্রভু জগদ্বন্ধুকে কেমন বোধ হয়?

শ্রীম—তাঁর অনন্ত কাণ্ড। মানুষ কি বুঝবে? চৈতন্যদেব নিজে বলে গেছেন, "মুই সেই।" তাই মানুষ বুঝছে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "প্রভু, আপনি যখন বলছেন, তখন আমি বিশ্বাস করি। আপনিই কেবল নিজেকে জানতে পারেন।" অবতাররা কি মান যশ চান? তাঁরা গোপনে আসেন। ঠাকুর বলতেন, "অচিন গাছ জান?"

শ্রীম তাঁহাকে জল খাইতে দিলেন। তিনি নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৃষ্টি পড়িতেছে। সন্ধ্যার সময় শ্রীম চারতলার ঘরে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানের পর বালকের ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। তারপর মাদুরে আসিয়া বসিলেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত।

দেহাত্মবোধ। কর্ত্তাভজা। চৈতন্যদেব। নিত্যানন্দ।

একজন বৈষ্ণব—কত লোক বলছিল, 'মেঘ হচ্ছে না, মেঘ হচ্ছে না।'

জিতেন—কলকাতার লোকেরা জলের জন্য হাহাকার করছিল।

শ্রীম—সেই জন্য নদীর ধারে বাস করতে হয়। তা করতে গিয়ে হয়ত ঘর-দোর জলে ভেসে গেল, তবু লোকে সে জায়গা ছাড়ে না। যেখানে অনেক দিন থাকা যায়, সে জায়গা পুরানো বলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। আমি শ্যামপুকুরে বাড়ী ভাড়া করে ছিলুম। সে বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় কেঁদেছিলুম। দেহবুদ্ধি কিছুতে যেতে চায় না। দেখ না, ট্রেনে কত লোক বসে রয়েছে, একজন এসে তাদের সরিয়ে দিয়ে বলে, "আমি শোব।" কেউ হয়ত খেতে বা খাওয়াতে পারছে না। তখন বলে, "অমুক মরলে আমি

চাকরি পাব।" এমন দেহবুদ্ধি!

জিতেন—এর উপায়?

শ্রীম—উপায় 'কর্ত্তাভজা' হওয়া—কর্ত্তাকে ভজন করা। তাঁকে যদি দর্শন করা যায় তাহলে দেহবুদ্ধি যায়। কোন duty (কর্ত্তব্য) আর করতে হয় না।

এই বলিয়া গান গাহিতেছেন—

"এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥" ইত্যাদি।

"ঠিক ঠিক যদি যন্ত্র বোধ করিয়ে দেন—'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'—তাহলে দেহবুদ্ধি যায়।

'সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী মা, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।'

"দেহবুদ্ধি গেলে জন্ম-মৃত্যু চলে যায়। যতক্ষণ sense-worldএ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে) মন আছে ততক্ষণ কি করে কাটাবে? তাই সাধক মাতৃভাবে তাঁকে ডাকছে।"

পুনরায় গাহিতেছেন—

"কেমন করে হরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই॥ ইত্যাদি।

"ঠাকুর বলতেন, 'একটা মাছকে নানা রকম করে খাওয়া—ঝোলে, ঝালে, অম্বলে। দেহ-বুদ্ধি গেলে দিনরাত বোধ চলে যায়। মানুষ দেশকালের অতীত হয়। যেমন—

"'নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম, ছবিবিশ্ব চরাচর।'"

জিতেন—নিজেকে যন্ত্র বোধ কি করে হয়?

শ্রীম—তপস্যা চাই। বিচার করে কি তাঁকে বোঝা যায়? যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ sense-worldএ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে) মন। পরমহংস অবস্থায় মুক্তি পর্য্যন্ত চায় না। "ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।"

এইবার গান গাহিতেছেন—

"কবে হবে দরশন, হে প্রেমময় হরি,
কবে উথলিবে হৃদি মাঝে চিদানন্দ লহরী।
তনু হবে রোমাঞ্চিত প্রাণমন পুলকিত
(আর) নয়নে বহিবে বারি ও রূপ মাধুরী হেরি।

তোমার প্রেম মূরতি নিরমল মুখ জ্যোতি
(ভবরসে মগ্ন হয়ে) নিরখিব প্রাণ ভরি।"

"সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।" ইত্যাদি
শ্রীম—হরিনামের পর ঠাকুর বলতেন, "এই কাজ হল"।
আবার গাহিতেছেন—

"হরি তোমা বিনে কেমনে এ ভবে জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরী।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয় তাপ সব পাশরি।"
"জগত জীবন জগবন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয়, পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়,
হেরিলে তব মুখ ইন্দু।"

শ্রীম—এই সব গান জগন্নাথ দেবের কাছে গাইতে হয়। বৃন্দাবনে যে ভাব, তাতে মুক্তির নাম নেই।

এই বলিয়া গাহি. েছেন—
"বাঁশী বাজিল ঐ বিপিন (কে যাবি তোরা আয় গো)
তোদের শ্যাম কথার কথা, আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই)
তোদের বাজে বাঁশী কানের কাছে, বাঁশী আমার বাজে হৃদয় মাঝে।"
ইত্যাদি

"আর যাব না সই যমুনার জলে।
ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে॥"

শ্রীম গান গাহিতে গাহিতে ভাবে বিভোর, চক্ষুতে প্রেমাশ্রু। আবার বলিতেছেন, "অবতার পুরুষ নিজের শরীর রাখতে চান না। কেবল লোকের মঙ্গলের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাখেন। ঠাকুরের যখন এই রকম অবস্থা হল, তখন জগন্মাতাকে বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে চল। ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারব না।' মা তাতে বললেন, 'বাবা, দিনকতক থাক, লোক কল্যাণের জন্য। অনেক শুদ্ধ ভক্ত আসবে, তাদের নিয়ে আনন্দে থাকবে।'"

উপস্থিত বৈষ্ণবদের লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছেন,—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে,
অভিমানশূন্য নিতাই, নগরে বেড়ায় রে।"

"যখন নিত্যানন্দ দুই স্ত্রী বিবাহ করে পুরীতে চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে গেলেন, তখন তাঁর কাছে না গিয়ে নরেন্দ্র সরোবরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি কামিনী-কাঞ্চন ঘেঁটেছি, এই শরীর নিয়ে মহাপ্রভুকে দর্শন করব না।' ভক্তেরা প্রভুর কাছে খবর দিলেন, 'নিত্যানন্দ প্রভু নরেন্দ্র সরোবরের কাছে কাঁদছেন, আসতে চান না।' চৈতন্যদেব শুনে তখন নিজে সেখানে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'বিবাহ করেছ, তাতে কি হয়েছে? তোমার দ্বারা গৃহস্থদের শিক্ষা হবে।'

"চৈতন্যদেব তাঁর মান বাড়ালেন। ঈশ্বর দর্শন করলে মানুষ বালকবৎ হয়ে যায়, ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। সমস্ত আসক্তি চলে যায়। সংসার জয় করে সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত হয়। এই বলিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥" (গুরু গীতা)

আবার বলিতেছেন, "নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ" ইত্যাদি

(গীতা ১৫।৫)

"যেমন 'নেতি নেতি' (এ নয়, ও নয়) করে যাচ্ছ; শেষে যেখানে হাত পড়ল তাতে বোধ হল, 'এই, এই' ঠিক হাত পড়েছে, অস্তি বোধ হয়েছে।

"যেমন গানে আছে—

একরূপ, অরূপ-নাম বরণ, অতীত আগামিকালহীন,
দেশহীন, সর্ব্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।" ইত্যাদি।

২০শে জুন, শুক্রবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বেলা প্রায় দুইটা। শ্রীম দুইজন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর নিজেকে নিজে চিনেছিলেন

শ্রীম—"সখি গো সখি, যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" ওঃ, তাই ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না। টাকা হাতে করলেই হাত বেঁকে যেত। শেষকালে কোন ধাতু দ্রব্য ছুঁতে পারতেন না। তিনি নিজেকে চিনেছেন কি না।

"'স্বয়মেবাত্মনাত্মনং বেত্থত্বং পুরুষোত্তম।' (গীতা ১০।১৫)। ঠাকুরের মার যখন শরীর যায়, তখন নিজেকে দেখে কেঁদেছিলেন ও বলেছিলেন, 'মা, তুমি কেগো, তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলে!'"

নারীর লজ্জা

"কাশীপুরের বাগানে ভদ্রঘরের দুটি ছোট মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনিয়েছিল। তারা নীচে এসে ভক্তদের আগ্রহে তাঁদের কাছেও গেয়েছিল। ঠাকুর জানতে পেরে তাদের বাপকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখ, যেখানে সেখানে এদের গাইতে দিও না। মেয়েদের লজ্জা গেল ত রইল কি?'"

ব্রজমোহন ও ঠাকুর

"অশ্বিনী দত্তের বাপ, ব্রজমোহন ঠাকুরের ঘরে বসে অন্যের সঙ্গে বিষয়ের কথা বলছিলেন। ঠাকুর 'মা' 'মা' করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধির পরে বললেন, 'বাবু, এ সব কথা বলনা, এতে আমার কষ্ট হয়।' অহঙ্কার নেই। অন্যে জাঁক করে বলে, 'আমি এত বড় সাধু, আমার কাছে আবার বিষয়ের কথা।' কিন্তু তিনি বলতেন, 'মা আমাকে এ রকম অবস্থায় রেখেছেন'। দৃষ্টান্ত দিতেন, 'বেশ জল দেখা যাচ্ছিল, আবার পানা এসে ঢেকে ফেললে।' তাই তাঁর মহাবাক্য স্মরণ করে চললে আমাদের মঙ্গল।"

দুর্দ্দান্ত ছেলে

রাঁচি হইতে এক ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। তিনি সেখানকার ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে ছেলেদের পড়ান ও দেখাশুনা করেন।

ব্রহ্মচারী—ছেলেদের পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করা গেল; কিন্তু এমন এক একটা ছেলে আছে, যারা কিছু না বলে হঠাৎ চলে যায়। চিঠি পর্য্যন্ত দেয় না।

শ্রীম—ওসব আপনার ভুল। যার যা সংস্কার আছে তার তাই হবে। আমি তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে হেডমাষ্টারি করি। বয়স সাতাশ কি আটাশ বছর হবে। এক দুর্দ্দান্ত ছেলেকে বিদ্যাসাগর মশায় নিজে শাসন করেও পারলেন না। আমি বললাম, "চেষ্টা করলে ছেলেদের ভাল করা যায়।" তিনি বললেন, "দেখ, তুমি পারত চেষ্টা কর, আমি কিন্তু পারলাম না।"

ব্রহ্মচারী—এই সব দেখে শুনে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালাতে ইচ্ছা করে।

শরীর অনিত্য

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, "আগে নির্জ্জনে সাধন ভজন করে তাঁর আদেশে কর্ম্ম করতে হয়। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা হাতে লাগে না।" শরীর এই আছে, এই নেই। যেমন সাপে ব্যাঙ ধরেছে; ব্যাঙটা সাপের মুখে থেকেই মাছি ধরতে যাচ্ছে, জানে না তখনই তার মৃত্যু হবে, কালের কবলে পড়েছে। কখন যে কার শরীর যাবে তার ঠিক নেই। তাই তাড়াতাড়ি তাঁর দর্শনের জন্য চেষ্টা করতে হয়।

সন্ধ্যা হইল। দোতলার ঘরে মাদুর পাতা হইয়াছে। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। ক্রমে ভক্তেরা উপস্থিত হইলেন। ধ্যানের পর "কথামৃত" চতুর্থ ভাগ, ষষ্ঠ খণ্ড পড়া হইতে লাগিল। উহাতে নিরাকার ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে।

জিতেন—নিরাকারের ধ্যান কি রকম?

শ্রীম—যেন সচ্চিদানন্দ সাগর, জলে জল, ঊর্দ্ধ, অধঃ জলে পরিপূর্ণ। সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে যেন একটি 'আমি' রূপ মাছ খেলা করছে। এই 'আমি' যদি না থাকে, তাহলে সব এক, বাক্যমনের অতীত। সাধন ভজন দ্বারা তিনি যদি বুঝিয়ে দেন, তাহলে বোঝা যায়। তখন কি অনুভব হয়, মুখে বলা যায়

না। যেমন বোবা স্বপ্ন দেখে কিছুই বলতে পারলে না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল, খবর দিলে না।

॥ ১৫ ॥

২১শে জুন, শনিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বেলা প্রায় দুইটা। অদ্বৈত আশ্রমের পাচক লক্ষ্মণের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—তোমার ভাগ্য ভাল, তাই সাধুদের সেবা পেয়েছ। "আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে সেবা পায়, হয়ে ত্রিলোকজয়ী।" কলিকালে এরূপ সাধু অন্য কোথাও দেখা যায় না। এঁরা কতবড় মহাপুরুষকে চিন্তা করছেন। সব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাস নিয়ে কাজ করতে খুব কম লোককে দেখা যায়। ঠাকুর এসেছিলেন বলে এই সব সাধুদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর ধ্যানান্তে শ্রীম দোতলার ঘরে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—(ললিতের প্রতি) আপনার সেই স্তোত্রগুলি হোক না।

ললিত গঙ্গার স্তব ও অন্যান্য স্তব পাঠ করিতেছেন—

"মাতঃ শৈলসুতা" ইত্যাদি (বাল্মীকি কৃত)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভিষ্ট দোহং" ইত্যাদি (ভাগবত ১১ স্ক)

শ্রীম—তিনিই বেদ করেছেন ও জানেন—"বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।
(গীতা ১৫।১৫)

পরে "কথামৃত", চতুর্থ ভাগ, দশম খণ্ড পাঠ হইতে লাগিল। উহাতে লেখা আছে—যখন মহিমাচরণ বলিতেছেন, "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্" (শঙ্করকৃত নির্ব্বাণষট্‌ক), তখন ঠাকুর বলিতেছেন, "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু —আমি নয়, আমি নয়, তুমি, তুমি।"

অবতারদের অবস্থা। যথার্থ পণ্ডিত

শ্রীম—লোকের মঙ্গলের জন্য এরকম বলছেন, অবতারদের সব অবস্থা হয়। তাঁরা সোঽহং ভাবেও থাকেন। কিন্তু লোকে ঐ highest ideal (সর্ব্বোচ্চ আদর্শ) ধরতে পারে না, কারণ কলিতে দেহবুদ্ধি সহজে যায় না। তাই তাঁরা বলেন যে ভক্তি নিয়ে থাকো ভাল, সেব্য সেবক ভাব। পণ্ডিতদের কথা আর বল কেন? তারা শ্লোক ঝেড়ে দিয়ে খালাস। ঠাকুর বলতেন, "চিল শকুনি ওপরে ওঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।" যেমন ফোড়ার ওপরটা দেখতে বেশ কিন্তু ভেতরে পুঁজ ভর্ত্তি। পণ্ডিতদের কথা নিলেই সর্ব্বনাশ। দূর থেকে তাঁদের নমস্কার করতে হয়। "যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে।" বেদে বলেছে, "যারা সাধনপথে উঠেছে তারাই যথার্থ পণ্ডিত।" তাইত মহাত্মা গান্ধী লোকে যাতে দুটি পেটে খেতে পায়, পরতে পায়, তারই চেষ্টা করছেন। তাহলেই ঈশ্বরকে ডাকতে পারবে। তিনি নিজে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সপ্তাহে একদিন মৌনী হন। তিনি যে কেবল কর্ম্ম করেন তা নয়। মহাত্মা কত বড় লোক।

"সেদিন মঠের সাধুরা বলছিলেন, 'ও দেশের লোকেরা আমাদের কথা শুনে অবাক হয়ে থাকে।' ভারতবর্ষ কত বড দেশ। পাশ্চাত্য হাঁ করে রয়েছে, এরা কি বলে শোনবার জন্য।"

রাত্রি নয়টা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১৬ ॥

২২শে জুন, রবিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সকাল আটটা। শ্রীম নিজ হস্তে ছাদের যেখানে জল পড়ে সেখানে সিমেণ্ট ইত্যাদি লাগাইতেছেন। কাছে দুইজন ভক্ত। তন্মধ্যে একজন শ্রীমর গায়ে রৌদ্র লাগিতেছে দেখিয়া ছাতা ধরিয়াছেন।

আলিবাবা

শ্রীম—(ছাতা ধরায় হাসিতে হাসিতে) বাড়ীর এক চাকরাণীকে জল

আনতে দেখে আলিবাবা বলেছিল, "আমি যখন রাজা হব, তুই তখন রাণী হবি। সেই সময় তুই যখন জল নিয়ে আসবি, তোকে দুজন বাতাস করবে।" তাতে চাকরাণী বলেছিল, "দূর, তখন কি আর আমায় জল আনতে হবে! তখন কত দাসদাসী আমার সেবা করবে।"

কর্ত্তা না হলে কাজ চলে না

শ্রীম—(হাসিতে হাসিতে, শান্তির প্রতি) ভরত পাখীর কথা বল ত। (তারপর নিজেই বলিতেছেন) ধান ক্ষেতে পাখী বাসা করেছিল। ধান পাকাতে ক্ষেতের মালিক চাকরদের বললে, "দেখে এস ধান পেকেছে কিনা। যদি পেকে থাকে তা হলে কাটতে আরম্ভ কর।" তাদের দেখে ভরত পাখীর ছানাগুলি বললে, "মা, এবার আমরা অন্য জায়গায় পালিয়ে যাই চল। এরা এখন ধান কেটে নিয়ে যাবে।" ভরত পাখী বলল, "এরা চাকর। এরা কখনও কাটবে না।" যেদিন মালিক নিজে এল, সেদিন তারা অন্যত্র উড়ে গেল। মালিক না হলে কাজ হয় না, তাই আমি নিজে কাজ করছি!

॥ ১৭ ॥

২রা জুলাই, বুধবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বেলা এগারটার সময় চাতরলার ঘরে শ্রীম একজন ভক্তের সহিত দক্ষিণেশ্বরের কথা কহিতেছেন।

আশীর্ব্বাদ

শ্রীম—(ভক্তের প্রতি) বলত, সেই ব্রাহ্মণের কথা।

ব্রাহ্মণের বাড়ী বরিশালে, তিনি শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে একরাত্র ছিলেন।

ভক্ত—লোকটি খুব অমায়িক এবং সরল।

শ্রীম—এখান থেকে যাবার সময় খুব প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করতে লাগল।

বললে, "বাড়ীর সকলের মঙ্গল হোক, মঙ্গল লোক।" ঠাকুর যেন ওর মুখ দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

"আর একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, একজন নেশাখোর আমার কাছে পয়সা চাইলে। আমি কিছু পয়সা দিতে সেও সেইরকম আশীর্ব্বাদ করেছিল। একবার একজন বৃন্দাবনবাসীকে দুআনা পয়সা দিতে সে বলেছিল, 'ভগবানে তোমার ভক্তি হোক'।

সাধু মাহাত্ম্য

বেলা পাঁচটা। পাচক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ আসিয়াছে।

শ্রীম—(লক্ষ্মণের প্রতি) কেমন সাধুসঙ্গে আছ? সংস্কার না থাকলে সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না। ওঁরা কত বড় ত্যাগী। সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন। সাধুসেবা, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা এ সব বিদ্যার সংসার। পিতামাতা, ভাইভগিনী প্রভৃতির সেবা অবিদ্যার সংসার। দেখ তাদের কাছে তুমি মাইনে চেয়োনা, রোজ সাধুদের প্রণাম করবে। প্রণাম করলে পূজো হয়ে যায়। ভাগবতে কেমন সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা রয়েছে, শোন।

এই বলিয়া তাহাকে একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় হইতে শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিলেন, "উদ্ধব, সৎসঙ্গ দ্বারা আমি যেমন বশীভূত হই, যোগ, সাংখ্য, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ত্যাগ, ইষ্ট, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, বেদ, তীর্থ, যম ও নিয়ম দ্বারা তেমন বশীভূত হই না; এই সব আমাকে বাঁধতে পারে না। সৎসঙ্গ দ্বারা বিভিন্ন যুগে দৈত্য, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং মানুষের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ প্রভৃতি উদ্ধার হয়ে গেছে; যেমন বাণ, বলি, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজ, গৃধ্র, ব্যাধ কুব্জা প্রভৃতি। ব্রজগোপীরা বেদ না পড়ে কোন ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও তপস্যা না করে কেবল সৎসঙ্গেই পরম পদ লাভ করেছিল।"

"যাঁকে দেখলে উদ্দীপন ও ভগবানের কথা স্মরণ হয় ই সাধু। তুমি সাধুসঙ্গে আছ কি না, তোমাকে দেখলে উদ্দীপন হয়। তোমার ভাগ্য ভাল।"

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম ছাদে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ধ্যান হইতে উঠিতে জনৈক ভক্ত একটি গান গাহিলেন এবং একজন বৈষ্ণব কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনের শেষে তিনি মহাপ্রভুর জয় দিয়া সর্ব্বশেষে বলিতেছেন, "মাষ্টার মশায়কী জয়", ইত্যাদি।

শ্রীম—(বিরক্ত হইয়া) উপাধি দাও কেন? তাঁর অনন্ত কাণ্ড। ঐ দেখ অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল। অন্তরে, বাহিরে, নীচে, ওপরে তিনি পরিপূর্ণ। দেবতারা সকলেই তাঁর বন্দনা করছে। তার মধ্যে আমরা এই কটি প্রাণী বসে আছি।

॥ ১৮ ॥

৩রা জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

পোষ্টাপিস

বৈকালে পাঁচটায় শ্রীম বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীম কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া পরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—আমি আজ বেড়াতে গিয়েছিলাম, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে মাড়োয়ারী হাসপাতাল ছাড়িয়ে পোষ্টাপিস পর্য্যন্ত। পোষ্টাপিস দেখলে লোকের মনের অবস্থা বোঝা যায়। কারু বন্ধু আসবে, তাড়াতাড়ি চিঠি ফেলতে যাচ্ছে। কারু হয়ত অসুখ করেছে, টেলিগ্রাফ করতে যাচ্ছে। কারু বা মরণাপন্নাবস্থা। কেউ আনন্দের খবর দিতে যাচ্ছে। কেউ বা সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করছে, এই সব।

রমেশ—আপনি বড় বিল্ডিংওয়ালা পোষ্টাপিসে গিয়েছিলেন?

বিরাট

শ্রীম—এই যে অনন্ত আকাশ এর চেয়ে আর কিছু বড দেখি না। সাহেবরা বলে, এই যে এক একটি নক্ষত্র এগুলি এক একটি সূর্য্যের মত বড়। এর পিছনে এক একটি জগৎ রয়েছে, আমরা তার মধ্যে ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র।

'পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।

জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও (ওহে) দুর্ব্বল শরণ।" ইত্যাদি

জনৈক অফিসার—যাদের শুদ্ধ মন তারা সবতাতে সেই অনন্তকে অনুভব করতে পারে।

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর চিত্তশুদ্ধি কববাব জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করতে বলতেন। নিষ্কাম কর্ম্ম কবলে চিত্ত শুদ্ধ হয়।

ক্রাইষ্টকে দেখেছি

একদিন আমি খ্রীষ্টানদেব বললাম, 'কিছু ক্রাইষ্টেব কথা শোনান।' তাঁরা কিছু বলছে না দেখে আমিই বললাম। একজন আমার মুখ থেকে শুনে বললে, 'আপনি এ সব রহস্য কি কবে জানলেন?' মনে মনে ভাবলাম, আমবা যে তাঁকে দেখেছি। আমবা ঠাকুরকে দেখেছি। তিনি বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, যে খ্রীষ্ট, যে চৈতন্য সেই আমি।' কি কবে বা তারা বুঝবে? ভোগ নিয়ে থাকলে বোঝা যায় না। আবার তাব ওপর পেটেব চিন্তা। পেটেব চিন্তাই মনকে নীচু করে বেখে দেয়।

"ও দেশেব লোকেবা ভেবেছিল, 'কালা লোকদের আমরা শিক্ষা দেব।' উল্টে কালা লোকেরা তাদেব শিক্ষা দিচ্ছে। 'উল্টা সমঝলি রাম।' এক সাধুর কিছু বই, লোটা, কম্বল প্রভৃতি ছিল। সেই সব জিনিষপত্র নিয়ে ঘোরাঘুবি করতে অসুবিধা বলে রামকে প্রার্থনা কবেছিল, 'হে রাম, আমাকে একটা ঘোড়া জুটিয়ে দাও, যার ওপব সব বেখে এবং নিজে চেপে ঘোরা ফেরা করতে পারি।' সেই সময় রাস্তা দিয়ে এক দল সেপাই যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে ঘোড়াও ছিল। যেতে যেতে একটা ঘোড়াব বাচ্ছা হল। সেপাইরা সামনে আর কাউকে না পেয়ে সেই সাধুটিরই কাঁধে বাচ্ছাটিকে চাপিয়ে দিলে, ছাউনিতে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। তখন সেই সাধু বলেছিল, 'হে রাম, উল্টো বুঝলে? কোথায় আমি চাপব, তা না হয়ে তুমি আমারই ওপর চাপালে।'

মহাত্মা গান্ধী

"ভারতবর্ষে টাকা নেই। তাই মহাত্মা গান্ধী চেষ্টা করছেন, যাতে লোকে দুটি খেতে পায়। তাঁর কাজ হচ্ছে কর্ম্মযোগ। ওপথের আদর্শ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে কুন্তীদেবী মহাযোগেশ্বর, মহাযোগী বলে স্তব করছেন। শ্রীকৃষ্ণ কত কাজ করেছেন—বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র

প্রভৃতি জায়গায়। বৃন্দাবনে গোপীদের প্রেম বিতরণ করে চলে গেলেন। যখন মথুরা গেলেন তখন যেন বৃন্দাবনের কথা ভুলেই গেলেন। আবার মথুরা থেকে যখন দ্বারকা গেলেন তখন যেন মথুরার কথা মনেই নেই। কত বড় ত্যাগী! কি নির্লিপ্ত! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় রাত্রে ঘুম নেই, কার সঙ্গে কি রকম যুদ্ধ করতে হবে তারই পরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত। আবার মহাযোগে রয়েছেন। পাণ্ডবেরাই তাঁকে ঠিক ঠিক চিনেছিলেন।

'ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥' (গীতা ৪।১৪)

"যাঁরা তাঁকে নির্লিপ্ত বলে জানে তারাও কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় না।

"মাহাত্মা গান্ধীর একবার জেলে অসুখ হয়েছিল। সাহেবরা তাঁর বন্ধুদের চিঠি লিখে দেখে যেতে বললে ও তাঁদের ডাক্তারের পরামর্শ মত চিকিৎসা হতে লাগল। না হলে তাঁরা মনে করবেন, এরা মেরে ফেললে। কোন বিষয়ে গান্ধীর কি মত তা জানবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। শ্রীকৃষ্ণের বেলাও ঠিক এই রকম হত। শ্রীকৃষ্ণ কি মত প্রকাশ করেন শোনবার জন্য রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি সকলে উৎসুক। তিনি যশস্বী কি না। এক সময় যখন অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন, বলরাম রেগে নিজের হল, মুসল, সৈন্য সামন্ত নিয়ে অর্জ্জুকে শাস্তি দেবার জন্য চললেন। খানিক রাস্তা গিয়ে মনে পড়ল শ্রীকৃষ্ণের কথ। তখন সকলকে বললেন, 'তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে আসি।' গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'দেখ, অর্জ্জুন কাউকে কিছু না বলে চোরের মত সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। সেইজন্য আমরা তাকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি। তোমার এতে কি মত?' শ্রীকৃষ্ণ খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'দাদা, শাস্ত্রে আছে গন্ধর্ব্ব-বিবাহের কথা। দুজনের পরস্পর প্রণয় হলেই বিবাহ হতে পারে।' বলরাম বললেন, 'ও, বুঝেছি এতে তোমার মত আছে। তা আগে বল নি কেন?' আর তাঁদের যাওয়া হল না, যুদ্ধও থামাতে হল। সভাতেও ঐ রকম হত। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে সকলেই হৈ চৈ করছে, কিন্তু যেই শ্রীকৃষ্ণ কথা বললেন, অমনি সকলে চুপ হয়ে গেল।

বৈষ্ণব সাধু বাসুদেব বাবা

(বীরেনের প্রতি) "আমার সাধ ছিল বাসুদেব বাবাকে দর্শন করব। দর্শন করে আমার পরম লাভ হল। তিনি ষাট বৎসর ধরে পুরীতে আছেন।

তাঁর অনেক শিষ্য ও ভক্ত। তাঁরা বাসুদেব বাবাকে যে প্রণামী দেন, ত দিয়ে মহাপ্রসাদ আনিয়ে তিনি সাধুদের নিত্য সেবা করেন।

সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে বালক স্বভাব হয়ে গেছেন। খুব মিষ্টভাষী। প্রায়ই জগন্নাথের সেবা-পূজা নিয়ে থাকেন।"

বীরেন—আমার একটি ছোট মেয়ে বাসুদেব বাবার কাছে যেত। তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন।

শ্রীম—সাধুদের কাছ থেকে স্নেহ দৌড মারে। একটা কুকুর খাচ্ছিল। তাই দেখে জড়ভরতের তার প্রতি স্নেহ হল। বললেন 'আহা, খাক্, খাক্।' পরক্ষণেই ভাবলেন, 'ওঃ, আমার এর উপর স্নেহ আসছে।' পূর্ব্বজন্মে হরিণের উপর আসক্তি হওয়ায় হরিণ হতে হয়েছিল। সেই সমস্ত ভেবে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

শোক ও স্নেহ কাটবার ব্রহ্মাস্ত্র

শ্রীম—স্নেহ কাটবার ব্রহ্মাস্ত্র কি? দেখি কে বলতে পারেন?

কেহ কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া নিজেই বলিতেছেন, "যেখানে কাউকে দেখে স্নেহের উদয় হয় সেখান থেকে পালানো। কিছু দিন না দেখলেই স্নেহ আপনা আপনি কমে যায়। দেহবুদ্ধি কিছুতেই যায় না। স্ত্রীর চিঠি পুরুষ বুকে করে রাখে। লোকে বলে এ প্রেম। তা হবে না? মহামায়া এই রকম করে তাঁর সৃষ্টি চালান।

"শোক নিবারণের ব্রহ্মাস্ত্র কি? যার জন্য শোক হচ্ছে তার দোষ স্মরণ করা। যাঁরা ভগবানকে দর্শন করেছেন, তাঁদের আর স্নেহ শোক প্রভৃতি কিছু করতে পারে না। তাঁরা 'নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ' (গীতা ১৫।৫)। তাঁরা সমস্ত সঙ্গ দোষ জয় করেছেন। তাঁদের দেহ-বুদ্ধি থাকে না। তাঁদের এ দিকের সমস্ত কর্ম্মও কমে যায়।"

জনৈক ভক্ত ক্লান্তি বোধ করায় বেঞ্চিতে কাত হইয়া বসিলেন।

শ্রীম—এই রকম করে ঠাকুর তপস্যা করিয়ে নিচ্ছেন।

ভক্ত—অল্পের ওপর দিয়ে হলেই বাঁচি।

সিদ্ধ

শ্রীম—হঠাৎসিদ্ধ আর সাধনসিদ্ধ; আবার সিদ্ধের সিদ্ধও আছে। হঠাৎ-সিদ্ধ কেমন জান? যেমন এক গরীব বিধবা ব্রাহ্মণীর ছেলে কোন বড়লোকের

নজরে পড়েছে। অমনি তার গাড়ী, ঘোড়া, বিষয় সম্পত্তি সব হয়ে গেল। সাধনসিদ্ধ—যেমন সাধন করতে করতে তাঁর কৃপা পেল।

ভক্ত—আমি একটি ছোট মেয়েকে দেখলাম, কতকগুলি খেলনা, পেনসিল ইত্যাদি নিয়ে খেলা করছে। তার ভাই এসে চাইলে; সে কিছুতেই দিল না। কিন্তু বামুন ঠাকুরকে এসে বলছে, 'এই পেনসিল নাও।' যাঁরা বিবাহাদি করেন নি তাঁদের খুব সুযোগ।

শ্রীম—তাঁর কাছে এ সব কিছুই নয়। যেমন হাজার গাঁটওয়ালা দড়ি কেহ খুলতে পারছে না। কিন্তু যাদুকর যেই দড়িটা ধরে নাচাতে লাগল অমনি হাজার গাঁট খুলে গেল। তেমনি গুরুর কৃপা হলে সমস্ত বন্ধন এক মুহূর্ত্তে চলে যায়।

"তাই মা কালী বরাভয়দায়িনী। ভক্তদের অভয় দিয়ে বলছেন, 'ভয় নাই। কি বর চাও?' যারা তাঁর কাছে কিছু চায়, দিতে যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

অহেতুকী ভক্তি

"আর এক থাকের লোক আছে। তারা হাজার বিপদে পড়ুক, হাজার শোক আসুক, তবু 'মা' 'মা' বলে ডাকে। তারা আর কিছু চায় না; মা কাছে থাকলেই হল; একে বলে অহেতুকী ভক্তি। যেমন মা ছেলেকে মারছে, ছেলে কিন্তু মার খেয়েও মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই অহেতুকী ভক্তি সকলের হয় না। অবতারদের হয়। ঠাকুর এক বৎসর কাল ক্যান্‌সারে ভুগলেন; তবু তিনি মার কাছে বলেন নি, 'মা, আমার রোগ আরাম করে দাও।'

"ক্রাইষ্টের দেখনা, বিপক্ষেরা যখন তাঁকে বিচারকের কাছে ধরে নিয়ে অভিযোগ করে বললে, 'এ লোক রাজদ্রোহী; বলে, আমি ইহুদীদের রাজা।' তখন বিচারক ক্রাইষ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' ক্রাইষ্ট বললেন, 'আমি ভক্তদের রাজা। শুধু তাই নয়, প্রলয়ের পর আমিই থাকি, সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিই।' এই সব শুনে বিচারক তাঁকে ক্রুশে দেবার হুকুম দিলেন। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থাতেও বিচলিত না হয় বলেছিলেন, 'পিতা, এরা জানে না, এদের দোষ ক্ষমা কর।'

"ঠাকুরেরও ইচ্ছা ছিল ভক্তদের রাজা হওয়া। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন 'রাম রক্ষা কর' 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করে। স্বয়ং রাম

যখন মারছেন, তখন চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই। তাঁর এসব খেলা বই ত নয়। সৃষ্টি-স্থিতি, মৃত্যু, আপদ-বিপদ মানুষের পক্ষেই বড়। তাঁর পক্ষে এ সব খেলা।* ঋষিরা বনে জঙ্গলে তপস্যা করে এ সব তাঁর লীলা বলে অনুভব করেছিলেন। তাঁকে অনুভব করলে কি হয়, কেউ মুখে বলতে পারে না।"

গজমোক্ষণ। জগন্নাথ। মাহেশ

এইবার ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধ হইতে গজেন্দ্র মোক্ষণ অংশ পাঠ হইতে লাগিল। একটি হস্তী নদীতে জলপান কবিতে নামিয়া এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। বহু চেষ্টাতেও তাহার কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া অবশেষে কাতরভাবে ভগবানের স্তব করিতে লাগিল, "হে প্রভো, আপনি জগতের সর্ব্ববিধ কারণ, আবার কার্য্যকারণ ভাবের অতীত। আমি আপনার শরণাগত।† কালের প্রভাবে সকল বস্তু নষ্ট হইলেও আপনি বিদ্যমান থাকেন। আপনি নটের ন্যায় জগতে লীলা করিতেছেন। কেহ আপনাকে চিনিতে পাবে না। হে ভগবান, আমাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করুন।" হস্তী এইরূপ প্রার্থনা করিতে থাকিলে অন্তর্যামী ভগবান গরুড়ের পৃষ্ঠে তথায় আগমন পূর্ব্বক চক্রের দ্বারা কুম্ভীরকে বিনাশ করিয়া হস্তীকে উদ্ধার করিলেন।

শ্রীম—(পাঠান্তে) এ থেকে আমাদের কি শিক্ষা হল? এই শিক্ষা হল যে যতক্ষণ পুরুষকার, ততক্ষণ চেষ্টা। যখন পুরুষকারে কুলুচ্ছে না, তখন তাঁকে ডাকা, তাঁর শরণাগত হওয়া। গরুড় বাহন মানে—অনাদি অপৌরুষেয় বেদই তাঁর বাহন।

বীরেন—পুরীতে মাঘী পূর্ণিমার দিন জগন্নাথকে ঐ ভাবে সাজায়। শাস্ত্রে আছে ঐ দিন নাকি ভগবান গজকে মুক্ত করেছিলেন।

শ্রীম—আমি এক দোল পূর্ণিমায় পুরীতে ছিলাম। কাল মাহেশের রথ। ঠাকুর মাহেশের রথে গিয়েছিলেন এবং অত ভিড়ের মধ্যেও রথ টেনেছিলেন। ভক্তরা এদিকে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না। শেষে দেখে যে তিনি কীর্ত্তনের

---

* লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্—ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩ সূ॥

† যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোহস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ৮।৩।৩—শ্রীমদ্ভাগবত

দলের মধ্যে কীর্ত্তন করছেন। ভক্তদের কাছ থেকে কখন ছুটে চলে গিয়েছিলেন। তিনি কি ভক্তদের চান? কাউকে তিনি চান না। একদিন বললেন, 'মা আমাকে এমন অবস্থায় রেখেছেন যে কাউকে দরকার নেই।'

বড় জিতেন—ভক্তদের চৈতন্য করবার জন্য তাদের নিয়ে থাকেন।

শ্রীম—আমার ইচ্ছা আছে কাল জগন্নাথের ঘাটে ও বাগবাজারে রথ দেখব। ঠাকুর বলেছিলেন, 'এই যে লোকে রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এর ভাব, আমরা ভগবানের দাস।' দাসভাবে সেই অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।' তাই লোকের এত উৎসাহ দেখা যায়।

রাত্র পৌনে দশটা। ভক্তরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১৯ ॥

৪ঠা জুলাই, শুক্রবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বৈকালে শ্রীম ডাক্তার কার্ত্তিক বক্সীর গাড়ীতে রথ দেখিতে যান। সন্ধ্যার পর ফিরিয়া ছাদে বসিয়া ঐ সম্বন্ধে ভক্তদের নিকট গল্প করিতেছেন।

শ্রীম—অনেক গান শুনলাম, কিন্তু ঠাকুরের গানের মত গান শুনতে পেলাম না। তাঁর মত এমন মিষ্টি গলা আর কারও দেখি নি। তার পরই স্বামীজীর গলা। তিনি যখন গান গাইতেন তখন লোকের মনে একটা ভগবৎ-স্রোত বয়ে যেত।

"জগন্নাথ ঘাটে রথ দেখলাম, গঙ্গা স্পর্শ করলাম। সেইখানে একটি সাধু বসেছিলেন, তাঁর সঙ্গ করছিলাম। তিনি গল্প করলেন, 'হরিদ্বারে একজন সাধু আই-এ পাশ করে তপস্যা করছিলেন। তাঁর গুরুদেব তাঁকে বললেন, 'এম-এটা পাশ করে নাও, প্রথম হলে কিছু টাকা পাবে; সেই টাকা মাকে দিয়ে আসবে, মারও তাতে সেবা হবে।' সাধুটি বললেন, 'এর মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয় তা হলে কি হবে? তাঁর পাদপদ্ম চিন্তাই সার। তাই আমি তাঁকে পাবার চেষ্টা করছি।'

"আমি দেখছি, ঠাকুরের মহাবাক্যগুলি যেন মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তিনি বলেছিলেন, 'ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।'

ধ্রুব চরিত্র

"একবার এক জায়গায় ধ্রুব চরিত্র অভিনয় হচ্ছিল। উত্তানপাদ রাজার দুই স্ত্রী—সুনীতি ও সুরুচি। রাজা ছোটরাণীর পরামর্শে বড়রাণীকে বনবাস দিয়েছিলেন। যখন ছোটরাণীর সঙ্গে রাজা আমোদ আহ্লাদ করছিলেন তখন দর্শকরা হাসছিল। তাই দেখে ঠাকুর, পাশে যারা বসেছিল, তাদের বললেন, 'দেখছ, এরা এইসব নিয়ে রয়েছে কিনা! তারপর রাজা একদিন মৃগয়া করতে করতে গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়েন। সেখানে বড়রাণী কুটীর বেঁধে বাস করছিলেন। বড়রাণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ও রাজা সেই কুটীরে থাকেন। ঐ প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের একটি কথা বলছি শোন। রাণী ব্যাকুল হয়েছিল বলে রাজাকে পেলে। সত্য বলছি, যারা আন্তরিক ব্যাকুলভাবে ভগবানকে চাইবে তারা তাঁকে পাবেই পাবে।'

ব্যাকুলতা। ভক্তবৎসল ঠাকুর

"কেউ ব্যাকুল হয়েছে শুনলেই ঠাকুর নিজে তার কাছে দৌড়ে যেতেন। একদিন অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ী করে একজন ভক্তের বাড়ী গিয়ে পড়লেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম। ঠাকুর এসেছেন শুনে ভক্তটি তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি এই অন্ধকার রাত্রে কষ্ট করে এসেছেন কেন? আমাকে বললেই আমি যেতাম।' ঠাকুর তখন বললেন, 'দেখ, কখনও ভক্ত ছুঁচ হয়, ভগবান চুম্বক হন; আবার কখনও ভগবান ছুঁচ হন, ভক্ত চুম্বক হয়। ব্যাকুল হলে সে ভগবানকে পায়।' এটি অবতার-জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। ভক্ত ব্যাকুল হলে ভগবান হয়ে যায়। তার এমন শক্তি হয় যে ভগবানকে কাছে টেনে নিয়ে আসে। তিনি তার কাছে না এসে পারেন না।

"সাধুদের ideal (আদর্শ) সামনে রাখতে হয়; তবে চৈতন্য থাকে। সাধুদের কথা শুনলে প্রাণ শীতল হয়।

ভক্তি উপহার

"রথযাত্রার দিন জগন্নাথ দেবের পূজো দিতে হয়। আমি ডাক্তারের গাড়ীতে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো পর্য্যন্ত এসে সেখান থেকে ট্রামে কালীতলায় নামলুম। মা কালীর চরণামৃত ধারণ করে এলুম। ঠাকুর বলতেন,

'সংসারীদের মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যেতে হয়।' আজ জগন্নাথ দেবকে আম কাঁঠাল দিতে হয়। শুধু চোখ বুঁজলে কি হবে? গীতাতে বলছে, 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি (৯।২৬)। তাঁকে ফল ফুল দিয়ে পূজো করতে হয়।

"গুরুজনরা বলেছেন বলে আমাদের করা উচিত। শেষে অবশ্য মনেতেই সব হয়। মানস পূজা করলেই সমস্ত হয়ে যায়।"

জনৈক ভক্ত আম আনিয়াছেন। উহা ঠাকুরকে নিবেদন করিবার জন্য শ্রীম নিজেই একখানি থালা মাজিতেছেন দেখিয়া একজন বলিলেন, 'young manরা (ছোকরারা) থাকতে আপনি থালা মাজছেন কেন?'

শ্রীম—কোথায় কি আছে ওরা সব জানে? বরং হাঙ্গামা বাড়াবে। বুড়োদের নিজেরা করে শিক্ষা দেওয়া উচিত তবে ত শিখবে। (ভক্তের প্রতি) তোমার আমটা কেটে এই থালায় সাজিয়ে ঠাকুরকে নিবেদন করে দাও। নমস্কার করে নিবেদন করলেই হল।

নিবেদনের পর ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইলেন। শ্রীম নিজেও একটু গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আঁটিটি জিতেনবাবুকে দাও।"

শ্রীমন্ত সওদাগর

আহারান্তে শ্রীম পুনরায় ছাদে আসিয়া বসিলেন। মা কালীর প্রসাদ আসিয়াছে। প্রসাদ দর্শনে মাকে মনে পড়ায় শ্রীম গান করিতেছেন—

"এই ছিল কোথায় গেল কমল দল বাসিনী।
লোক লাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশী বরণী॥"

শ্রীম—চণ্ডীর গানে আছে, শ্রীমন্ত যখন ডিঙ্গি করে সমুদ্র দিয়ে সিংহলে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন এক জায়গায় হাজার হাজার পদ্ম ফুটে রয়েছে। তার মধ্যে মা জগদম্বা ভুবনমোহিনী রূপে দেখা দিলেন। মাকে কেবল শ্রীমন্তই দেখেছিলেন, মাঝিরা কেউ দেখে নি। তার পর সিংহলে গিয়ে সেখানকার রাজা শালিবাহনকে সেই কথা বলেন। রাজা তাঁর কথা অবিশ্বাস করায় শ্রীমন্ত বললেন, "আমি যদি ঐ কমলে কামিনী আপনাদের দেখাতে না পারি তবে আপনি আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেবেন ও আমাকে আপনার দক্ষিণ মশানে বধ করবেন।" রাজাও প্রতিজ্ঞা করলেন, "যদি আমাকে কমলে কামিনী দেখাতে পার ত তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দেব ও আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।" কিন্তু শ্রীমন্ত আর রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে

পারলেন না। রাজা তাকে বধ করবার হুকুম দিলেন। শ্রীমন্তের বয়স তখন ষোল বছর মাত্র। তিনি বললেন, "মহারাজ, আমি ছেলেমানুষ, তাঁর মায়া বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা করুন।" রাজা কিন্তু তাঁর কথা শুনলেন না। কোটাল শ্রীমন্তকে মারবার জন্য দক্ষিণ মশানে নিয়ে গেল। শ্রীমন্তের প্রার্থনায় মা চণ্ডী বৃদ্ধারূপে এলোথেলো বেশে তাঁকে কোলে নিয়ে বসলেন। কোটাল শ্রীমন্তকে মারবার জন্য অস্ত্রাঘাত করলে, কিন্তু বৃদ্ধার গায়ে লেগে সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। শ্রীমন্তর তাতে কিছুই হল না। বুড়ীকে মারতে এসে রাজার সৈন্যরাও সব প্রাণ হারাল। রাজা তখন বুঝলেন, ইনি সামান্য স্ত্রীলোক নন, সাক্ষাৎ মহামায়া। বুঝতে পেরে স্তব করতে লাগলেন এবং তাঁর কৃপায় মার কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখতে পেলেন।

"অবতারাদি এলে তাঁর আভাস পাওয়া যায়। মা রূপ ধারণ করে ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইতেন। তাঁরই নাম আদ্যাশক্তি।"

এই সময় কয়েকজন ভক্ত মাহেশের রথ দেখিয়া আসিলেন।

শ্রীম—আলোটা ধর, আমি এদের মুখ দেখি। এরা ভগবানকে দর্শন করে এসেছে। "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" কি বল? ঠাকুর মাহেশের রথ দেখিতে গিয়েছিলেন; সেই রথ দেখে তারা ফিরছে। বিশ্বাস হলে এখুনি হয়ে যায়।

একজন জগন্নাথ দেবের প্রসাদী মালা আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমকে দিলেন।

শ্রীম মালাটি স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"এই তাঁর সঙ্গে touch, (স্পর্শ) হল।"

তিনি সেটি ভক্তদের দিলে তাঁহারাও উহা স্পর্শ করিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

॥ ২০ ॥

৬ই জুলাই, রবিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়া

সাধুর আলাদা শরীর

বেলা তিনটা। গদাধর, লক্ষ্মণ ও মঠের জনৈক সন্ন্যাসী ছাদে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণ জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ আনিয়াছেন।

শ্রীম—(ছাদে আসিয়া লক্ষ্মণের প্রতি) মহাপ্রসাদ? কোথা থেকে আনলে? সকলকে দাও।

সন্ন্যাসী—আমার পায়ে বেদনা হয়েছে, মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। চলতে পারিনে। ডাক্তার বলেছেন সারবে না।

শ্রীম—ডাক্তারের কথা শোন কেন? সাধুর আলাদা শরীর। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীর হৃষীকেশে খুব অসুখ হয়। তাঁর গুরুভাইরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেই বিপদের সময় একজন সাধু কোথা থেকে এসে একটু ওষুধ দিয়ে মধুর সঙ্গে খেতে বললেন। তাতেই স্বামীজী সেরে গেলেন। তোমার ভাল হয়ে যাবে।

"এই পাড়ায় একজন অনেকদিন ধরে হাঁপানিতে ভুগছিল। ঐ রকম একজন সাধু ওষুধ দেয়। তাই খেয়ে সেরে গেল। সে এখন কাশী বাস করে।"

কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বিদায় লইলেন এবং কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন শ্রীশ্রীমার শিষ্য। ইঁহারই সহিত শ্রীম কথা কহিতে লাগিলেন।

মার কথামৃত শ্রবণ

ভক্ত—অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। জয়রাম বাটী গিয়েছিলাম। মা সেখানেই ছিলেন। তখন তাঁর কাছে আমার দীক্ষা হয়। মার কাছে তৃতীয় ভাগ "কথামৃত" পাঠ করেছিলাম।

শ্রীম—দেখাতে পারেন, কোন্‌খানটা পাঠ করেছিলেন?

ভক্তটি পুস্তকের গোড়ার দিক দেখাইলেন।

শ্রীম—আপনি একটি চিত্র আমাদের দেখালেন।

ভক্ত—আমাদের বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে।

শ্রীম—কতদূর ?

ভক্ত—বেশী দূরও নয়, কম দূরও নয়।

শ্রীম—না, বৃদ্ধ অবস্থায় যেতে পারব না। বুড়োদের এক জায়গায় বসে ঈশ্বর চিন্তা করাই ভাল। মঠে যেতে পাচ্ছি না। পাকাফল ; কোন্‌দিন হয়ত হয়ে যাবে।

ভক্ত—কি বলেন! এর মধ্যে হবে কি ? আরও কথামৃত বার হোক।

শ্রীম—(হাসিতে হাসিতে) ঠাকুরের বাবা ঠাকুরের মাকে বলেছিলেন, 'এখন প্রসব কি ? আগে রঘুবীরের সেবা হোক।'

ভক্তটি জল খাইতে চাইলে শ্রীম কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২১ ॥

৭ই জুলাই, সোমবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সকাল সাতটা। শ্রীম দোতলায় বসিয়া শচীন ও একজন ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—(শচীনের প্রতি) দেখ, তুমি জগবন্ধুর কাছে ফিলসফি (দর্শন) পড।

ভিক্ষা

(ব্রহ্মচারীর প্রতি) "তুমিও পড়। তুমি ভিক্ষা কর না ? ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে অসুস্থ, তখন ভক্তদের ভিক্ষা করতে পাঠাতেন। এমন কি, বাড়ীর গিন্নীদেরও পাঠিয়েছিলেন। যাদের তিনি ভিক্ষা করা শিখিয়েছিলেন তাদের সব ভয় কেটে গিয়েছিল ও লজ্জা ভেঙ্গে গিয়েছিল। 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।' ভিক্ষা করতে গেলে কেউ গালাগালি দেবে, কেউ অপমান করবে। এসব সহ্য করতে হবে। ভগবানের জন্য হরিদাস বত্রিশ

বাজারে কোড়া খেয়েছিলেন। ভগবান মন দেখেন, পারবে কি না।

"তুমি যে দেশে যাওনা, এ বেশ। তা না হলে ভগবান গৃহস্থাশ্রমে রেখে দেবেন! এক গুরুর তিন শিষ্য ছিল। তিনি তিনজনকে তিন রকম উপদেশ দিলেন। একজনকে বললেন, 'তুমি গৃহস্থাশ্রমে যাও।' একজনকে বললেন, 'তীর্থাদি ঘুরে এস।' আর একজনকে বললেন, 'আমার কাছে থাকলেই হবে।' যাকে বললেন, 'গৃহস্থাশ্রমে যাও', তার ভোগের বাসনা ছিল। সে ভক্তদের ছেলেমেয়েদের কোলে করত, তাদের নিয়ে খেলা করত। যাকে বললেন, 'তীর্থাদি ঘুরে এস', সে ভাবত, 'তীর্থাদি দর্শন না করে এক জায়গায় থেকে কি হবে?' তাই তাকে তীর্থ-ভ্রমণের জন্য পাঠালেন। আর যাকে দেখলেন গুরু সেবাতেই সন্তুষ্ট, গুরু সেবা ছাড়া কিছুই চায় না, তাকে নিজের কাছে রাখলেন।

"কেউ যদি মনে করে, আমি হঠাৎ পৃথিবীতে এসেছি, পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, জ্ঞাতি কেউ নেই, এক আমার ভগবান আছেন, তাহলে হয়। তুমি ভিক্ষা করে আমায় দেবে।"

ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল পাইয়াছেন। তাহাই শ্রীমকে দেখাইতেছেন।

শ্রীম (উৎসাহের সহিত)—কি পেয়েছ দেখি? কে কি বললে?

ব্রহ্মচারী সমস্ত বলিলেন।

শ্রীম—বিদ্যাসাগর মশায় বলতেন, "আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার খাবার ভাবনা কি? চার বাড়ী থেকে চার মুঠো চাল ভিক্ষে করে—সেইগুলি ফুটিয়ে খেয়ে নিলেই জীবন ধারণ হল।" ভগবান এইসব সুবিধা করে দিয়েছেন। যে ভগবানকে চিন্তা করবে তাকে তিনিই জুটিয়ে দেবেন।

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা ৯।২২)

"তুমি যদি ভগবানকে চিন্তা কর তা হলে তোমাকেও জোটাবেন। এ ত ভগবানের জন্য ভিক্ষা, এতে দোষ নেই। যারা ভোগের জন্য করে তাদেরই দোষ হয়। আমি দেখছি তোমার উপর ভগবানের কৃপা আছে। ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করবে, 'আমাকে সদ্‌বুদ্ধি দাও।' তুমি হয়ত বলবে, 'আমি বললাম বলে হল'—তা হলে আর ভাবনা ছিল না। কেউ কি কারও কথা শোনে? যাদের সংস্কার আছে তাদেরই বললে শোনে, তা না হলে মহামায়া ভুলিয়ে রাখেন।

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥' (গীতা, ২।৬২।৬৩)

"মহামায়ার মায়াতে গুরুর উপদেশ ভুল হয়ে যায়। তাঁকে অবশ্য দেখতে হবে; তিনি কেন জন্ম দিয়েছেন? স্বাধীন ভাবে থাক। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।' ঠাকুর রাখালকে বললেন, 'তুই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিস তাও শুনব, কিন্তু পরের চাকরি করছিস একথা যেন শুনতে না হয়।'

শ্রীবুদ্ধ

"বুদ্ধদেব যখন সিদ্ধিলাভের পর কপিলাবাস্তু গিয়েছিলেন তখন তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তাঁকে বলেছিলেন, 'আমাদের বংশের ক্ষত্রিয়েরা কেউই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নি। তুমি যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছ সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জাকর।' বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি আপনাদের বংশের নহি। আমার জন্ম অর্হৎ বংশে (অর্থাৎ সাধুবংশে)। বুদ্ধেরা আমার পূর্ব্বপুরুষ। ভিক্ষাবৃত্তি তাঁদের চিরন্তন প্রথা।' তিনি সমস্ত রাজাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে অম্বপালী নামে এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং তাকে উদ্ধার করবার জন্য তার আম-বাগানে গেলেন।

"প্রত্যেক বাড়ী থেকে এক মুঠো চাল নেবে, অথবা যদি হাঁড়িটাড়ি কেনবার দরকার হয়, এক আধটা পয়সা নিতে পার। কিন্তু সঞ্চয় করতে নেই। বেশী দিলে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। বিনীতভাবে বলবে, 'আমার 'দরকার নেই। আমি সঞ্চয় করিনে' ইত্যাদি আড়ম্বর করে বলতে নেই। ভিক্ষা করতে যাবার সময় ও ভিক্ষা করে ফেরবার সময় ভগবানের নাম জপ করা উচিত। যে ভিক্ষা দিচ্ছে তাকে ভগবান ভাবা উচিত। সকলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, 'হে ভগবান, সকলের মঙ্গল কর, সকলকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।' বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন সকলের জন্য প্রার্থনা করতে। চণ্ডীতে আছে, দেবতারা যখন মার কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'মা, জগতের মঙ্গল কর।' তখন মা খুব সন্তুষ্ট হলেন। ঈশ্বর চিন্তার জন্য যে ভিক্ষা, সে ভিক্ষাতে দোষ নেই।

"যে আপনার প্রকৃতি বুঝতে পারে সে ত সিদ্ধ পুরুষ। নিজের প্রকৃতি বুঝতে পারে না বলে গুরুর দরকার। গুরুই শিষ্যের প্রকৃতি বুঝে উপদেশ দেন। সব উপদেশ তার মনের মত হবে কি করে? প্রকৃতি যে তাকে কেবল 'প্রেয়ের' (ইন্দ্রিয় সুখের) দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গুরুই তাকে টেনে টেনে রাখেন, 'শ্রেয়ের' (মোক্ষের) দিকে নেবার জন্য।

শরীর যন্ত্র বিশেষ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

বৈকালে পাঁচটায় শ্রীম চারতলায় নিজের ঘরে বসিয়া জনৈক ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—আমরা মনে করি যে আমরা ভগবানকে কৃপা করে ডাকছি, কিন্তু কোথায় তোমার 'আমি'? দেখনা, জন্মের আগে খবর নেই, মৃত্যুর পরেও খবর নেই। অন্ন, জল, হাওয়া, নিদ্রা এই সব দিয়ে রেখেছেন। তাই ভেতর থেকে 'আমি' বেরুচ্ছে। এসব না দিলে 'আমি' কোথায় থাকে দেখি। একটু জল কি বাতাস না পেলে বলে, 'প্রাণ গেল'; খাবার না পেলে বুদ্ধি বেরোয় না, নিদ্রা না হলে বলে, 'শরীর খারাপ।'

"আমি একদিন গোলদীঘিতে বসে আছি, দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা এসে জলে ডুব দিচ্ছে। তখন ভাবলাম, নিজেকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান এদের বুদ্ধি দিয়েছেন পালন করবার জন্য মাতৃস্নেহ দিয়েছেন। এ শরীর একটা যন্ত্র বই ত নয়। পরমহংসেরা সব চৈতন্যময় দেখেন। যেমন একটি গাছে ডাল, পাতা, ফুল, ফল, সব হয়ে রয়েছে।

"যারা ভগবানকে ডাকে না তাদের ওপর রাগ করা উচিত নয়। ভগবান দু রকম লোক তৈরি করেছেন—প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী। কেউ অবিদ্যার সংস্কার নিয়ে আছে, কেউ বিদ্যার সংস্কার নিয়ে আছে। কেউ যদি তাঁকে ভজনা করে তাতে তার কি বাহাদুরী? তাকে তিনি সেই সংস্কার দিয়েছেন। রাখাল মহারাজকে ঠাকুর গান বাঁধতে বারণ করলেন। বললেন, 'ওতে লোক খারাপ হয়ে যায়।' আমাদের যোগীদের কথা নেওয়া উচিত।"

এইবার গান গাহিতেছেন—

"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥' ইত্যাদি

গাহিতে গাহিতে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিতেছে।

আমি আমার

সন্ধ্যার পর চারতলা বারান্দায় শ্রীম বসিয়া আছেন। নিকটে কয়েকজন ভক্ত।

বড় জিতেন—আপনি শুনেছেন? উকিল চন্দ্রকান্তের পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাসি খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ খেয়ে শরীর গিয়েছে।

শ্রীম—হাঁ খোকা মহারাজের কাছ থেকে শুনলাম। সেই জন্য ঠাকুর বলতেন, " 'আমার' 'আমার' বলতে নেই; তা হলে মুস্কিলে পড়বে।" একজন ভক্ত 'আমার ছেলে' বলেছিল। ঠাকুর শুনে ধমক দিয়ে বললেন, "আমার ছেলে কি? সব ভগবানের।" বলতেন, "ছেলেদের গোপাল ভাবে সেবা করবে। আমার বল না, আমার বলে ভালবাসতে যেও না।"

"আত্মা ছাড়া অন্যকে প্রিয় বললে সেই প্রিয় তার নষ্ট হয়।* 'হে ভগবান, আমাকে রক্ষা কর' বলে প্রার্থনা করতে হয়। ছেলেবেলায় আমাদের এক পোষা বেডাল ছিল। একদিন সেটি বাড়ী আসে নি! তাব জন্য এপাড়া ওপাড়া গিয়ে অর্দ্ধেক রাত ধরে খুঁজেছিলাম।

রাম। কৃষ্ণ। ব্যাস

"শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের কথা ছেড়ে দাও। অবতারদের কথাই আলাদা। তাঁরা নির্লিপ্ত। সমস্ত যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তিনি অচল অটল ভাবে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে সমস্ত বংশের নাশ দেখলেন। জানেন কিনা, এদের ভোগ আছে, এরা নষ্ট হবে। এ কি মানুষে পারে? ব্যাসদেব মায়ের আদেশে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর, এই তিনটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করলেন। এ কি কাম! কাম নয়, ঈশ্বরের আদেশ। যেমন জনকাদি ভগবান লাভ করে সংসারে ছিলেন। আগে নির্জ্জনে সাধন ভজন করে তারপর যদি সংসারে থাক তা হলে দোষ নেই। গাছ বড় হলে গুঁড়িতে হাতি বেঁধে দিলেও তার কিছু হয় না। তাই সন্ন্যাস-আশ্রম হয়েছে। সেখানে সমস্ত মন দিয়ে ভগবানকে ডাকবার সুবিধা।

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবার আগে শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে দুর্য্যোধনের সভায় গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের ত আত্মপর নেই, কারও পক্ষ অবলম্বন করে ত বলবেন না। তাই

* বৃহদারণ্যক ১।৪।৮ দ্রষ্টব্য

যুধিষ্ঠির তাঁকেই দূত করে পাঠালেন। সেই সভায় ঋষিমুনিরাও গিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি বলেন শোনবার জন্য। তিনি ত সংসারী। ঋষিরা জানেন, সংসার করলেও তিনি নির্লিপ্ত। তাই তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য গিয়েছিলেন।"*

কিছুক্ষণ কথামৃত পাঠের পর সকলে বিদায় লইলেন।

॥ ২২ ॥

১৪ই জুলাই, সোমবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের শিষ্য কেদারবাবু আসিয়া চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন। শ্রীম বিশ্রামান্তে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় চারটা। আরও অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—(কেদারবাবুর প্রতি) এর মধ্যে মঠে গিয়েছিলেন কি?

কেদারবাবু—না যাওয়া হয় নি। যখন বাবুরাম মহারাজ ছিলেন, তখন আমরা মঠে গেলে তিনি কত যত্ন করতেন! তখন একটা টান ছিল।

শ্রীম—তাঁর ভক্তসেবা নামকরা ছিল। যে তাঁর সঙ্গে একবার মিশেছে সে আর তাঁকে কখনও ভুলতে পারেনি। সকলেই বলে থাকে, "আমাকে বড় ভালবাসতেন।" ঠাকুরের ভালবাসার যেন প্রতিমূর্তি ছিলেন।

কেদারবাবু—আমি একদিন মঠে গেছি। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তখন মঠে আছেন। আমি তাঁকে বললাম, "মহারাজ, ইচ্ছে হচ্ছে যে পুনশ্চরণ করি।" মহারাজ তখন পায়চারি করছিলেন। শুনে বললেন, "তাঁকে ভক্তি করলেই হবে।" আরও বললেন, "আপনি কি মনে করেন, ভক্তের জ্ঞান হয় না? ভক্তও সেই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে সম্ভোগের জন্য আমিটা রেখে দেয়।"

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, "মা-ই এই আমিটা রেখে দিয়েছেন! মাকেই বলতে হবে। তবেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন।" দেখলেন ত, পুনশ্চরণের কথা বলতেই মহারাজ যেন ভয় পেলেন।

* বিশেষ মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৯০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

এই বলিয়া শ্রীম গানের দুইটি ছত্র আবৃত্তি করিলেন—

"কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই,
মনে সন্দ হয় পাছে তোমা ধনে হারাই, হারাই।"

শ্রীম—গুরু হয়ে গেছে আর ভয় কি? ঠাকুর বলতেন,—"গুরু হয়ে গেল ত, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসতে পাওয়া গেল।" আপনার চিত্ত যদি চঞ্চল হয় ত আপনার গুরু আছেন, তিনিই রক্ষা করবেন।

কেদারবাবু—বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে উদ্দেশ করে বলতেন, "ঐ পাড়াতে বর আছেন; দর্শন করে আসুন।"* তাঁদের পরস্পরের প্রতি কি গভীর ভালবাসা—কি গভীর ভক্তি! একদিন বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'যাদের খুব ব্যবসা-বুদ্ধি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা্ করা ভাল নয়।' রাখাল মহারাজও বলতেন, 'ঠাকুরকে নিয়ে যে ব্যবসা করে সেই যথার্থ ব্যবসায়ী।' আরও বলতেন, 'ব্যবসা করলেও সত্যকথা বলতে হয়।'

শ্রীম—অপ্রিয় হলেও সত্যকথা বলতে হয়—মনুসংহিতায় আছে (৪।১৩৮)

কেদারবাবু—মহারাজ বলতেন, "চৈতন্যের একটা ভিন্ন ঘর আছে।"

শ্রীম—ঠাকুর ত বলতেন, "আমি সব চৈতন্যময় দেখছি; বিচার আর কি করব?"

কেদারবাবু—এই মনের দ্বারা কি তাঁকে পাওয়া যায়?

শ্রীম—শুদ্ধ মনের দ্বারা আর কৃপার দ্বারাই কেবল তাঁকে ধরা যায়। যেমন, এক ছেলের অসুখ করেছে—সঙ্কটাপন্ন রোগ। তার মা ছেলের জন্য যাগ, যজ্ঞ, পূজা, প্রার্থনা ভগবানের কাছে করছে, তারকেশ্বরে হত্যা পর্য্যন্ত দিচ্ছে। তবু মধ্যে মধ্যে ছেলে বলে, "মা, বড় লাগছে।" মা তখন বলে, "বাবা, ভগবানকে ডাক, তিনি তোমায় যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবেন।" তেমনি ধ্যান, জপ, তপস্যাদি করাও কেবল তাঁর কৃপা হওয়ার জন্যই।

কেদারবাবু—মহারাজ বলতেন, "দেখ, চৈতন্য যেন না হারিয়ে যায়।"

শ্রীম—তার মানে, ঈশ্বরকে যেন ভুল না হয়।

ঠাকুর ও হীরানন্দ

এমন সময় ভাটপাড়া হইতে শান্তি ও তিনটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল।

---

* মহারাজ থাকিলেই মঠে আনন্দের স্রোত চলিত। যীশুখ্রীষ্ট নিজেকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ বর আছে ততক্ষণ আনন্দ করিয়া লও।

শ্রীম—(যুবকদের প্রতি) আজ কলেজ স্কোয়ারের কাছে মহাবোধি সোসাইটিতে হীরানন্দ সম্বন্ধে লেকচার হচ্ছে। তোমরা সকলে যাও। হীরানন্দের কথা শোনগে। ঠাকুর হীরানন্দকে বড় ভালবাসতেন। একদিন তাঁকে চুমু খেয়েছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুর নরেন ও হীরানন্দকে বললেন, "তোমরা দুজনে বিচার কর, আমি শুনব।" নরেন্দ্র জ্ঞানের পক্ষ নিলেন, আর হীরানন্দ ভক্তির পক্ষ। দুজনে বিচার আরম্ভ হল। নরেন্দ্র বললেন, "জ্ঞানের দ্বারাই কেবল তাঁকে পাওয়া যায়।" হীরানন্দ বললেন, "দুই পক্ষই ভাল। জ্ঞান যেন ঘরের মধ্যে বসে ঘর দেখা, আর ভক্তি যেন ঘরের বাইরে থেকে ঘর দেখা।" ইত্যাদি।

যুবক তিনটি শ্রীমকে প্রণাম করিয়া লেকচার শুনিতে গেল।

শ্রীম কেদারবাবুকে একটি আম ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবার জন্য দিলেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে শ্রীম রিক্স যোগে মহাবোধি সোসাইটিতে গমন করিয়া হীরানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি শ্রবণান্তে স্কুলবাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে ছাদে ভক্তগণের নিকট হীরানন্দের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষে বলিলেন, "আজ এই চাঁদ দেখে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। ঠাকুর তখন কাশীপুরে ছিলেন, তখন একদিন হীরানন্দ এই জ্যোৎস্না দেখবার জন্য বাইরে আসছিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, কোথায় যাচ্ছ?' হীরানন্দ বললেন, 'রামকৃষ্ণ চাঁদ দেখবার জন্য বের হয়েছি।' ঠাকুর শুনে হাসতে লাগলেন।"

রাত্রি প্রায় দশটা। সকলে শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৩ ॥

১৫ই জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সন্ধ্যার পর শ্রীম ধ্যানান্তে নিজের ঘরে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—(রমেশের প্রতি) কাল হীরানন্দর বিষয় কি সব শুনলে। আমরা ছেলেবেলায় মনে করতাম, কেশববাবু প্রভৃতি এঁরাই খুব বড় লোক। আমি তখন এনট্র্যান্স পড়ি। কেশববাবুর লেকচার শোনবার জন্য অনেক আগে থাকতে গিয়ে বসতাম। সে কি লোকের ভিড়! জায়গা পাওয়া যেত না। পরে বুঝলাম, কেশববাবু ঠাকুরের কথা বলতেন বলেই, এত ভাল লাগত। ঠাকুরের নাম প্রকাশ্যে করতেন না। এমনই সব বলতেন। তখন ভাবতাম, বড়লোকেরা আবার কোনদিন মরে নাকি!

এমন সময় বড় জিতেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিবার জন্য চেয়ার দিতে বলিলেন। তারপর হাসিতে হাসিতে এক বড জমিদারের গল্প করিলেন। বলিলেন, "স্কুল ইনসপেক্টার ভূদেব মুখুজ্যে মশায় একবার তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। জমিদার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কর্ম্ম করা হয়।' ভূদেববাবু বললেন, 'ছেলে পডাই।' জমিদার শুনে বললেন, 'ও, ছেলে পড়িয়ে খাও। কত মাইনে পাও?' ভূদেববাবু জবাব দিলেন, 'এক হাজার টাকা'। জমিদার তখন অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'এক—হাজার —টাকা! তারপর কাছে যে কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল তাকে বললেন, 'ওরে, এঁকে বসতে চেয়ার দে, চেয়ার দে।' (সকলের হাস্য)

"ঠাকুরও একজনকে বলেছিলেন, 'তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারব না।' একঘর লোক বসে, তবু তিনি শুদ্ধ ভক্তদের দিকে চেয়েই কথা কইতেন। বিষয়ী লোক দেখলে দরজা বন্ধ করে দিতেন। পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে, এইজন্য মোটা চাদর গায়ে দিতেন। বলতেন, 'বিষয়ীদের দেখলে পর্য্যন্ত জ্ঞানের দরজায় পরদা পড়ে যায়। মা আমাকে সে রকম অবস্থায় রাখেন নি। আমার ভগবান ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। তোমাদের এতটা দরকার নেই—তোমরা রসে বসে বেশ আছ। আমার যে অবস্থা, সে শুধু নজীরের জন্য। সকলেই মনে করে, আমার ঘড়িই ঠিক চলছে। কিন্তু ঠিক চলছে কি না জানবার জন্য সূর্য্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে

মেলাতে হয়।'

"অবতার হলেন সেই সূর্য্য। অবতার না এলে কে আর বুঝিয়ে দেবে, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল ; কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য ; কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় ? তিনিই কেবল সমস্ত নিজের জীবনে করে দেখিয়ে দিয়ে যান। আদালতে যখন মকদ্দমার বিচার হয়, উভয় পক্ষের উকিল নিজেদের পক্ষে সমর্থন করবার জন্য যুক্তি দেয় ও সাক্ষী হাজির করে। শেষে জজ বলে, 'সব ত হল, লেখাপড়া দলিলপত্রে কিছু আছে ? তাই দেখাও।' জীবনে আচরণ করে দেখালে তবে বিশ্বাস হয়, কথায় হয় না। অবতার 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।'

ঠাকুর ও ছোকরা ভক্ত

"একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আপনি এত যে আমাদের ভালবাসেন, লোকে দেখে কি মনে করবে ?'

"ঠাকুর উত্তরে বললেন, 'যেদিন তোমাদের সব মানুষবুদ্ধিতে দেখব সেদিন থেকে আর তোমাদের মুখ দর্শনও করব না।'

"যোগীরা প্রত্যক্ষ দেখেন, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—তাঁ হতে হচ্ছে। যোগীদের লক্ষণ—তাঁরা হয় নির্জ্জনে নয় সাধু সঙ্গে থাকেন।

সৃষ্টি

"কি অদ্ভুত সৃষ্টিই না তিনি করেছেন! খাবার যাই একটু মুখে দিলে, অমনি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব চলতে লাগল। কি আশ্চর্য্য! অনন্তকে কি চিন্তা করা যায় ? এ সব কি কেবল কবিদের কল্পনা যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র তিনি করেছেন! সন্ধ্যার পরই অসংখ্য গ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্রের উদয় ; আবার দিন হওয়া মাত্র সূর্য্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন! এরা সকলেই সেই আদি কবির কল্পনার প্রতিচ্ছবি। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে! লোকে এ সব দেখেও দেখে না। বলে, রোজই এই রকম হয়। আবার বলে miracle (বিভূতি) দেখাও। এর চেয়ে অলৌকিক আর কি হতে পারে ? শরীরের দিকে তাকালে একবারে অবাক! আবার বাইরের দিকে তাকালেও অবাক হতে হয়। দেবতারা সেই আদিকবির গান গায়।

'চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার, শোভার আগার এ বিশ্ব সংসার।' ইত্যাদি।

সাধু ও দেবতা

"সাধুদের দেখে দেবতারা হিংসা করে। ভাবে, 'আমরা অপ্সরা নিয়ে ভোগ করছি, আর সাধুরা সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে নির্জ্জনে বসে ভগবানকে চিন্তা করছে। ভোগের দিকে একেবারেই নজর নেই। ভগবানের কাছে কিছুই চায় না—বরং প্রার্থনা করে, আমাদের ভোগের দিকে নিও না।'

"ঠাকুর আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, 'হে ভগবান! তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আর মুগ্ধ কর না।' আমাদের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার সব জমা রয়েছে। আমরা সেগুলিকে জানি না। ঠাকুর কিন্তু সব জানতেন।

(ভক্তদের প্রতি) "গীতার শ্লোক কার মনে আছে, বলুন। বড় অমূল্য—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥' (৪।৫)

শ্রীচৈতন্য। নিরালম্ব ভাব

শ্রীম—পুরীতে চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করতেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" (শিক্ষাষ্টক)

"একদিন সকল ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে ধরে বসলেন, 'প্রভু, একবার প্রতাপ রুদ্রকে দর্শন দিতে হবে। চৈতন্যদেব তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমরা যদি এমন কথা দ্বিতীয় বার বল, তা হলে আমি আলাল নাথ (পুরী হইতে সাত মাইল) চলে যাব। এতে তোমরা আমাকে ভক্তি কর আর নাই কর। আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না।'

"তাঁরা কাউকেই চান না। 'একে হলে আমার চলবে, আর একে না হলে আমার চলবে না'—এ সব তাঁরা কিছুই ভাবেন না। ঈশ্বরই তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব।

"সকলেরই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের ভয় আছে, আর সকলেই বলে, 'এ থেকে আমাদের নিস্তার করুন।' উপনিষদে আছে, 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮)। কিন্তু তিনি অভয়স্বরূপ। ভয়ং ভয়ানাম্, ভীষণং ভীষণানাম্।' যিনি তাঁকে পান, তিনিও অভয় স্বরূপ হয়ে যান 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তো-

হসি' (বৃহদারণ্যক, ৪।২।৪)।

"মাত্র অল্প কয়েকজন ভক্তই তাঁর কাছে কেবল শুদ্ধাভক্তি চায়, আর কিছুই চায় না। ভক্ত নিজে আর কতটুকু করবে? তাই কেবল শুদ্ধাভক্তির জন্য প্রার্থনা করে।"

এই বলিয়া নিজেই গান গাহিতেছেন—

"এ হাটে বিকোয় না সূতো
বিকোয় নন্দরাণীর সুত।
এ হাটের প্রধান তাঁতি
পশুপতি প্রজাপতি!
আর যত অন্য তাঁতি
তাদের কেবল যাতায়াত।"

"সূতো মানে ভোগ," এই বলিয়া আবার গান ধরিলেন—

"জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তি রথে চড়ি লয়ে জ্ঞান তূণ, রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথ রথী,
শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥"

"চারিদিক থেকে অস্ত্র শস্ত্র এসে পড়ছে—যুদ্ধ কর," এই বলিয়া আবার গাহিতেছেন—

"একি বিকার শঙ্করী,
কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরী।
অনিত্য গৌরব হল অঙ্গদাহ,
আমার আমার একি হল পাপমোহ,
(তায়) ধনজন তৃষ্ণা না হয় বিরহ,
কিসে জীবন ধরি।" ইত্যাদি।

"জীব সতত প্রলাপ বকছে। ঠাকুর বলতেন, 'একজন বলেছিল, রাস্তায় যেতে যেতে বৃষ্টি হল। তারপর নর্দ্দমায় বড় বড় ইলিশ মাছ বেরুল।'" (সকলের হাস্য)

বড় অমূল্য—সারাদিন এইরূপ চলেছে।

শ্রীম—আগে এত গোলমেলে কথা ছিল না; আজকালই যেন খুব বেশী

হয়েছে। স্বামীজী এত বড় লোক ; তিনি কখনও (পঠদ্দশায়) থিয়েটার দেখতে যেতেন না। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা সে আলাদা কথা ; যেমন "চৈতন্য-লীলা" প্রভৃতি নাটক।

"কেবল অবতারকেই আমাদের চিন্তা করা উচিত। তিনিই সকলের উচ্চতম আদর্শ। আর আর সাধুদের নমস্কার, খাওয়ান প্রভৃতি সেবা করা যায়।"

এই সময়ে ডাক্তার কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতি আসিলেন।

শ্রীম—(ডাক্তারের প্রতি) আসুন, আসুন, বসুন।—গত কাল উৎসবে কত টাকা খরচ হল, বিনয়বাবুর হাত দিয়ে হিসেব দেখাতে হবে।

ঠাকুরের উৎসবের তালিকা

"যদি চৈতন্যদেবের সময়ের উৎসবের বিবরণ পড়া যায়, তা হলে হাঁ করে শুনবে। আমি ঠাকুরের উৎসবের খরচের তালিকা নকল করে রাখতাম। ঐগুলিই ত পুরাণ—আবার কি!"

ডাক্তার—কাল উৎসবে সাধুদের দেখে কত শিক্ষা হল।

শ্রীম—কি কি শিখলে ?

ডাক্তার—একজন মহারাজকে আমরা নিমন্ত্রণ করি নি। তিনি তথাপি অনুগ্রহ করে এসেছিলেন। এ থেকে নিরভিমানতা শিক্ষা হল।

শ্রীম—ওঁরা যে সাধু—ওঁরা আসবেন না ত কি ? কবে মঠে যাচ্ছেন ? সকালে মঠে যাওয়া ভাল। সেই সময় সাধুরা ধ্যান জপ করেন। সকালে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে ঠাকুর ও সাধুদের বেশ দর্শন করে আসা যায়। এখন মঠে যাবার কত সুবিধা। কাশীপুর থেকে বেলুড় পর্য্যন্ত ষ্টীমার হয়ে গেছে। আগে কত অসুবিধে ছিল।

রাত্রি প্রায় দশটা। ভক্তেরা যখন বিদায় লইবার জন্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিলেন, শ্রীম তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুধু হাত জোড় করে নমস্কার করুন, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করা আবার কি ? ভিতরে যিনি নারায়ণ আছেন তাঁকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।"

॥ ২৪ ॥

২২শে জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বৈকাল প্রায় পাঁচটা। শ্রীম ছাদে এক ভক্তের সহিত জনৈক ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

যার পেটে যা সয়

শ্রীম—(ভক্তটির প্রতি) আমি ওকে বললাম—আশ্রমে যদি থাকতে চাও তা হলে কাজ কর্ম্ম-করতে হবে। তা তুমি যে আশ্রমেই থাক না কেন। আর তা না হলে গাছতলায় থাক। সেখানে কাজ-কর্ম্ম কিছুই কবতে হবে না। তবে এ যুগে গাছতলায় থাকতে পারে না। কলিকাল—তাতে আবার অন্নগত প্রাণ। যার পেটে যা সয়। কারও বা পোলাও, আর কারও বা ঝোলভাত। মাও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মেয়েরা কি থিয়েটারে গিয়ে নাচবে? যার যা কর্ম্ম সে তাই করবে। অন্য লোক যা কবছে, আমিও দেখাদেখি তাই করব? সেটা ভাল নয়। তা হলে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। যেমন ঈগল পাখীকে আকাশে উডতে দেখে কচ্ছপেরও উডতে সাধ হয়েছিল। ঈগলপাখী কচ্ছপকে বললে, "তুমি কেমন করে আমার মত উডবে?" কিন্তু কচ্ছপ তা শুনলে না, বললে, "তা পারব, তুমি কেবল আমাকে মুখে করে আকাশে নিয়ে গিয়ে ছেডে দেবে, তা হলেই হবে।" ঈগলও তাই করলে; ফলে, কচ্ছপেব মৃত্যু।

"শাস্ত্রে আছে, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে যারা ভগবানকে চিন্তা করে, তারাই ভাগ্যবান। তাদের বৈরাগ্য ঠিক থাকে। 'ভিক্ষান্ন মাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।' " ইত্যাদি (শঙ্কর কৃত কৌপীন-পঞ্চক)

এইবার তিনি একটু বেড়াইতে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া ছাদে চেয়ারে বসিলেন, অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও বেঞ্চিতে বসিলেন।

(শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) সন্ধ্যার সময় সব ছেড়ে ভগবানকে ডাকা উচিত। তা না হলে হুঁস থাকে না। হুঁস রাখবার জন্য রোজ নিয়মিতভাবে তাঁকে স্মরণ মনন করা উচিত।)

অতঃপর শ্রীম ধ্যান করিতে গেলেন। ভক্তেরাও সকলে স্মরণ মনন করিতে লাগিলেন। শ্রীম ফিরিয়া আসার পর বড় জিতেন আসিলেন।

শ্রীম—(বড় জিতেনের প্রতি) চেয়ারে বসুন। (একজনকে দেখাইয়া) আমাদের এই বন্ধুটি গদাধর আশ্রম থেকে এসেছেন। ওহে বন্ধু, হাত তোল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না।

আশ্রম

"আমাদের আর কোন্ কালে আশ্রম দেখা ছিল—ঠাকুর আসাতেই এই সব আশ্রম একে একে দেখা যাচ্ছে। ছেলেবেলায় শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, ভট্টি ইত্যাদি বই পড়ে তপোবন, আশ্রম এই সবের কথা জানা ছিল।"

বড় জিতেন—চোর রত্নাকর সাধুসঙ্গে কি হয়ে গেলেন! উইয়ের ঢিপি থেকে একেবারে ঋষি বাল্মীকি হয়ে বেরুলেন! গুরুর এমনই শক্তি!

শ্রীম—হাঁ, ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গুরুর কৃপা হলে এককক্ষণে সব গাঁট খুলে যায়। হাজার গাঁটওয়ালা দড়ি কেউ খুলতে পারছে না। যাদুকর যেই একধার ধরে নাড়া দিতে লাগল অমনি সব গেরো খুলে গেল।'

জীবরূপী মীন

"এই দেখুন সামনে অনন্ত—অনন্ত খেলা চলেছে। জগতের মধ্যে জীবরূপী 'আমি' যেন একটি মীন হয়ে খেলা করছে। সেখানে আর কেউ নেই। অধঃ, উর্দ্ধ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চতুর্দ্দিক জলে পরিপূর্ণ। কোথাও কোন কূলকিনারা নেই—অনন্ত সচ্চিদানন্দ সমুদ্র।

"এইরূপ অনন্তের ধ্যানে ডুব দিতে দিতে যদি তাঁর কৃপা হয়—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—(কঠ ১।২।২৩, মুণ্ডক ৩।২।৩) তখন যে কি হয় তা আর মুখে প্রকাশ করে বলা যায় না। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে জল হয়ে গেল—ফিরে আর খবর দিতে পারলে না।

"ঠাকুর বলতেন, 'তোমরা সব শুদ্ধ বলে, তোমাদের মধ্যে নারায়ণ দেখি। সাক্ষাৎ নারায়ণকে দেখতে পাই, তাই তোমাদের এত ভালবাসি।' এই সমাধি অবস্থাতে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ চলে না—'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্য দেখা নাই।'"

বড় জিতেন।—সে অবস্থায় তাঁরা শিষ্যের ভার নিতে পারেন কি ?

শ্রীম—না, সে অবস্থায় ভগবান বই আর কিছুই তাঁরা দেখেন না। এই ঘরে ডিমে তা দেওয়া যে পাখীর ছবি দেখছ—চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, তার সমস্ত মনটা ঐ ডিমের উপর পড়ে রয়েছে, বাইরে আর কোনদিকে নেই। সেই রকম যোগীদের মন ঈশ্বরেতে সব গত হয়ে যায়। তদ্গত-অন্তরাত্মা। যোগীরা চেয়ে থাকলেও আর কিছুই দেখতে পান না। তাঁদের ঠিক ঐ পাখীর মতই মনের অবস্থা হয়।

বড় জিতেন—সে অবস্থায় মন ঈশ্বরীয় রূপাদি কিছু দেখে কি ?

শ্রীম—কলকাতাতেই গেলে না, তা গড়ের মাঠ, শ্যামপুকুর কি করে জানবে ? কেউ কেউ বাজনার বোল মুখস্থই করে, হাতে আর আনতে পারে না ! 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বললে কি হবে ? বেটে খেতে হবে, তবে নেশা হবে।

বড় জিতেন—তেমন ত ধ্যান হয় না। যদি গভীর ধ্যান হত তা হলে না হয় অকূলে সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাঁকে ধরা যেত।

শ্রীম—ঠাকুর কেশবকে বললেন, "একবার ডুব দাও, একবার ডাঙায় ওঠ—একেবারে যদি ডুবে যাও তা হলে এঁদের (পরিবারবর্গের) কি দশা হবে ?" তার মানে এঁরা এসব ছাডতে চান না।

শ্রীম—উপনিষদে বলেছে, তোমার ঈশ্বরদর্শন হচ্ছে বা হয়েছে কি না, মুখ দেখলে বুঝা যায় (ছান্দোগ্য ৪।১৪।২)।

"চেলাদের কথা আর বল কেন ? কত সব আবোল তাবোল বাড়িয়ে লেখে—কত অদ্ভুত miracleএর (বিভূতির) কথা লেখে।"

শ্রীম আহারান্তে পুনরায় ছাদে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "রাখাল মহারাজ বলতেন, 'যতদিন এ শরীরটা আছে কেবল তাঁর নাম করে যাও।' সাধু না হলে এমন কথা আর কে বলবে ?"

রাত্রি প্রায় দশটা। সকলে প্রণামান্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৫ ॥

৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী'

চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম

সকালে শ্রীম তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময় একটি ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীম তাহাকে বলিতেছেন, "চিত্তশুদ্ধির জন্য এই কর্ম্ম করা। নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবানের পথে এগিয়ে দেয়। ধর, গুরু সেবা করছ। গুরুর নিজের কিছু দরকার নেই; শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরু কখনও সেবা গ্রহণ করেন, কখনও বা সেবা করিয়ে নেন। ঠাকুর সেবা করিয়ে নিতেন।

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বললেন, 'এ যোগ অতি গোপনীয়। তুমি আমার সখা ও ভক্ত, সেইজন্য তোমাকে এ সব বললাম।' "

শ্রীম গীতা খুলিয়া শ্লোকটি দেখাইতেছেন—

"স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ (গীতা ৪।৩)

পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,—কিছু ভোগ আকাঙ্ক্ষা না করে নিষ্কাম কর্ম্ম করলে চিত্তশুদ্ধি হবে। আর যদি বল, 'আমি সিদ্ধ, চিত্ত-শুদ্ধি হয়ে গেছে,' তা হলে লোকশিক্ষাব জন্য কর্ম্ম কর, যেমন আমি করছি। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আমি সূর্য্যকে বলেছিলাম," ইত্যাদি। ভক্তটি বেলা হইতেছে দেখিয়া কাজে যাইবার উপক্রম করিতেছে। তাই শ্রীম বলিলেন, "একটু বস। তোমার কাজ আছে আমি কি জানিনে?"

জনৈক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা হইতে ফিরিলে শ্রীম উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কি পেয়েছ দেখি?" ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি দেখিয়া বলিলেন, "তোমার খুব বাহাদুরি। যারা তাঁর চিন্তা করে তিনি তাদের জোটান। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।" (গীতা ৯।২২)

বৈকালে শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত।

স্বামীজীর রোক

শ্রীম—(একটি ভক্তের প্রতি) স্বপাক খেলে মন ভাল থাকে। এরা কষ্ট করতে চায় না। স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় কত কষ্ট পেয়েছেন। একবার

দুদিন খাওয়া হয় নি। এক জায়গায় বসে আছেন; সঙ্গে গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ)। একজন লোক আসছে দেখে স্বামীজী গঙ্গাধরকে বললেন, "এই খাওয়াবে।" সে ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করছে, "মহারাজ, ভোজন হুয়া?" স্বামীজী বললেন, "হোগা, হোগা।" সেই লোক তাঁদের আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল। ভোজন করে আসবার সময় স্বামীজী গীতা থেকে কিছু শ্লোক তাকে শুনিয়ে এলেন। আর একবার তিন দিন না খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। এক মুসলমান কৃষক একটি শশা দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল। স্বামীজী বলতেন, "তাই মঠ তৈরী করলাম। সাধুরা সাধন ভজন করে এসে এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারবে।"

"যখন মা ও ভাইয়েরা খেতে পাচ্ছে না তখন কত কষ্ট পেয়েছেন। সারাদিন কাজের জন্য ঘুরে ঘুরে কিছু না খেয়ে বাড়ীতে এসে বলতেন, 'আমি খেয়ে এসেছি, তোমরা খাও, আমি খাব না।' সেদিন কিছু না খেয়ে শুয়ে থাকতেন। তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁর মায়ের কাছে টাকা দিয়ে বলতেন, 'আমাদের নাম করবেন না, তাহলে ফিরিয়ে দেবে।' বন্ধুরা দিয়েছে শুনলেও ফিরিয়ে দিতেন। এমন রোক ছিল যে এত কষ্টেও বিচলিত হতেন না।

নিম্ন অধিকারী

"যারা নিম্ন অধিকারী তারাই সুবিধা খোঁজে। মঠের এক সাধু হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন। খোকা মহারাজ মায়াবতী যাবার রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বললেন, 'চল আমাদের সঙ্গে মায়াবতীতে।' তিনি শুনলেন না। মনের ভাব—এতদিন ভগবান দেখছেন, কেন দুদিনের জন্য সুবিধা নেব?"

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া ধ্যান করিতে নিজের ঘরে গেলেন।

ধ্যানান্তে গান গাহিতেছেন—

"মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।" ইত্যাদি
"জাগো মা কুল কুণ্ডলিনী" ইত্যাদি
"গিরি গৌরী আমার এসেছিল" ইত্যাদি
"গিরি গণেশ আমার শুভকারী" ইত্যাদি

সাধুভক্তি

মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত চারতলার বারান্দায় সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মঠে বা ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন।

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) মঠে কে গিয়েছিলেন? সাধুদের সঙ্গে কোন কথা হল?

দুর্গাপদ—তুলসী মহারাজের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম।। অবতার কি জন্য আসেন? অবতারের মধ্যে ছোট বড় হতে পারে কিনা? তিনি বললেন, "যার যতটুকু ধারণা সে তাই বলে। সূর্য্য পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হলেও আয়নাতে বেশী প্রকাশ, দেওয়ালে কম। যে যেমন অধিকারী তার কাছে ভগবান সেইভাবে প্রতিভাত হন।"

শ্রীম—সাধুদের কাছে এভাবে জিজ্ঞাসা করতে আছে? খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করে যেতে হয় এবং জিজ্ঞাসা করতে হয়—কিসে ভগবানকে পাওয়া যায়। তা না হলে সাধুকে দর্শন এবং সাধুকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করে চলে আসতে হয়। পশ্চিমের লোকেরা সাধুভক্তি বেশ জানে। যতক্ষণ সাধু থাকেন, ততক্ষণ তারা হাঁটু গেড়ে থাকে। কলকাতায় মুড়ি মিছরির একদর। এখানকার লোকেরা সাধুভক্তি জানে না। মনে করে—আমিও যা, সাধুও তাই।

অমৃতবাবু শ্রীমর কাছে বসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি, "আমি নই, বাবা" বলিয়া উঠিয়া অন্য স্থানে বসিলেন।

শ্রীম—সাধুর কথা হচ্ছে। (সকলের হাস্য)—(সাধু সর্ব্বত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছে। এর দ্বারাই সকলের শিক্ষা হয়ে যাচ্ছে। আবার লেকচার কি? হাত নেড়ে লেকচার না দিলে হয় না? তাতে কি হয়? এক কান দিয়ে শোনে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।) লেকচার না দিলে যদি বেশী লোক না আসে, নাই বা এল? ঠাকুর বলতেন, "পান চিবুতে চিবুতে চাপকান পরে যারা আপিসে যায় তারা আমাকে বলবে অবতার। তাহলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম।" কত বড় ideal (আদর্শ) রেখে গিয়েছেন! অন্য লোক যাদের সংস্কার নেই, তারা ঠাকুরের কথা শুনে বিশ্বাস করে না। কিন্তু যারা সংস্কারবান তারা তাঁর কথা শুনে হাঁ করে থাকে, তাঁকে দেখে অবাক হয়ে যায়। বলে—এমন মানুষ 'দেখিনি, এমন

কথাও কারু কাছে শুনিনি। 'Never man spake like this man' (এঁর মত কথা আর কোনও মানুষ বলেনি)। ঠাকুর কি বলছেন তাই তারা আগ্রহ করে শোনে। ক্রাইষ্টের প্রধান শিষ্য জন তাঁর কথা শুনে হাঁ করে থাকত, তাঁর সঙ্গ ছাড়ত না। যেমন জাত সাপ রোজার কাছে ফণা ধরে বসে থাকে।

॥ ২৬ ॥

২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

বেলা সাড়ে আটটা হইবে। শ্রীম তেতলার বেঞ্চিতে বসিয়া জনৈক ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা ভক্ত লীলাতে যোগ দিক

শ্রীম—(ভক্তের প্রতি) ঠাকুরবাড়ীতে কি কি কাজ করলে? দেখ, ভগবান ইচ্ছা করলে কর্ম্ম ঘুচিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু দেবেন না। ঈশ্বর নিজে লীলা করছেন; তাঁর ইচ্ছে এও কর্ম্ম করুক এবং লীলাতে যোগ দিক। কাল অনন্ত কিনা? অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "কেন এই ঘোর কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করছ?" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তোমার প্রকৃতি তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি কর্ম্মত্যাগ করতে পারবে না। তোমার প্রকৃতিই তোমাকে কার্য্য করাবে।" গুরু যেমন জানেন, শিষ্য কি তেমন নিজেকে জানে? যে নিজের প্রকৃতি বুঝতে পারে সে ত সিদ্ধপুরুষ।

জনৈক ভক্তকে উপনিষদ পড়ানো

ভক্ত—মঠে বেদ উপনিষদাদি পড়া হয়, সাধুরা পড়েন। আমারও ইচ্ছা হয় উপনিষদ পড়ি।

শ্রীম—বেশ বেশ। কিছু কিছু পড়। বেদ দুভাগে বিভক্ত—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড হচ্ছে উপনিষদ। এতেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

এই বলিয়া তখনই ঈশোপনিষদের কিয়দংশ পাঠ করিলেন এবং নিম্নলিখিত শ্লোক দুটি ভক্তকে মুখস্থ করিতে বলিলেন—

" 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানু পশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥' (ঈশ ৫।৬)

"তিনি গতিশীল আবার তিনি স্থির। তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে দূরে আবার দ্ধ বুদ্ধির কাছে। তিনি সকলের অন্তরে আবার তিনি সকলের বাইরে। যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দেখেন এবং সর্ব্বভূতে সেই আত্মাকে দেখেন, তিনি কোন জিনিষকে ঘৃণা করেন না।"

পরদিন সকালে শ্রীম নিজের ঘরে মুণ্ডকোপনিষদ হইতে ভাল ভাল শ্লোক ভক্তকে পডাইতেছেন—"দেবতাদের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন। তিনি বিশ্বেব কর্ত্তা ও পালক। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ক্রমে অঙ্গিরস ঐ বিদ্যা জানেন। সদ্‌ গৃহস্থ শৌনক এঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে ব্রহ্মন্, কোন্ জিনিষ জানলে আব সব জিনিষ জানা হয়ে যায়?' উত্তরে অঙ্গিরস পবা ও অপরা বিদ্যার বর্ণনা করে বলেছিলেন, 'সেই অক্ষর পুরুষকে জানলেই সকলকে জানা যায়'।" ইত্যাদি

সন্ধ্যার সময় শ্রীম বেডাইয়া ফিরিলেন এবং ছাদে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

পূজোর বাজার

শ্রীম—আজ অনেক জিনিষ দেখা গেল। রাস্তায় এক ভক্তের সঙ্গে দেখা হল, নাম, খোকা (মণীন্দ্র)। তার যখন ষোল বৎসর বয়স তখন সে ঠাকুরের কাছে যেত। ঠাকুর তাকে নিয়ে আনন্দ করতেন। অনেক দেবালয় প্রভৃতিও দর্শন হল। শ্যামবাজার থেকে ডাক্তারের গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ট্রামে করে দেখতে দেখতে কালীতলায় এলাম। মা দুর্গা আসছেন, তাই কাপড়ের দোকানে, গহনার দোকানে খুব ভিড়। সব কেনা বেচা হচ্ছে। কত গরীব দুঃখী, বাড়ীর দরওয়ান প্রভৃতি আশা করে আছে, এই সময় বকশিশ পাবে।

"আমি আগে কুমারটুলিতে দুর্গাপ্রতিমা দেখতে যেতাম। যেমন উকিল

দেখলেই জজ মনে পড়ে, তেমনি এই সব উদ্‌যোগ দেখলেই মাকে মনে পড়ে, মা আসছেন মনে হয়।

নমাজ

"কালীতলার কাছে আর একটি জিনিষ দেখলাম। এক মুসলমান একাগ্রতার সঙ্গে নমাজ পড়ছে। মেজেয় মাদুর পাতা। তাতে একবার বসে, একবার দাঁড়ায়। কাছে কেউ নেই, একলা, লোকদেখানো নয়। কেউ কেউ বলেন—এ সব অনেক দেখা আছে। দেখলে কি হবে? একবার খেলে কি আর খেতে হয় না! যত দেখা যায় ততই ভেতরে সংস্কার জন্মায়। সেই জন্য মহম্মদ দিনে পাঁচবার করে নমাজ পড়বার নিয়ম করেছেন। যেমন একবার নাম করলেই ত হয়; এতবার করবার দরকার কি? ভেতরে এত মাটি জমে রয়েছে যে দু একবার নাম করলে সংস্কার হয় না। বহুবার নাম করতে করতে তবে শুভ সংস্কারগুলো দৃঢ় হয়। সংস্কারগুলো কেমন জান?—একটা ন্যাকড়ার পুতুলকে চিনির রসে ডুবিয়ে রেখেছিল; সেই রস ন্যাকড়াকে কামড়ে ধরে রয়েছে। এই যে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহং, এসব জড়ের তৈরী। তাই কেবল সাকারের দিকে নজর, নিরাকারকে দেখতে দিচ্ছে না। তাঁর দর্শন হলে অশুভ সংস্কার চলে যায় ও সমাধি হয়। তখন কি হয় মুখে বলা যায় না। যেমন নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল, আর খবর দিতে পারলে না। জনকের অন্য এক নাম বিদেহ—দেহবুদ্ধি রহিত।"

বড় জিতেন—একজন বলছিল, চন্দ্রের জ্যোতিঃ, সূর্য্যের জ্যোতিঃ, এসব বুঝতে পারছি না।

শ্রীম—এইটে বুঝলেই সব বোঝা হয়ে যাবে? আর কিছু বোঝবার দরকার হবে হবে না? কতকগুলো শব্দের মানে বুঝলে কি হবে? ঠাকুর বলতেন, "চিল শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। তেমনি পণ্ডিতরা লম্বা লম্বা কথা কয়, শ্লোক ঝাড়ে, কিন্তু কামিনী কাঞ্চনে নজর।"

এইবার রমেশবাবু "দেবী ভাগবত" বর্ণিত আদ্যাশক্তি জগজ্জননী হইতে মহাবিরাট, বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়ার উৎপত্তি বর্ণন পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠান্তে সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৭ ॥

২৭শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

শাস্ত্র-রহস্য

বেলা প্রায় আটটা। শ্রীম নিজের ঘরে গদাধরকে বৃহদারণ্যকোপনিষদ হইতে জনৈক যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যান পড়াইলেন।

"এক সময় জনক একটি যজ্ঞ করেন এবং তাতে দান করবেন বলে এক হাজার গরু রাখেন। সেই যজ্ঞে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত ছিলেন। জনক সকলকে বলে দিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গরুগুলি নিয়ে যেতে পারেন।' কিন্তু কেউ সাহস না করায় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে বললেন, 'এই গরুগুলি আশ্রমে নিয়ে যাও।' এতে সব পণ্ডিত তাঁর ওপর চটে তাঁকে খেলো করার জন্য একে একে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রথমে জনকের পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সমস্তই মরণশীল হয় তা হলে কার দ্বারা যজমান মৃত্যুকে অতিক্রম করে?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'হোতা, বাক্য ও অগ্নির দ্বারা। যজমানের বাক্যই হোতা; সেই বাক্যই অগ্নি, এবং হোতাও অগ্নি। সেই জন্য অগ্নিরূপে উহারা মুক্তির হেতু।' এর তাৎপর্য্য হচ্ছে, নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হলে মুক্তি হয়। সোজাসুজি আঙ্গুল নাকের কাছে না নিয়ে মাথার পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আঙ্গুলটা নাকের কাছে নিয়ে দেখাচ্ছে।

"শাস্ত্রের দুটী অর্থ—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থটাই নিতে হয়। গুরুর সঙ্গে যেটা মেলে সেইটেই নিতে হয়। পণ্ডিতরা কেবল টীকা-টিপ্পনী করেই বই বাড়িয়েছেন। ঠাকুর বলতেন, 'এই মুখ দিয়ে মা কথা কন। কেশব সেনের বাড়ীতে যাবার সময় এই এই কথা বলব ভেবে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। মা, তোমার কথাই কথা, তুমি যা বলবে তাই সত্য, তাই যথার্থ।' "

সন্ধ্যার পর শ্রীম ধ্যানান্তে ভক্ত-সঙ্গে আসিয়া বসিলেন এবং একজন ভক্তকে বলিলেন, "তুমি যা পড়েছ ও মুখস্থ করেছ, বল।" ভক্তটি বৃহদারণ্যক

ও ঈশোপনিষদ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিলে শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, "শাস্ত্র পড়লে, শ্লোক মুখস্থ করলে, ঝাড়তে ইচ্ছে করে। দয়ানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি দেখে বললেন, 'আমরা যা এত দিন শাস্ত্রে পড়ে এসেছি, এঁর তা হয়েছে।' একজন দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সমাধি হয়?' তার উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার পাণ্ডিত্যাভিমান আছে।' পাণ্ডিত্যাভিমান থাকলে ভগবানকে দর্শন করা যায় না।"

মহামায়ার খেলা

জনৈক ভক্তের একটি ছোট মেয়ে মারা গিয়াছে। সেই প্রসঙ্গে শ্রীম বলিতেছেন, "আহা! মেয়ের শোক সহজে কি যায়? মা তাকে নিয়ে কত লালন পালন করেছে। ঠাকুর বোঝাতেন, 'হাঁড়ির ভাতের ফেন গালতে গালতে দু একটা ভাত পড়ে যায়। সেই রকম সব কি বাঁচে?' তিনি বলতেন, 'প্রায়ই মেয়েদের জ্ঞান হয় না। সৃষ্টি করবার জন্য এসেছে কিনা? মেয়েদের সাধ সর্ব্বদাই একটি ছেলে কোলে থাকে এবং সেটিকে নিয়ে লালন পালন করে। মহামায়া টেনে রেখে দিয়েছেন। ইচ্ছা, কতকগুলি ছানাপোনা করিয়ে নেবেন। অনেক ধাক্কা খেয়ে পুরুষদের বৈরাগ্য হয়।"

সৃষ্টির রহস্য

স্কুলের দরোয়ান রামলালের আজ হাসপাতালে শরীর গিয়াছে। শ্রীম তিনজন ভক্তকে তাহার সৎকার করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া বলিলেন যে, তার আত্মীয়েরা এসেছে, তারাই দাহ করবে।

শ্রীম—ঈশ্বরই এই রকম করে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করছেন। বায়স্কোপের ছবির মত একদল যাচ্ছে আর একদল আসছে। ছেলেবেলায় যারা সাথী ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই নেই। আমাদের পক্ষে মৃত্যুটা ভয়ঙ্কর জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই নয়। তিনি আনন্দে সৃষ্টি, আনন্দে পালন, আনন্দে সংহার করছেন। মানুষ ত সর্ব্বদাই আত্মস্থ থাকতে পারে না, তাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চৈতন্য করিয়ে দিচ্ছেন, জানিয়ে দিচ্ছেন, এ শরীর থাকবে না। আজ সেই মৃত্যু ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৮ ॥

২২শে ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সেতু। পরমাত্মার ধ্যান

সকালে ধ্যানান্তে শ্রীম চারতলার ঘরে কয়েকজন ভক্তকে "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" নামক পুস্তক হইতে পড়িয়া শুনাইতেছেন।

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)

ইনি সকলের ঈশ্বর। ইনি ভূতগণের অধিপতি। ইনি সর্ব্বভূতের পালক। বিভিন্ন লোক যাতে' পরস্পর মিশে না যায় এজন্য ক্ষেতে আলের (সেতুর) মত সকলকে যথাস্থানে ধরে রেখেছেন।

"আহা! একটি ভক্ত আর এক রকমের সেতুর স্বপ্ন দেখে ঠাকুরকে বলেছিল, 'চতুর্দ্দিক জলময়। এক ব্রাহ্মণ দিব্যি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। দেখে ভক্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি করে জলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'জলের নীচে বরাবর সাঁকো (আল) আছে। এই পথ দেখে রাখ, পরে এই পথ দিয়ে আসবে।'

"তিনি ধারণ করে রয়েছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে—

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)

"হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষের কঠোর শাসনেই সূর্য্য, চন্দ্র নিজের নিজের স্থান না ছেড়ে কাজ করে যাচ্ছে। গার্গী খুব উঁচু প্রশ্ন করেছিল। তার জবাবে যাজ্ঞবল্ক্য ঐ কথা বলেছিলেন। ঋষিরা সেই অক্ষর পুরুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

'প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥' (মুণ্ডক ২।২।৪)

"ওঁকার হচ্ছে ধনুক, জীবাত্মা হচ্ছে তার শর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন তার লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে তীর যেমন লক্ষ্যের ভেতর ঢুকে যায় তেমনি ব্রহ্মে লীন য়ে যাবে। উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হবে। নাম, যশ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অন্যদিকে

লক্ষ্য থাকলে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে শর বিদ্ধ হবে না। কেবল তাঁকে দর্শন করবার জন্য ব্যাকুলতা এলে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চসর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

(মুণ্ডক ২।২।৫)

"যাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় সহিত মন ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে, সেই আত্মাকে জান। অন্য সব কথা ছেড়ে দাও। অমৃতত্বের এই সেতু।

"ঠাকুর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা বলতেন না। অশ্বিনী দত্তের বাবাকে বলেছিলেন, 'বাপু, বিষয়ের কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়।' ঠাকুরের অহঙ্কার ছিল না। তাই বলতেন, 'মা, আমাকে এই রকম অবস্থায় রেখেছেন।' অন্যলোক কত জাঁকজমক দেখায়, নিজেকে জাহির করবার জন্য কত চেষ্টা করে। দক্ষিণেশ্বর বেশ ধ্যানের জায়গা। ঝাউ গাছের সোঁ সোঁ শব্দ, মা গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি, ধ্যানের বিঘ্ন করে না বরং মনকে গম্ভীরই করে তোলে। ঠাকুর সেখানে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করেছেন। সেখানে কিছু না করে এমনি বসে থাকলেও ধ্যানের কাজ হয়।

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিরুধ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি। (শ্বেতাশ্বতর ২।৮)

"ধ্যান করবার সময় বুক, ঘাড ও মাথা সোজা রাখতে হয়। ঝুঁকে পড়তে নেই। ইন্দ্রিয়গুলোকে মনের দ্বারা বাইরের বিষয় থেকে নিয়ে এসে হৃদয়ে (ইষ্ট স্থানে) স্থাপন করবে। সংসার-সাগরের ভয়াবহ স্রোত ব্রহ্মরূপ ভেলায় চড়ে পার হবে।

"এই রকম ধ্যান করতে করতে আপনা আপনি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কুসংস্কারগুলো নষ্ট হয়ে উত্তরোত্তর ভগবানে শ্রদ্ধা, প্রীতি বেড়ে যায়। তখন আর এত নিয়মের দরকার থাকে না। সিদ্ধ পুরুষদের যখন তখন ধ্যান হয়। গভীর রাত্রে হয়ত তাঁতে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।"

বালকবৎ অবস্থা

পাঠের পর একজন ব্রহ্মচারীকে বৃহদারণ্যকোপনিষদ পড়াইতেছেন—

"কৌষীতকের পুত্র কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, 'যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের অন্তরাত্মা তাঁর বিষয় আমায় কাছে ব্যাখ্যা করুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'যিনি ক্ষুৎ পিপাসার অতীত এবং শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছেন, তিনিই তোমার ও সকলের আত্মা। সেই আত্মাকে জেনে ব্রাহ্মণেরা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও লোককামনা ত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন।' (বৃহদারণ্যক ৩।৫।১)

(ব্রহ্মচারীর প্রতি) "কেমন, 'ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি'—এই কথা শুনে তোমার আনন্দ হচ্ছে? ঋষিরাও ভিক্ষা করে খেতেন। তুমিও যে সেই ভিক্ষা করে খাও, সেটা মন্দ নয়। 'যা পুত্রকামনা তাই বিত্তকামনা, যা বিত্তৈষণা তাই আবার লোকৈষণা।' যেমন ঠাকুর বলতেন, 'কাঞ্চন থাকলেই কামিনী পেতে ইচ্ছা করে, আবার কামিনী থাকলে অর্থের প্রয়োজন। তখন রাজার কাছে গিয়ে টাকার জন্য খোসামোদ করতে হয়। আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, কাল ছেলের বিয়ে, 'জয় হোক মহারাজ', ইত্যাদি। তা থেকে যত কামনা বাসনার ফেকড়ী বেরুতে থাকে। 'পাণ্ডিত্যে কি আছে জেনে ব্রাহ্মণেরা বালকভাবে থাকতে ইচ্ছা করেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য দুয়েরই মর্ম্ম জেনে মুনি হন। মৌন ও অমৌনকে জেনে যথার্থ ব্রাহ্মণ হন।'

"ঠাকুরের এই রকম অবস্থা হত। কখনও বালকের মত ফষ্টিনাষ্টি করতেন, কখনও বা মৌনী হয়ে থাকতেন। তখন কাছে লোক থাকলেও কথা বলতেন না। তিনি ছিলেন অত্যাশ্রমী।"

ঠাকুরের গায়ের রং

বৈকালে পাঁচটার সময় শ্রীম ছাদে বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। কাছে গদাধর ও একজন নবাগত ভক্ত।

ভক্ত—ঠাকুরের গায়ের রং কি রকম ছিল?

শ্রীম—আমরা যখন তাঁর কাছে যাই তখন তাঁর রং ফর্সা দেখেছি। আপনার গায়ের মত ফর্সা। মা ঠাকরুণ বলতেন, "ঠাকুরের গায়ের রং আগে দুধে আলতার মত ছিল।" আমরা যখন দেখি তখন দাড়ির চুল পাকতে আরম্ভ হয়েছে। দাড়ি বড় হলে মাঝে মাঝে ছাঁটতেন।

ভক্ত—নির্জ্জন মানে কি?

শ্রীম—যেখানে আপনার লোক নেই। যেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে সেখান থেকে দূরে যাওয়া। Family (পরিবার) নিয়ে বাস করাকে নির্জ্জন বাস বলে না। সে বাড়ীতে উপরের ঘরে একলা থাকলেও নির্জ্জন হল না। দূরে যেতে হবে। দক্ষিণেশ্বর বেশ জায়গা।

ভক্ত—আমার মাথায় হাত দিন, তাঁর চরণ-রেণু আপনারা গায়ে ঠেকিয়েছেন।

শ্রীম—তা বলতে পারেন।

এই বলিয়া তাঁহার মাথায় হস্ত স্পর্শ করিয়া শ্রীম বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের প্রত্যেক ধূলিকণা তাঁর পদরেণুতে পবিত্র হয়ে রয়েছে। একলা একলা সেই ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে হয়। পুরনো গাছপালা এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

কথাবার্ত্তার পর ভক্তটি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৯ ॥

৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

অন্তর্যামী পুরুষ

বৈকাল বেলা চারটা। শ্রীম চারতলায় তাঁহার ঘরে এক ব্রহ্মচারীকে বৃহদারণ্য-কোপনিষদ হইতে যাজ্ঞবাল্ক্য সংবাদ পড়াইতেছেন।

অরুণের পুত্র উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যজ্ঞ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য যখন মদ্রদেশে কপিবংশীয় পতঞ্জলের গৃহে বাস করতাম, সেই সময় পতঞ্জলের ভার্য্যার গন্ধর্ব্বাবেশ হয়েছিল, যেমন লোক ভূতাবিষ্ট হয় সেইরূপ। গন্ধর্ব্বাবিষ্ট পতঞ্জলের ভার্য্যাকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'তুমি কে?' উত্তরে সে বলেছিল, 'আমার নাম কবন্ধ। আমি অথর্ব্ব ঋষির পুত্র।' সেই গন্ধর্ব্ব কপি গোত্রীয় পতঞ্জল ও যাজ্ঞিকদিগকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'যে সূত্রের দ্বারা ইহলোক, পরলোক, সমস্ত ভূতবর্গ গাঁথা রয়েছে, তোমরা কি সেই সূত্রকে জান?' পতঞ্জল তার উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি সেই সূত্রকে জানি না।'

"গন্ধর্ব্ব পুনরায় পতঞ্জল ও যাজ্ঞিককে প্রশ্ন করেন, 'হে কাপ্য, যিনি ইহলোক, পরলোক ও সকল ভূতবর্গের অন্তরে থেকে সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণ করছেন, সেই অন্তর্যামী পুরুষকে কি জান?" পতঞ্জল উত্তর দেন, 'হে ভগবন্, আমি সেই অন্তর্যামী পুরুষকে জানি না।' আবার সেই গন্ধর্ব্ব

যাজ্ঞিক ও কাপ্যকে বললেন, 'যিনি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবেত্তা (ব্রহ্মকে জানেন), লোকবেত্তা (লোককে জানেন), বেদবেত্তা (বেদকে জানেন), ভূতবেত্তা (ভূতকে জানেন), আত্মবেত্তা (আত্মাকে জানেন) এবং সর্ব্ববেত্তা (সকলকে জানেন); হে যাজ্ঞবল্ক্য, সেই গন্ধর্ব্ব তাঁদের অর্যন্তামী ও সূত্রাত্মার কথা বলেছিলেন এবং আমি সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। তাই আমি জানি। তুমি কি সেই সূত্র ও অন্তর্যামী পুরুষকে জান? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'হাঁ, আমি সেই সূত্র ও অন্তর্যামী পুরুষকে জানি।' উদ্দালক বিশেষভাবে জানতে চাইলে যাজ্ঞবল্ক্য বলতে আরম্ভ করলেন, 'হে গৌতম, বায়ুই (হিরণ্যগর্ভ) সেই সূত্র। সেই বায়ু ইহলোক, পরলোক ও সকল প্রাণীকে ধারণ করে রয়েছে। প্রাণবায়ু না থাকলে লোকে বলে,—মরে গেছে; তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, দেহ ফুলে ওঠে। অতএব হে গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র।' উদ্দালক বললেন, 'ঠিক ঠিক। এবার অন্তর্যামী পুরুষের কথা বল।' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'যিনি পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবী হতে ভিন্ন, পৃথিবী যাঁকে জানে না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর ভেতরে থেকে তাকে প্রেরণা দিচ্ছেন, তোমার অমর আত্মাই সেই অন্তর্যামী পুরুষ। এই রকম জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক, চন্দ্রতারা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ, মন, ত্বগিন্দ্রিয়, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বস্তুতে যিনি আছেন এবং যাঁকে তারা জানে না, যাঁর ঐ সব শরীর, যিনি তাদের অন্তরে থেকে প্রেরণা দেন, তোমার অন্তর আত্মাই সেই অন্তর্যামী পুরুষ। দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয়েও যিনি চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধির অগোচর, এ থেকে অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা বিজ্ঞাতা নেই, তিনিই তোমার অমর আত্মা এবং অন্তর্যামী।' ”

সন্ধ্যার পর শ্রীম ছাদে বসিয়াছেন; খদ্দরের চাদর ভাঁজ করিয়া মাথায় দেওয়া। ভক্তগণ বেঞ্চিতে বসিয়াছেন।

ঠাকুর ভুল ধরতেন না

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) ঠাকুর বলতেন, "তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, সবই তিনি। তাঁ ছাড়া আর কিছুই নেই।" তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। ঋষিরা বলেছেন, "সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, দিন, রাত, মন, বুদ্ধি সবই তাঁর এক একটি শরীর। তিনি সকলের অন্তরে আছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জানে না। তিনি সকলকে জানেন।" কি সুন্দর!

'আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥' (গীতা ১০।১৩)

"অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'ঋষিরা তোমাকে নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী আদি পুরুষ বলছেন, তুমি নিজেও তাই বলছ, তখন আমার যা কিছু সন্দেহ ছিল, সব দূর হয়ে গেল।'"

শ্রীম—(ডাক্তারের প্রতি) ঠাকুর জোড়াসাঁকো, পটলডাঙ্গায় দুর্গাপ্রতিমা দেখতে যেতেন। আপনি দেখতে যাবেন?

ডাক্তার—সে জায়গা দেখি নি।

শ্রীম—আমরা নিয়ে যাব। একবার দেখে এলে হয়। সেদিন ব্রাহ্ম সমাজের বেদিতে বসে আচার্য্য, "মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মা আনন্দময়ী, মা নিরাকার রূপিণী, দর্শন দাও" বলে প্রার্থনা করছিলেন। তাই শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

দুর্গাপদ—ও সব পাগলামি। বলছে—আনন্দময়ী, আবার বলছে—নিরাকার, এ কি রকম?

শ্রীম—ঠাকুব যেতেন। মানুষের ভুল হয়ে থাকে, ঠাকুর কিন্তু ভুল ধরতেন না। ঠাকুর ব্রাহ্মদের দেখে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন; বলতেন, "এত লোক নিরাকাবকে ডাকছে।" কেশবের জন্য পাগল। যখন কেশবের অসুখ, ঠাকুব মার কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কবতেন। বলতেন, "কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব?" ব্রাহ্মদের সঙ্গে মায়েব নাম করে নৃত্য করতেন। যেখানে দেখতেন ঈশ্বরকে ডাকছে, সেইখানেই দৌড়ে যেতেন। ঠাকুর মন্ত্র নেবাব জন্য অত বলতেন না; বলতেন, "ব্যাকুল হয়ে ডাক, তাহলে সব হয়ে যাবে।"

এইবাব একজন দেবীভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে ভক্ত সুদর্শনের চরিত্র পাঠ করিতেছেন।

অযোধ্যার জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পিতৃহীন সুদর্শন বৈমাত্রেয় মাতামহ যোধাজিতের শত্রুতায় মাতা মনোরমার সহিত আশৈশব ভরদ্বাজ আশ্রমে পালিত হন। তথায় তিনি দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন ও তাঁহার কৃপায় কাশীরাজকন্যাকে স্বয়ম্বরে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। ঐ সময় সমবেত রাজন্যবর্গের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তাহাতে জগন্মাতা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে জয়যুক্ত করেন, এবং যোধাজিতের ঐ যুদ্ধে মৃত্যু হয়। কাশীরাজ সুবাহুও ঐ সময় দেবীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হন ও তাঁহাকে

স্তব দ্বারা প্রসন্ন করেন। তারপর সুদর্শন অযোধ্যার রাজা হন এবং উভয় রাজ্যেই দেবীপূজার প্রবর্ত্তন হয়।

পাঠ সমাপ্ত হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা হইয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩০ ॥

১লা অক্টোবর, বুধবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

অক্ষর পুরুষ

শ্রীম নিজের ঘরে একটি ব্রহ্মচারীকে বৃহদারণ্যকোপনিষদ হইতে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ পড়াইতেছেন।

"ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পেয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে গাগী দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করেন। সেই সময় বলেন, 'আমি তীক্ষ্ণ বাণের মত দুটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আপনি তার উত্তর দিন।'

"ভয় দেখাচ্ছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্বীকৃত হলে গার্গী বললেন, 'সর্ব্বব্যাপী সূত্রাত্মা কিসে ওতপ্রোত হয়ে আছেন?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "আকাশে।' গার্গী নমস্কার করে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন—'আকাশ কিসে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, 'ব্রাহ্মণগণ যাঁকে অক্ষর বলেন তাঁতে। তিনি স্থূলও নন, সূক্ষ্মও নন, হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন, ছায়া বা অন্ধকার নন, বায়ু বা আকাশও নন, তিনি নির্গুণ, অসঙ্গ ও ইন্দ্রিয় মনপ্রাণাদি বর্জ্জিত, তিনি ভোক্তাও নন, ভোজ্যও নন, এই অক্ষরের কঠোর শাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, এবং কাল যথাযথভাবে নিয়মিত হচ্ছে, নদ নদী নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, এবং দান যজ্ঞাদির ক্রিয়া চলছে। যিনি এই অক্ষরকে না জেনে বহুবর্ষ ধরে যাগ, হোম, তপস্যাদি করেন, তাঁর সে সব ক্ষয়শীল হয়। এঁকে না জেনে যার মৃত্যু হয় সে ভাগ্যহীন। আর যিনি এঁকে জেনে শরীর ত্যাগ করেন তিনিই ব্রহ্মবিৎ। ইন্দ্রিয়াদির অগোচর এই অক্ষরই একমাত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা। হে গার্গি! এঁতেই আকাশ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।' তখন গার্গী তাঁকে অজেয় বলে ঘোষণা করেন।

(ব্রহ্মচারীর প্রতি) "এই সব শুনে ধ্যান করবে, তবে ধারণা হবে। ঠাকুর ন্যাংটার (তোতাপুরীর) কাছে বেদান্ত শুনতেন। কিছু শুনে নির্জ্জনে সেগুলি ধারণা করে আবার এসে প্রশ্ন করতেন 'এটা কি হল? তারপর কি আছে?' ইত্যাদি। তোমার ঈশ্বর বিষয়ে এত আগ্রহ হচ্ছে কেন? তুমি অনেক কর্ম্ম করেছিলে বলে হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে বাস, তীর্থদর্শন, উৎসবে যাওয়া, নির্জ্জনে থাকা—এই সব কর্ম।"

আঙ্গুর ফল টক

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' (মুণ্ডক ৩।২।৩)

"মনে বল চাই। ভিক্ষা করে যে থাকতে পারে সে সব জয় করতে পারে। যেখানে দেখবে যে গতিক সুবিধা নয় মার দৌড় সেখান থেকে। বলবে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।' (হাসিতে হাসিতে) আঙ্গুরের গাছে থোলো থোলো আঙ্গুর ফলে ছিল। একটা শেয়াল আঙ্গুর খাবার জন্য দুই একবার লাফিয়ে নাগাল পেলে না। চলে যাবার সময় বলে গেল, 'দূর, আঙ্গুর আবার কেউ খায়। বেজায় টক ফল।'"

ব্রহ্মচারী—আমার যাতে ধারণা হয়, অনুভব হয়, তাই করে দিন।

শ্রীম—'এই আম, পাক,' বললেই কি আম পাকে, সময় না হলে?

ব্রহ্মচারী—শ্রীকৃষ্ণ আম গাছে অসময়ে আম ফলিয়ে ছিলেন।

শ্রীম—তাঁর কৃপা হ'লে হয়। তখন আর চেষ্টা করতে হয় না।

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম তাঁহার ঘরে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে গান গাহিতেছেন।

"শ্রীদুর্গানাম ভুলনা, ভুলনা, ভুলনা, ভুলনা।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্রমন্থনে, বিষপানে বিশ্বনাথ মলনা।" ইত্যাদি
"কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।" ইত্যাদি

কিছুক্ষণ পরে ছাদে গিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। তথায় অনেক ভক্ত সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীম—(উপরে তাকাইয়া) এই দেখ অনন্ত।

বড় জিতেন—দেখছি ত।

শ্রীম—কিন্তু বুঝতে পারছি না। বুঝবার জন্য কত দর্শন, কত বিজ্ঞান হয়েছে, তবুও মানুষ বুঝতে পারে না। (গদাধরের প্রতি) উপনিষদ বল ত।

গদাধর ঈশ, মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে আবৃত্তি করিলে শ্রীম তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তদের শুনাইলেন।

শ্রীম—(রমণীর প্রতি) গান হোক।

রমণীবাবু সুমধুর কণ্ঠে গান গাইলেন—

"এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাবনা" ইত্যাদি।

পরে শ্রীমর আদেশে একজন ভক্ত "দেবী ভাগবত" পাঠ করিলেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম বলিতেছেন, "অহঙ্কার না গেলে সমাধি হয় না। ঠাকুর বলতেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বোধ হবে, যখন অহঙ্কার নাশ হবে।' এই অহঙ্কার রয়েছে বলে মানুষ সাকার নিয়ে আছে। তাই সাকার পূজার ব্যবস্থা।

(ডাক্তারের প্রতি) "লোকে একেবারে 'নির্জ্জলা একাদশী' করতে পারে না, তাই তন্ত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি। মানুষের ভোগের প্রবৃত্তি রয়েছে বলে তন্ত্র এই প্রবৃত্তিকে ঈশ্বরের দিকে মোড ফিরিয়ে দেবার উপদেশ দেয়।"

রাত্রি নয়টা হইয়াছে। ভক্তরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩১ ॥

২রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সকালে শ্রীম নিজের ঘরে একজন ভক্তকে চণ্ডী পড়াইতেছেন। প্রথমে চণ্ডীর গল্পটি বলিতেছেন।—

বন্ধন ও মুক্তির কারণ মহামায়া

"সুরথ নামে এক প্রজা বৎসল রাজা ছিলেন। শক্র যবন রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে তিনি রাজ্য ছেড়ে বনে পালান এবং মেধস মুনির আশ্রমে থাকেন। কাছেই এক বৈশ্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। রাজা তাঁকে দুঃখিত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৈশ্য নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার নাম সমাধি। আমার স্ত্রী-পুত্র আমার টাকা কড়ি সব নিয়ে নেয় ও দুর্ব্যবহার করে। তাই বনে এসেছি। কিন্তু বনে এসেও তাদের দিকেই আমার মন টানছে।' রাজা বললেন, 'সেকি!' বৈশ্য বললেন, 'হাঁ, এততেও তাদের

ভুলতে পারছিনে।' তখন দুজনে মেধস মুনির কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্ত কথা জানালেন, এবং কেন এমন হয় জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষি বললেন, 'এর কারণ মহামায়া, যিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। তিনিই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। তোমরা সেই ভগবতীর আরাধনা কর। তাহলে তাঁর কৃপায় সংসার বন্ধন হতে মুক্তি পাবে। তিনি নিত্যা হলেও কখনও কখনও দেবকাজে জগতে অবতীর্ণা হয়ে জগৎকে রক্ষা করেন।' রাজা ও বৈশ্য তাঁর চরিত ও লীলার বিষয় জানতে চাইলে মেধস চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করলেন। প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ বধের জন্য দেবীকে ব্রহ্মার স্তব। মধ্যম চরিত্রে মহিষাসুর বধ ও 'শক্রাদি' স্তুতি। তৃতীয় চরিত্রে শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পূর্ব্বে 'নমো দেব্যৈ' ইত্যাদি স্তুতি এবং বধের পর, 'নারায়ণী' স্তুতি। তাঁরা দুজনে ঐ অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনে নদী তীরে তপস্যা ও একাগ্র মনে মৃৎ প্রতিমায় দেবীর পূজা করেন। তিন বৎসরের মধ্যে তাঁরা দেবীর দর্শন পান। (ভক্তের প্রতি) এত অল্প সময়ের মধ্যে এঁদের দর্শন লাভ হল, তার কারণ কি? তাঁরা রোজ গুরুকে দর্শন করতে আসতেন ও তাঁর উপদেশানুসারে তপস্যা করতেন তাই। সর্ব্বদা সিদ্ধ পুরুষকে দর্শন করলে তপস্যার কাজ হয়ে যায়।

"মা তাঁদের দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি; তোমরা কি বর চাও?' রাজা প্রার্থনা করলেন, 'আমার যেন পুনরায় রাজ্য লাভ হয়।' বৈশ্য বর চাইলেন, 'মা, আর যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। আমি তোমার কৃপায় সংসারের অসারতা বুঝতে পেরেছি। আমার যেন জ্ঞান হয়।' দেবী উভয়কে তাদের অভিলষিত বর দিয়ে অন্তর্দ্ধান হলেন। সুরথ নিজের রাজ্য ত পেলেনই আবার দেবীর কৃপায় পরজন্মে সাবর্ণি মনু হবেন; আর বৈশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন।"

গল্পটি শুনাইয়া শ্রীম ভক্তকে ব্রহ্মার কৃত স্তবটি মুখস্থ করিতে দিলেন—'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকার স্বরাত্মিকা।' ইত্যাদি।

যে, বলবে—তাঁর এই মত ছিল, আর কিছু ছিল না, সে তাঁকে বুঝবে না। তাঁর অনন্ত কাণ্ড। তাঁর ভাবের ইতি করা যায় না। জগতের যাবতীয় বস্তুই অনন্ত। যদি বল প্রত্যক্ষ গাছ দেখছি, এক হিসাবে তার আদি রয়েছে। তার উত্তরে বলা যায়—গাছ কোথা থেকে এল? সে আবার কোথা থেকে এল? তার পিতা, পিতার পিতা কোথা থেকে এল? এই রকম বিচার করে দেখতে গেলে কিছুরই অন্ত পাওয়া যায় না। শেষে অনন্তে গিয়ে ঠেকে। আমি আগে মনে করতাম, বুঝি এই সামনের দিকটা অনন্ত। তা ত নয়। নীচে, ওপরে, ভেতরে, বাইরে সবই অনন্ত।”

॥ ৩৩ ॥

১৮ই অক্টোবর, শনিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সাধুসঙ্গে মনের বল আসে

বেলা আটটা। শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে জনৈক ভদ্রলোক ও গদাধর।

শ্রীম—(ভদ্রলোকের প্রতি) সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকতে হয়। ঠাকুর কত স্থবিধে করে দিয়েছেন। নানা স্থানে তাঁর আশ্রম হয়েছে। সেই সব আশ্রমে অনায়াসে সাধুসঙ্গ করা যায়। সাধুসঙ্গ করতে করতে মনে বল আসবে। মনে হবে, এঁরা সব ত্যাগ করে রয়েছেন, আর আমি পারব না। তা হলে বিবাহ করতে ইচ্ছা যাবে না। Family’র (পরিবারের) মধ্যে বাস করলে তাদেরই চিন্তা আসবে। সংস্কার থাকা চাই। ঠাকুর মানতেন। ঠাকুরের গান শুনে একজন ভক্তের নেশা লেগেছিল। সে বললে, “আর গান হবে?” তখন তিনি বললেন, “একটা ময়ূরকে আফিম খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। ময়ূরটা তার পরদিন সেই সময়ে হাজির।” ঠাকুর বলতেন, “এর (মাষ্টারের) সংস্কার আছে। তা না হলে এত ঘন ঘন আসে?” তাই সংস্কার মানতে হয়। সংস্কার থাকলে এই সব ভাল লাগে।

ভদ্রলোকটি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম নামিয়া দোতালার বেঞ্চিতে বসিলেন। কাছে তিনটি ভক্ত। তন্মধ্যে একজনকে চণ্ডী হইতে শক্রাদি-স্তুতি পড়াইতেছেন।

চণ্ডী—ঈশ্বরলীলা

"মহিষাসুর বধের পর দেবতারা গদগদ বাক্যে মায়ের স্তুতি করতে লাগলেন। বললেন—মা, তুমি সারা জগৎ ছেয়ে রয়েছ। তুমি আমাদের শক্তির সমষ্টি স্বরূপ। তোমার মহিমা অনন্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও তোমার মহিমা বর্ণনা করতে পারেন না। তুমিই জগতের কারণ। তুমিই মুক্তির নিদান। মুনি ঋষিগণ তোমাকেই ধ্যান করে থাকেন। হে দেবি! তুমি জগতের মঙ্গল করবার জন্য সদাই উদগ্রীব। তুমি যে দুষ্ট অসুরদের বধ কর তাতে তাদেরও মঙ্গল হয়। তোমার অস্ত্রাঘাতে তারা পবিত্র হয়ে স্বর্গে চলে গেল। হে দেবি, বাইরে ভয়ঙ্করী হলেও তুমি অন্তরে করুণাময়ী।"

"শূলেন পাহি নো দেবি, পাহি খড়্গেন চাম্বিকে", (৪।২৪) এই শ্লোক যখন পড়া হচ্ছে, শ্রীম বলিতেছেন, "দেবতারা ঐশ্বর্য্য নিয়ে আছে কিনা, তাই মায়ের কাছে 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক শূলের দ্বারা রক্ষা কর' বলছেন।"

ভক্ত—মা অতীন্দ্রিয়া হয়েও সাধারণের মত কি করে স্থূলভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন?

শ্রীম—এসব ঠাকুর বুঝতেন; আমাদের এত কথায় কাজ কি? তিনি বলতেন, "মা, জানতেও চাইনা। আমাকে তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।" তবে দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা, ঈশ্বরলীলা এই সব বিভিন্ন লীলার কথা ঠাকুর বলতেন, এ হচ্ছে ঈশ্বরলীলা। তিনি দর্শন করতেন।

বৈকাল প্রায় পাঁচটা। শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। আজ শনিবার বলিয়া ভক্তরা অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন।

জ্ঞানযোগ—মৈত্রেয়ী সংবাদ

শ্রীম একটি ভক্তকে বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ পড়াইতেছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী। নাম কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। এঁদের মধ্যে কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় ও মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য একদিন তাঁদের ডেকে বললেন, "দেখ আমার যা সম্পত্তি আছে তা তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে আমি সন্ন্যাস নেব।" তাতে মৈত্রেয়ী

জিজ্ঞাসা করলেন, "এর দ্বারা কি অমৃতত্ব পাব?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "ধনদ্বারা ভোগসুখ হতে পারে, অমৃতত্বের আশা নেই।" তখন মৈত্রেয়ী বললেন, "তবে এতে আমার কি লাভ? যাতে সেই অমৃতত্ব লাভ হয় তার উপায় বলুন।" (যাজ্ঞবল্ক্য তখন খুব খুশী হয়ে তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন। বললেন, "দেখ, পতির সুখের জন্য পতি ভার্য্যার প্রিয় হয় না। নিজের সুখের জন্যই পতি তার প্রিয় হয়ে থাকে। স্ত্রীর সুখের জন্য স্ত্রী স্বামীর প্রিয় হয় না, নিজের সুখের জন্যই স্ত্রী তার প্রিয় হয়ে থাকে। এই রকম পুত্র, ধন, পশু, ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন লোক, দেবতা, বেদ, এক কথায় সকল বস্তু তাদের জন্য প্রিয় হয় না, নিজের সুখের জন্যই মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে। সেই নিজেকে—আত্মাকে—শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা দর্শন কর।) যারা সব জিনিষকে নিজের থেকে আলাদা বলে মনে করে সব জিনিষই তাকে অনাদর করে। এ সবই যে আত্মা।

"যেমন দামামা বাজালে তার বিভিন্ন আওয়াজ আলাদা করে ধরা যায় না, কিন্তু দামামা গ্রহণ করলে তার অন্তর্ভুক্ত সব শব্দও গ্রহণ করা যায়। সেই রকম জগতের মূল ব্রহ্মকে জানলে জগতের সব জিনিষ জানা যায়।

শ্রীম—ঠাকুর একটি গল্প বলতেন, "একদিন মা ভবানী বহুমূল্য রত্নহার পরে বসে আছেন। তাই দেখে গণেশ ও কার্ত্তিক দুজনেই মায়ের কাছে সেই হার চাইলেন। মা বললেন, 'যে আগে চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরে আসতে পারবে, তাকেই এই হার দেব। এই কথা শুনে কার্ত্তিক তখনই ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু গণেশ মাকে প্রদক্ষিণ করে বললেন, 'মা, এইবার হার আমাকে দাও। তোমা ছাড়া এজগতে আর কিছু কি আছে? তুমিইত সব হয়ে রয়েছ।' মা তাঁর জ্ঞান দেখে সন্তুষ্ট হয়ে হারটি তাঁকেই দিলেন।" সেই রকম ব্রহ্মে সমস্ত জীবজগৎ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। তাঁকে জানলে আর কিছু জানবার বাকী থাকে না।

"যতক্ষণ দ্বৈত বোধ আছে ততক্ষণই পরস্পর পরস্পরকে দেখে, শোনে, জানে। সমাধি অবস্থায় কে কি দেখবে, শুনবে, জানবে? যার দ্বারা সমস্ত জানা হচ্ছে তাঁকে কার দ্বারা জানবে?"

সন্ধ্যার পর ধ্যানান্তে শ্রীম চারতলার ঘরে কথা কহিতেছেন। ডাক্তার, বলাই, প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত।

লীলা যেন বায়স্কোপের ছবি

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) ধীরেন মহারাজ চিঠি দিয়েছেন হৃষীকেশ, স্বর্গাশ্রম, হরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান বন্যায় ভেসে গেছে এবং অনেক লোক মারা গেছে। মঠের দুজন সাধুও ভেসে গেছেন।

বড় জিতেন—আমরা তাঁর লীলা কিছু বুঝতে পারিনে।

শ্রীম—আমরা বেশ বুঝতে পারছি। এ সব বায়স্কোপের ছবির মত। এইবার ভাবের সহিত গান গাহিতেছেন—

(কালী) "এরূপে আর গত হবে কত কাল।" ইত্যাদি

"দুর্গে এবার কর এ দীনের উপায়,

এ দেহ পঞ্চত্ব কালে দেহাত্মা যেন মিশায়।" ইত্যাদি

গানের পর বলিতেছেন, "এই সব গান শুনলে মনে হয়, সব ছেড়ে ভগবানকে ডাকি। কিন্তু এমনি তাঁর মায়া যে সব ভুলিয়ে দেয়। ঠাকুর বলতেন, 'জল বেশ দেখা যাচ্ছিল, আবার নাচতে নাচতে পানা এসে ঢেকে ফেললে।' আমরা ত ভাবছি এত লোক মারা গেল, ভগবান কি করলেন? ঠাকুরের কাছে একজন বললে, 'একখানা জাহাজ ডুবে কত লোক মারা গেছে। ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর! তাদের প্রার্থনা একেবারে শুনলে না।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'আচ্ছা, এর চেয়ে ভাল জায়গায় যদি তাদের নিয়ে গিয়ে থাকেন?' তখন চুপ। আমরা ত এতটুকু দেখছি—যা চোখের সামনে আছে। তিনি যে ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান দেখছেন। তাঁর মহামায়াতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার হচ্ছে। এ তাঁর খেলা। এ কথা সব মহাপুরুষ বলে গেছেন।"

॥ ৩৪ ॥

১০ই নভেম্বর, সোমবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন

সকাল ৮টা। শ্রীম চারতলায় নিজের ঘরে তিনটি ভক্তকে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে পড়িয়া শুনাইতেছেন—"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (১৩।১৭)॥

"ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন শুনে ঠাকুর কেঁদেছিলেন। তাই ত তিনি যাকে ভালবাসতেন তাকে বলতেন, 'আমার পাটা কামড়াচ্ছে, হাত বুলিয়ে দাও, বুকে হাত বুলিয়ে দাও, জামার বোতামটা দিয়ে দাও।' তাঁর কিছু দরকাব নেই, তবু অন্যের মঙ্গলের জন্য ঐ রকম বলতেন। যেখানে যার মধ্যে ব্যাকুলতা দেখতেন, সেখানে তার কাছে দৌড়ে যেতেন। অসুখের সময় গামছায় থুতু ফেলতেন। কাউকে বলতেন, 'গামছাটা কেচে নিয়ে এস।' একজনকে বললেন, 'তুমি নিজে গিয়ে ঐ জিনিষগুলি কিনে আনবে।' এই রকম করে সেবা করিয়ে নিতেন। যাকে বলছেন সেত তা জানে না। তিনি নিজেকে নিজেই বুঝেছিলেন। এই রকম সেবা করলে অনেক দিন মনে থাকবে; পরে বুঝতে পারবে কাকে সেবা করেছি। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তাঁর কথা মনে করলে চোখে জল আসে। তাঁকে স্মরণ করলে সমস্ত শাস্ত্রের মানে বোঝা যায়। (একটি ভক্তের প্রতি) আজ তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি শুক্র, ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি মণ্ডল, কালপুরুষ। কি বিরাট কাণ্ড! 'ব্রহ্মা বিষ্ণুরও ফলার।'* শাস্ত্রে বলে দেবতারা কল্প পর্য্যন্ত অমর। কলেজে পড়বার সময় Astronomy (গণিত জ্যোতিষ) পডতাম। ঋষি ও অবতার পুরুষরা জন্মগ্রহণ করে এই আকাশ নক্ষত্রাদি দেখেছেন। তাই ঐগুলি দেখি।"

ভোর রাত্রে শ্রীম একাকী ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে জ্যোৎস্নাময় আকাশ দেখিতেছিলেন সেই সময় ভক্তটিকে ধ্রুবতারা ইত্যাদি দেখাইয়াছিলেন।

* এক ব্রাহ্মণ ফলার করিয়া প্রকাণ্ড উদব লইয়া যাইতে যাইতে জলে একটা মড়া ভাসিতেছে দেখিলেন। তাহাবও পেট ফোলা দেখিয়া বলিলেন, 'দাদারও দেখছি ফলাব একই অবস্থা' তাই 'ব্রহ্মা বিষ্ণুব ফলাব' মানে তাঁহাবাও তাঁহার অন্ত পান না।

শ্রবণ মনন

শ্রীম—(ভক্তের প্রতি) কি এক জায়গায় বসে বসে চিন্তা করবে। কি চিন্তা কর'ব তার ঠিক নেই। তাঁর কথা শোনাই ধ্যান। এইসব শুনলে ও চিন্তা করলে অনন্তকে ধ্যান করা হয়।

ভক্ত—বইতে এইসব থাকলেও মানুষ ভুলে যায়। ভগবান যখন বল্লেন, তখন সেগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়।

শ্রীম—আহা! ব্রাহ্ম সমাজে এমন বেদ পাঠ হয়, লোকে তা শুনতে যায় না। যেখানে বক্তৃতা হচ্ছে সেইখানে যাবে। তাদের যদি জিজ্ঞাসা কর কে কেমন বললে? তবে বলে, অমুক বেশ বলেছে। আর কিছু বলতে পারে না। কিন্তু ঠাকুরের একটি একটি কথা হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে।

ধ্যানের অধিকারী সকলে নয়

বেলা প্রায় দুইটা। দক্ষিণেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী যোগীনবাবু আসিয়াছেন। শ্রীম ছাদে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—মাঠাকরুন বলতেন, "বেশী ধ্যান করতে নেই। যা রয় সয় তাই করবে।" বেশী বাড়াবাড়ি করতে নেই। হাঁড়িতে বেশী আল দিলে হাঁড়ি ফেটে যায়। যাদের শরীর সুস্থ সবল, তারা করতে পারে। বেশী উপবাস বা অনিদ্রা হলেই মাথা খারাপ হয়।

"ঠাকুর সমাধির পর বলতেন, 'তামাক খাব, জল খাব।' তা না হলে সমাধিতে আবার মগ্ন হবার সম্ভাবনা। প্রাণ বুঝি থাকবে না। সকলে ধ্যানের অধিকারী নয়। তাই বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'মধ্য পন্থাই ভাল।' তিনি খুব কঠোরতা করেছিলেন কিনা তাই তাঁর অভিজ্ঞতা শিষ্যদের বলেছিলেন।"

সন্ধ্যার পর ধ্যানান্তে শ্রীম মঠের দুইজন সাধুর সহিত গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। সেই অনন্তের কথা। কথাবার্ত্তার পর ডাক্তার বক্সির মোটরে রাস দেখিতে বাহির হইলেন। দরজিপাড়ায় ও মদনমোহনের রাস দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে ফিরিলেন ও দোতলার ঘরে বসিলেন। অনেকেই তথায় উপস্থিত আছেন। ডাক্তারবাবু ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতেছেন। ঐ প্রসঙ্গে শ্রীম বলিলেন,—"যারা জিতেন্দ্রিয় তারাই এসব

লীলা শোনবার অধিকারী"। পাঠান্তে ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৫ ॥

১২ই নবেম্বর, বুধবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

ভক্ত হবি ত বোকা হবি কেন ?

সকালে শ্রীম চারতলার ঘরে কয়েকজন ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

শ্রীম—(জনৈক ভক্তের প্রতি) কেমন তোমাকে গোয়ালা গ্রাহ্য করছিল না। তোমার সঙ্গে লোক দিলাম, তারা বলে দিলে তবে শুনলে। ঠাকুব একজনকে এক পয়সার পান আনবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। পয়সায় এগারটা পান পাওয়া যায়। সে এনেছে সাতটা। ঠাকুর তাকে বললেন, "যা পান ফিরিয়ে দিয়ে আয়। ভক্ত হবি ত বোকা হবি কেন? বেশী হলে দান করবি। তা বলে ঠকে আসতে হবে!" ভেতরে আঁট নেই, রোক নেই, সব আলগা, এরকম লোকেব উপর বড় কাজের ভার দেওয়া যায় না। ঠাকুব একজনকে ডেকে বললেন, "দেখ অমুককে ডেকে দিও।" আবার আব একজনকে তাকেই ডেকে দিতে বললেন। দ্বিতীয় লোকটি ঠাকুরকে তখন বললে, "কেন, এইত আপনি ওকে বললেন ?" ঠাকুর তাতে বললেন, "তুমি বুঝি মনে করেছ ও ডেকে দেবে ? ও এসে বলবে, ভুলে গেছি। চারদিকে মন ছড়িয়ে রয়েছে।" ভেতরে রোক না থাকলে কাম ক্রোধ জয় করতে পারে না। ভেতরে পুরুষকার নেই, সত্যের আঁট নেই, চিঁড়ের ফলারের মত ভ্যাদভেদে অমন হলে হয় না। ঠাকুর একদিন শোভাবাজারে বলেছিলেন, "সত্য ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়।" (ভক্তটির প্রতি) গোপালকে বল সত্য ধরে থাকলে বার আনা হয়ে গেল। শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি হবে? যে বলে আমার সব হয়ে গেছে, সেকি কিছু শিখতে পারে? উঁচু ঢিপিতে জল জমে কি? শিষ্য হয়ে থাকা ভাল, না গুরু হওয়া ভাল? "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" Ideal man (আদর্শ পুরুষ) চিরকাল শিষ্য। "সখী গো সখী, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" এই দেখছ না,

সামনে অনন্ত কাণ্ড, অনন্ত লীলা চলেছে ? দন্তস্ফুট করবার জো নেই।

ভক্তটি দাঁড়াইয়াছিলেন, এই সব কথা শুনিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

শ্রীম—হাঁ, দাঁড়িপাল্লার যে দিকটায় মাল থাকে সেই দিকটা নীচু হয়ে যায়, সেই দিকটা ভারী হয়। তুমি অনেক শিখেছ।

ভক্ত—কই কিছুই হচ্ছে না।

॥ ৩৬ ॥

১৩ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সকালে শ্রীম তাঁহার নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। কয়েকটি ভক্ত তথায় উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—(জনৈক ভক্তের প্রতি) এক ঠোঙ্গা জিলিপি আছে। কাকগুলিকে খাওয়াও। এসব সাধুদের কাজ।

ধ্যান যোগ

বেলা প্রায় একটা। শ্রীম ছাদে আসিয়া পায়চারি করিতে করিতে একটি ভক্তকে বলিলেন, "আহা ! রোগা হয়ে গেছ। খুব ঘুমুবে, ওতে শরীর ভাল থাকে। ধ্যান জপ করতে পারছ না বলে মন খারাপ করবে না। সর্ব্বদাই আত্মচিন্তা নিয়ে থাকবে। 'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' (গীতা ৬।২৫)। যারা সংসার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তারা অনেকটা এগিয়ে আছে।"

নিরালম্ব উপনিষদ্

এইবার গদাধরকে নিরালম্ব উপনিষদ্ পড়াইতেছেন। ইহাতে ব্রহ্মা সমস্ত জীবের অরিষ্ট শান্তির জন্য ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর জীব প্রকৃতিই বা কি, কর্ম্ম অকর্ম্ম, স্বর্গ নরক, জ্ঞান অজ্ঞান কি, বন্ধ ও মোক্ষের লক্ষণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছেন। যেমন, নিরুপাধিক, অনাদি, অনন্ত, শিব, শান্ত, নির্গুণ অনির্ব্বাচ্য চৈতন্যই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই নিজ প্রকৃতিতে আশ্রয় করিয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার তাহাতে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক

ব্রহ্মাদির ও বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্তৃরূপে যিনি আছেন তিনিই ঈশ্বর পদবাচ্য। সৎসঙ্গই—স্বর্গ, অসৎসঙ্গই—নরক, ইত্যাদি।

রাসদর্শন

সন্ধ্যার সময় শ্রীম ডাক্তারবাবুর গাড়ীতে চিংড়িহাটায় রাস দেখিতে গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, কোথাও দোকান, কোথাও বায়োস্কোপ, কোথাও গান হইতেছে। সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া আনন্দ করিতেছে। ম্যানেজার কিশোরীবাবু শ্রীমকে প্রণাম করিয়া উপরে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। গৃহস্বামী আশুবাবু প্রমুখ তিন ভ্রাতা আসিয়া প্রণাম করিলেন।

কিশোরী—আমি দূর থেকে আপনাকে দেখে ছুটে গেলাম। আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনার পায়ের ধূলো পড়ল।

শ্রীম—যা করে রেখেছেন, তাইতে সাধু মহাত্মারা আপনা আপনি আসছেন। "ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী, জটাজুটধারী, গিরি গণেশ আমার শুভকারী।"

কিশোরীবাবু শ্রীমকে সঙ্গে করিয়া যেখানে যাহা দ্রষ্টব্য দেখাইতে লাগিলেন। নৌকাবিহার, দেবীগোষ্ঠ, কৃষ্ণকালী, কালীয়-দমন, ননীচুরি, গোদোহন, নন্দোৎসব, ব্রজগোপীদের যমুনা পার হওয়া, কংসের কারাগারে কৃষ্ণ, বসুদেব ও দেবকী, গর্গমুনি প্রভৃতি মূর্ত্তি করিয়া দেখান হইয়াছে। যেখানে যাত্রা হইবে সেখানে স্তম্ভে স্তম্ভে বহু দেবদেবীব পট টাঙান আছে তারপর নানা রঙের আলোকে আলোকিত রাসমঞ্চ। ঊর্দ্ধে দেবগণ পরিবৃত রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি।

শ্রীম—(জনৈক ভক্তের প্রতি) আসল নকল এক।

ভক্ত—এ সব যিনি করেছেন তিনি মহৎ লোক।

অতঃপর শ্রীম তাঁহাদের নিত্যপূজার মন্দির দর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ

ছোট জিতেন—গীতা এটি বেশ অল্প কথায় বলেছেন। গীতা পড়লে মনে হয়, চণ্ডাল হোক অথবা শূদ্র হোক ভক্তি থাকলেই হল।

শ্রীম—আমি সেইজন্য চিংড়িহাটায় রাস দেখে বলেছিলাম—এ সব যিনি করেছেন তিনি ব্রাহ্মণ।

স্থখলাল—ওঁদের পিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন। ভেখ নিয়ে আট বছর বাইরে থেকে সাধন ভজন করতেন। ফিরে এসে রাধাকান্ত প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। আমরা দেখেছি রাস্তায় সংকীর্ত্তনের দল নিয়ে বেরুতেন।

শ্রীম—ওঃ, সেইজন্য এমন সব ঠাকুরদের মূর্ত্তি স্থাপন করেছেন। সদ্‌বংশ। তিনটি নাতি; তাদের মধ্যে একজন সাধুদের পায়ের ধূলো নিলে।

সংহার কালী

স্থখলাল—তাঁদের মাছের ব্যবসায় আছে। সেখান থেকে কিছু দূরে কসাইখানা। সে জায়গাটা ভাল নয়।

শ্রীম—ঈশ্বরই স্থষ্টি, স্থিতি, সংহার করছেন। সেখানে সংহারমূর্ত্তিতে কালী লীলা করছেন। তবে তাদের টাকা হয়েছে, খাওয়া পরার অভাব নেই, এখন মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলেই হয়।'

যোগীর কর্ম্ম

"সাধারণ লোকের পক্ষে 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। (গীতা ৩৮)—কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল।

বড় জিতেন—ভেতরে যে কিছু নেই।

শ্রীম—যোগীদের বাহ্য জগতের ওপর নজর নেই। তাঁদের কত উঁচু দৃষ্টি! নির্লিপ্ত হয়ে কাজ কর্ম্ম করছেন। জানেন শরীর থাকতে একেবারে কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব। "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" (গীতা ১৮।১১)। প্রকৃতিতে কর্ম্মগুলি আছে বলে তাঁরা করেন। তাঁরা এমন এক বস্তু লাভ করেছেন যে অপর কিছু লাভকে বড় বেশী মনে করেন না। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (গীতা ৬।২২)। (গদাধরের প্রতি) গীতা পড় না? ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, "গীতা পড়বে। গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার।"

ডাক্তার—কাশীপুরের রতনবাবুদের বাড়ীতে রাস দেখলাম।

শ্রীম—বল বল কি দেখলে।

ডাক্তার—রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্যে বাস, সূর্পণখার নাসিকা ছেদন, ছদ্মবেশী রাবণের সীতা হরণ, কৈলাস থেকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তি—এই সব মূর্ত্তি রয়েছে। এ রাস কাল পর্য্যন্ত থাকবে।

শ্রীম—আমার সাধ, যেখানে যেখানে রাস হচ্ছে, মনোরথে (মোটরে) করে দেখি। (ডাক্তারের প্রতি) মঠে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন ?

ডাক্তার—কাল মঠে গিয়েছিলাম। সুধীর মহারাজ আপনাকে মঠে যেতে বলেছেন।

ছোট জিতেন—টালিগঞ্জে "মুক্তা চুরি" দেখেছি।

বড় জিতেন—"মুক্তাচুরি"টা কি ?

শ্রীম—মুক্তার গহনা পরতে মেয়েদের সাধ হয়। (সকলের হাস্য)।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৮ ॥

১৭ই নভেম্বর, সোমবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

উৎসাহ চাই

শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। তিনটি ভক্ত প্রণাম করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "ব্রাহ্ম সমাজে (নববিধানে) কেশবচন্দ্রের উৎসব দেখে এস।"

তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাঁদের নিজেদের মধ্যে হচ্ছে।"

শ্রীম—তোমরা জান না। চেষ্টা করতে হয়। কম বয়সে নিরুৎসাহ হলে কি মহৎ কাজ হয় ?

দুইটি ভক্ত আবার সেখানে গেলেন এবং দেখিয়া আসিয়া তাহার গল্প করিলেন।

বৈকাল পাঁচটা। শ্রীম নিজের ঘরে শুইয়াছিলেন। ভবানীপুর হইতে ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) আসিয়াছেন দেখিয়াই উঠিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

কমলেশ্বরানন্দের সহিত শাস্ত্র বিচার

ললিত মহারাজ—আজ আপনাকে কিছু শাস্ত্র হতে শোনাব। আপনাকে শোনালে মনে আনন্দ হয়।

তিনি স্তব পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন—

'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।' ইত্যাদি। (গুরুগীতা)
'নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং, ভক্তানুকম্পা-ধৃত-বিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।'
(স্বামী অভেদানন্দকৃত রামকৃষ্ণ স্তোত্র)
'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' (গুরুগীতা)

আবার জগদ্ধাত্রীর স্তব বলিতেছেন। এই সময় ভবানীপুর হইতে মন্মথ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্মথবাবু—আপনাকে দর্শন করতে অনেক দিন থেকে ইচ্ছা। কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় এতদিন আসতে পারি নি। যাঁরা ঠাকুরকে ভালবাসেন, তাঁরা ভক্ত, তাঁরাই আমার আত্মীয়। আপনি ঠাকুরের হাতে গড়া। আমি মহা পাপী, তাই অনধিকারী। ছ-বছর আগে প্রথম 'কথামৃত' পড়ি এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে গড়াগড়ি দেই। তাঁর পায়ের ধুলো সেখানে সর্ব্বত্র রয়েছে।

শ্রীম—হাঁ, সেখানে আবার একদিন যাওয়া উচিত। কেবল বললে হবে না। সেখানে সমস্ত দিন থাকতে হয়। তুলোর পাহাড়ে একটু আগুন দিলে সবটা পুড়ে যায়। সিঁদুরেপটিতে বিজয় গোস্বামীকে ঠাকুর বললেন, "তাঁর নাম করেছি, আবার পাপ!" তাহলে তাঁর নামের মাহাত্ম্য আর থাকে না। কটি ছেলেপুলে?

মন্মথবাবু—সাতটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। অনেকগুলি মানুষ হয় নি। চারটি বিবাহিত। রাণীগঞ্জে হেডমাষ্টারি করতাম। স্কুলের একটি ছেলে পরীক্ষা দিতে পায় নি বলে রাস্তায় আমাকে ছোরা মারে। তার মকদ্দমা হয়। তাতে তাকে ক্ষমা করি।

শ্রীম—বেশ করেছেন।

মন্মথবাবু—পরে আশুবাবু আর একটি চাকরি যোগাড় করে দেন। আগে খুব বিচার করতাম। 'কথামৃত' পড়ে তর্ক বুদ্ধি দূর হয়ে গেছে। আপনার ত হয়েছেই।

শ্রীম—হাঁ, তাঁর (ঠাকুরের) blow (ঘা) খেয়ে তবে গেছে। তিনি বলেছিলেন, "বল আর বিচার করবে না। ওতে খারাপ হয়।" তারপর নিজে নিজেই বললেন, "মা, তারই বা দোষ কি? একবার ত বিচার করতে হয়।" নিরাকারই সাকার হন, একথা মানুষ এক ছটাক বুদ্ধিতে কি করে বুঝবে?

ললিত মঃ—সদসদ্ বিচাব করতে হয়।

শ্রীম—হাঁ, পাণ্ডিত্য বিচার নয়।

ললিত মঃ—কেন, শঙ্করাচার্য্য ত শাস্ত্রযুক্তি দিয়ে তাঁর মতবাদ স্থাপন করেছেন।

শ্রীম—স্বামীজী বিচারকে বড স্থান দেন নি। বলেছেন, mere intellectual somersault (খালি বুদ্ধিব ডিগবাজি)।

ললিত মঃ—গায়ের জোবে।

শ্রীম—সকলের ত এক মত নয়।

ললিত মঃ—শাস্ত্র, যুক্তি, বিচার, এ সবের স্থান আছে।

শ্রীম—শেষে এই দাঁড়াবে যে ও সব দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না।

এই সময় অন্য কথা উঠায় ললিত মহারাজ বলিতেছেন, 'বেশ ভগবৎ কথা হচ্ছিল, এর মাঝে বিষয় কথা কেন?"

মন্মথবাবু—যা কিছু বলছেন সবই ভগবানের কথা।

ললিত মঃ—কি মাষ্টার মশায়, এই কি ঠিক?

শ্রীম—বিদ্যা, অবিদ্যা, দুইই আছে। বিদ্যা তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়।

ললিত মঃ—তবে একটু তফাতে রাখে।

শ্রীম—হাঁ। (সকলের হাস্য) কিন্তু অসত্য বোধ করিয়ে দেয়। মানুষ তখন নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আসক্তি চলে যায়। অকর্ত্তা বলে বোধ হয়, প্রকৃতিতে আছে বলে করছি, এই মনে হয়।

ললিত মঃ—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। (গীতা ৩।২৭)।

ডাক্তার—যিনি ভগবান দর্শন করেছেন তিনি ত নির্লিপ্ত?

শ্রীম—'ইতি মাং যোঽভিজানাতি'। (গীতা, ৪।১৪) আমাকে 'এইরূপে যে জানে সেই নির্লিপ্ত।

এই সময় অনেক ভক্ত আসিলেন।

বড় জিতেন—আপনাদের কি কথা হচ্ছে?

শ্রীম—(হাসিতে হাসিতে) 'তোমার শ্যামের কথা।'

মন্মথবাবু—আপনার 'কথামৃত পড়ে জীবনে কি যে শান্তিলাভ করেছি তা মুখে বলতে পারি না।

শ্রীম—তা হবে। ভগবানের শ্রীমুখের কথা। ঠাকুর একদিন হঠাৎ বললেন, "অবতারের মুখ দিয়ে তিনি নিজে কথা কন।"

মন্মথবাবু—ঠাকুর বহুরূপী ছিলেন। তাঁর ভাব নিয়ে অন্যে কে কি লিখেছে, পড়বার, জানবার খুবই ইচ্ছা হয়।

শ্রীম—শরৎ মহারাজ ঠাকুরের "লীলা প্রসঙ্গ" লিখেছেন। রামবাবু তাঁর "জীবনী" ও অক্ষয়বাবু "পুঁথি" লিখেছেন।

মন্মথবাবু—"কথামৃতে"র মতন নয়।

শ্রীম—সে কি। সেগুলিও ভাল হয়েছে। আমরা "কথামৃতে' তাঁর চিত্র দেবার চেষ্টা করেছি।

শ্রীম—(বড় জিতেনের প্রতি)—ইনি থাকেন ভবানীপুরে।

মন্মথবাবু—'কথামৃতে' পড়লাম, আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন—একটি ব্রাহ্মণ জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, ইত্যাদি।

শ্রীম—হাঁ, সেই গল্প ঠাকুরকে বলেছিলাম।

মন্মথবাবু—আসবার সময় মনে করলাম, শুধু হাতে সাধু দর্শন করতে যাব?

শ্রীম—ব্রাহ্ম সমাজে গান করে—

"ভক্তিতে গেঁথেছি হার, দিব উপহার,
প্রেমের চন্দন ফোঁটা তাহার উপর।"

বাবুরাম মহারাজের ভালবাসা

ললিত মঃ—বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "সাধুর কাছে যেতে হলে তাঁর নাম করে যেতে হয়।" আমরা আগে সংসারীদের নিন্দা করতাম। তাতে বাবুরাম মহারাজ আমাদের শাসন করে বলতেন, "বেটারা ভারি সাধু হয়েছে!" "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণরে।" যারা ঠাকুরকে

ভজনা করে তারাই খাঁটি লোক। ঠাকুরের প্রসাদ সকলকে দেওয়া তাঁর বাই ছিল।

শ্রীম—হাঁ।

ললিত মঃ—একদিন একদল লোক নৌকা করে মঠে এসেছে। টেরি কাটা; শিস দিতে দিতে যাচ্ছে। বাবুরাম মহারাজ তাদের ডেকে প্রসাদ দিলেন। একজন মঠের সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের প্রসাদ দেওয়া কেন? বাবুরাম মহারাজ তাকে বললেন, "তুই কি বুঝবি? যখন এরা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত পাবে তখন তাদের এইসব কথা মনে পডবে। প্রসাদ খাওয়ায় তাদের একটু সংস্কার হয়ে রইল।" এক জায়গায় (রাঢ়িখালে) পালকি করে গেছেন। আসবার সময় লোকে তাঁর জন্য কাঁদতে লাগল। ছাড়ে না। তাঁর ভালবাসা এমনি ছিল! আমি আজ তাঁর কথা ভাবছিলাম; তাঁর একখানা চিঠি পড়ছিলাম। লিখেছেন, "নাম বদলালে ও গেরুয়া পরলেই কি সাধু হয়ে গেল? মহামায়ার হাত থেকে এড়ান সহজ নয়।" আমি মঠে গেলে ঠাকুরের প্রসাদী পায়েস খাওয়াতেন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কথা বলতেন। বলতেন, "ওরে, আমি চলে গেলে গালাগাল দেওয়ার লোক পাবিনে।"

জনৈক ভক্ত আবার বৈষয়িক প্রসঙ্গ তুলিতে যাইতেছিলেন।

শ্রীম—থাক্ থাক্, ওতে রস ভঙ্গ হয়।

ললিত মঃ—যেখানে তাঁর কথা হয় সেখানে সকল তীর্থের সমাগমহয়।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গঃ॥

(প্রপন্ন গীতা, ৩৮)

"ভাগবতে আছে ভগবৎবিষয়ের বক্তা, শ্রোতা ও জিজ্ঞাসু তিন জনেই পবিত্র হয়ে যায়।* তিনি বাক্য মনের অতীত। তাঁর স্তব, স্তুতি, নিজের মন বাক্যশুদ্ধির জন্য। তাঁর ভুবনমোহন রূপ কার মনকে না আকর্ষণ করে।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী

শ্রীম—ঠাকুরের শরীর যাবার পর তীর্থদর্শনে অযোধ্যায় গেছি। এক পরমহংস সাধুকে দর্শন করলাম। তিনি বললেন, "আর কি আছে? তাঁর

* শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১।১৬

নাম গুণগান, ভক্ত দর্শন করা, এই সব উপায়।" ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে খাবার কিছু দিলে তিনি ছেলেমানুষের মত লুকাতে লাগলেন। ঠিক বালকের অবস্থা।

ললিত মঃ—"কথামৃত" পাঠের সময় বাবুরাম মহারাজ বলতেন, "যা ভক্তদের দেখে আয়।"

শ্রীম—(মন্মথবাবুর প্রতি) ভগবানের জন্য যারা তৃষিত, ব্যাকুল, তাদের ঈশ্বর সাধু পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাছেই সাধু দর্শন হল।

রাত্রি সাড়ে আটটা। জনৈক ভক্তকে শ্রীম বলিলেন, "আলোটা ধর, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান দর্শন করি।" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৯ ॥

২০শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

সকালে শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। গদাধর প্রণাম করিলে শ্রীম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নববিধানে যাবে বুঝি?" কয়েকটি ভক্ত তথায় উৎসব দেখিতে গেলেন।

কেশব সেন

গদাধর না যাওয়ায় শ্রীম তাহাকে বলিতেছেন, "তুমি বোঝ না ঠাকুর কেশবকে কত ভালবাসতেন। আপার সার্কুলার রোডে কমল কুটীরে ঠাকুর কেশববাবুকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন কেশবের শরীর অসুস্থ। সিঁড়িতে উঠতেই ঠাকুর ভাবে বিভোর হলেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে কেশব দেহ-রক্ষা করেন। ঠাকুর সংবাদ পেয়ে তিন দিন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন। বলতেন, 'আমার মাথা যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।' কেশবের ছেলেকে নিয়ে কান্না; তাঁর কথা মনে পড়েছে কিনা। সেই কেশববাবু ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেছেন। সে স্থান দর্শন করলে মন পবিত্র হয়ে যায়।"

কিছুক্ষণ পরে ভক্ত কয়টি বক্তৃতাদি শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীম—(রজনীর প্রতি) কি দেখলে বল?

শ্রীম—(বর্ণনা শুনিয়া গদাধরের প্রতি) শুনলে আনন্দ হয়। তাই যারা দক্ষিণেশ্বর ও মঠে যায় তাদের থেকে শুনি। আমার ভাগ্যে নেই, যেতে পারলাম না।

রাজযোগ ও আচার

শ্রীম—(জনৈক ভক্তের প্রতি) কৃপা করে চাদরে নাক পুঁছবেন না। শাস্ত্রে বলেছে, অন্তরে বাইরে শুচি থাকতে হয়। সাহেবরা কাপড চোপড় ঘন ঘন বদলাতে পারে না; ওদের বরফের দেশ কিনা। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা মুসলমানের হাতের ছোঁয়া খায়। অবতার এসে বলেন, "ভক্তের জাত নেই।" রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিলেন। শবরীর এঁটো ফল গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥" ৯।৩০

—অতি দুষ্ট লোকেও যদি আমাকে একান্তভাবে ভজনা করে, তা হলেও তাকে সৎ বলে মনে করতে হবে, কারণ সে ঠিকই বুঝেছে। অবতার আরও বলেছেন, "ভগবান দর্শনই জীবনের লক্ষ্য।" "যে সমন্বয় করেছে সেই ধন্য।" "ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা চাই।"

গোপাল—কেশববাবু বিবাহ করেছিলেন? ছেলেপিলে আছে?

শ্রীম—হাঁ, তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঠাকুর কেঁদেছিলেন। ভগবান তাদের সংসারে রাখেন লোকশিক্ষার জন্য। জেনে শুনে যদি কেউ সংসারে প্রবেশ করে তা হলে আগুনে ঝাঁপ দেবে। সংসার জ্বলন্ত অনল।

গোপাল—এত কম বয়সে কেন এঁদের শরীর যায়?

শ্রীম—যুগধর্ম্ম। তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব পঁচাশী বৎসর জীবিত ছিলেন। চৈতন্যদেব আটচল্লিশ বৎসর, ক্রাইষ্ট তেত্রিশ বৎসর কাল ছিলেন। (গদাধরের প্রতি) পতঞ্জলি ঋষি বলেছেন, "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগের কথা। নিয়মের মধ্যে শুচি থাকতে বলেছেন—অন্তর ও বাহ্য শৌচ।" (যোগসূত্র, ২।২৯-৩১)।

(ছাদে গিয়া তিনটি ভক্তের প্রতি) "লেখ—প্রথম, নাক ঝেড়ে কাপড়ে পুঁছবে না। দ্বিতীয়, প্রসাদাদির হাত যেখানে সেখানে দেবে না। তৃতীয়, ঘুমন্ত লোককে ওঠাবে না। চতুর্থ, কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখবে। পঞ্চম,

ভিজে গামছা পরে পায়খানা যাবে। ষষ্ঠ, যে জিনিষ যার কাছ থেকে নেবে, কাজ শেষ হলেই সেটি তাকে ফিরিয়ে দেবে।”

সমগ্র পৃথিবী তীর্থ

বৈকালে পাঁচটার সময় শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী ও আর কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত আছেন। ব্রহ্মচারী ৺ কেদার-বদরী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমর আগ্রহে যেখানে যাহা দর্শন হইয়াছে তৎসমস্ত বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম—যদি ঠাকুর এঁকে দেখতেন ত সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ঠাকুরের অতি অল্পেই ঈশ্বরের ভাব উদ্দীপন হত। অবতার হচ্ছেন শুক্‌ন দিয়াশলাই। মথুরবাবু জোর করে ঠাকুরকে তীর্থে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা না হলে তাঁর এইখানে বসেই হয়ে যেত। অবতার ও ঋষিরা এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন। সেই পঞ্চভূত এখনও বর্ত্তমান কাজেই তাঁদের স্পর্শে সমস্ত তীর্থ হয়ে রয়েছে। একবার তীর্থ ভ্রমণ করে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে হয়।

লীলা সত্য

এইবার ব্রহ্মচারীকে জলখাবার খাওয়াইলেন। সন্ধ্যা হইল। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। তেতলায় তাঁহার পৌত্র বসিয়া হারমোনিয়ম বাজনা বাজাইতেছে। ধ্যানান্তে শ্রীম সেই শব্দ শুনিয়া বলিতেছেন, “বাঃ কি চমৎকার! ঠাকুর বলেছিলেন, ‘মাই সব হয়ে রয়েছেন।’ একদিন বললেন, ‘লীলাও সত্য।’ লীলা রেখেছেন আস্বাদ করবার জন্য। তিনিই সপ্তস্বর (সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি) হয়ে রয়েছেন। এক জায়গায় আছে, শিব গান গাইছেন, গণেশ বাজনা বাজাচ্ছেন। যার জন্মের আগের খবর নেই, মৃত্যুর পরেরও খবর নেই, সেই লোক কেমন বাজাচ্ছে! ঠাকুর বলতেন, ‘মন নাবে না।’ সর্ব্বদাই নি-তে রয়েছে।”

॥ ৪০ ॥

৪ঠা ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

ব্রহ্মানন্দই শ্রেষ্ঠ

সকালে শ্রীম চারতলায় গদাধরকে লইয়া 'কথামৃতে'র প্রুফ দেখিতেছেন। আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।

শ্রীম—(গদাধরের প্রতি) হুঁ দাও, তবে আনন্দ হয়। এই আনন্দই শরীরটা চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সুখ দুঃখের শরীর। এর অতীত হচ্ছে ভগবানের আনন্দ। এই আনন্দ অনেক রকমের যেমন ভজনানন্দ, ধ্যানানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভ কবলে সুখ-দুঃখ থাকে না। "সুখদুখ সমান হল, আনন্দসাগর উথলে।"

"হাজার বিচাব কব, নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা না করলে শক্তির এলাকা ছাডিয়ে যেতে পারবে না। আচ্ছা, সংসার যদি কিছুই নয়, তবে ঠাকুর ভক্তের ছেলেকে নিয়ে কাঁদলেন কেন? পুত্র-শোকসন্তপ্ত একজন ভক্তকে দেখে কাঁদলেন। মা ঠাকরুনও কেঁদেছিলেন। অধরবাবুর যখন শরীর যায় তখন ঠাকুর জগদম্বার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'মা, তুই আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেইত এই অবস্থা' (অর্থাৎ, ভক্তের জন্য কাঁদতে হচ্ছে)।"

তীর্থদর্শন

গোপাল—"আমি পুরী যাব?"

শ্রীম—বেশ ত, তীর্থদর্শন কর। চৈতন্যদেব তীর্থভ্রমণ করেছিলেন। স্বামীজী অনেক তীর্থে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। আমারও ইচ্ছা করে তীর্থ দর্শন করি।

গুরুনিন্দা

বৈকালে পাঁচটার পর শ্রীম ভবানীপুরের মন্মথবাবুর সহিত ছাদে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন।

মন্মথ—সেদিন আপনার কথা শুনে পরদিন উদ্বোধনে গিয়েছিলাম।

দুর্য্যোগ বলে মঠে যেতে পারিনি। আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাব।

শ্রীম—(গদাধরের দিকে তাকাইয়া) এ আপনাকে সাহায্য করবে। সেখানে থাকে।

মন্মথ—আমার এক বন্ধু বড় গুরুনিন্দা করে। ঠাকুরের নামে বড় চটা। একদিন তাঁর নিন্দা শুনে তিন দিন উপবাস করেছিলাম।

শ্রীম—(হাসিতে হাসিতে) আপনার ওটি আছে? যে গুরুনিন্দা করে, হয় তার গলা কেটে ফেলা, না হয় সেখান থেকে চলে যাওয়া।

মন্মথ—স্কুলেও কেউ কেউ বিদ্রূপ করে।

শ্রীম—ওদের দোষ কি? তারা কি কোন মহাপুরুষের ভালবাসা পেয়েছে? পূর্ব্বজন্মের কি কোন সংস্কার আছে? ঠাকুর বলতেন, "বাহাদুরী নেই। বাঁশীকে যে সুরে বেঁধেছে, সেই সুরে বাজছে। ওরা ত কেবল পরিবার নিয়ে বাস করে।"

দেবেন মজুমদার ও গিরিশ ঘোষ

ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার আসিয়া তাঁহার সম্পাদিত একখানি গীতা শ্রীমকে উপহার দিলেন।

প্রাণেশকুমার—এই গীতার জন্য অনেক খেটেছি।

শ্রীম—আপনি সাধন করেছেন। এই গীতার কথা শেষ পর্য্যন্ত আপনার মনে উঠবে।

প্রাণেশ—দেবেন মজুমদার মহাশয়ের জীবনী লিখতে দিয়েছে। তিনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন সেখানেই প্রসাদ পান। তার পর তাঁর জ্বর হয়। সেই জন্য আট মাস ঠাকুরের কাছে যান নি। পরে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান।

শ্রীম—গিরিশবাবু ঠাকুরের সমাধি দেখে বলেছিলেন, "ঢং হচ্ছে।" তারপর আট বছর ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। পরে ঠাকুর যখন "চৈতন্য লীলা" অভিনয় দেখতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তার দুমাস পরে বলরামবাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বরাবর যেতে লাগলেন।

মন্মথ—গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বলতেন, "আমার ছেলে।"

শ্রীম—পান করতেন কি না।

স্বামীজীর তপস্যা লোকশিক্ষার জন্য

মন্মথ—স্বামীজী যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে তপস্যাদি করতেন, রামবাবু বলতেন, "তাকে (ঠাকুরকে) দর্শন করা গেছে, আবার তপস্যা কি?"

শ্রীম—তাঁদের তপস্যা লোকশিক্ষার জন্য। তা না হলে সখের সাধনায় কি ভগবান লাভ হয়? গরম ভাত চাই। খেতে দেরী হলে লাথি মেরে ভাত ফেলে দেয়। এ সব করলে কি চলে? স্বামীজী কত কষ্ট সহ্য করেছেন।

মন্মথ—আপনি যখন নবতে থাকতেন, আপনার কষ্ট হত না?

শ্রীম—না। সে সময় হত না।

আত্মারাম

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম বারান্দায় ধ্যান করিতেছেন। অনেক ভক্তেরাও আসিয়াছেন। ধ্যানান্তে শ্রীম গান গাহিতেছেন—

"কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম, বলব হরিনাম, নয়নে বাহিবে প্রেম-অশ্রুধার।"

গানের পর বলিতেছেন, "ওদের (ব্রহ্মচারীদের) দেখলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। একজন সাধুকে দেখেছিলাম—আত্মারাম। কত লোকে কত জিনিষপত্র দিচ্ছে, তার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে 'শ্রীধর', 'শ্রীধর' উচ্চারণ করতেন। তিনিই লোকের মধ্যে সব থাক থাক করে রেখেছেন।" প্রাণেশ কুমার এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীম আবার গান করিতেছেন—

"প্রেম-বৃন্দাবনে গিয়ে মাধুকরী কবে খাব।" ইত্যাদি

রূপ ও জীব গোস্বামী। জীবে দয়া

শ্রীম—(জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রতি) যাকে ভয় কর সেই মাধুকরী। হক কথা বলতে হবে। রূপ গোস্বামীর ভাইপো জীব গোস্বামী। এঁরা বৃন্দাবনে থাকতেন। জীব গোস্বামীর কাছে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হয়। জীব সেই পণ্ডিতের কাছ থেকে জয়পত্র লিখে নিয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁর ঐরূপ ব্যবহার দেখে বললেন, "সাধু হয়ে এত অহঙ্কার।" তার সঙ্গে দুমাস কথা বন্ধ করে রইলেন। জীব গোস্বামী মনের দুঃখে আছেন।

একদিন রূপ গোস্বামী পাঠ করছেন, "জীবে দয়া করিবে।" যারা শুনছিলেন, তাঁরা বললেন, "প্রভু, জীবকে দয়া করছেন না কেন?" তখন তিনি জীব গোস্বামীকে গ্রহণ করেন।

"কোনও বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি দেখলে ঠাকুর বড় ধমক দিতেন।"

মন্মথ—এসব শুনলে ভয় করে।

শ্রীম—অবতার যখন এসেছেন তখন আর ভয় নেই।

মন্মথ—উপদেশ পালন করা বড় শক্ত।

শ্রীম—মোটেই নয়। কোন একটা সুযোগ হয়ে গেলেই হয়।

মন্মথ—আগে পরিবার কিংবা ছেলের অসুখ হলে প্রার্থনা করতাম, 'এদের রোগ সারিয়ে দাও।' এখন সে সব কিছু মনে হয় না।

শ্রীম—কালে সব হয়। আপনাকে বেশ সাধু-সঙ্গ জুটিয়ে দিয়েছেন। মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কাছে গদাধর আশ্রম। ঠাকুরের আপনার প্রতি কৃপা আছে।

মন্মথ—আপনার সঙ্গও জুটিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীম—কর্ত্তা, কারয়িতা তিনিই।

মন্মথ—এক বন্ধু আমাকে বললেন, "গীতা, বাইবেল ও দর্শন পড, তবে বুঝতে পারবে।"

শ্রীম—সাধুর মুখ থেকে শুনতে হয়। সাধু-সঙ্গে বাস করতে হয়। ঠাকুর মাকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতেন, "মা, বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রে কি আছে জানিয়ে দাও।" মা রূপ ধারণ করে তাঁব সঙ্গে কথা কইতেন। অবতার যখন আসেন তখন ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল।

মন্মথ ও বঙ্কিমবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বঙ্কিমবাবু যাইবার সময় বলিতেছেন, "তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়, আপনার কাছে এই প্রার্থনা।"

শ্রীম—তা বই কি।

ভোজনান্তে শ্রীম গীতা হইতে শ্লোক পড়িয়া শুনাইতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণের সমদৃষ্টি

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ"—(গীতা, ৬।১) ইত্যাদি।

তারপরে বলিলেন, "অবতারকে চিন্তা না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা

যায় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবার পূর্ব্বে পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকেই দূতরূপে বরণ করেন। বললেন, 'তোমার তো শত্রু-মিত্র ভেদ নেই। সকলকে ভালবাস। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। তুমিই দূতরূপে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যাও।'

রাত্রি নয়টা হইয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

॥ ৪৬ ॥

২৫শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৪। স্কুলবাড়ী

কীর্ত্তিমান পুরুষের বাক্য

বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ বসু ও শ্রীযুত শরৎ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দোতলায় বসান হইল। কয়েকটি ভক্তও উপস্থিত আছেন।

শ্রীম শরৎবাবুকে দেখিয়া বলিতেছেন, "তোমার শরীর বেশ ভালই দেখছি।" (তাঁহাকে দেখাইয়া ত্রৈলোক্যর প্রতি) ইনি "বেদান্ত-সূত্রের" ব্যাখ্যা লিখেছেন। খুব পণ্ডিত।

শরৎবাবু—সরল ভাষায় লেখবার চেষ্টা করেছি, যাতে সকলে বুঝতে পারে।

ত্রৈলোক্যবাবু—কি লিখেছেন, একটু বলুন না।

শরৎবাবু—সে অনেক কথা।

শ্রীম—একটু আরম্ভ কর।

শরৎবাবু—শঙ্কর চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর এ রকম বিভাগ করেন নি। একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মকেই মেনেছেন। সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদরহিত ব্রহ্ম। রামানুজের মতে চিৎ অর্থাৎ জীব, অচিৎ অর্থাৎ জগৎ এবং ঈশ্বর এই তিনটি মিলে এক ব্রহ্ম। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের শরীর। তিনি স্বগতভেদ স্বীকার করেছেন। বৈষ্ণবদের মতে জীব হচ্ছে অণু, সূক্ষ্ম, ঈশ্বরের দাস। মায়াতে জীব সে যে তাঁর দাস তা ভুলে গিয়েছে। তাই নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। ধ্যান-তপস্যায় যখন—আমি তাঁর দাস, এই বোধ আসবে, তখনই মুক্তি।

শ্রীম—স্বামীজীর ও ঠাকুরের কথা দিয়ে বলবে। নিজেকে authority (আপ্ত) করতে নেই।

ত্রৈলোক্যবাবু—কেউ নিজেই যদি তাই হয়?

শ্রীম—তাহলে লোকে শুনবে না, তার কথা নেবে না। বলবে—ও নিজে বানিয়ে লিখেছে। ঠাকুর কিংবা স্বামীজী বলেছেন বললে তবে নেবে। কোন মহৎ লোক অথবা শক্তিমান পুরুষ যদি বলেন, তবে লোকে বিশ্বাস করে। রাজসভাতে শিশুপাল প্রভৃতি কত হাসি ঠাট্টা করছিল। যেই সেই সভাতে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন, অমনি সভাসুদ্ধ সকলে চুপ। কারও মুখে কোন কথা নেই। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তিমান পুরুষ কিনা। Highest man (শ্রেষ্ঠ মানব) না হলে শাস্ত্র বুঝোতে পারে না। এই রকম মানুষ হচ্ছেন অবতার।

ঈশ্বরের লক্ষণ

"এই দেখুন না, ঈশ্বর আগে থেকে হাওয়া, জল, খাদ্য, মাতৃস্তন্য, শরীর সুস্থ রাখবার জন্য নিদ্রা দিয়েছেন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন। তবু মানুষ বলে, 'আমি কর্ত্তা, আমি কর্ত্তা।' যেমন ঠাকুর বলতেন, 'নীচে আগুন রয়েছে বলে দুধ ফুলে উঠছে। আগুন টেনে নাও, কোথাও কিছু নেই।' হাওয়া অথবা খাদ্য কোন একটার অভাব হোক দেখি, কোথায় 'আমি' থাকে? আর 'আমি' নেই।"

ত্রৈলোক্যবাবু—কেন এই সব করেছেন?

শ্রীম—তাঁর ইচ্ছে। এ প্রশ্নই ওঠান যায় না। তিনি কার্য্যকারণের অতীত। ঋষিরা বলে গেছেন, এসব তাঁর খেলা। বেদান্তে আছে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২)। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁ থেকেই হচ্ছে। তাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য ও মৃত্যু সর্ব্বদা কাজ করে বেড়াচ্ছে। "মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" (কঠ ২।৩।৩)। এই রাস্তায় নিত্য কত লোককে মরতে দেখা যায়। আবার তিনি সকলকে পালন করবার জন্য, যার যেটি প্রয়োজন তার সেটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—

"কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"

—(ঈশ ৮)

সকাম ও নিষ্কামভক্ত—সাধুসঙ্গে ঈশ্বর বশীভূত

ত্রৈলোক্যবাবু—তিনি এই সমস্ত করছেন কি করে বুঝব?

শ্রীম—তাঁর কৃপায় বোঝা যায়। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" (কঠ, ১।২।২২)। তা না হলে তাঁকে পেতে অনেক জন্ম লাগে। "অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (গীতা ৬।৪৫)। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—সকাম যারা, তারাও আমার ভক্ত। তবে জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" (গীতা ৭।১৮)। জ্ঞানী পুরুষ ভগবানকে মানছে কিনা, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানে না। তাই তাঁর এত প্রিয়। যে সকাম তাকেও ভক্ত বলেছেন। তার মানে, সকামভাবে কর্ম্ম করতে করতে তাঁর দিকে মন যাবে। তখন নিষ্কাম ভাব আসবে। ঠাকুর বলতেন, "ধ্রুব কাঁচ কুড়ুতে এসে রত্ন পেয়েছিল," (রাজ্য পাবার আশায় তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করেছিল)।

শরৎবাবু—ঐ রকম চণ্ডীতেও সুরথ রাজা, সমাধি বৈশ্য ও মেধস ঋষির কথা আছে।

শ্রীম—মহাত্মারা বলে গেছেন, অন্য এক থাকের লোক আছে, যারা ভগবানকে অনেক দিন না দেখার দরুন অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করে, তাঁকে দেখবার জন্য ছটফট করে। ছোট ছেলে মাকে না দেখলে যেমন করে। সেই ব্যাকুলতা সাধুসঙ্গে আসে। ভাগবতে আছে, "হে উদ্ধব, তপস্যা, স্বাধ্যায়, যাগযজ্ঞ, দানব্রতে আমি তত প্রীত হই না, যত সাধুসঙ্গে হই। সাধুসঙ্গের আমি খুব বশীভূত। আব কিছু না করে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি সাধুসঙ্গ করে, তা হলে আমাকে লাভ করতে পারে।" আমি কাল ষ্টুডেণ্টস্ হোমে গিয়েছিলাম। তখন অনাদি মহারাজ ছাত্রদের নিয়ে ক্লাশ করছিলেন। তাঁর সেই কথাগুলি অত্যত মিষ্ট লাগল।

ত্রৈলোক্যবাবু—এইবার আসি।

শ্রীম—পেয়ে বেশ আনন্দ হল।

ত্রৈলোক্যবাবু—কি বলেন! আমি অধমাধম। আমার ভাগ্য যে আপনাকে দর্শন করলাম।

যাইবার সময় আলোটা সিঁড়িতে ধরিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে স্কুল ইন্সপেক্টর শ্রীযুত হেমচন্দ্র সরকার তাঁহার বালকপুত্র সহ এবং আরও কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন।

হেমবাবু—এ ছেলেটি খোল বাজাতে জানে, গান গাইতে পারে।

শ্রীম (বালকের প্রতি)—গাও না।

বালক গাহিতেছে।

গানের অর্থ এই যে, অনুভূতি ব্যতীত বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পড়িয়া কোন ফল নাই। সাধুসঙ্গই মূল।

শ্রীম—বাঃ, ঠিক ধরেছে। বেশ গান জানে ত!

হেমবাবু—ছেলেবেলা থেকে হরিনাম কীর্তনে বেশ প্রীতি।

শ্রীম—সংস্কার আছে। একে মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবেন। সাধুসঙ্গেই লোক মহৎ হয়। তবে জোয়ান বয়সে মন একটু এদিক ওদিক যায়।

উপাধ্যায়—এর কিছু হবে না।

(শ্রীম—তুমি কি করে জানলে? যিনি সমাধি করাচ্ছেন, তিনি আর নাবিয়ে দিতে পারেন না? তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। তাই 'চণ্ডি'তে মহামায়ার উপাসনা করতে বলেছে। এই মহামায়াই বন্ধন ও মুক্তির কারণ।

"একজনের পরমহংস অবস্থা। ঠাকুর তাকেই বলেছিলেন, 'সাধু সাবধান। পড়ে যাবি।' অন্যের কি কথা! এত উচ্চ অবস্থা থেকেও পতনের সম্ভাবনা। মনে কর না, 'আমি নির্লিপ্ত' হাবুডুবু খাইয়ে দেবেন। ভাগবতে আছে, গজেন্দ্রের যখন একেবারে 'আমি' গিয়েছিল, তখন ভগবান এসে তাকে রক্ষা করলেন। যতক্ষণ তার অহং ছিল, ততক্ষণ কুমীরের সঙ্গে তার একহাজার বছর যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মহামায়ার কাছে চালাকি! জন্মের আগে যার খবর নেই মৃত্যুর পরও খবর নেই, সেই লোক কি করে বলে আমি জ্ঞানী? তাই ঠাকুর বলতেন, 'আমার ছেলে, একথা বলতে নেই। তাতে অনেক বিপদ আছে।' Humanityকে (মানুষকে) ভালবাসতে গেলেই অনেক যন্ত্রণা। যদি কেউ জানে, এসব ভগবানের জিনিষ; আমিও তাঁর; পৃথিবীতে কেবল তাঁর সেবা করতে এসেছি, তবেই মঙ্গল।)

শ্রীম—(উপাধ্যায়ের প্রতি, শরৎবাবুকে দেখাইয়া) ইনি শাস্ত্রজ্ঞ। এর সঙ্গে আলাপ কর।

শরৎবাবু—আমি একদিন এক বৈষ্ণব সভাতে বলেছিলাম, "মহাপুরুষদের বাক্যই বেদ।" ঠাকুর নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তাঁর বাক্যগুলি বেদমূর্তি ধারণ করেছে। স্বামীজীও যা বলে গেলেন, সেগুলি শাস্ত্রের সার কথা। আমার এখন পাঁচদিন ছুটি, তাই ভক্তদের দর্শন করতে ইচ্ছা।

শ্রীম—আমারও ইচ্ছা হয়, ঐরকম ঘুরে ঘুরে ভক্তদের দর্শন করি। কিন্তু শরীরে কুলোয় না। এইবার শরৎবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উপাধ্যায়—দেশে গিয়ে আপনার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। আপনাকে

তিনবার স্বপ্নে দেখেছি। একবার হাত দিয়ে ইশারা করে কি বলছেন। অন্য একদিন দেখলাম, কৌপীন পরা।

শ্রীম—বল কি! দেখছি তোমার সন্ন্যাসের দিকে মন। যার যে দিকে মন, সে সেইরকম স্বপ্ন দেখে। দাঁড়িয়ে খৃষ্টানেরা লেকচার দিচ্ছে, এই রকম কেউ যদি চিন্তা করে, তা হলে সে তাই দেখবে।

কথাবার্ত্তার পর উপাধ্যায়ও প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীম (সত্যবানের প্রতি)—বল ত কাল অনাদি মহারাজ তোমাদের কি বলছিলেন?

সত্যবান—আমাদের মধ্যে একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করেছিল, ওঁকার মানে কি? তাতে তিনি বললেন, 'ওঁকার হচ্ছে ঈশ্বরের একটি নাম; প্রণব ঈশ্বর-বাচক। প্রলয়ে এই প্রণবই থাকে। আবার যখন সৃষ্টি হয়, এই ওঁকার থেকেই হয়। এই ওঁকার থেকেই বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি।' আর একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি করে চিত্তশুদ্ধি হয়?' তাতে তিনি বললেন, 'সৎকর্ম্ম, সৎচিন্তা ও সাধুসঙ্গে হয়।'

শ্রীম—বাঃ! নোট করে রাখ ত?

সত্যবান—আজ্ঞা, হাঁ।

আজ যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন বলিয়া শ্রীম বাইবেল পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন—

প্রথম ভগবান এক দেবদূতকে দিয়ে মেরীকে বলে পাঠালেন, ঈশ্বরই তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি জগতে ঈশ্বরের মানসপুত্র যীশুখ্রীষ্ট নামে পরিচিত হবেন। তিনি সকলের ত্রাণকর্ত্তা হবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মেরী অবিবাহিত অবস্থাতেই গর্ভবতী হন। যোসেফ তাঁকে বিবাহ করতে না চাইলেও দেবদূতের আদেশে তাঁকে বিবাহ করেন। তারপর তাঁকে নিয়ে নাজারেথ সহরে গিয়েছিলেন। বেথলহামের রাস্তায় এক ঘোড়ার খাবারের গামলাতে তাঁর জন্ম হয় এই ডিসেম্বরে, ইত্যাদি।

পাঠান্তে সকলে প্রণাম করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টায় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪২ ॥

১লা জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

বৈকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা। শ্রীম চারতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। নির্ম্মল মহারাজ এবং কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত। শ্রীম নির্ম্মল মহারাজের সহিত হৃষীকেশের জলপ্লাবনের কথা কহিতেছেন।

রাম মারলে কে আর রাখবে

নির্ম্মল মহারাজ—হঠাৎ গঙ্গার জল বেড়ে উঠেছিল। লোকে আগে খবর পায়নি তাই কেউ পালাতে পারে নি। কেউ গাছে, কেউ পাথরে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে। যে কজন বেঁচেছে অনেক struggle (চেষ্টা) করে।

শ্রীম—পাথরে ধাক্কা খেয়েই অনেক মরেছে।

নির্ম্মল মহারাজ—তিনি মারলে কে আর রাখবে ?

শ্রীম—ঠাকুর, রাম আর কোলা ব্যাঙের গল্প করেছিলেন। কোলা ব্যাঙ বলেছিল, "হে রাম, অন্যে যখন মারে, তখন 'রাম রক্ষা কর' 'রাম রক্ষা কব' বলে চীৎকার করি। এখন আপনি নিজে যখন মারছেন তখন আর কাকে ডাকি ? তাই চুপ করে আছি।"

কর্ম্মযোগী গান্ধী

"আমি স্বর্গাশ্রমে থাকতে এই রকম হঠাৎ জল বেড়েছিল। আমরা জানতে পেরে গাড়ী করে পাঁচ ক্রোশ দূরে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি সেখানটায় দশ হাত জল। কেউ ত এ সব খবর নেয় না। তাদের সাহায্য করছে বলে খবরের কাগজেও দেখতে পাইনে।

নির্ম্মল মহারাজ—আমরা এই রকম বন্যে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে ভুগেই মরব। এ বছর চার দিকেই বন্যে। মাদ্রাজের দিকেও হয়েছে।

শ্রীম—মহাত্মা গান্ধী কর্ম্মযোগী। যারা ভোগ ত্যাগ করে কর্ম্ম করে তারাই যোগী। যোগী পুরুষ না হলে ঠিক নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে না।

দুষ্ট লোকদের খাওয়াতে নেই

"ঠাকুর তাঁর ঘরে সন্দেশ পচে যেত তবু কাউকে খেতে দিতেন না। দেশে হৃদয়কে বললেন, 'তুই যদি এই সব দুষ্টু লোকদের খাওয়াস তা হলে এখুনই এখান থেকে চলে যাব।' একদিন কালীবাড়ীতে কি একটা হয়েছিল। তাঁর ঘরে যে প্রসাদী থালা আসত, দিতে দেরী হয়েছিল। তাইতে ঠাকুর চটি জুতো পায়ে চট্ চট্ শব্দ করতে করতে গিয়ে খাজাঞ্চীকে বললেন, 'কই এত বেলা হল, প্রসাদী থালা পাঠালে না যে?' যোগানন্দ স্বামী দেখে বললেন, 'আপনি এই সামান্য জিনিষের জন্য বলতে গিয়েছিলেন?' তাতে ঠাকুর বললেন, 'ওরে ভক্তদের খাওয়ালে দাতা ধন্য হয়ে যাবে। রাণী রাসমণি যে উদ্দেশ্যে এ সব করেছে তা সার্থক হবে।'

নির্ম্মল মহারাজ—আমরা ভাবছি এই ধারে বাড়ী ভাড়া নেব।

শ্রীম—এখানে হলে বেশ হয়। সাধুদের দেখলে উদ্দীপন হয়।

এইবার নির্ম্মল মহারাজ জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীম বড়বাজারে শিখদের উৎসব দেখিতে গেলেন।

॥ ৪৩ ॥

২৩শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

শ্রীম ছাদে চেয়ারে উপবিষ্ট। ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

শ্রীম—(ভক্তের প্রতি) যারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল, তাদের দেখলে শান্তি হয়। যারা ভোগ নিয়ে রয়েছে, তাদের দেখলে কি শান্তি হয়? শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—দুটি পথ আছে। সকলেরই প্রেয়ের দিকে নজর। ঠাকুর একদিন গাড়ী করে যেতে যেতে দেখলেন, সকলেরই নিম্নদৃষ্টি, কেবল দুএক জনের উর্দ্ধদৃষ্টি। তিনি বলতেন, "তাঁর কাছে জোর কর। নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁর দর্শন হয়।" ঠাকুরের ঐ এক কথা। ভক্তদের বলতেন, "ধ্যান করলে তাঁর দর্শনলাভ হয়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়।" শুধু ত

উপদেশ নয়, তিনি মার সঙ্গে কথা কইতেন। বলতেন, "আমি কি অন্যায় করেছি, মা?" কোন কোন ভক্তকে এরকম করে দিয়েছেন যে সর্ব্বদাই তাঁর অনুভূতি হচ্ছে। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। তাঁর জোরেই বলছি। একজন ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "যদি পরিবার আত্মহত্যা করে?" ঠাকুর বললেন, "করুক গে, সে অবিদ্যা স্ত্রী।" আবার বললেন, "আন্তরিক হলে সব বশে আসে, রাজা স্ত্রী সব বশে আসে। সবাই বলে—আমার স্ত্রী খুব ভাল। এমনি মহামায়ার মায়া, বুঝতে দেয় না। অবিদ্যা-স্ত্রী কর্ম্ম বাড়িয়ে দেয়; ছেলের অসুখ, টাকার ভাবনা, এই সব। ভগবানের দিকে মন দিতে দেয় না। বিদ্যা-স্ত্রী ঈশ্বরের পথে যেতে সাহায্য করে।"

বড় জিতেন—দুর্গা, দুর্গা। (সকলের হাস্য)

টাকার অপর দিক

শ্রীম—টাকা দিয়ে তাদের সব ঠাণ্ডা করতে হয়। টাকা থাকলে অর্দ্ধেক জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ, টাকা থাকলে সাধুসেবা, গুরুসেবা, তীর্থদর্শনাদি হয়। পুরুষদের কি দোষ নেই? কেন তারা সাধুসঙ্গ, নির্জ্জনবাস করে না? মাখন তুলে মুখে ধরলেও খেতে চায় না? দশ বছরের বেদান্ত পড়ার কাজ ঠাকুর করে দিয়েছেন। দশ বছর বেদান্ত পড়ে যে সব জিনিষ বোঝা যায় না, ঠাকুরের কথা চিন্তা করলে সে সব সোজা হয়ে যায়। অনায়াসে বোঝা যায়।

বড় জিতেন—আমি এখানে পড়ে আছি, যা হয় হবে।

ডাক্তার বক্সী—ভোগটা ত্যাগ করিয়ে দিলেই ত হয়।

পাকা খেলোয়াড়। কুঁড়ের কর্ম্ম নয়

শ্রীম—কি করলে কমে যাবে, তার উপায় বলে দিয়েছেন। ঠাকুর বলতেন, "মানুষের দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ আছে, সে সব শোধ করতে হবে।" সব বিষয়ে আলগা হলে চলে? মনে বল চাই। বাড়ীর সকলকে দেখাবে যেন কত আপনার; অন্তরে জানবে, এরা আমার কেউ নয়। ভগবানই আমার আপনার। পাকা খেলোয়াড় হওয়া চাই। দক্ষিণেশ্বরে নবতে মার কাছে যেদিন ঝি না আসত, সেদিন ঠাকুর মাকে তাঁর ঘরে শোবার জন্য ডেকে পাঠাতেন। একদিন ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, ঝি আসেনি, মাকে তাঁর ঘরে শুতে বললেন। মা এলে পর বললেন, "তোমার গয়না কোথায়?

নিয়ে এস।” মা বললেন, “এখন আমি আনতে পারব না। শুভ সংস্কার— সব তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ছোট আধার হলেই বলে, “আমি খুব আলগা হয়ে গেছি।” “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” (মুণ্ডক, ৩।২।৪) কুঁড়েগুলোর কর্ম্ম? মঠে বেশ করেছে—যারা কর্ম্ম করতে পারবে না, তাদের বলে—সরে পড়।

“অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥’—(গীতা ৬।১)

“অনাসক্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষা না রেখে যারা কর্ম্ম করে তারাই সন্ন্যাসী ও যোগী।

এইবার শ্রীম গান গাইতেছেন—

“একি বিকার শঙ্করী, কৃপা-চরণ-তরী পেলে ধন্বন্তরি,
অনিত্য গৌরব হল অঙ্গদাহ, আমার আমার একি হল পাপ মোহ”
ইত্যাদি

গানের পর বলিতেছেন, “বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, ‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি’ (বৃহদারণ্যক, ৪।২।৪)—হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হয়েছ, যেহেতু অভয়স্বরূপ ভগবানকে অনুভব করেছ, আর তোমার সংসারে কোন ভয় নেই। তাঁর কৃপা হলে, তাঁর দর্শন পেলে, সংসারের ভয় থাকে না, মানুষ নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে।”

॥ ৪৪ ॥

২৫শে এপ্রিল, শনিবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

গোপীদের প্রেম

সকালে চারতলার ঘরে গদাধর আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাহাকে বলিলেন, “তুমি আধ ঘণ্টা করে আমার কাছে পড়।” এই বলিয়া তিনি দোতলায় নামিয়া আসিলেন এবং গদাধরকে ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ৩১শ অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক পড়াইয়া মুখস্থ করিতে দিলেন এবং বলিলেন, “এই শ্লোকগুলি স্বামীজী ভালবাসতেন—

'সুরতবর্দ্ধনং শোক নাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্
বিতর বীর নস্তে অধরামৃতম্ ॥১৪॥
'অটতি যন্তবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥'১৫॥

"শ্রীকৃষ্ণের অধরস্পর্শে গোপীদের বিষয়বুদ্ধি দূর হয়ে যেত, জগৎ ভুল হয়ে যেত। তিনি যখন বৃন্দাবনে গোচারণে যেতেন, তাঁর অদর্শনে তাদের ক্ষণকাল যেন এক যুগের ন্যায় প্রতীত হত। তাদের তাঁর প্রতি এমন ভালবাসা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বই তারা অন্য কিছু জানত না।"

ছয়টার পর শ্রীম দোতলায় ভক্তগণের নিকট আসিয়া বসিলেন।

শ্রীম—আজ পঞ্চম ভাগ 'কথামৃত' লেখা হয়েছে। সন্ধ্যার পরে পাঠ হবে।

ঠাকুরের সার্কাস দর্শন

"বেলা তিনটের সময় ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ী করে এলেন। আমি তখন বিদ্যাসাগর স্কুলে ছিলাম। ঠাকুর সার্কাস দেখবার জন্য আমাকে সেই গাড়ীতে উঠিয়ে নিলেন। যেতে যেতে উঁকি মেরে রাস্তা দেখছেন। সার্কাসে গিয়ে আট আনার সীটে বসা গেল। বিবি এক পায়ে ঘোড়ার ওপর দৌড়ুচ্ছে, আবার রিং ধরছে। সার্কাস দেখে ঠাকুর গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছেন, 'দেখলে, বিবি কত কষ্ট করে শিখেছে? যদি পড়ে যায় তাহলে মৃত্যু হবে। তাই আগে সাধুসঙ্গ, তপস্যা করে রাখা দরকার। ফস করে কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক হেঁটমুণ্ড হয়ে কত তপস্যা করেছে।' মৃত্যু মানে কি? আত্মার মলিন গতি প্রাপ্ত হওয়া।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

একজন ভক্ত—আত্মার মৃত্যু হয়?

শ্রীম—মলিনতা জীবাত্মার হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
—(মুণ্ডক ৩।১।১)

"জীবাত্মা সংসারের নানা বিষয়বস্তু ভোগ করে বলে তাকে বার বার এই সংসারে আসতে হয়, অনেক দুঃখ কষ্ট পেতে হয়। পরমাত্মা ভোগ করেন না, সাক্ষিস্বরূপ, অজর, অমর।

তপস্যা চাই

"তপস্যা চাই, তপস্যা চাই, মুখস্থ করলে কি হবে? তাঁকে জানতে হবে —'তমেব বিদিত্বা' (শ্বেতাশ্বতর ৩।৮)। আজ বিয়াল্লিশ বছরের কথা মনে হচ্ছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শ্রীম বলিতেছেন—ঠাকুর বলতেন, "সন্ধ্যার সময় সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে ঈশ্বরকে চিন্তা করবে।"

সকলে ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে গঙ্গার স্তব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনচরিত পাঠ হইল। এই সময়ে মঠের দুই জন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈশম্পায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য

শ্রীম—সাধুর শুভাগমন, আসুন, আসুন, এতদিন আপনাদের ধন্যবাদ দিতে সময় হয় নি, আজ দিচ্ছি। সেদিন মঠে 'যাজ্ঞবল্ক্য' অভিনয় দেখে বড়ই আনন্দ হয়েছিল। সাধুদের মুখ থেকে শুনলে impression (ধারণা) হয়, তাঁরা ঐ নিয়ে রয়েছেন কিনা।

মনু মহারাজ—যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে বৈশম্পায়নের কাছে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কিছু দিন পরে এক সাধু সভায় বৈশম্পায়ন না যাওয়াতে তাঁর ব্রহ্ম-হত্যা-দোষ হয়। ঐ দোষ ক্ষয়ের জন্য তিনি শিষ্যদের বললেন, "তোমরা ধ্যান, জপ, প্রায়শ্চিত্তাদি করে যাতে আমার এই দোষের নিবৃত্তি হয় তার চেষ্টা কর।" যাজ্ঞবল্ক্য তাই শুনে বললেন, "শুধু আমাকে বললেই হত, এদের বলবার কি প্রয়োজন ছিল?" বৈশম্পায়ন তাঁর এই রকম উদ্ধত কথা শুনে বললেন, "আমার কাছ থেকে যা শিখেছ তা ফিরিয়ে দিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও।" যাজ্ঞবল্ক্য সেই সমস্ত বিদ্যা উদ্গার করে দিলেন। অপর কয়েকজন ঋষি তিত্তির পাখীর রূপ ধারণ করে সেগুলি গ্রহণ করেন বলে তাঁর

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। পরে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের উপাসনা করে শুক্ল যজুর্ব্বেদের জ্ঞান লাভ করেন। তারই প্রচারের জন্য জনকের সভায় বিচার করেছিলেন। তার পর সংসার ত্যাগ করে চলে যান।

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) সাধুদের মিষ্টমুখ করাতে হবে।

কিছুক্ষণ পর পঞ্চম ভাগ "কথামৃত" হইতে প্রাণকৃষ্ণ ও কেশববাবুর বিষয় পাঠ হইল। রাত্র প্রায় দশটা হইবে। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪৫ ॥

১লা জুলাই, বুধবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

আজ উল্‌টা রথ। শ্রীম নিজের ঘরে বসিয়া "কথামৃত" পঞ্চম ভাগ বলিয়া যাইতেছেন এবং জনৈক ভক্ত উহা লিখিয়া লইতেছেন। কালীঘাট হইতে মাকালীর প্রসাদ আসিল। শ্রীম প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, "আজ মায়ের প্রসাদ পাবার ইচ্ছা ছিল, মা আমার সে সাধ পূরিয়ে দিলেন।" পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের কথা হইতে লাগিল।

বাবুরাম মহারাজ

শ্রীম—বাবুরাম মহাবাজ প্রত্যেক লোককে ভালবাসতেন। ছেলে ও ভক্ত যারা মঠে যেত তাদের ঠাকুরের প্রসাদ দিতেন। সকলে বলে আমায় তিনি বড় ভালবাসতেন। ঠাকুরের ভালবাসা যেন তাঁর ভেতর দিয়ে ফুটে বেরিয়েছিল।

পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা

পরে ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "ঠাকুর সব আলাদা আলাদা থাক করেছেন। যোগী, সাধু, বৈষ্ণব, বেদান্তী, ভোগী—এই সব। কাউকে দেখে নাক সেঁটকাবার জো নেই। ঠাকুর সকল সম্প্রদারের সঙ্গেই মিশতেন—বৈষ্ণব, বেদান্তী, ইদানীংকার ব্রাহ্ম, সকলের সঙ্গেই। ব্রাহ্ম সমাজের পরস্পরের ঝগড়া তাঁকে স্পর্শ করত না।

মুটেদের পঞ্চায়তি

(গদাধরের প্রতি) "মুটেরা পঞ্চায়তি করে, দেখেছ ? তাদের মধ্যে যে সরদার, তাকে তামাক সেজে দিচ্ছে, জল টল এনে দিচ্ছে, হাওয়া করছে। তেমনি সাধুদের ভেতরেও বড় আছেন—যেমন অবতার। অবতার সাধুশ্রেষ্ঠ। ভোগীদের মধ্যেও তেমনি বড়লোক আছে।

পুতুলনাচ

"তোমরা বাগবাজারে মদন মোহন দেখে এলে ; আমিও একবার গিয়েছিলাম। সেখানে পুতুলনাচ দেখেছিলাম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সাধু, রাজা—যে যেমন থাকে, তাকে তেমনি নাচালে ; আবার একসঙ্গে বেখে দিলে। এই রকম সবই তাঁর হাতেব পুতুল। তিনি যেমন নাচাচ্ছেন, সকলে তেমনি নাচছে এবং তাঁতেই শেষে লয় হচ্ছে।* তাঁর লীলা দেখ। তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।"

এই সময় একটি ইঁদুব বিছানাব উপব দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীম—(সেটিকে লক্ষ্য কবিয়া) ইনি হচ্ছেন পায়খানাব লোক। নোংরা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কি করা যায়, সব বিছানাপত্র ত ফেলে দেওয়া যায় না। যতদূর সম্ভব নিয়ম পালন করা।

গেরুয়া অসহ্য

"একবার বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদের এক ভাণ্ডারা হয়েছিল। তাতে গেরুয়া পরা কয়েকজন সাধু গিয়েছিলেন। বৈষ্ণবরা তাঁদের দেখে বলে উঠলেন, 'এদের আবার কে আনলে ?' কারণ গেরুয়া পরা লোকদের তাঁরা দেখতে পারেন না।"

কথাবার্ত্তার পর এটর্ণি বীরেনবাবুর মোটরে শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে গেলেন।

* ত্বং ব্রহ্মা ত্বংচ বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নির্বরুণো বায়ু স্ত্বমিন্দ্র স্ত্বং নিশাকরঃ॥
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং জাতং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয্যেবান্তে লয়ং যাতি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্॥

॥ ৪৬ ॥

৩রা জুলাই, শুক্রবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

বুড়ী ছুঁলে খেলা শেষ

বৈকাল চারটায় শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ দেখিয়া দিতেছেন।

শ্রীম—(গদাধরের প্রতি) শোন, ঠাকুরের কথা। যাঁর দ্বারা লোক-শিক্ষা দেওয়াবেন, ঈশ্বর তাঁকে হয়রান করান। স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি দিন না খেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। ঈশ্বর কি জন্য তাঁদের দেখা দেন না? তাঁর ইচ্ছা যে এরা খেলুক। (গোপালের প্রতি) তুমি যে বলছিলে, অশান্তি, মন চঞ্চল। দিন কতক কষ্ট কর। বুড়ীর ইচ্ছা যে, খেলা চলে। তোমাদের দেশে লুকোচুরি খেলা আছে?

ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ, আছে।

শ্রীম—সেই খেলাতে যে বুড়ীকে ছোঁয় তার খেলা ফুরিয়ে যায়। সেইজন্য বুড়ীর ইচ্ছা যেন সকলে তাকে না ছোঁয়।

তীর্থরাজ

"দক্ষিণেশ্বর তীর্থরাজ। মারলেও সেখান থেকে নড়তে ইচ্ছা হয় না। আমরা কত কষ্ট করে যেতাম। কখনও শেয়ারের গাড়ীতে কখনও হেঁটে।

"যে ভিক্ষা করতে শিখেছে সে সংসার জয় করেছে। ভগবানের জন্য ভিক্ষেয় দোষ নেই। এ সময়টা খুব সাবধান—বর্ষাকাল। গাছতলা ভিজে থাকে, অসুখ করে। বর্ষা এলে সাধুরা একটা স্থান আশ্রয় করে।"

কর্ম্মক্ষয়ে ভগবান্ দর্শন

আবার বলিতেছেন, "কর্ম্মক্ষয় হলে ভগবান দর্শন দেন। নারদ রামচন্দ্রকে বললেন, 'আপনি রাবণবধের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন; যান, রাবণবধ করুন।' রামচন্দ্র বললেন, 'রাবণের কর্ম্মক্ষয় হোক, তবে ত বধ হবে।' তোমাদের পক্ষে তীর্থ, পূজা, জপ, এইসব কর্ম্ম।"

এইবার গাহিতেছেন—

'আমি ঐখেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি,' ইত্যাদি।

এই সময় জনৈক সাধু এবং তাঁহার সহিত এক ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীমর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শ্রীম সঙ্কুচিত হইয়া বলিতেছেন, "থাক, থাক।"

সাধুরও সাধুসঙ্গ প্রয়োজন

সাধু (ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া)—ইনি খুব ব্যাকুল হয়েছেন।

শ্রীম—মঠে নিয়ে যাবেন। সাধুসঙ্গ দরকার। অসাধু ত সাধুসঙ্গ করবেই, সাধুরও সাধুসঙ্গ দরকার। আগে নিয়ম কানুন বড কড়া ছিল। যে সাধুরা অনেক দিন ধরে গৃহস্থ বাড়ীতে থাকত, তাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিত। বললেই হল আমি নির্লিপ্ত হয়ে করেছি। টাকাকডির দরকার, সেই জন্য বিষয়ী লোকদের বা মেয়েদের কাছে যেতে হয়। এতে নিজের সর্ব্বনাশ। ঠাকুরের নামে মাডোয়ারী যখন টাকা লিখে দিতে চাইলে, ঠাকুর শুনেই মূর্চ্ছিত; বললেন, "আর অমন কথা বলো না।" সংসার ত্যাগ কি এই জন্য।

তিনি কি লাউ কুমড়ো ফল দেন?

"একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আসতে খুব রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফটকের বাইরে এসেই পাঁচ পয়সার শেয়ারের গাড়ী পেয়ে গেলেন। পরে ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'অত রাত্রিতে গেলে, কিছু অসুবিধা হয়নি ত?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনার কাছে এলে কি আর অসুবিধা হতে পারে? যেই ফটকের কাছে গেছি, অমনি পাঁচ পয়সায় শেয়ারের গাড়ী পেয়ে গেলুম।' ঠাকুর শুনে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছিঃ! তিনি কি লাউ কুমড়ো ফল দেন? তিনি অমৃতফল দেন।' গিরিশবাবুর অসুখ করেছিল, ঠাকুরের কাছে একজন এসে বললে, 'আপনার প্রসাদ যেই খাইয়ে দিয়েছি, অমনি সেরে গেল।' ঠাকুর বললেন, 'ও কি? তোমার কি ঐটুকু উদ্দেশ্য।' শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'যদি একটিও সিদ্ধাই থাকে তাহলে আমাকে পাবে না।' তিনরকম একাদশী আছে—নির্জ্জলা, ফল মূল খেয়ে, আবার লুচি ছক্কা খেয়ে। ঠাকুর বলতেন, 'আমার নির্জ্জলা একাদশী।' সকলে তা পারে না।

(ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া) "এঁকে মঠে নিয়ে যাবেন।"

সাধু—উনি যান না।

শ্রীম—জোর করে নিয়ে যাবেন। তিন রকম বৈদ্য আছে—উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম বৈদ্য জোর করে নিয়ে যায়।

মহামায়ার কাছে চালাকি ?

সন্ধ্যার পর শ্রীম চিত্তরঞ্জন দাসের সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে ব্রাহ্ম সমাজে গেলেন। অনেক ভক্তেরাও সঙ্গে গিয়েছিলেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দিয়া আসিতে আসিতে ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তাঁর (মহামায়ার) কাছে চালাকি ? বড় বড় হাতী পড়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে থাকতে হয়। সংসারী লোক ভোগে কাঁটা পড়বে বলে শোক চেপে রাখে। যোগীরা চেপে রাখে না। কেন না তাতে তাদের যোগ হয়। ভগবান দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে পাবার জন্য।"

এইবার মানিক প্রভৃতি ভক্তেরা ছাদে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

"এসেছে এক নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে॥
শ্রীবদনে মা মা বাণী পড়ি গঙ্গা-সলিলে।
(বলে) ব্রহ্মময়ী গেল মা দিন, দেখা ত নাহি দিলে॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে, সরল কথা শিখালে।
যেই কালী সেই কৃষ্ণ, নামভেদ, একই মূলে॥" ইত্যাদি

"গুরু পদ ভরসা কর,
গুরু গুরু গুরু বলে সংসার সাগর তর।" ইত্যাদি

"এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।" ইত্যাদি

নিজের বুদ্ধিতে তাঁকে বুঝবার জো নেই

কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীম কহিতেছেন।

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) সাপ বুঝি প্রসব করে নিজের ডিমগুলি খেয়ে ফেলে। যে দু একটি বাকী থাকে তাতেই বাচ্চা হয়। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন। মায়াতে সকলকে নিম্নদৃষ্টি করে রেখেছেন। তার মধ্যে দু-একটির উর্দ্ধদৃষ্টি। আবার মুক্ত হল ত তাকে অহং দিয়ে লোকশিক্ষা

করিয়ে নেন। যে দিকে যাও সেই দিকেই ছুরি বার করে রয়েছেন। তাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। নিজের বুদ্ধিতে বোঝবার জো নেই। দেখুন না, বাড়ীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়াতে জ্বলে পুড়ে বেরিয়ে গেলাম। ভাবলাম এ জীবন ধারণ করা বৃথা। কিন্তু ঠাকুরের দর্শন লাভ হল।

এতে কি নিজের বুদ্ধির কিছু আছে? এমন সময় বৃষ্টি আসিল। ভক্তেরা বলিতেছেন, "বৃষ্টি পড়ছে।" শ্রীম তাহাতে বলিলেন, "বলতে হবে না।" বৃষ্টি একটু বেশী হওয়ায় সকলে উঠিয়া গেলেন।

শ্রীম যাইতে যাইতে বলিতেছেন, "টপ্‌টপায়তে।"

॥ ৪৭ ॥

৭ই জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

সকাল সাতটা। শ্রীম চারতলার ঘরে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে এক একটি শ্লোক বলিতেছেন। কয়েকজন ভক্ত কাছে বসিয়া শুনিতেছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক

শ্রীম—প্রকৃতি ও পুরুষ দুইই অনাদি। পুরুষকে সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলে মনে হচ্ছে, বাস্তবিক কিন্তু তিনি কিছুই ভোগ করেন না। যেমন আগুনে জল গরম হল; তাতে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। মনে করি জলে হাত পুড়ে গেল কিন্তু তা নয়। আগুনের তাপ জলে মিশে আছে বলে পুড়ল। সেই রকম প্রকৃতির সংযোগে পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করছেন এবং সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মাচ্ছেন।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥" (গীতা, ১৩।২১)

সেই এক গামছা কাঁধে দাঁড়িয়ে

জনৈক ভক্ত—উপনিষদে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতার কথা আছে।

শ্রীম—হাঁ, উপাধি ভেদে কত রকম অবস্থা হয়। সাধন চাই। গুরু বুঝিয়ে দিলে তবে বোঝা যায়। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? ঠাকুর শ্লোক

বলতে পারতেন না। বলতেন, "আমার বলতে নেই।" ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই—"সেই এক গামছা কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে।" নুনের পুতুল সমুদ্রে গিয়ে তাতেই মিশে গেল, আর খবর দিলে না। এক রাজা একজনকে বললেন, "আমাকে এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে।" তাতে তিনি প্রথমে দু আঙ্গুল দেখিয়ে পরে এক আঙ্গুল দেখালেন। তার দ্বারা বোঝালেন, এক থেকেই দুই হয়েছে।

উত্তম অধিকারী

"সমাধিবান পুরুষ লোকশিক্ষার জন্য কথা কন। যারা উত্তম অধিকারী তারা এক কথায় বুঝে যায়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার আছে কিনা। দক্ষ রাজার ছেলেদের নারদ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা আর সংসারে ফিরে যান নি। তাই দক্ষ নারদের উপর চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'ওরে অর্ব্বাচীন, তুই কি জানিস? কর্ম্ম না করলে কি জ্ঞান হয়? তোর কোথাও স্থান হবে না।'*

"অজ্ঞানীদের কাছে কখনো জ্ঞানের কথা কইতে নেই। বরং তাদের কর্ম্ম করতে বলতে হয়।

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্ব কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥' (গীতা ৩।২৬)

তালে তালে পড়ছে না। গীতা উপনিষদ

"ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, 'তোমার অনেক শাস্ত্র জানা আছে, কিন্তু তালে তালে পড়ছে না। মধ্যে মধ্যে এসো বলে দেব।' শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে আর এক জায়গায় বলেছেন, 'এসব অনিত্য, আমিই সত্য।'

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।'—(গীতা ৯।৩৩)

"অবতার আসেন এই অনিত্যতা বোঝাবার জন্য; তা না হলে বলে দেবে কে?" আবার গীতায় দশম অধ্যায়ের বিভূতি-যোগ প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "এই গীতাকেও উপনিষদ বলা যায়। কেন না উপনিষদের সার কথাই এতে রয়েছে এবং এও সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য।

"সব সময় ত আর সমাধিস্থ হয়ে থাকা যায় না, তাই যখন বহির্মুখ তখন এই সব নিয়ে থাকতে হয়। যখন সিঁড়িতে—তখনও বেদ, আর যখন ছাদে

* শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৫।

উঠেছ—তখনও বেদ ; অর্থাৎ বেদেতে সাধনের কথাও আছে আবার সিদ্ধি বা সমাধির কথাও আছে। যেমন,—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়' (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৮)

"অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও।

'যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কংপশ্যেৎতত্তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫)

"যখন সমাধি অবস্থায় সব একাকার হয়ে যায় তখন কি দিয়ে কাকে দেখবে, কি দিয়ে কোন্ জিনিষকে আঘ্রাণ করবে ?"

কথামৃত

বৈকালে শ্রীম 'কথামৃতে'র প্রুফ দেখিতেছেন, এমন সময় বরাহনগর হইতে ভুতনাথবাবু আসিয়া বলিলেন, 'প্রবর্ত্তকে' লিখেছে—

"রামকৃষ্ণ কথামৃত অমৃত সমান।

শ্রীম-রচিত যাহা, পড়ে ভাগ্যবান ॥"

শ্রীম—যে যেমন লোক, তাকে সেই রকম বলতে হয়। কেউ সংস্কৃত পছন্দ করে, কেউ বা ইংরেজী। তাই তাতে এই সমস্ত দেওয়া আছে।

ভূতনাথ—একজন সাহেব এক মাঝিকে বলছে, "তরি তীরস্থ কর।" মাঝি তার র্থ। বুঝতে পারছে না। সেই সময় একজন বাঙ্গালী এসে সাহেবকে বললে, "এরকম বাংলা বললে ও বুঝতে পারবে না।" সাহেব বললে, "কেন, আমি ত শুদ্ধ বাংলা বলিয়াছি।" তখন বাঙ্গালীটি মাঝিকে ডেকে বললে, "ও মাঝি, নৌক ভিড়োও।' (সকলের হাস্য)

॥ ৪৮ ॥

১০ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

রামকমলের গান ও ব্যাকুলতা

শ্রীম চারতলার ঘরে চৌকিতে বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকটি ভক্ত।

শ্রীম—রামকমলের কীর্ত্তন শুনতে কে কে গিয়েছিলে?

বিনয়—আমরা গিয়েছিলাম। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে সুবল-মিলন হয়েছিল। এত লোক হয়েছিল যে বসবার এতটুকু জায়গা ছিল না। তিনি গানের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কথাও কন।

শ্রীম—তাঁর কি ব্যাকুলতা! এরূপ ব্যাকুলতায় ঈশ্বর দর্শন হয়। তাই তিনি 'কথামৃত' চেয়ে নিয়ে যান। এই রকম করে ঠাকুর তাঁকে দিয়ে প্রচার করিয়ে নিচ্ছেন।

বিনয়—আজ আগমনী হবে, আপনি যাবেন?

শ্রীম—ইচ্ছা নেই, তবে একটু দর্শন করবার ইচ্ছা আছে। যদি সেখানে ধরে বসায়, তাহলে বড় মুস্কিল। একবার ঠাকুরবাড়ীতে বড় মুস্কিলে পড়েছিলাম। মধ্যে মধ্যে heart-এর palpitation (বুক ধড়ফড়) হয়।

বিনয়—অফিসের বাবুরা যায়, হিন্দুস্থানীরা যায় না। তাদের গান ভাল লাগে না। মেয়েদের আলাদা বসবার জায়গা আছে।

শ্রীম—সব ঐশ্বর্য্যের বশ। যেখানে ঐশ্বর্য্য সেখানেই লোক যায়। এদেশের মতন 'মা' 'মা' বলা কোথাও নেই। বংলা দেশে বিজয়া দশমীর দিন মা দুর্গা চলে গেলে বাড়ীতে মেয়েরা কাঁদে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে মা যেমন কাঁদে। পুরুষদের কঠিন হৃদয়, তারা কাঁদে না।

গোপাল—ওড়িশা দেশে বিষ্ণু পূজো করে।

শ্রীম—কর্ম্মকাণ্ডী তারা। তুমি ত খুব পূজা করতে, পয়সাও পড়ত। এখন কর না? ঠাকুর বলতেন, "একবার নাম করলে যখন চোখে জল আসে, তখন কর্ম্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে হবে।" জল আসে না বলে করে। যতক্ষণ সেই প্রেম না আসে, ততক্ষণ দান, তপস্যা ও পূজা করা উচিত। প্রেম হলে পর ওসব না করলেও ক্ষতি নেই।

'দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।' যাদের পূর্ব্বজন্মে অনেক করা আছে তাদেরই হয়। প্রহ্লাদের ছেলেবেলা থেকে সমাধি হত।

(গদাধরের প্রতি) "এখন বই পড় না ?"

গদাধর—হাঁ, এখন ত বই পড়ছি।

কামারপুকুরে ঠাকুর ও হৃদয়

শ্রীম—ঠাকুর পডতেন না, তিনি শুনতেন। ওঁদের সব কাজ হয়ে গেছে। একে বলে অত্যাশ্রমী—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এ সব আশ্রম অতিক্রম করেছেন। ঠাকুর সন্ন্যাস নিয়ে তিন দিন ছিলেন, চাঁদনীতে থাকতেন। তিনি সব আশ্রমে থাকতে পাবতেন। কামারপুকুর, জয়রাম-বাটীতেও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। মা ঠাকরুণ ও ঠাকুর যে ঘরে ছিলেন আমি সেই ঘরে সাত দিন ছিলাম। কালেতে সব লোপ পায়। তাই আগেই দর্শন করে নিতে হয়। (গোপালের প্রতি) তুমি কামারপুকুর, জয়রামবাটী গিয়েছ ?

গোপাল—হাঁ, গিয়েছি।

শ্রীম—ঠাকুর একবার কামারপুকুর যাচ্ছিলেন। হৃদয়ের সঙ্গে পাঁচশো টাকা ছিল; মথুরবাবু ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়েছিলেন। ঠাকুর হৃদয়কে বলতে লাগলেন, "ওকে এত টাকা দে, একে এত টাকা দে।" হৃদয় বললে, "আমি কত টাকা এনেছি যে এত লোককে দেব ?' ঠাকুরের একটি সোনার আঙটি ছিল। ঠাকুর সেটি এক গরীবকে দান করলেন। লোকটি আঙটি পেয়ে দৌড়ে পালাল। হৃদয় দেখে বললে, "ওকে দিলে যে ?" ঠাকুর বললেন, "তোর কি আমি দিয়েছি।" কামারপুকুর যখন যেতেন, পাড়ার লোকেরা বলত, "গদাই এসেছে, গদাই এসেছে, অনেক টাকা এনেছে।" আর নিজের বাড়ীর লোকেরা বলত, "উনি আমাদের কি দিয়েছেন ? যা সমস্ত গয়নাপত্র নিজের স্ত্রীকে দিয়েছেন।" ঠাকুর যখন প্রকৃতিভাবে সাধনা করেছিলেন, সেই সময় মেয়েদের মত গহনা পরতেন। সেই গহনা মাকে কিছু কিছু দিয়েছিলেন। এখন ত বাড়ীর লোকেরা বলবেই। সব কিছুতেই সন্দেহ।

যে যত বুঝবে সে তত এগিয়ে যাবে

"তাঁকে চেনা বড় শক্ত। তিনি বলতেন, 'যারা আমার অন্তরঙ্গ, আপনার লোক, তাদের গালাগালি দিলেও আসবে।' প্রথম প্রথম রতির মা ঠাকুরকে

খুব ভক্তি করত। যাই শুনলে যে তিনি মাছ খান, আর এল না। ঠাকুর বৈষ্ণবদের কাছে বলতেন, 'আমি মাছ খাই।' তারা বেদান্ত ও কালী মানে না কিনা। একবার রাধিকা গোস্বামী ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের কথা ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের কথা হল, তারপর বললেন, 'এ ত তোমাদের কথা হল। এখন যদি শাক্ত কি বেদান্তী আসে?' এই বলে বেদান্তের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

"ঠাকুর স্বামীজীকে দুবার বকেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুর বাগানে। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম প্রথম স্বামীজী মা কালীকে যা তা বলতেন। ঠাকুর তাই শুনে একদিন বললেন, 'তুই এখানে আর আসিস্ নি।' স্বামীজী ঠাকুরের বকুনি খেয়েও রাগ না করে তাঁর জন্য তামাক সাজতে লাগলেন। কাশীপুর বাগানে তান্ত্রিক মতের কথা নিয়ে বকেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি দেখেছি, যারা ধর্ম্মের নামে এরকম করে, তাদের কারো ভাল হয় নি।' স্বামীজী নীচে এসে বললেন, 'আমি কখনও বকুনি খাইনি, তোরা লাগিয়ে লাগিয়ে আমাকে বকুনি খাওয়ালি।'

"কেউই তাকে ধরতে পারছে না। নিজের প্রকৃতি অনুসারে নেমে পড়ে। তাই তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে ধ্যান কর, তাহলে সব হবে। যে আমাকে যত বুঝবে সে তত এগিয়ে যাবে।'

দত্তাত্রেয় ও ত্রিগুণাতীত অবস্থা

(গদাধর ও গোপালের প্রতি) "বালকের মত গুণাতীত হয়ে বেড়াও, সামনে যা পেলে খেলে। 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।' যিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে বিচরণ করেন তাঁর পক্ষে বিধিই বা কি, আর নিষেধই বা কি? কারণ তাঁরা বিধিনিষেধকে অতিক্রম করেছেন। ভাগবতে ঋষভদেবের বর্ণনা আছে। তিনি অজগর বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। যেখানে খেতেন, সেইখানে বাহ্য করতেন। বর্ণনা আছে, তাঁর বিষ্ঠা থেকে পদ্ম-গন্ধ বেরিয়েছিল। লেখক মনে করেছেন দুর্গন্ধ বললে লোকে ঘৃণা করবে। তা কি হয়েছে? যেমন বালক বিছানায় বাহ্য করে।

"নাগ মশায়ের ভক্তরা বলেন, তিনি তাঁর বাপের জন্য গঙ্গা এনেছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ না হলে শাস্ত্র বুঝতে পারে না। প্রার্থনা করতে হয় তাহলে তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। জগতের সবই আশ্চর্য্য। যোগী পুরুষ সমস্ত দেখে শুনে charmed (মুগ্ধ) হয়ে থাকেন। ভোগী ভোগ করে এবং যা

খায় সেইগুলি পেটে পাক হয় ও মলমূত্রাদিরূপে বেরিয়ে যায়। বাইরের জিনিষ নিয়ে 'আমি'টা। যাই কিছু food (খাদ্য) পেটে পড়ল, অমনি বুদ্ধিবৃত্তি চলতে আরম্ভ করল। যদি কিছু না খাও, আর বুদ্ধি মন কাজ করবে না।

তারা ও রামচন্দ্র

"বিকারের রোগী সমস্ত অন্য রকম দেখে। পূর্ব্বের মানুষ যেন আর নেই। রামচন্দ্র যখন বালিকে বধ করলেন, তারা স্বামীর শোকে খুব কাঁদছিলেন। তখন রামচন্দ্র তাঁকে বললেন, 'তুমি যাব জন্য কাঁদছ সে ত আর নেই। ওর জন্য কেন কাঁদা?'* ডাক্তাররা রোগী দেখে এ সব ত বলে না। বলবেই বা কি করে? ওরা ত আর জানে না। আমরা এসব ঠাকুরের কাছে শুনেছি।"

এইবার তিনি গীতা পাঠ করিতেছেন—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥" ২।২৯

—কেহ কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন ও সেইরূপ কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ বর্ণনা করেন; কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। আবার কেহ বা শ্রবণ করিয়াও ইঁহাকে জানিতে পাবেন না।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢাঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ১৫।৫।

—যাঁহাদের অহঙ্কার ও মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, আসক্তি দূর হইয়াছে, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাশীল, কামনাশূন্য এবং সুখ-দুঃখ-রূপ দ্বন্দ্বের পার, তাঁহারাই সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* অধ্যাত্মরামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩।১৩।১৪

ভয় নেই। 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই মা জ্ঞান বিচারে।' এইটি ঠাকুরের অবস্থা।"

রাত প্রায় নয়টা হইয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪৯ ॥

২৯শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

সকাল আটটার সময় শ্রীম দোতলায় বসিয়া আছেন। কাছে মঠের একটি ব্রহ্মচারী এবং দুই জন ভক্ত।

বিড়াল তপস্বী

শ্রীম—(ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া জনৈক ভক্তের প্রতি) ইঁনি পাকা লোক। আমি গোকুলের সুখ্যাতি করছিলাম। তাতে ইনি বললেন, "দাঁড়ান, আরও দুবছর যাক কত অষ্টম কষ্টম আছে।" এতে বোঝা যায়, তিনি নিজে প্রার্থনা ক.রন। মহামায়ার কাছে চালাকি, অহঙ্কার করলেই গোল্লায় যায়। তোমাকে কেউ কেউ সুখ্যাতি করে, না? দাঁড়াও আরও কিছু দিন যাক।

হেমেন্দ্র মহারাজ শ্রীমকে দিবার জন্য একটি ছেলের হাতে একখানি পত্র দিয়াছেন। উহা পড়িয়া তিনি বলিলেন, "তাকে বল কাল ভাল দিন।" পত্রে হেমেন্দ্র মহারাজ শ্রীমকে কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীম কোথায় যাইবেন এখনও স্থির নাই। কখনো কখনো বলিতেছেন, "মায়াবতীর শাখা অদ্বৈত আশ্রম, সেখানে গিয়ে থাকলেও হয়।" কথাবার্ত্তার পর সকলে বিদায় লইলেন।

দুপুরের পর শ্রীম নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। হেমেন্দ্র মহারাজ স্টুডেণ্টস্ হোম হইতে একটি ছাত্রকে পাঠাইয়াছেন। তিনি ও আর একজন উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—(ছাত্রের প্রতি) কাল একটা সময় ঠিক করুন। অদ্বৈত আশ্রমে গেলেও হয়। তবে বড় কাছে এই যা। (হাসিতে হাসিতে) "পাখী জুথী

খাইনে আমি ধর্ম্মে দিয়েছি মন। বিচালীর দড়ি গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।" একটা বিড়াল আগে খুব পাখী মেরে খেত। তার ভয়ে পাখীরা অস্থির হত এবং তাকে দেখলেই পালাত। ফলে কিছু দিন পরে সে আর খেতে পায় না। তখন সে বৈষ্ণব সেজে বলছে, "আমি এবার বৃন্দাবনবাসী হব। এখন অহিংসা আমার পরম ধর্ম্ম। তোমরা আর ভয় পেয়ো না, আমার কাছে এস।"

বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় বাগবাজার মঠ হইতে তিন জন সাধু ও ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন। শ্রীম চারতলার বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। সাধুদের মধ্যে একজন বলিলেন, "শশী ডাক্তার ঠাকুরের জীবনী লিখছেন। ঠাকুর 'কথামৃতে' নিজের জীবনী যেটুকু বলেছেন তাই একত্র করে লিখেছেন।"

শ্রীম—আমারও ঐ রকম লেখবার ইচ্ছা ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সাধু তিন জন চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় অনেক ভক্ত সমবেত হইলেন। শ্রীম ধ্যানান্তে চারতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। অদ্বৈত আশ্রম হইতে জিতেন মহারাজ, বিমল মহারাজ, প্রভু মহারাজ, উপেন মহারাজ প্রভৃতি আসিয়াছেন।

গুরু-ভক্তি। ভয় নেই

শ্রীম সেই একান্ত গুরুভক্ত মেয়েটির কথা বলিতেছেন।

শ্রীম—মেয়েটির কি গুরু-ভক্তি। গুরু বলেছিলেন, "তুই ডুবে মরতে পারিস নে, এতটুকু ভাঁড়ে করে দই নিয়ে এসেছিস!" গুরুর কথা শুনে মেয়েটি জলে ডুবে মরতে গেল। কিন্তু ডুব জল আর হয় না। শেষে ঈশ্বর দর্শন দিলেন ও তার নিষ্ঠাভক্তির ফলে গুরুরও ঈশ্বর দর্শন হল। গুরু যা বলেন তাই করতে হয়।

জিতেন মহারাজ—গুরু ও ইষ্টকে কি ভাবে ধ্যান করতে হয়?

শ্রীম—এ সব গুরুর কাছ থেকে জানতে হয়।

জিতেন মঃ—আপনারা ঠাকুরের সন্তান, আপনাদের কাছে বলতে কি?

শ্রীম—গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। গুরু হচ্ছেন সেই সচ্চিদানন্দ। 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' (গুরুগীতা)।

জিতেন মঃ—আমি দু-ঘণ্টা জপধ্যান করে যে আনন্দ পাই, কর্ম্ম করে তা পাইনে।

শ্রীম—তা বললে কি হয়? গুরুই প্রকৃতি জানেন। তা না হলে

গুরুকরণে ফল কি? গুরু ধরে রয়েছেন, ভয় কি? বাপ যেমন ছেলেকে ধরে থাকলে পড়ে না এবং তার জন্য ভয়ও থাকে না।

জিতেন মঃ—সে যেন বিশ্বাস করলাম, কিন্তু কাঁহাতক বিশ্বাসের উপর থাকা যায়? তিনি আমাকে ধরে রয়েছেন, অনুভব করলে তবে ত ষোলআনা বিশ্বাস হবে? এক এক সময় বড় অসহায় বোধ হয়। ঠাকুর ভক্তদের দেখবার জন্য চীৎকার করে ডাকতেন; আমরাও এত কাঁদি, তবু কিছু হয় না। এত নিষ্ঠুর।

শ্রীম—ঐভাবে তিনি মঙ্গল করছেন, আপনি তা বুঝতে পারছেন না। ধরুন ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়লেন। গাড়ী কাশীতে পৌঁছে গেছে। আপনি কিন্তু ঘুম ভাঙ্গবার পর মনে করছেন সেইখানেই আছেন। বোঝা যায় না। কিছু কাজ করাবার জন্য তিনি ঐ রকম করছেন। বীজ পড়লেই কি তখুনি গাছ হয়? আপনি ব্যাকুল হয়েছেন, তাই এমন বোধ হচ্ছে।

জিতেন মঃ—তাও কই বোধ করছি? আপনারা দেখিয়ে দিন। মহারাজ ঠাকুরের কাছে বলেছিলেন, "আমার মন অস্থির।" ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করতেই সব হয়ে গেল। মাষ্টার মশায়, আপনাদের কাছে শুধু এই ভিক্ষা—দর্শন করবার জন্য বেরিয়েছি; যেন দর্শন হয়, এই আশীর্ব্বাদ করুন। মা ও মহারাজ বলেছেন, "ভয় নেই।" তাঁরা ভুলবেন না, তা বুঝছি। কিন্তু দর্শন চাই।

শ্রীম—১৮৮৮তে আলমবাজার মঠে এই গান হয়, আপনারা তখন জন্মান নি—"এস গুরু দুজন যাই পারে, আমার একলা যেতে ভয় করে," ইত্যাদি।

এইবার তিনি সাধুদের জলযোগ করাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। একজনকে বলিলেন, জল নিয়ে এস।" আর একজনকে বলিলেন, "সাধুদের জন্য খাবার নিয়ে এস।"

জিতেন মঃ—মাষ্টার মশায়, আপনি বসুন।

শ্রীম—এঁরা আপনাদের দর্শন করছেন। আপনাদের দর্শন করলে কর্ম্ম-পাশ ছেদন হয়ে যায়, হৃদয়ের গাঁঠ খুলে যায়। সাধু ভগবান।

জিতেন মঃ—আমরা না বসলে ত আপনি বসবেন না।

শ্রীম—হাঁ, হাঁ।

অবশেষে তাঁহার অনুরোধে বসিলেন এবং বলিতেছেন, "আপনাদের ঠাণ্ডা লাগবে।"

জিতেন মঃ—আমাদের যেন ভুলবেন না।

শ্রীম—(বড় জিতেনকে দেখাইয়া) আমাদের জিতেনবাবু দুয়েতেই রাজী আছেন। (হাস্য)

জিতেন মঃ—(বড় জিতেনের প্রতি) একটু নাড়াচাড়া না দিলে হয় না, মশায়। এতক্ষণ বেশ কথা হচ্ছিল।

এইবারে সাধুরা জলযোগ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাধুরাই প্রেমের অধিকারী

ডাক্তার—(বড় জিতেনের প্রতি)—সাধুরা কি ব্যাকুল! একেবারে প্রাণের কথা খুলে বলেন।

বড জিতেন—রাতদিন ঐ নিয়ে আছেন।

শ্রীম—একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বারান্দায় বেডাতে বেডাতে বলছেন, "কথাটা এই—সচ্চিদানন্দে প্রেম।" এঁরা সেই প্রেমেব অধিকারী।

এই বলিয়া গাহিলেন—

"বাঁশী বাজিল ঐ বিপিনে, কে যাবি তোরা আয়রে।
আমার ত না গেলে নয়, শ্যাম পথে দাঁডায়ে আছে।"

"এদের দেখলে দেহ মন পবিত্র হয়ে যায়।" এই বলিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন—

"কাজকি তোদের শ্যামের কথা কহিয়ে।
আমি আপনি করেছি প্রেম, আপনি বুঝিয়ে
আমি যদি করি মান, শ্যাম আমার রাখেন মান,
হয় হব অপমান শ্যামের লাগিয়ে।"

শ্রীম—দেখি কেউ কেউ মঠে গিয়েছে, আবার বলে, "আমায় খাতির করলে না।" অমন স্থানে কোথায় ভক্তি ভাবে ঠাকুবঘরে বসে ধ্যান জপ করবে, যাতে সাধুদের অসুবিধা না হয়, আশ্রমের পীড়া না হয়, তা নয় ভাবছে, "আমায় খাতির করলে না।" রাই বলছেন, "তোদের শ্যাম কথার কথা।" অর্থাৎ প্রাণের জিনিষ নয়। সত্তা উপলব্ধি করাই প্রয়োজন। অন্য সব দেখবার দরকার কি?

প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি

"অনেক দিনের কথা। জানলা দিয়ে দেখছি একটি তিন বছরের ছেলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে। খেলা করতে করতে বললে, 'আমি

একবার মাকে দেখে আসি।' মাকে দেখে এসে আবার খেলায় যোগ দিলে, মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখে জোর পেয়েছে।

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' (শ্বেতাশ্বতর ৪।২১)

"ঠাকুরকে দেখতাম, এক একবার কৃপাদৃষ্টিতে ভববন্ধন খুলে দিতেন। ঠনঠনের মা কালীর বড় প্রসন্ন মূর্ত্তি।

এটর্নি বীরেনবাবু আসিয়াছেন, ভুবনেশ্বরে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবার জন্য শ্রীমকে বলিতেছেন।

বীরেন—চলুন ভুবনেশ্বর খুব ভাল জায়গা।

শ্রীম—রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনে ছিলেন। ঠাকুরের কাছে চিঠি এল, "বৃন্দাবন বেশ জায়গা। ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করছে।" তারপর চিঠি এল, "রাখালের অসুখ।" ঠাকুর শুনে বললেন, "এখন ময়ূর ময়ূরী নৃত্য দেখাচ্ছে।" ভুবনেশ্বর বড ম্যালেরিয়া জায়গা। রামবাবুকে বলবার জো ছিল না যে যোগোদ্যান ম্যালেরিয়া জায়গা। কারণ তিনি সেখানে ঠাকুরের নিত্য সেবা নিয়ে থাকতেন। ঠাকুর একবার বৈদ্যনাথ গিয়েছিলেন। অনেক বেলা হয়েছে তবু তারা খায় না। ঠাকুব বললেন, "তোমরা কি রকম বড় লোক গা, এত বেলায় খাও।" (হাস্য)।

ইহার পব ভক্তগণ সকলে ছাদে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনশেষে তাঁহারা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫০ ॥

৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ১৯২৫। স্কুলবাড়ী

চারতলার বারান্দায় শ্রীম ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—শিবানন্দ স্বামী, খোকা মহারাজ এঁরা পূর্ব্ববাংলা হয়ে কাশী যাবেন। এবার সুধীরকে (শুদ্ধানন্দ) মঠের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম দেখতে হবে। এতদিন বেশ বেড়াচ্ছিল বালকের মত।

জনৈক ভক্ত—অনঙ্গ মহারাজ তপস্যা করতে যাবেন।

সাধুদের থাক আলাদা

শ্রীম—তা বই কি। কত দিন আর কর্ম্ম ভাল লাগে? কিছুদিন কর্ম্ম করে সাধন-ভজন করবার জন্য নির্জ্জনে চলে যায়। ছাইমাখা সাধুরা বলে, "তোর রোগ সেরে যাবে; বড চাকুরী পাবি, রাজা হবি," ইত্যাদি। নিজের মধ্যেও ঐ রকম বাসনা আছে, 'আমি ইন্দ্রত্ব পাব, রাজা হব।" অধিকাংশ সাধুর এই ভাব। অবতার এসে বলে যান, "এসব কিছুই নয়, সব মিথ্যা, দুদিনের জন্য। ভগবানকে দর্শন করাই জীবনের উদ্দেশ্য।" আমাদের এই সময় জন্ম হয়েছে, ভাগ্য ভাল। (পরিহাসচ্ছলে ভক্তের প্রতি) তুমি ত মোহন্ত হবার চেষ্টায় আছ। (হাস্য) শুনলাম এক জায়গায় মোহন্তকে ডাকাতেরা মেরে পাতকুয়োয় ফেলে দিয়েছে।

তারপর ডাক্তার বিপিন ঘোষ আসিলেন। শ্রীম উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ছাদে আসিয়া বসিলেন। বিপিনবাবু ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

মাস পয়লা

বিপিনবাবু—বারবেলায় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) বেরুতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে বত্রিশ বছর ধরে মিশেছি। একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, দেখি মহারাজ মুখ ভার করে বসে আছেন।

শ্রীম—ভাবিত হয়েছিলেন।

বিপিনবাবু—একদিন মহারাজ ভুবনেশ্বরে রাস্তায় বেরিয়ে বারবেলা বলে আবার ফিরে এলেন।

শ্রীম—ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, "তুমি আজ যাচ্ছ, মাস পয়লা, কে জানে বাবু?"

সন্ধ্যার সময় বিপিনবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম চারতলায় বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত।

ক্ষীরোদ ও সুবোধ

শ্রীম—(গদাধরের প্রতি) কত দূর (অর্থাৎ তোমার বাবাকে কত দূর এগিয়ে দিয়ে এলে)?

গদাধর—আজ তিনি বাড়ী গেলেন।

শ্রীম—তোমাকে কিছু বললেন ?

গদাধর—হাঁ, বললেন, "মাঘ, ফাল্গুনে বাড়ী যেও।"

শ্রীম—তুমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত গেলে না ?

গদাধর—তিনি বললেন, "আর দরকার নেই, আমরা দুজনে যাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও।"

শ্রীম—সদ্বংশ। সহোদর ভাই সাধু। দেখলে, ছেলে ভাল জায়গায় আছে জেনে কিছু আপত্তি করলে না। ঠাকুর একঘর লোকের মধ্যে সুবোধকে দেখে বললেন, "দাঁড়াও দেখি।" শিবমন্দিরে তিনি একদিন তাকে গভীর ধ্যানে মগ্ন দেখেছিলেন। সুবোধ ও ক্ষীরোদ, এরা দুজনে বন্ধু, দুজনেই ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন ; কিন্তু ক্ষীরোদের হল না, ভোগ বাকি ছিল। ঠাকুর একজনকে বললেন, "তুই কোন বন্ধনের মধ্যে নেই।"

রাত্রি অনেক হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫১ ॥

৩০শে নভেম্বর, সোমবার, ১৯২৫। শশী নিকেতন, পুরী

চৈতন্যদেবের অবস্থা

সকাল আটটার পর শ্রীম ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

জনৈক ব্রহ্মচারী—আমার রামেশ্বর দর্শনে যাবার ইচ্ছা হচ্ছে।

শ্রীম—তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করলেই হেঁটে চলে যেতে পার। আমাদের সঙ্গে লোক চাই।—তবে যদি যাওয়া হয়।

ব্রহ্মচারী—হেঁটে গেলে ত ভিক্ষা করতে করতে যেতে হবে।

শ্রীম—না, ভিক্ষা করতে হয় না। তিনি সব জুটিয়ে দেন। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" (গীতা ৯।২২) চৈতন্যদেব রামেশ্বর, বৃন্দাবন, এ সব হেঁটে গিয়েছিলেন। সর্ব্বদা ঈশ্বরভাবে বিভোর। কোন্ দিকে যাচ্ছেন তারও খেয়াল নেই। দিক ভুল হয়ে যাচ্ছে। কাউকে সঙ্গে নেবেন না। খেতেও চান না। ভক্তেরা সঙ্গে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হত, বলতেন, "আমরা এই রাস্তা দিয়ে

যাচ্ছিলাম, দেখা হয়ে গেল।"

বিনয়—মিথ্যা কথা হল না?

শ্রীম—যা বললে ভগবানের শরীর রক্ষা হয়, বা যাতে লোককে ভগবানের পথে নিয়ে যায়, সে কি মিথ্যা কথা? চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আছে, "বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে, ভাব হবে বই কি রে, ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের।" ছ বছব তীর্থভ্রমণ করে সেই যে পুরীতে বসলেন, আব কোথাও যান নি।

এই বলিয়া একটি গান গাহিলেন—

"প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্ম-পর।" ইত্যাদি।

শ্রীম—আমার গৌর বাটসাহিতে (গৌরাঙ্গদেব যে পথে যাইতেন) বাস কববার সাধ ছিল। আর কি এখানে আসা হবে?

তিন রকম সাধু

"ঠাকুব তিন রকম সাধুব কথা বলতেন। এক আছে, যে কেথাও চাইতে যায় না, সব জিনিষ আপনি তাঁব কাছে এসে জোটে। আর এক আছে, 'নমো নারায়ণায়' বলে দাঁড়ায়; দিল দিল, না দিল না দিল। অন্য একবকম আছে, না দিলে জোর করে আদায় কবে। রাধিকা গোস্বামী মণীন্দ্র নন্দীব কাছে এক লাখ টাকা চেয়েছিলেন। রাজা রেগে বলেছিলেন, 'আমাকে কি বোকা ঠাউরেছেন?' গোস্বামী বললেন, 'রাজা, লীলা বুঝতে পাবলেন না।' (সকলের হাস্য)

"একবার একটি সাধুকে দেখেছিলাম, কৌপীন পরা, এক কম্বল সম্বল। সর্ব্বদাই ধ্যানে মগ্ন। মাঝে মাঝে 'শ্রীনাথ' 'শ্রীনাথ' উচ্চারণ করতেন। অনেক লোক তাঁর কাছে এসে ফল, মিষ্টি প্রভৃতি ভেট দিত, কিন্তু তিনি সে সবের দিকে চেয়েও দেখতেন না। কিছুক্ষণ পরে হয়ত সেখান থেকে উঠে গেলেন; জিনিষ সব সেখানে পড়ে রইল। তখন তিনি আসছেন না দেখে, যার যা জিনিষ তারাই খেতে লাগল।

"সাধুসেবার জন্য সঞ্চয় করা যায়, নিজের ভোগের জন্য নয়। মহামায়া পথ ভুলিয়ে দেন, লোকে বুঝতে পারে না। ঘটকালী করতে করতে হয়ত নিজেই বিয়ে করে ফেললে। হয়ত বা মকদ্দমা করতে যেতে হল।"

সন্ধ্যা হইতে অল্প বাকী আছে। শ্রীম সমুদ্রের ধারে মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর

বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছে। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত।

শ্রীম—ঈশ্বর আমাদের এমনি গড়েছেন যে নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন দৃশ্য দেখতে চাই। পুরানো জিনিষগুলিতে মন বসে না। বুড়ো হয়েছি, তবু ব্যাঙ্গালোর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

(ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া) "এ রামেশ্বব যেতে চায়। একে টাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দাও ত যাবে। তা না হলে বলবে, 'আর গিয়ে কি দবকার? এইখানেই হবে।' আগেকার লোকেরা সব পদব্রজে তীর্থ করতেন। চৈতন্যদেব হেঁটে গিয়েছিলেন।"

জনৈক ভক্ত—পরিব্রাজক ভাব নিলে মন ভাল থাকে।

শ্রীম—গুরুই বলে দেন অধিকারী দেখে। যে যেমন অধিকারী তাকে সেই বকম বলেন। কাউকে বলেন—তীর্থ করে এস। কাউকে বলেন—এক জায়গায় বসলেই হবে। মঠের জ্ঞান মহারাজ অনেক ঘুরে ঘুরে এখন মঠেই থাকেন। সেখান থেকে আর কোথাও যান না। স্বামীজী অনেক জায়গা বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ ও কামাবপুকুব হয় নি। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) তুমি বলছিলে পেটেব জন্য ভিক্ষা কবতে হয়। চৈতন্যদেব কি করেছিলেন? যদি আগুন জ্বলে, বাদুলে পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। ভক্তেরা ছুটে আসে। বলে—কি চাই, মহারাজ?

নাচকেতা

"কঠোপনিষদে আছে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। যম নচিকেতাকে কত প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। কিন্তু নচিকেতা শ্রেয়েব অধিকারী বলে ভোগ্যবস্তু কাক-বিষ্ঠাব মত ত্যাগ করলে। মরে যাব সেও ভাল তবু প্রেয় চাই না। যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণ অনশনে থাকব। সদ্‌গুরু প্রেয়ের দিকে যেতে দেন না। শিষ্য কেবল প্রেয়েব দিকে ছুটছে, আর গুরু টেনে টেনে রাখছেন। ঠাকুর বাঘের গল্প বলতেন। বাঘের ছানা ভেড়ার পালের সঙ্গে থেকে ভেড়ার মত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মত ভ্যা ভ্যা করত। একটা বাঘ তাকে দেখতে পেয়ে টেনে হিঁচড়ে তার মুখে মাংস গুঁজে দিল। তখন মাংসের আস্বাদ পেয়ে বাঘের মত গর্জ্জন করে তার সঙ্গে বনে চলে গেল। গুরু বাপের মত চড় দেন, আবার মায়ের মত স্নেহ করেন। আমি সত্যিকার চড় খেয়েছিলাম। ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে ছিলেন তখন এক চড়

বসিয়েছিলেন। মায়েব চড় খেয়ে ছেলেটা কাঁদে, আবার সিধে হয়ে যায়।"

পুরুষ প্রকৃতি

ভক্ত—আমি একটা ঘটনা শুনেছিলাম। একদিন জয়পুরের রাজার বাড়ীতে গান বাজনা হবে, তাই রাজা তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সঙ্গে একজন সাধুকেও তাঁবা নিয়ে গেছেন। মেয়েদের নাচ শেষ হলে তারা হাতের ভঙ্গী করে সকলের কাছে টাকা চাইলে রাজা ও তাঁর বন্ধুরা যে যেমন পারলেন দিলেন। সাধুকে যে ফুলের মালা দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেই মালাটি তাদের দিলেন। রাজা ঠাট্টা করে সাধুকে বললে, "আপনি দেখি ফুলের মালাতেই সেরে দিলেন?" কিন্তু দেখতে দেখতে মালাটি হীরার মালা হয়ে গেল।

শ্রীম—আহা! আহা! "যাব ভয় কর তুমি, সেই দেবী আমি!" যা ত্যাগ করবার জন্য এত তপস্যা, নির্জ্জনবাস, আবার সেই কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে নাডাচাড়া। ফুলের মালাকে হীরার মালা না করতে পারলে আর সাধু কি? সনাতন গোস্বামী গরীব ব্রাহ্মণকে সাত রাজার ধন মাণিকটি পা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, স্পর্শ করেন নি। ব্রাহ্মণ মাণিকটি পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল, পাছে তার কাছ থেকে আবার নিয়ে নেয়। কিছু দূর গিয়ে তার চৈতন্য হল —তাইত, তিনি এমন কি ধন পেয়েছেন যে সাত রাজার ধন মাণিককে ধন বলে গ্রাহ্য করলেন না, পা দিয়ে ঠেলে দিলেন। তখন সনাতন গোস্বামীর পা ধরে কেঁদে বললে, "আপনি যে ধনে ধনী, সেই ধন আমাকে কিছু দিন, আমার পার্থিব ধনে প্রয়োজন নেই।" এই বলে মানিকটি জলে ফেলে দিলে।

"ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ কবতে পাবতেন না। সিদ্ধাইকে বলতেন, 'বেশ্যার বিষ্ঠা।' তিনি বলতেন, "সাধু মেয়েদের চিত্রপট দেখবে না।"

ঠেকে শেখা—দেখে শেখা

ভক্ত—জগন্নাথ মন্দিরের গায়ে ওকি ছবি দিয়েছে, যত অশ্লীল ভাবের মূর্ত্তি!

শ্রীম—রাতদিন তাই হচ্ছে। আপনি Botany (উদ্ভিদ্‌বিদ্যা) পড়েন নি? মেয়ে পুরুষ নিয়ে সারা দুনিয়া চলেছে। পুরুষ স্ত্রীকে চায়, স্ত্রী পুরুষকে চায়। পুরুষ-প্রকৃতির লীল চলেছে। ভেতরে যা গজ গজ করছে, বাইরে সেইটে প্রকাশ করলেই অসভ্যতা? কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। এই মায়া

পার হলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু একবার মায়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবেই। তাই ঠাকুর বলতেন, "আগে ভারি সব উৎকট সাধনা ছিল।" কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। সাধুরা দেখে শিখবে; তাদের ঠেকে শেখবার দরকার নেই। অন্যেরা এই মায়াতে হাবুডুবু খাচ্ছে। সাধুরা তাদের দেখে সাবধান হবে। তবে তাদের চৈতন্য হবে।

"এই মহামায়ার ভেতর থেকে কি করে বলা যায় আমি তাঁকে feel (অনুভব) করেছি? এক অবতার বলতে পারেন। ঈশ্বর যাঁকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন, তাঁকে পুরুষকার দেন, যেমন স্বামীজী, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকে। পুরুষকার রূপেও তিনি বর্ত্তমান। 'শব্দঃখে পৌরুষং নৃষু' (গীতা ৭।৮)। নাবাতে কতক্ষণ? তাই ভাল উপায় হচ্ছে তাঁর শরণাগতি, শরণাগত হয়ে থাকা।"

এইবার শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। ধ্যানান্তে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখুন, তিনিই একরূপে চন্দ্র হয়ে আছেন। 'নক্ষত্রাণামহং শশী' (গীতা ১০।২১)। আবও দেখুন, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি নক্ষত্র গ্রহগুলি জ্বল জ্বল করছে। নীচে সাগর, কূল কিনারা নেই, অসীম অনন্ত। আমাদের ভাগ্য ভাল যে এ সব দেখতে পাচ্ছি।"

এইবার সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫২ ॥

১লা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯২৫। শশী নিকেতন, পুরী

বিদেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রভাব

শ্রীম আহারান্তে ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন—কাছে বিনয় ও গদাধর।

শ্রীম—(গদাধরের প্রতি) "দেখ আমেরিকা থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি, তাতে সে-দেশের একজন লিখেছেন যে তিনি ঠাকুরের পূজো করছেন। আমরা কেবল হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছি, আর সে-দেশের লোকেরা তাঁকে পূজো করছে—জীবনের আদর্শ করছে। আবার লিখেছেন, "আপনার

সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় নাই, তথাপি পত্র লিখিতেছি। আমি জানি, ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না; কারণ আমি যখন তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) পূজো করি, তখন আমিও আপনাদের আপনার লোক।"

"এই Gospel of Ramakrishna (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত) টনী সাহেবকে* উপহার দিয়েছিলাম। তিনি ঠাকুরের কথা পড়ে অবাক। চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন, 'আগে মনে করতাম ভারতবর্ষকে বুঝে ফেলেছি, কিন্তু এই বই পড়ে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানি না।"

শ্রীম এইবার বিশ্রাম করিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা

বৈকাল প্রায় পাঁচটা। শ্রীম সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইতেছেন। সঙ্গে দুই তিনজন ভক্ত কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর বাড়ীর চাতালে বসিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীম—অন্ধকার রাত দেখে ঠাকুরের কথা মনে পড়ছে। সেই দক্ষিণেশ্বরে রাত্রে গভীর অন্ধকারে বসে "মা" "মা" বলে কাঁদছেন—"মা আমায় দেখা যে দিতে হবে। তোমা বই আমার ত আর কেউ নেই, মা। মা ছাড়া ছেলে কি করে থাকবে মা?"

"ঠাকুরের কাছে একজন এসে বলেছিল, "আমার কেউ নেই, আমি অসহায়', শুনে ঠাকুর নাচতে লাগলেন, বললেন, 'আহা! যার কেউ নেই, তারই ভগবান আছেন।' ঠাকুর ঐ পথ দিয়ে গিয়েছেন কিনা। ছেলেবেলা থেকে অর্থাভাব—বরাবর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। পিতৃবিয়োগের পর কলকাতায় এসে বাড়ী বাড়ী পূজো করতে হল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যখন মা কালীর সেবা করতেন তখন অন্য ভাব—রাত দিন 'মা' 'মা' রব, শরীরের দিকে নজর নেই, খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকত না। সারাদিন মা কালীর সেবা করে গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতে এসে ধ্যান করতেন। খাবার সময় হলে হৃদয় ডেকে ডেকে এনে খাওয়াত।

কর্ম্ম ও আদেশ

"'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।' ঠাকুর বলতেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা। ব্যাকুল হয়ে নির্জ্জনে গোপনে তাঁকে ডাকতে

---

* টনী সাহেব কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

হয়।’ হয় নিঃসঙ্গ, না হয় সাধুসঙ্গ। তাঁকে লাভ করার পর যদি আদেশ পাও ত কর্ম্ম কর। তাঁর সঙ্গে যোগ রেখে তবে কাজ-কর্ম্ম।

ভক্তদের প্রতি টান

“ভক্তদের দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছে টেনে টেনে রাখতেন। একজন কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়ী হয়ে ফিরে আসবে বললে। তিনি বললেন, ‘আবার বাড়ী যাবে? এখানে ত বেশ আছ।’ কয়েক ঘণ্টার জন্য যাবে, তাও তাঁর ইচ্ছা নয়।

“বলরামবাবুর বাড়ীতে স্বামীজীকে বললেন, ‘একটু গা না।’ স্বামীজী বললেন, ‘কাজ আছে।’ ঠাকুর বললেন, ‘তা আমাদের কথা শুনবে কেন বাছা? ‘যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা আনা’ ইত্যাদি। অবশেষে ঠাকুরের কথায় স্বামীজী গাইতে লাগলেন এবং গাইতে গাইতে কেঁদে ফেললেন। স্বামীজীকে দেখবার জন্য মাঝে মাঝে অত্যন্ত ব্যাকুল হতেন। আমাকে স্বামীজীর কাছে তিনবার পাঠিয়েছিলেন।

গুরু

“গুরু ইহকাল পরকাল দেখেন। কোন হেতু নেই অথচ ভালবাসা। তাঁর কি অহৈতুক প্রেম। তাঁকে কি ভোলা যায়? কোন্ গুণে যে আমাদের ওপর তাঁর এত কৃপা তা কে বলতে পারে!”

ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে শ্রীম কাঁদিতেছেন। কাপড় দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন। পরে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে সমুদ্রের ধারে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

জনৈক ভক্ত—পূজা কি বরাবর করতে হবে?

শ্রীম—অনেকগুলি কড়ি জমিয়ে পয়সা, পয়সা জমিয়ে টাকা, আবার টাকা জমিয়ে মাণিক করা যায়। যত দামী জিনিষ হবে তত কমে যাবে। এক ধনীর অতুল সম্পত্তি ছিল। তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিক্রি করে একটি মাণিক কিনে গলায় হার করে রেখে দিয়েছেন। সেই রকম ভক্তি হলে সকল কর্ম্ম কমে যায়। গুরু যা বলেন সেই অনুযায়ী চললে কাজ কমে যাবে।

“কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ॥ (গীতা ৪।১৬)

“সাধারণ লোকে কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, কোন্ পথ আশ্রয় করলে কর্ম্মবন্ধন

-কেটে যায়, এসব কিছুই জানে না। গুরুই সব বলে দেন। তাই তাঁর বাক্যে বিশ্বাস ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।”

যাইতে যাইতে বলিতেছেন, “সত্যচরণবাবুর শরীর ত্যাগ হয়েছে শুনে বড়ই দুঃখ হল। আমাদের দেহবুদ্ধি রয়েছে কিনা, তাই অপরের দুঃখ দেখলে কষ্ট হয়। ঈশ্বরের কাছে এসব বায়স্কোপের মত—আনন্দে সৃষ্টি, আনন্দে পালন, আনন্দে সংহার করছেন।”

॥ ৫৩ ॥

২রা ডিসেম্বর, বুধবার, ১৯২৫। শশী নিকেতন, পুরী

পৃথিবীর মহাশ্চর্য্য—অবতার

সকাল সাড়ে দশটা। শ্রীম ঘরে বসিয়া আছেন। আশুবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, “আপনাকে দেখব বলে আসি, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হয় না।

“রামেশ্বর থেকে একখানা চিঠি পেলুম; তাতে লিখেছে ওখানে এখনও শীত পড়েনি। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের বিবরণ পড়ে মনে হল যেন রামেশ্বরেই আছি।”

শ্রীম—দেখুন বৈজ্ঞানিকরা কত wireless (বেতার), এয়ারোপ্লেন, টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছে, সে সমস্ত দেখা হল। কিন্তু জগতের আর একটি আশ্চর্য্য বস্তু অবতারকে দেখলাম। অবতার সব চেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ। দেখতে সাধারণের মত, কিন্তু কি অদ্ভুত লোক! জগতের লোকের সঙ্গে তাঁর মেলে না। ঠাকুর বলতেন “অচিনে গাছ দেখেছ?” অবতার হচ্ছেন অচিনে গাছ। রাত-দিন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। মানুষ যে পথে চলে, তিনি তার উল্টো পথে চলেন।—বলিয়া গাহিতে লাগিলেন—

“মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
মনের মানুষ হয় যে জনা তার নয়নেতে যায় গো জানা,
সে দুই এক জনা।
ভাবে ভাসে, রসে ডোবে, ও সে উজান পথে করে আনাগোনা॥”

শাস্ত্র চিনিতে বালিতে মেশানো

শ্রীম—একজন ঠাকুরকে বললে, "ঈশ্বরের একাংশে জগৎ রয়েছে।" ঠাকুর বললেন, "ঈশ্বরকে বুঝে ফেলেছ আর কি!" তাই তিনি বলতেন, "বুঝতে চাই না মা; জানতে চাই না মা; আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও। মা, এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?"

"গুরুর কাছে শাস্ত্র পড়া উচিত। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। বালি খেলে ব্যামো হবে, তাই সে অংশটা পড়তে নেই। সিদ্ধ গুরু কাছে থাকলে তবে তিনি বুঝিয়ে দেন। ঠাকুরকে মা জানিয়ে দিয়েছিলেন। শাস্ত্র শুনে চিনিটুকু (সারাংশ) নেবে।"

মানব-জন্ম ও মুক্তি

রাত্রি প্রায় নয়টা। শ্রীম ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছেন। কাছে দুইটি ভক্ত।

শ্রীম—আহা, আহা, ঈশ্বর কি সুন্দর মানুষ তৈরী করেছেন! এই মানুষ তাঁকে চিন্তা করতে পারে, তাঁর দর্শন পায়, তাঁর সঙ্গে কথা কয়। মানুষকে তিনি মন, বুদ্ধি দিয়েছেন। তা দিয়ে স্মরণ মনন করে। এগুলি ভাবলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। শুনেছি কোটি জন্মের পর জীব মানব-শরীর ধারণ করে। তাঁকে না পেলে নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়; তাঁকে পেলে আর জন্ম হয় না। কারও কারও ব্রহ্মলোকাদি থেকে মুক্তি হয়। অনন্ত চশমা (দৃষ্টিভঙ্গী)। সকলকে তারই এক একটা পরিয়ে দিয়েছেন। যাকে যেমন চশমা পরিয়েছেন সে সেই রকম দেখে। একজনের খেলা হয়ে গেল ত আর একজন নাচছে। এ যেন রঙ্গমঞ্চ। একদল যায় ত আর একদল আসে। ঠাকুর বলতেন, "এই রকম দেবলীলা, নরলীলা, ঈশ্বরলীলা চলেছে।" আমাদের যতটা ধারণা করবার শক্তি দিয়েছেন, ততটুকু ঈশ্বরকে বুঝতে পারি। ততটুকু ঈশ্বরের অনুভূতি হচ্ছে। এর চেয়ে বেশী যদি দেখান তা হলে অর্জ্জুনের মত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে যাব। "কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী" (গীতা, ১১।৩৫)।

"কেউ কেউ তাঁকে আশ্চর্য্যময় দেখেন, কেউ কেউ তাঁর বিষয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বলেন, কেউ কেউ আশ্চর্য্য হয়ে শোনেন, কেউ কেউ বা শুনেও তাঁকে বুঝতে পারেন না (গীতা ২।২৯)। যেমন, অসীম কারণসলিলের মধ্যে বিষ্ণুর

নাভি-কমল থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমি কোথা হতে এলাম, এই পদ্মের মূলই বা কোথায়?' ইত্যাদি। তখন অশরীরী বাণী হল, 'তপস্যা কর, তপস্যা কর, তবে সকল বিষয় জানতে পারবে।'* তখন ঈশ্বরই ঐ কথা বলছেন বলে তিনি বুঝতে পারেন নি।"

ভক্ত—দেবতারা মানুষ হতে ইচ্ছা করেন কেন?

শ্রীম—স্বর্গ ভোগের স্থান, সেখানে ভোগ ছাড়া শক্ত। কিন্নরী, অপ্সরা নিয়ে থাকা, এই সব সুখ। মানুষের জীবনে দুঃখ আছে; সে ভোগ ছাড়তে পারে; কাজেই ঈশ্বরের দিকে তার মন যায়।

॥ ৫৪ ॥

৭ই ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯২৫। শশী নিকেতন, পুরী

জানকীবাবুর সঙ্গে

আজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব। সৈকতালয়ে স্বামী সিদ্ধানন্দ বিশেষভাবে মায়ের পূজাদি করিয়া ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করিলেন। কিছু প্রসাদ শ্রীমর কাছেও পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে শ্রীম সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া শশী নিকেতনে আসিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেশ ঘোষ,† জানকীবাবু ও হরেনবাবু শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিলেন। সিদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত আছেন।

জানকীবাবু আরাম-চেয়ারে উপবিষ্ট। তিনি কটকের বড় উকীল। শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর পিতা।

শ্রীম—(জানকীবাবুর প্রতি) আপনি ঠাকুরকে দর্শন করেন নি?

জানকীবাবু—না, ঠাকুরের যখন অসুখ তখন আমি Law (আইন) পড়ি। কেউ কেউ তাঁকে বলত পাগল। পরে (ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর) দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি ঘুরে দেখেছি।

---

* শ্রীমদ্ ভাগবত, ২।৮।৯

† বলরাম বসুর জামাতা, যিনি ভবানীপুর গদাধর-আশ্রম-বাটী বেলুড় মঠকে দান করিয়াছেন। পুরীতে শেষ জীবন কঠোর সাধনভজন করিয়া কাটাইতেন।

শ্রীম—আপনার এখন বয়স কত ?

জানকীবাবু—আমার বয়স ৬৫ চলছে।

শ্রীম—স্বামীজীর বয়সী, আমাদের এখন বৃদ্ধাবস্থা।

জানকীবাবু—এঁরা (যোগেশবাবু প্রভৃতি) আসছিলেন, সেই সঙ্গে আমার সুযোগ হয়ে গেল। আপনার দর্শনও হল।

শ্রীম—এই বয়সে ভগবানের চিন্তা করা উচিত। আগে রাজা ও মুনিঋষিরা ৫০ বৎসর হলে বনে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করতেন। সামনে মৃত্যু। পরমহংসদেব বলতেন, "মাছ ধরবে বলে বক তাক করে বসে আছে, মাছের উপরই দৃষ্টি, আর কোন দিকে হুঁস নেই। জানে না তার পিছনে ব্যাধ বাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এখনই তাকে বধ করবে। সেই রকম যম কালপাশ নিয়ে তাকিয়ে আছে—সময় হলেই এসে ধরবে।" সবতাতেই মৃত্যুর ছাপ, লোকে ভোগ কি করবে ? খাবার যোগাড় হলেও অভ্যাস ছাডতে পারে না, তবু কর্ম্ম করতে চায়। তাই মাঝে মাঝে নির্জ্জনে পালিয়ে আসি, যদি পারি তাঁকে চিন্তা করব।

জানকীবাবু—পারছেন ত ?

শ্রীম—প্রভুর কৃপায় দুমাস আছি। ঠাকুর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তুলতে দিতেন না। কেউ যদি বিষয়ের কথা বলত ত তাঁর কষ্ট হত। অশ্বিনী দত্তের বাবা খুব ভাল লোক ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার দেখে ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে তিন দিন রেখেছিলেন। ঠাকুরের কাছে উকীল, মোক্তার সব যেত; তাঁদের সঙ্গে বসে তিনি একদিন মকদ্দমার বিষয় আলোচনা করছিলেন। সেই সময় ঠাকুরের সমাধি হয়। সমাধির পর হাত জোড় করে বললেন, "বাবু, ওসব কথা বলো না। ওতে আমার কষ্ট হয়।" অশ্বিনী দত্তের বাবা অতি নম্রভাবে বললেন, "আমাদের ত রোগ চিনলেন। এখন ওষুধ দিন, যাতে এ রোগ সারে।"

নদের গৌরাঙ্গ—সেই আমি

"আমরা তাঁকে দেখেছি, যার সঙ্গে কথা কইতেন। স্বামীজীর বয়স তখন উনিশ; ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয়, ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই নদের গৌরাঙ্গ জানিস ? সেই-ই আমি।' স্বামীজী আমার কাছে গল্প করলেন, আর বললেন, 'উনি পাগল নাকি ?' তার পর তিনিই আমেরিকাতে প্রচার করলেন, 'অবতার চিন্তা ভিন্ন

অন্য কোন উপায় নেই। ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কি ধারণা করবে! এক আনাড়ী শিব গড়তে বানর গড়েছিল। যারা ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপক, অনন্ত, নিরাকার বলে প্রচার করে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, তারা নিরাকার বলতে কি বোঝে, কতকগুলি শব্দের বানান ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ঈশ্বর স্বরূপ যতই কল্পনা কর না কেন, তোমার কল্পিত ঈশ্বর অবতার অপেক্ষা নীচু। মানুষের মানুষরূপী ভগবানের পূজা ছাডা আর অন্য উপায় নেই।'

"অবতারে তিনি বেশী প্রকাশ। এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? এক কাঁচ্চা বুদ্ধিতে কি অনন্তকে ধারণা করতে পারে? তাই অবতারকে চিন্তা করলে তাঁকে চিন্তা করা হয়। তাঁকে পূজা করলে ঈশ্বরকে পূজা করা হয়। ফিলিপ যখন বলেছিল,—'হে প্রভো, আপনি আপনার পিতাকে দেখিয়ে দিন, ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, 'সে কি ফিলিপ, এতকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে বাস করলাম, তবু তোমরা আমাকে চিনতে পারলে না। যারা আমাকে দেখেছে, তারা আমার পিতাকে দেখেছে। আমি তাঁতে, তিনি আমাতে; আমি ও আমার পিতা এক—অভেদ।'*

"অন্য এক অবস্থাতে অন্যপ্রকার বলেছেন। একজন এসে ক্রাইষ্টকে সম্বোধন করে বললে, "মঙ্গলময় প্রভো, আপনি অমৃতত্ব লাভের উপায় বলে দিন—কি করলে অমৃতত্ব লাভ কবা যায়।' তখন ক্রাইষ্ট বললেন, 'আমাকে কেন মঙ্গলময় বলছ? এক ঈশ্বর ছাডা আর মঙ্গলময় নেই। যদি অমৃতের অধিকারী হতে চাও তবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস কব এবং তাঁর আদেশ পালন কর।'†

"ঠাকুর এ অবস্থাকে ভক্তের অবস্থা বলতেন। যখন তাঁর ভক্তের অবস্থা, তখন কেউ তাঁকে কর্ত্তা, গুরু, বাবা বা ঈশ্বর বললে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, 'একঘেয়ে কেন হব? এক ফোকডের বাঁশী থেকে কেবল একটি পোঁ শব্দ বেরোয়, আর সাত ফোকডের বাঁশী থেকে নানা রাগ রাগিণী বেরোয়। আমি পোঁ ধরে থাকব কেন?' তিনি কখনও সখ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও বা মধুর-ভাবে ঈশ্বরকে আস্বাদন করতেন। আবার কখনও বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবে থাকতেন। তাঁর নানা অবস্থা হত। তাঁর এই ভাবটি ছিল অন্য ভাব ছিল না বললে ভুল করা হবে।

* St. John, 14.

† St. Leuke. 18

"তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন। বলতেন, 'বিচার করব কি? আমি যে দেখছি তিনি সব হয়ে আছেন।' স্বামীজী যখন বললেন, এ সব আপনার মনের ভুল।' ঠাকুর বললেন, 'তোর কথা ঠিক নয়।' মা বললেন, 'আমি যা বলি সে সব প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে মেলে, সে সব কেমন করে মিথ্যা হবে'?"

জানকীবাবু—আমি খুব বিশ্বাস করি। পরমহংসদেব কলুটোলার হরিসভায় চৈতন্যদেবের আসনে বসেছিলেন। তিনি অবতার, আমার খুব বিশ্বাস।

যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ

শ্রীম—আমাদের একছটাক বুদ্ধিতে কি বুঝব? তাই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর যখন অসুস্থ, অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা, তখন স্বামীজী ভাবছেন, এই সময় যদি ঠাকুর বলেন, "আমি অবতার," তা হলে বিশ্বাস করি। তখনি বললেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।"

জানকীবাবু—কেশববাবু পরম ভক্ত ছিলেন।

শ্রীম—হাঁ, উত্তম অধিকারী। ঠাকুর তাঁকে খুব ভালবাসতেন। একদিন বলেছিলেন, "তোমার অনেক কাজ-কর্ম্ম, ভগবানে সব মন দেবার অবসর নেই। যেন অন্ধকার ঘর, একটু ছেঁদা দিয়ে আলো দেখতে পাচ্ছ।"

"সাধুরা সর্ব্বত্যাগী। তাই তাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরে সব মন দিতে পারেন। ঠাকুর কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার ক আনা জ্ঞান হয়েছে?' কেশববাবু বলেছিলেন, 'ষোল আনা।' ঠাকুর বললেন, 'তোমার কথায় বিশ্বাস হল না। যদি শুকদেব, নারদ এঁরা বলতেন তা হলে একটু বিশ্বাস হত।' তার মানে—তুমি কি নিয়ে আছ? সংসারের বিষয়, যশ, মান, ইন্দ্রিয় সুখ। এই মন নিয়ে ভগবানকে বিচার করলে ভুল হবে। শুকদেব, নারদ, এঁরা সংসারত্যাগী, শুদ্ধমন; তাই তাঁদের কথা বিশ্বাসযোগ্য। কেশববাবুকে যে অপদস্থ করলেন তা নয়, তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাই বুঝিয়ে দিলেন।"

জানকীবাবু—ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কি করে দেখা হল?

শ্রীম—ধাক্কা খেয়ে। অশান্তিতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে বরানগরে ভগ্নীর বাড়ীতে ছিলাম—ঈশান কবিরাজের বাড়ী। সেখান থেকে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী দর্শনের জন্য সিধুবাবু (ভাগ্নে) আমাকে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার সময় যখন পরমহংসদেবের ঘরে ঢুকব, সেই সময় বৃন্দে ঝির সঙ্গে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইনি কি খুব বই পড়েন?" সে বললে, "বাবা, শাস্তর টাস্তর তাঁর মুখে।" ভক্তসঙ্গে কথা বলবার সময় প্রথমে একটা কথা আমার কানে এল, "যখন ভগবানের নামে অশ্রুপুলক হবে, তখন জেনো পূজাদি কর্ম্ম আর বেশী করতে হবে না।"

"দ্বিতীয় দিনে মাটির প্রতিমা পূজোর কথা উঠল। তাতে বললেন, 'মাটি কেন গো চিন্ময়ী মূর্ত্তি।' আমি বললাম, 'তাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।' এক ধমক দিয়ে বললেন, 'নিজেকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই, অপরকে বোঝাবে। আপনার চরকায় তেল দাও। অপরকে ভগবান করেছেন—যদি প্রয়োজন মনে করেন, তিনি বুঝিয়ে দিবেন'।"

জানকীবাবু—আমাদের ত সে দৃষ্টি নেই, মাটির প্রতিমা পূজা করতে করতে যদি ভক্তি আসে।

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, "বিশ্বাস করে কামনা না রেখে একখানা ইঁট পূজো করলেও তাইতে ভগবানের আবির্ভাব হয়।" তাই তিনি ভক্তদের এত ভালবাসতেন। "আমার কোন ঐশ্বর্য্য নেই, তবু এরা আসে, আমাকে দেখতে।" শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে গোকুলে পাঠালেন, বললেন, "আমার যখন কোন ঐশ্বর্য্য ছিল না, তখন গোপগোপীরা আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। আমা বই তারা কিছু জানত না। এখন আমি রাজাদের সিংহাসনে বসাচ্ছি, লোকেরা মানবে, স্তুতি করবে, ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করবে, এ আর আশ্চর্য্য কি। আমি কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় তাদের খবর নিতে পারিনি; যাও উদ্ধব, একবার তাদের খবর নিয়ে এস।" এই বলে শ্রীকৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন। প্রেমের শরীর কিনা।

"আজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি, সব আশ্রমে আজ তাঁর পূজো উৎসব। আমেরিকাতে পর্য্যন্ত তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজো করছে। যারা মায়ের কাছে দীক্ষিত তাদের বাড়ীতেও পূজো হচ্ছে।

জানকীবাবু—ঠাকুর মন্ত্র দিতেন?

শ্রীম—না, বলতেন, "মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন, আমার দেবার জো নেই।" তাঁর অবস্থা হত কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ।

জানকীবাবু—গাঢ় ভক্তি হলে লোমকূপ দিয়ে রক্ত পড়ে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পড়ত।

শ্রীম—কই, আমরা ঠাকুরের দেখিনি। ঠাকুর বলতেন, "মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না—শতসিদ্ধি চাই না, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।" আর বলতেন, "লোকমান্যে ঝাঁটা মারি।"

কথাবার্ত্তার পর জানকীবাবু প্রভৃতি বিদায় লইতেছেন, তাই তাঁহাদের সকলকে প্রসাদ দেওয়া হইল। শ্রীম নিজ হাতে অনেককে প্রসাদ দিলেন।

শ্রীম—আজ ঈশ্বরীয় কথায় বেশ কাটল। মুক্তি ও (স্বামী নির্গুণানন্দ) বোধ হয় দ্বাবকা যাবে।

(সিদ্ধানন্দের প্রতি) "তোমার চাবধাম হয়ে গেছে, অমরনাথও?"

সিদ্ধানন্দ—হাঁ।

শ্রীম—স্বামীজীর বদরীনারায়ণ, কামারপুকুর ও পুরী হয় নি। ঠাকুর বলতেন, "কাশী, বৃন্দাবন, এই দুটো হয়ে গেলেই হল।"

সিদ্ধানন্দ—লাটু মহারাজও তাই বলতেন।

শ্রীম—মাও তাই বলতেন, একদিন বললেন, 'অত তীর্থ ঘুরে এলাম, কিছু মনে নেই।"

সিদ্ধানন্দ—মা বুড়ো বয়সেও ভক্তদের জন্য কত খাটতেন। রাতদিন ভক্তদেব সেবা। একটু বিশ্রাম ছিল না। জয়রামবাটীতে আমরা গেলে কাছে বসে খাওয়াতেন। যেদিন বিদায় নিয়ে আসব, সেদিন বেশী করে খাওয়াতেন। বলতেন, "বাস্তায় ত আব হবে না।"

শ্রীম—থালায় ভাত বাডা দেখে বোঝা যেত মা বেড়েছেন। চেপে চেপে ভাত বাডতেন, যাতে বেশী না দেখায়। কোন ভক্তেব বাড়ীতে মা গিয়েছেন, সাধুবাও এসেছে। ভক্তটি হয়ত জলখাবার দিয়ে কাজ সাবছেন। মা বলতেন, "না না, ওতে হবে না, পেট ভরে খাইয়ে দাও, আবার কখন খাওয়া হবে না হবে।" তাঁব কথা কি ভোলা যায়?

"গৌবী মা বলতেন, 'ওঁব বই (কথামৃত) পড়ে যত লোক মাকে জ্বালায়—রাত দিন লোক লেগে রয়েছে। মানুষের শরীর ত।' উনি চাকর বামুন রেখে দিন। আমি উদ্বোধনে নীচে বসেছিলাম, কিছু বললাম না। মনে ভাবলাম যে এ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে, মানুষ কি করবে?"

॥ ৫৫ ॥

১০ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯২৫। শশী নিকেতন, পুরী

নির্জ্জনপ্রিয়তা

একজন ব্রহ্মচারী আজ শশী নিকেতনে ভিক্ষা করিলেন। শ্রীমর ভোজন শেষ হইয়াছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। শ্রীম সৈকতালয়ে যাইতেছেন। বাড়ীটি আধ মাইল দূরে অবস্থিত এবং খুব নির্জ্জন। ব্রহ্মচারীও সঙ্গে চলিলেন। পথের দুই পাশে গাছপালা। মাঝে মাঝে জঙ্গল।

শ্রীম ঐ সকল দেখিয়া আনন্দে বলিতেছেন, "বাঃ বাঃ, বেশ নির্জ্জন।"

একটি গাভী তাহার নবপ্রসূত বৎসটিকে স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছে এবং মাঝে মাঝে তাহার গা চাটিতেছে। শ্রীম তাহা দেখিয়া বলিলেন, "দেখলে, ঈশ্বর কেমন পালন করবার জন্য স্নেহ দিয়েছেন?" এইবার রাস্তার ডান দিকে বসিলেন। কেহ কোথাও নাই। বলিলেন, "এখন চুপ কর, এখানে বসে তাঁকে আস্বাদন করি। জালার মাছ পুকুরে ছেড়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি নির্জ্জনে এলে মন আনন্দ-সাগরে বেড়ায়। নির্জ্জন ভাল লাগে কেন? পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ছিল। ঠাকুর বলতেন, "তোমার পূর্ব্বের সংস্কার আছে; তা না হলে ঘন ঘন আসবে কেন? তাই ত যোগীরা ধ্যান করে পূর্ব্ব-জন্মের খবর বলে দেয়। যে গুরুর সৎকথা শোনে না, বুঝতে হবে যে তার এবার প্রথম মনুষ্য জন্ম, সংসারে এসেছে ভোগ করতে।" তারপর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। নিস্পন্দ দেহ। ধ্যানের পর আবার রাস্তায় আসিলেন। কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে দেখা গেল কতকগুলি গরীব ছেলে শুকনো কাঠ কুড়াইতেছে। তাহাদের দেখিয়া বলিতেছেন, "আহা! আহা! কত কষ্ট করছে। কাঠ কুড়িয়ে না নিয়ে গেলে মা-বাপ বকবে, মারবে। তোমার কাছে পয়সা আছে?"

ব্রহ্মচারী—না।

শ্রীম—সঙ্গে পয়সা নিয়ে বেরোন উচিত ছিল।

যখন 'সৈকতালয়ে' পৌছিলেন তখন সিদ্ধানন্দ স্বামী তথায় ছিলেন না। শ্রীম বাড়ীর ফুলের বাগানটি ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেখান হইতে

সমুদ্র বেশ দেখা যায়। পূর্ব্ব দিকে মাঠ। ঐ সকল দেখিয়া বলিতেছেন, "এর নাম সিদ্ধাশ্রম রাখিলে হয়। বিশ্বামিত্র ঋষি যখন যজ্ঞরক্ষা ও মারীচ বধের জন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যান, তখন তিনি রাস্তায় একটি স্থান দেখিয়ে তাঁদের বললেন যে এটি সিদ্ধাশ্রম। এখানে বিষ্ণু তপস্যা করেছিলেন।"* শ্রীম কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া শশী নিকেতনে ফিরিলেন।

॥ ৫৬ ॥

১১ই ডিসেম্বর, শুক্রবার, ১৯২৫। পুরী।

ছেলে ধরা

আজ শ্রীম সকালে বেড়াইতে বেড়াইতে 'সৈকতালয়ে' আসিয়াছেন। তথায় কিছুক্ষণ ধ্যানান্তে বালির রাস্তা ধরিয়া শশী নিকেতনের দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে জনৈক ব্রহ্মচারী। রাস্তার ধারে এক গাছতলায় বসিয়া যাত্রীদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আট বৎসরের একটি বালক, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে, রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

শ্রীম—(বালকের প্রতি, ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া) একে কি বলে ?

বালক—জানি না।

শ্রীম—এদের সাধু বলে। এরা কি করে ?

বালক—জানি না।

শ্রীম—ভগবানকে চিন্তা করে, সমস্ত ত্যাগ করে গৈরিক বস্ত্র পরে ঈশ্বরের ধ্যান করে। তোমার এ রকম সাধু হবার ইচ্ছা হয়, না চাকরি করতে ইচ্ছা হয় ?

বালক—না, চাকরি করতে ইচ্ছা করে না, সাধু হওয়া ভাল।

বালক চলিয়া গেলে শ্রীম ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "দেখলে, কেমন সময় ধরেছি ? সাধু দেখে, ঈশ্বরীয় কথা শুনে ভেতরে সংস্কার হয়ে রইল। যখন বড় হবে তখন স্মরণ হবে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হাঁ, আমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে। আমার কাকা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন। কিছু

* বাল্মীকি রামায়ণ, বালকাণ্ড, ২৯ সর্গ।

দিন বাদে তিনি একবার দেশে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর যে সব কথা হয়েছিল মনে আছে।"

কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, তিন জন ছোকরা এক পাচক ব্রাহ্মণ-সহ যাইতেছে। শ্রীম তাহাদের ডাকিয়া ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "এরা কি জাত?"

বালক—জানি না।

শ্রীম—সাধু, ভগবানের চিন্তা করেন। তোমাদের সাধু হতে ইচ্ছা করে?

বালক—না।

শ্রীম—চাকরি করা ভাল, না সাধু হওয়া ভাল?

বালক—সাধু হওয়া ভাল।

শ্রীম—তবে হবে না কেন?

বালক—আমাদের ঠাকুর সেবা রয়েছে, মা-বাপ আছে।

শ্রীম—(ব্রহ্মচারীকে দেখাইয়া) এরও রয়েছে, এ কি করে সাধু হল? গুবরে পোকা দেখেছ? তার কেবল গোবরের গন্ধ ভাল লাগে। মাছিদের দেখেছ? তারা পচা ঘায়েও বসে, আবার সন্দেশেও বসে। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে মধু পান করে। সংসার করলে জগতের বিষয় ভাল লাগবে, আর সাধু হলে ভ্রমরের মত কেবল ঈশ্বর চিন্তা ভাল লাগবে।

ছেলেগুলি সব শুনিয়া চলিয়া গেল।

দান

ছোট ছোট দুটি গরীব বালিকা জঙ্গলে কাঠ কুড়াইতেছে। শ্রীম তাহাদের ডাকিয়া পয়সা দিলেন। তাহারা পয়সা পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল। শ্রীম শশী নিকেতনে ফিরে বিনয় ও সুখেন্দুকে বলিতেছেন, "একে নিয়ে রাস্তায় লেকচার দিচ্ছিলাম। ক্রাইষ্টের মত মন্দিরে (৺জগন্নাথ মন্দিরে) দিলে হয়।"

॥ ৫৭ ॥

১৩ই ডিসেম্বর, রবিবার, ১৯২৪। পুরী

আর কিছুই সাধ নেই

বেলা প্রায় ১টা হইবে। শ্রীম 'সৈকতালয়ে' কিছুক্ষণ বসিয়া বালির রাস্তায় যাইতেছেন। সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী। তাহাকে বলিতেছেন, "দেখ, সকালে, দুপুরে, বৈকালে, সন্ধ্যায়, কেবল নির্জ্জন প্রান্তরে বেড়াতে ইচ্ছা করছে।" ভাবে গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন—

"মন ত সরে না, ঘরে মন ত বসে না।
মনে করি, মনকে ধরি, না পারি, কেঁদে মরি,
বল উপায় কি করি।"

"শ্মশানে মশানে ফেরে, ঘরের ভাবনা আর ভাবে না" ইত্যাদি।

রাস্তার ধারে কতকগুলি তালগাছ। শ্রীম তাহার নীচেয় বসিলেন। এখন রাস্তায় লোকের যাতায়াত নাই। শীতকালের সূর্য্য মাথার উপরে।

শ্রীম—দেখ, এখানে মন লয় করতে ইচ্ছা করছে। শরীর বোধ হয় আর বেশী দিন থাকবে না। মনকে নেড়ে চেড়ে দেখলাম, আর কিছু সাধ আছে কিনা। কিছুই সাধ নেই। ঠাকুরকে দেখা হয়েছে, আর কি সাধ থাকবে? সব সাধ মিটে গেছে।

শ্রীম এবার ধ্যানে তন্ময়। ধ্যানের পর ভাবে গান গাহিতেছেন—

"মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে" ইত্যাদি।

"হরিবোল মদনমোহন।"
যাব ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপিকার নূপুর,
রুনু ঝুনু নূপুর, বাজিব চরণে।" ইত্যাদি
"হরিনাম নিস রে জীব যদি সুখে থাকবি।" ইত্যাদি
"প্রেম বিলায় গৌর রায়।
শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়।" ইত্যাদি

লীলা—নিত্য ও অনিত্য

গানের পর কথা কহিতেছেন—

"গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্" (গীতা ৯।১৮)

—তিনিই গতি, পোষণ কর্তা, প্রভু, কর্ম্মের সাক্ষী, বাসস্থান, রক্ষক, বন্ধু, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, লয়স্থান ও জগতের অক্ষয় বীজ। গীতার এক একটি শ্লোক মন্ত্র। মানুষের নজর কেবল প্রেয়ের দিকে। ভোগে আসক্তিই ভগবানকে দেখতে দিচ্ছে না। অবিদ্যা অনাদি, কালও অনাদি; তাই লীলাও অনাদি কাল থেকে চলেছে।

"ঠাকুর বলতেন, 'লীলাও সত্য।' তা বলবেন না?—মানুষ রূপ রসাদি ছাড়তে পারে না; জগৎ মিথ্যা বললে কি নিয়ে থাকে? কেউ কেউ বলে, লীলা উপাধিযুক্ত; কেউ কেউ বলে, না, উপাধিশূন্য নিত্যলীলা। কিন্তু ঈশ্বর নিজে শরীর ধারণ কবে লীলা করেন, ঠিক মানুষেব মত—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক নিয়ে।

"দেবতারা পর্য্যন্ত মানুষ হতে ইচ্ছা করে। মনুষ্য জন্মেই মুক্তি। শরীর যায় সেও স্বীকার, তবু প্রেয়েব দিকে যাওয়া উচিত নয়। মহাত্মা বলে কাকে? যার কোন জিনিষে লোভ নেই। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ; এইটি মনে রেখ। দেখ, আমাব বালির উপর শুতে ইচ্ছা করছে।" এই বলিয়া বালির উপর শয়ন করিলেন। শুইয়া শুইয়া জপ করিতেছেন। পরে গান গাহিতেছেন—

"আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে" ইত্যাদি।

তারপর বলিলেন' "সব সাধ মিটিয়ে নেওয়া ভাল।"

এইবার শশী নিকেতনে যাইতেছেন। ফটকের কাছে আসিয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "তুমি এইবার যাও, এমন দিন কি হবে?" ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া 'সৈকতালয়ে' আসিলেন।

কান্না থামান যায় না। স্বরূপ ও রামরায়ের হাত ধরে কাঁদতেন আর বলতেন—

"উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি,
না যায় কঠিন প্রাণ, ছার নারী জাতি।"

ভক্ত—তাঁরা সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গে কথা কচ্ছেন, অন্তরে বাহিরে তাঁকে দর্শন করছেন, তবু তাঁদের এত বিরহ হত কেন?

শ্রীম—যাঁরা ঐরকম দর্শন করেন, তাঁদেরই ঐসব অবস্থা হয়। যেমন সাগরের কাছে যে নদী তাতেই বেশী জোয়ার ভাঁটা হয়। ঠাকুর বলতেন, "মাই এমন অবস্থা করলেন।" কখনও তাঁরা ভাবোন্মাদ, প্রেমোন্মাদে পাগল হয়ে যান, কখনও বা তাঁদের জ্ঞানোন্মাদ হয়। যেমন ডোবাতে বড় মাছ থাকলে তোলপাড় করে। তাঁকে চিন্তা করে ভাব, মহাভাব হয়। ঠাকুর ও চৈতন্যদেবের হয়েছিল। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, এঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে ছিলেন, তাই তাঁদের ভাব চাপা ছিল। ঠাকুর সাধারণভাবে বলতেন, "কলিতে অন্নগত প্রাণ, তাঁকে তাড়াতাড়ি ডেকে নাও। শরীর এই আছে, এই নেই।" ঠাকুর অধরকে বলেছিলেন, "শরীর অনিত্য, যত শীগ্‌গির পার ভগবানকে ডেকে নাও।" তার ছমাস পরে অধরের শরীর গেল।

ভক্ত—সবই যখন তিনি করছেন, তখন যাদের প্রকৃতিতে কর্ম্ম আছে, তারা কর্ম্ম করলে শীগ্‌গির হবে না কেন?

শ্রীম—সে সব গুরু জানেন; গুরুই বলে দেবেন। ঠাকুর জগন্মাতাকে বললেন, "মা, আমাকে শীগগির নিয়ে চল, শরীর রেখ না।" মা বললেন, "না, সব মতের লোক আসবে, তাদের শিক্ষার জন্য দিন কতক থাক।"

এইবার শ্রীম গান গাহিতেছেন—

"হরি বলে আমার গৌর নাচে।
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে।
থেকোরে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের পাশে,
রাধা প্রেমে গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে।
বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই,
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই॥"

গান করিতে করিতে, শ্রীমর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। গানের

পরঃ বলিতেছেন, "এই দেখ সামনে অনন্ত; প্রতি মুহূর্ত্তে অবাক হতে হয়। ঠাকুর যাঁকে দেখে বালক হয়ে গিয়েছিলেন।"

ধর্ম্ম ও গ্লানি

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ছাদে তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে শ্রীম চেয়ারে বসিলেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—রাজা অশোকের সময় ভারত ও ভারতের বাইরে সর্ব্বত্র বৌদ্ধদের কি প্রভাব ছিল। কিছুদিন পরে সে সব চলে গেল। গীতায় ভগবান বলেছেন যে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই শরীর পরিগ্রহ করে তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। আবার কিছু দিন পরে যেকে সেই।

নিষ্কাম কর্ম্ম সার্ব্বজনীন

"শ্রীকৃষ্ণ এসে বললেন, 'অর্জ্জুন, পূর্ব্বে যে উপদেশ শুনেছ ও কিছুই নয়। ও সব কর্ম্মকাণ্ডীদের কথা। স্বর্গাদি ও সব ভোগের উপকরণ, ভোগ থাকলে পরমেশ্বরে অহৈতুকী ভক্তি হয় না, তাঁতে মন সমাহিত হয় না। মন নানা বিষয়ে ছড়িয়ে থাকে। তাই তুমি পৃথিবীর কোন ভোগ গ্রহণ করো না। শুধু নিষ্কাম কর্ম্ম করে যাও।' সাধারণের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম। যাকে যে ভাবে গড়েছেন, সে সেই দিকে যাচ্ছে। যদি কাউকে বলা যায়, 'বসে বসে তাঁর নাম কর', সে কি শুনবে? যেমন সংস্কার তেমনি হবে। যাকে যে সুরে বেঁধেছেন সে সুর বেরিয়ে যাক, তখন শুনবে।"

অমৃত—সে সুর সব ফুরায় না।

শ্রীম—আমরা শুধু সসীম জীব দেখছি, তিনি কিন্তু অনন্ত জীবন দেখছেন। তিনি যে অনন্ত।

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন" (গীতা ৪।৫)।

"অবতারই সব জানেন। ডাক্তারী শাস্ত্রে দেখলাম মায়ের পেটে কি ভাবে ছিলাম। মানুষ কি করে বলে আমি করছি, তিনি করছেন না। 'অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' (গীতা ৩।২৭)। (হিমাংশুর প্রতি) নবদ্বীপ গিয়ে পঁচিশ বৎসরের কাজ করে এলে।"

হিমাংশু—আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।

শ্রীম—তুমি বোঝ আর না বোঝ। লঙ্কা জেনে খাও আর না জেনে খাও,

ঝাল লাগবে। যেমন মা ছেলেকে স্তনপান করাচ্ছে। ছেলে যদি বলে, 'আমি বুঝতে পাচ্ছি না,' তাহলে কি সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে? মা সব জানে। মা-ই তোমাকে নবদ্বীপ নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা সকলে তাঁর কোলে বসে স্তন্য পান করছি

॥ ৬১ ॥

৩০শে মার্চ্চ, শনিবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

শ্রীম চারতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। জনৈক সন্ন্যাসী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ ও অপর অনেকে উপস্থিত আছেন।

ব্রহ্মাস্ত্র

শ্রীম—একটি মেয়ে খবরের কাগজে বেশ একটি কবিতা লিখেছে।

সুরেন্দ্র—লিখেছে, যেন তারার উপর সূর্য্যের আলো পড়েছে।

শ্রীম—এই তারা এ৹ একটি সূর্য্য। প্রত্যেক তারার পেছনে এক একটি জগৎ রয়েছে।

জনৈক সন্ন্যাসী—উপনিষদে আছে, এমন একদিন আসবে যখন সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি স্থির হয়ে যাবে। তখন তাদের কাজ থাকবে না। একি সমাধির অবস্থা?

শ্রীম—বোধ হয় হবে। যোগীরা বলেন, "এমন এক অবস্থা আছে যেখানে কিছুই নেই, চন্দ্র সূর্য্যের ওপারে, জগতের অতীত অবস্থা।"

সন্ন্যাসী—সকলে যোগী হতে পারে?

শ্রীম—তাঁর ইচ্ছা হলেই হতে পারে। এই (ঈশ্বরেচ্ছাই) হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র। বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি তিনি করেছেন। তাঁর আনন্দে সকলে প্রাণ ধারণ করে রয়েছে।

সুরেন্দ্র (একজনকে দেখাইয়া)—এঁরা যেন তাঁর আনন্দ পেয়েছেন, আমাদের কি হবে?

শ্রীম—তা কিছু বলা যায় না। চাঁদা মামা সকলের মামা। যে তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকবে, তাঁকে তিনি কৃপা করবেন। তিনি যে আমাদের জন্য করছেন না, কি করে জানলেন? আগাগোড়া তিনি; কোন্‌খানটায় আমি? অন্তরের দিকে তাকাও—হাড়, মাংস, brain (মস্তিষ্ক), lungs (ফুসফুস) ও বাইরের জল, হাওয়া খাদ্য নিয়ে 'আমি, আমি' করছে। এর একটা না হলে 'আমি' নেই। এর মধ্যে কোন্‌টা 'আমি'? ভেবে দেখুন, আমরা মার গর্ভে কিভাবে ছিলাম। সেই মানুষ হাতে ছড়ি, মুখে সিগারেট ধরিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

বিশ্বাস

সুরেন্দ্র—তিনি সব করছেন, এ বিশ্বাসটা ত হচ্ছে না।

শ্রীম—সেইজন্য গুরুর কাছে যেতে হয়। তিনি একটা উপায় করে দেবেন।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীতা ৪।৩৪)

"শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে বললেন, 'আমার শরণাগত হও। অনন্ত কাণ্ড, বোঝবার জো নেই। তোমার পূর্ব্ব-জন্মের কথা মনে নেই, আমার সব মনে আছে।—'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন' (গীতা ৪।৫)। এঁদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ এক থাক আছে। তাঁদেব জন্ম থেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস। যারা বলে, ঈশ্বর নেই, তাদের কথা শুনে এঁরা হাসেন—যেমন প্রহ্লাদ, শুকদেব প্রভৃতি। এঁদের জন্ম থেকেই বিশ্বাস। তাঁরা সামনে অনন্ত দেখেই অবাক হয়ে যান।

"ঈশ্বর লাভ এক জন্মে হয় না, অনেক জন্ম লাগে। 'অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ৬।৪৫)। এসব শাস্ত্রের নিয়ম। গুরুর কাছে যাওয়া, তপস্যা, প্রার্থনা, ছুটাছুটি করলে তবে তিনি কৃপা করেন।"

সুখ-দুঃখ

সুরেন্দ্র—এ দুঃখ কি করে যাবে?

শ্রীম—গাছে দুটি পাখী বসে আছে। একটি পাখী কিছু খায় না, সাক্ষীস্বরূপ থাকে। অপরটি কখনও তেঁতো, কখনও মিষ্টি, কখনও টক ফল

খেয়ে বেড়ায়। তার যখন এসব ভাল লাগে না, যখন ওপরের পাখীটিকে সে ছুঁয়ে ফেলে, তখন এই দ্বিতীয় পাখীটি আর থাকে না। তখন বোধ হয় একই পাখী বসে আছে। সেই রকম আপনি যে দুঃখ ইত্যাদি বলছেন ওসব কিছুই নেই। এক তিনিই আছেন।

সুরেন্দ্র—এ সব কি তবে স্বপ্নবৎ?

শ্রীম—ছাদে উঠলে তখন মিথ্যা বলে বোধ হয়। কিন্তু যতক্ষণ তার দর্শন না হয় ততক্ষণ সব সত্য—real। Lower egoর (কাঁচা আমির) ওপর দাঁড়িয়ে কি করে বলছেন, এ কিছু নয়? অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি, superstition (কুসংস্কার)—এ সমস্ত যখন চলে যায়, তখন কি হয় মুখে বলা যায় না। যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা পুরুষ তাঁরা বলে গেছেন। ভাদুড়ী মহেন্দ্র সরকারকে বলেছিলেন, "এখন বিশ্বাস করছ না, এরপর দেখো ইট পাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে (জন্ম আরম্ভ হবে)।

অবতারের দুটি দিক

"ঠাকুরের অসুখের সময় বলেছিলেন, 'এর মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া) দুটি আছে। একটি ভক্ত, অন্যটি ভগবান। ভক্তটিরই কষ্ট।' ক্রাইষ্টও বলেছিলেন, 'পিতঃ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, সামনে যে দুঃখ দেখছি তা যেন দূর হয়ে যায়।' শরীর ধারণ করলেই দুঃখ কষ্ট আছে। অবতারাদির পর্য্যন্ত হয়ে থাকে।"

॥ ৬২ ॥

৩১শে মার্চ্চ, রবিবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

সন্ধ্যার সময় শ্রীম চারতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন।

নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ

শ্রীম—আজ ইটলীতে সমস্তদিন ধরে ঠাকুরের উৎসব ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়েছিল। অনেক সাধুদের শুভাগমন হয়েছিল।

সুরেন্দ্র—আমরা সমস্ত দিন বেগার খেটে মরছি।

শ্রীম—না, যিনি "অকর্ম্মে কর্ম্ম ও কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান" (গীতা ৪।১৮)। এই ভাবটি হয় যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে। (যেমন বিনা মাইনের চাকর বেতন না নিয়ে সমস্ত কাজ করে। এমন কি, ভিক্ষা করে খেয়ে মনিবের সমস্ত কাজ করে দেয়। এই হল নিষ্কাম কর্ম্মের ঠিক উদাহরণ।) সাধুরা নিষ্কাম কর্ম্ম করতে চেষ্টা করছে।

দুরকম আমি

সুরেন্দ্র—তাঁরা ত এগিয়ে গেছেন।

শ্রীম—না, গুরু যা বলে দিয়েছেন, সে সমস্ত যদি না করে ত সব গোলমাল হয়ে যাবে। একটি higher ego (পাকা আমি), আর অপরটি lower ego (কাঁচা আমি)—বিদ্যার আমি ও অবিদ্যার আমি। যোগীরা পাকা আমি বা বিদ্যার আমি রেখে দেন। পাকা আমি হচ্ছে—শঙ্কর যাকে "সোঽহং" বলছেন। কাঁচা আমি বা অবিদ্যার আমি হচ্ছে—আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী, এই রকম ভাব। ঠাকুর বলতেন, "থোড়, বড়ি, খাড়া খাড়া, বড়ি, থোড।" অবিদ্যার আমি প্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়। বিদ্যার আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়।

সুরেন্দ্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস হচ্ছে না।

শ্রীম—তিনি আলাদা আলাদা থাক করেছেন। নিত্যসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। তাঁকে লাভ করতে অনেক জন্ম লাগে।

সাধুসঙ্গ ও ফটো

এই সময়ে ইটলীর উৎসব দর্শন করিয়া স্বামী শ্রীবাসানন্দ ও তাঁহার সঙ্গে জনৈক মাদ্রাজী যুবক আসিলেন।

যুবক—পাঁচ বৎসর আগে এখানে এসেছিলাম। আপনি আমাকে রসগোল্লা খাওয়ালেন।

শ্রীম—বুড়ো হয়েছি, মনে নেই।

শ্রীবাসানন্দ—আপনি বলে দিন, যুবকদের কি করা উচিত।

শ্রীম—সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার।

শ্রীবাসানন্দ—সব সময় ত সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না।

শ্রীম—যখন পাওয়া যাবে না, তখন সাধুদের ফটো বা ছবি ঘরে রেখে

ধ্যান করবেন। যাঁকে তিনি কৃপা করেন তিনিই তাঁকে লাভ করতে পারেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠ ১।২।২২)। যাঁরা সংস্কারবান তাঁরাই তাঁর উপদেশ ধারণা করতে পারেন।

ক্রাইষ্টের উপদেশ

"ক্রাইষ্ট জেলেদের ডেকে বললেন, তোমরা এসব কি মাছ ধরছ? মানুষ-মাছ ধরবে ত আমার সঙ্গে এস। 'তাঁর কথায় তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত জাল ফেলে তাঁর অনুসরণ করলে। অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ক্রাইষ্টের কাছে এসে বললে, 'প্রভু, ছেলেবেলা থেকে আমি আমার কর্ত্তব্য-পালনে যত্নবান। তবু কি করে আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারি, তার উপায় বলে দিন।' ক্রাইষ্ট বললেন, 'যদি ভগবান লাভ করতে চাও তবে তোমার যা কিছু সম্পত্তি আছে গরীবদের দিয়ে আমার সঙ্গে চলে এস।' কিন্তু তার সে কথা ভাল লাগল না। তার কারণ সে অনেক ধনসম্পত্তির মালিক ছিল; এখনও তার ভোগ শেষ হয় নি। যার যেমন সংস্কার তাইত হবে।"

৬৩

১লা এপ্রিল, সোমবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

সকাল আটটা। শ্রীম চারতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। মনোরঞ্জন ও চারজন যুবক উপস্থিত আছেন। ইহাদের মধ্যে দুইজন বি, এ, পাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নিমতলা ষ্ট্রীটে ৺আনন্দময়ীর নিকটে থাকেন। শ্রীম তাঁহাদের একজনকে জানেন। তাঁহার সহিতই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—তোমরা মার কাছে বাস কর, তোমাদের দেখে আমার উদ্দীপন হচ্ছে। এমন গ্রামে থাকা উচিত, যেখানে তাঁকে মনে পড়ে। নিমতলায় মড়া নিয়ে যাবার সময় মা আনন্দময়ীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য রাখে। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁ থেকে উৎপত্তি, তাঁতেই লয়। যেমন জলের ভুড়ভুড়ি জল থেকে উঠে তাতেই লয় পায়।

রসকে মেথর

"তোমরা মার কাছে রয়েছ, কত ভাগ্যবান্। দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে রসিক মেথর ঝাড়ু টাড়ু দিত। একদিন ঠাকুরের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, 'প্রভু, আমার কি উপায় হবে?' ঠাকুর বললেন, 'তুই মার কাজ করছিস, তোর আবার ভয় কি?' শেষ অবস্থায় তুলসীতলায় ভগবানের নাম করতে করতে তার শরীর যায়। তার কথা বলতে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

একি ভাষ্যের কর্ম্ম

গদাধর—এদের কি কর্ম্মফল ভুগতে হয় না? শাস্ত্রে বলে, কর্ম্মফল নাশ না হলে শত শত কল্পেও মুক্তি হয় না, কর্ম্মের ফল তোলা থাকে।

শ্রীম—এ সব নীচেকার কথা, sense world-এর (ইন্দ্রিয় জগতের) কথা। একি ভাষ্যের কর্ম্ম? তিনি যদি বুঝিয়ে দেন তবে বোঝা যায়। এর পরপারে যে কি অবস্থা তা মুখে বলা যায় না। কেবলমাত্র বোধে বোধ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীম ধ্যানান্তে ছাদে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

এক সূত্রে জগৎ গাঁথা

শ্রীম—(জনৈক ভক্তের প্রতি) পিতা কেমন আছেন?

ভক্ত—অর্শ রোগ, খুব যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

রজনী—বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা ওষুধ আছে। তার মূল কোমরে বেঁধে রাখলে যন্ত্রণা কমে যাবে।

শ্রীম—বেঁধে রাখলে হবে না কেন? চন্দ্র অত দূরে, তার আকর্ষণে গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা হয়। পাশ্চাত্ত্যেরা বলে, নক্ষত্রেরও এখানে প্রভাব পড়ে। একসূত্রে এই জগৎ গাঁথা। ঠাকুর বলতেন, "জীব, জগৎ, ঈশ্বর জড়িয়ে এক ব্রহ্ম। যেমন বেলের বীচি, খোলা ও শাঁস নিয়ে একটি বেল। তা থেকে একটিকে বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে যায়।"

ক্যাণ্ট ও শুদ্ধ বুদ্ধি

"যতক্ষণ ছাদে না পৌঁছান যায় ততক্ষণ এসব বোধ হয় না। ছাদে উঠে

দেখে তিনিই সব হয়েছেন। তখন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, এক বলে মনে হয়। ক্যাণ্ট যাকে বলেছেন pure reason (শুদ্ধবুদ্ধি)। (সুরেন্দ্রর প্রতি) গুহ মশায়, আপনাকে এত চিন্তামগ্ন দেখছি কেন? আমাদের চিন্তা কি? যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই দেখবেন। আমি কি বলছি? ঈশ্বরই বলাচ্ছেন। ঠাকুর একদিন কুকুরের মুখ দিয়ে মা কি বলবেন শোনবার জন্য তার পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। কুকুরের মুখ দিয়ে যদি তিনি বলেন ত মানুষের মুখ দিয়ে আর বলতে পারেন না?"

সুরেন্দ্র—এত দেরী কেন? তাঁব দর্শন কই হচ্ছে?

শ্রীম—সাধুদের জন্য দুটি function (কার্য্য) রেখেছেন। তাঁদের তপস্যাতে তাঁদের নিজেরও উন্নতি হয় আর লোকশিক্ষাও হয়। লোকশিক্ষার জন্য কিছু কর্ম্ম করিয়ে নেন। সাধারণ লোকের মন দেশকালের অধীনে। তাই সে দেশকালেই আরম্ভ ও শেষ দেখে। তিনি দেশকালের অতীত। তাঁব কাছে আরম্ভও নেই, শেষও নেই। তিনি অনাদি অনন্ত। যোগীরা দেশকালের পরপারে। তাই তাঁবা সবই অনন্ত দেখেন।

"পাশ্চাত্ত্য দেশের একজন দার্শনিক এক উপমা দিয়েছেন। 'যেমন চারদিকে ঘোর অন্ধকার; সেই অন্ধকারের মধ্যে একটু আলো দেখা যাচ্ছে; তাইতে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যিনি আলো দিচ্ছেন তাঁকেও দেখতে পাচ্ছি না, চারিদিকেরও কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যতটুকু জায়গায় আলো পড়েছে ততটুকুই মাত্র দেখতে পাচ্ছি।' এখন ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে যদি তিনি কৃপা করে আলোটি তাঁর মুখের কাছে ধরেন, তাহলেই তাঁর দর্শন হয়। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়। গীতাতে বলছেন, "মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৮।৬৬)।"

॥ ৬৪ ॥

৭ই এপ্রিল, রবিবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

বেলা প্রায় আটটা। শ্রীম ছাদের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত।

বিনয় জয়রামবাটী আশ্রমে একটি কূপ খননের জন্য 'হেল্‌থ অফিসারে'র কাছে যাইতেছেন।

শ্রীম—(বিনয়ের প্রতি) ঠাকুর ওকে সেখানকার লোকের ভাল করবার জন্য পাঠিয়েছেন। ভাল লোককে সকলে ভাল করতে পারে। দুষ্টু লোককে যদি কেউ ভাল করতে পারে তবেই তার মহত্ত্ব। ঠাকুর বলতেন, "মা, যারা মরে রয়েছে তাদের মেরে কি হবে? যারা খাড়া হয়ে রয়েছে তাদের (অর্থাৎ অহঙ্কার) মারলেই ত তোমার বাহাদুরি।"

বিনয় চলিয়া গেলেন।

যীশুখৃষ্ট ও ঠাকুরের প্রচারে ভেদ

শ্রীম—(হাসিতে হাসিতে জনৈক ভক্তের প্রতি) ময়মনসিংহ আশ্রমে যখন ছিলে তখন লেকচার দিতে না? (ভক্তটি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া বলিতেছেন) কাছা ধরে টেনে রাখা যায় না। ক্রাইষ্ট ত্রিশ বছর চুপ করে ছিলেন। মাত্র একবার ছেলেবেলায় তীর্থে যাবার সময় পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করেছিলেন। কাল প্রতীক্ষা করছিলেন। এত দিন ধরে তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে কথা চলছিল। ত্রিশ বৎসর পরে যখন লেকচার দিলেন, পণ্ডিতরা শুনে অবাক হয়ে গেল। তারা বললে, "আমরা অনেক শাস্ত্র পড়েছি, এমনটি ত শুনিনি। ইনি না পড়ে কি করে সাধনের সূক্ষ্ম রহস্য সকল জানলেন?" ভক্তদের সঙ্গে মাত্র তিন বৎসর ছিলেন এবং জনসাধারণের কাছে লেকচার দিয়েছিলেন। তাইতেই দেশ ভেসে গেল। তিনি এমন সব কথা বললেন যাতে পুরুতদের ভোগে কাঁটা পড়ল। তখন তারা চক্রান্ত করে তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

"ক্রাইষ্টের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত জন্, যাঁকে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি অমন করে তাদের কাছে

বলবেন না। তারা আপনাকে মারবার জন্য চক্রান্ত করছে। ক্রাইষ্ট বললেন, 'দূর হও শয়তান। আমি আমার পিতার কথা শুনব, না তোমার কথা শুনব? আমি আগে থেকে জানি আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হবে'।"

কৃষ্ণ সরকার—ঠাকুর কি ক্রাইষ্টের মত কঠোর ভাষায় বলেছিলেন?

শ্রীম—না, এবার তেমন আদেশ পান নি। তাঁর জীবনে দেখা যায়, সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে মিশে চলতেন। সকলের প্রতি সহানুভূতি, সকলের সঙ্গে মেলামেশা, সব ধর্ম্মের প্রতি ভালবাসাই প্রধান জিনিষ ছিল।

"এখন একটু কিছু না হতেই লেকচার। নিজের কি হল তার ঠিক নেই। এখন কে ত্যাগের কথা বলছে? বলে ত টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। এখন যেমন শ্রোতা, তেমনি বক্তা।

"লর্ড লিটন বলেছিলেন, 'উপযুক্ত লোক দুজন হয় সেও ভাল।' ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা, যারা তোমাকে চায়, যারা পৃথিবীর কোন ভোগ চায় না, এমন লোক এখানে পাঠাও'।"

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু

সন্ধ্যার পর শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। আরও অনেকে উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—তাঁর (ভগবানের) সকলের প্রতি সমান ভালবাসা। যেমন সূর্য্য সকলকে সমানভাবে কিরণ দেয়। অথবা যেমন বৃষ্টি সর্ব্বত্র সমানভাবে পড়ে।

শ্যামবাবু—তবে এত দুঃখ দিয়েছেন কেন?

শ্রীম—লোকের মঙ্গলের জন্য। যদি দুঃখ না থাকত, সকলে ধেই ধেই করে নাচত। বিধি-নিষেধ মানত না। কুপথে যেত। সকলের মধ্যেই কু-প্রবৃত্তি রয়েছে, মান-যশের খাতিরে, সমাজের ভয়ে বা রাজদণ্ডের ভয়ে কাজে করে না। চুরি করলে ধরে জেলে দেয়, আবার পঁচিশ বেত লাগায়।

"আরও একটা দিক আছে—দুঃখ মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। এই দুঃখ কষ্ট রয়েছে বলেই তাঁকে মনে পড়ে। যেমন পাঁক থেকে পদ্ম ফুল ফোটে, সেই রকম দুঃখ কষ্ট থেকেই ভগবান লাভ হয়। প্রবৃত্তিকে দমন করবার চেষ্টা আসে।"

উপেন্দ্র দেব

এইবারে শ্রীম ধ্যান করিতে গেলেন। ধ্যানান্তে কথা কহিতেছেন—

শ্রীম—উপেনবাবু চোদ্দ বচ্ছর বয়সে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। তাঁর অর্দ্ধেক সম্পত্তি মিশনকে দান করে গেছেন। এদিকে তাঁর পানদোষ ছিল। কিন্তু তা হলে হবে কি? ভেতরে ভক্তি ছিল। এখন সেখানকার (ইটিলীর) হাওয়া বদলে গেছে। সেখানে সাধুরা যাতায়াত করে। উপনিষদের ক্লাস হয়। আমার মধ্যে মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে।

গুহ—আমি ভাবছিলাম, সম্পূর্ণভাবে তাঁতে আত্ম-সমর্পণ হচ্ছে না কেন?

শ্রীম—তাঁকে দর্শন করলে হয়। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুণ্ডক ২।২।৮)। ঠাকুর তাঁকে দর্শন করে বালক হয়ে গিয়েছিলেন।

স্বাধীন ইচ্ছা

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥' (গীতা ৩।২৭)

"প্রকৃতি সব কাজ করে। লোকে অজ্ঞানেতে বলে, 'আমি করছি।' তিনি বলছেন, 'আমিই বেত্তা, আমিই বেদ্য' (গীতা ১৫।১৫)। তাই তাঁর শরণাগত হও, সব বুঝতে পারবে।"

গুহ—আমি যখন ওদেশে (আমেরিকায়) ছিলাম, তারা সব স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলত। তখন মনে করতাম, এটাই ঠিক।

শ্রীম—না। ঠাকুর বলতেন, "জমিদার তালুকে নায়েব রেখে দেয়, তালুক শাসন করবার জন্য। স্বয়ং জমিদার যখন তালুকে এসে পড়েন, তখন নায়েব বলে, 'এখন তিনি সব বুঝবেন। আমার কিছু করবার নেই'।"

"গায়ত্রীর মানে তাই, তিনি সব করছেন। যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁরা বলে গেছেন।

ক্যাণ্ট, হেগেল ও উপনিষৎ

"ক্যাণ্ট কতকটা বোঝবার চেষ্টা করেছেন, তাই ত্যাগের কথা বলেছেন। বলেছেন, pure reason (শুদ্ধবুদ্ধি) দিয়ে সত্য লাভ করা যায়।

"যাঁরা হেগেলের মতের, তাঁরা বলেন, 'যদি তিনি এই সব (বিশ্ব) হয়ে আছেন, তাহলে ভোগ করলেই বা দোষ কি?' আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু তা বলে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, তিনি সব হয়ে আছেন, এই জ্ঞান লাভ করতে হলে ত্যাগের দরকার। ত্যাগ ভিন্ন বোঝবার অন্য উপায় নেই।

উপনিষৎ বলছেন, 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'* (কৈবল্য ৩)।"

গুহ—বেশী শাস্ত্র পড়লে গুলিয়ে যায়।

শ্রীম—প্রাণ হাতে করে পডতে হয়। যেমন ডাক্তারখানায় অনেক ওষুধ আছে, নিজে নিয়ে খেলেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি। শাস্ত্র গুরুমুখে শুনলেই ভাল। একান্ত যদি পডবার ইচ্ছা হয়, গুরুর কাছ থেকে পডতে হয়। তিনি কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোম্‌টা ত্যাজ্য, বুঝিয়ে দেন। তা না হলে শাস্ত্রের অনেক ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী রয়েছে; তা থেকে নিজের সংস্কার মত একটা মানে করে বসল। নিজের মত করে বুঝলেই মুস্কিলে পড়তে হয়।

ছেলেবেলায় ভগবান দর্শন

গুহ—ছেলেবেলায় কেমন বিশ্বাস ছিল। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, মা কালীর নাম করে বেরিয়ে পডলাম। বিশ্বাস, মা কালী রক্ষা করবেন।

শ্রীম—ও বিশ্বাস আবার আসবে। বিষয়কর্ম্ম যেন কতকগুলি মাটি, তাইতে চাপা পড়েছে। গুরুর কৃপায় মাটি ঝেড়ে ফেল্লে আবার বালকের মত বিশ্বাস আসবে। ছেলেবেলায় ভগবান দর্শন যেমন না জেনে লঙ্কা খাওয়া। তখন বুঝতে পারে না যে ঈশ্বব দর্শন করছে। বিষয়কর্ম্মের শেষে ভগবান দর্শন—যেন জেনে লঙ্কা খাওয়া। তখন বালকবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ, উন্মাৎবৎ অবস্থা হয়। পরমহংসেরা কাছে বালক রেখে দেন, ভাব আরোপের জন্য।

অবতারের প্রয়োজন

"আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম বলে তাঁকে স্মরণ করে বুঝতে পারছি। অবতারকে দেখলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) দেখা হয়। ক্রাইষ্ট বললেন, 'আমাকে যেকালে দেখছ, তখন আমার পিতাকেও দেখেছ।'

"একবার তাঁর এক ভক্ত কতকগুলি গরীবকে পয়সা দিচ্ছিল। ক্রাইষ্ট বললেন, 'ওসব পরে করো, এখন আমার সঙ্গে থাক। আমাকে সর্ব্বদা পাবে না। ওদের পরেও পাবে।'

"অবতার অমৃতফল দিতে আসেন—যেটি মানুষের বিশেষ অভাব। কালক্রমে মানুষ তার স্বরূপ ভুলে গেছে। সে কি হারিয়ে ফেলেছে, তার সন্ধান দিতে আসেন।"*

* St Luke 19

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা, সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৫ ॥

৮ই এপ্রিল, সোমবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

বেলা প্রায় ৯টা। শ্রীম চারতলার ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। কয়েকজন ভক্ত আসিতেই তাহাদেব সহিত কথা কহিতেছেন।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য—গুরুসেবা, মাতৃভাব ও সাধুসঙ্গ

শ্রীম (নরোত্তমের প্রতি)—এখন তোমার গুরুসেবা করা উচিত। এইত সুযোগ, সামনে গঙ্গা; গুরু ও সাধুসঙ্গ। অনেক তপস্যায় এসব পাওয়া যায়। এখন ঢাকা আশ্রমে যাবার নাম করতে নেই। সব সময় এ সুযোগ মেলে না। জপ, তীর্থদর্শন, শাস্ত্রপাঠ—এসব ত বরাবর রয়েছে এবং লোকে করেও আসছে। কিন্তু অবতার এসে একটি নূতন message (বাণী) দিয়ে যান। সেটি ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা যার আসে সেই ভগবানকে দেখতে পায়।

"সাধনের সময় মেয়েদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নেই। ঠাকুর সাধন কালে স্ত্রীলোক বা বিষয়ী লোক এলে দরজা বন্ধ করে দিতেন। মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বেড়াতেন, পাছে বিষয়ীদের হাওয়া গায়ে লাগে।

"শেষের কথা মাতৃভাব। সাধনার শেষে তাঁর দর্শন হলে সকলকে মাতৃভাবে দেখে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' (চণ্ডী ৫।৩১)।

"গোড়া থেকেই যদি কেউ বলে, 'আমার মাতৃভাব, তাদের সঙ্গে মিশলেই বা ক্ষতি কি? তা হলে নিজেই ঠকবে। যারা ঠাকুরের কথা শুনবে না তারা তার ফল পাবে।"

শ্যামবাবু—ব্যাকুলতা আসে না কেন?

শ্রীম—একথা যে বলে তারই ব্যাকুলতা আসে। যে চায় সাধুসঙ্গ করতে, নির্জ্জনে বাস করতে, তারই ঐ সব হয়।

শ্যামবাবু—সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।

শ্রীম—কেন? সাধুদের আশ্রমে গিয়ে, তন্ন তন্ন করে দেখে সেই সব চিন্তা করতে হয়। তাতেও সাধুসঙ্গ হয়। মনেতেই সব। আমি সর্ব্বদা মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারি না বলে মনে মনে সেগুলি ধ্যান করি।

এই বলিয়া দক্ষিণেশ্বরের প্রত্যেক স্থানটির নাম উচ্চারণ করিলেন।

সুবর্ণ সুযোগ

শ্রীম (বিশ্বনাথের প্রতি)—আমি যে তোমাকে বাইবেল পড়তে বলেছিলাম, পড়েছ?

তিনি পড়িতেছেন বলায় শ্রীম বাইবেল হইতে কতকগুলি প্রশ্ন তাঁহাকে করিতে লাগিলেন।

বিশ্বনাথ—আমি ভাল পড়িনি।

শ্রীম—এই হচ্ছে অমূল্য সময়, এমন করে হেলায় হারাতে নেই। ইংরেজীতে বলে golden opportunity (সুবর্ণ সুযোগ)। ছাত্রাবস্থায় সব পড়ে নিতে হয়।

শ্রীম—মঠে যাও?

বিশ্বনাথ—হাঁ, সেখানে যাই।

শ্রীম—সেখানে গিয়ে ছোকরা সাধুদের সঙ্গে আলাপ করবে। ঠাকুরের 'পুঁথি' পড়বে। সেখানকার হাওয়া লাগানও ভাল। মঠের ঘাটে গিয়ে গঙ্গা স্নান করবে। দেখবে ভেতর পবিত্র হয়ে যাচ্ছে, শরীর নির্ম্মল হবে। দশদিন এই রকম করে এসে আমাকে বলো।

অন্তর্জ্জপ ও প্রার্থনা

বেলা প্রায় তিনটা। শ্যামবাবু ও সত্যবান আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (শ্যামবাবুর প্রতি)—এই যে ছুটোছুটি করছেন, এর নাম ব্যাকুলতা। যেমন ঘড়ি সর্ব্বদা টিক্ টিক্ করে, সেই রকম ভেতরে তাঁর নাম অনবরত করতে হয়। তবেই মহাযোগে থাকা যায়। যোগীদের অবস্থা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যেমন বর্ণচোরা আম; দেখে বোঝা যায় না যে আম পেকেছে।

শ্যামবাবু—মনটা ত কুপথে যেতে চায়।

শ্রীম—ভোরে, দুপুরে, সন্ধ্যার সময়, শোবার সময়, প্রত্যেক প্রহরে এক

ঘণ্টা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। আর সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ।

শ্যামবাবু—যখন মনের পতন হয়, তখন নিরুৎসাহ আসে, মনে হয় আর কিছু হবে না।

শ্রীম—আগে থেকে তাঁর কাছে জানিয়ে রাখতে হয়; আমি তাই করি। এই রকম করে যদি না হয় তা হলে আমাকে বলবেন। তিনি সব দেখছেন, ভয় কি?

রাত্রি প্রায় আটটা। চারতলার ছাদে জনৈক সন্ন্যাসী, মনোরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। শ্রীম ঠাকুর বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখান হইতে আসিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন।

বিশ্বাস

সাধু—একজন বলছিল, 'যে চোখ সাধু দর্শন করে নি, সে চোখ চোখই নয়।'

শ্রীম—আহা! ঠাকুর 'রাম রাম' করে পাগল, কি ভক্তি! একদিন ঠাকুর কথকথা শুনতে গিয়েছেন। কথক বলছে, 'যারা রাম নাম করে তাদের ময়লা থাকে না।' ঠাকুরের একেবারে বালকের মত বিশ্বাস। বললেন, 'তবে আমার গায়ে ময়লা রয়েছে কেন?' কৃষ্ণকিশোর বুঝিয়ে দিলেন; 'ভিতরের ময়লা যায়, বাইরের নয়।' তাই ঠাকুর, বোকা হলেও সরলকে এত ভালবাসতেন, আর একদিন ঠাকুর নাটমন্দিরে ভগবানের কথা শুনছিলেন। শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে যেন গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

চরণদাস বাবাজী

"এখন দেখছি পিসীমা ভাইপোকে যা বলেছিল তাই ঠিক। তুলসীতলায় প্রণাম ও মালা জপ করাই সার। এই গল্পটি চরণদাস বাবাজী করেছিলেন। তিনি কি সুকণ্ঠ ছিলেন! আমি যখন পুরীতে ছিলাম, একদিন তিনি রাস্তায় কীর্ত্তন করতে করতে যাচ্ছেন। তখন রাত হয়েছে। শুয়েছি। তাঁর সেই মধুর কীর্ত্তন শুনে কোথায় আলস্য, জড়তা চলে গেল। বিছানা-টিছানা ফেলে রাস্তায় এসে কীর্ত্তন শুনতে লাগলাম।"

কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর পীঠস্থান

সাধু—আপনার কি আজ বিশ্রাম হয়নি?

'প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি' (গীতা ১৮।৫৯)।

সখীচাঁদ—ভাবনা থেকেই দুঃখ হয়।

শ্রীম—বেদান্তে দুঃখ ওসব কিছুই নেই, একমাত্র তিনিই আছেন। গাছে দুটি পাখী বসে আছে, অজ্ঞানে দেখে। জ্ঞান হলে দেখে গাছে একই পাখী বসে আছে, দ্বিতীয় পাখী নেই।

বেলা সাড়ে নয়টা হইয়াছে। সাধুরা চলিয়া গেলেন।

সখীচাঁদ—আপনার সঙ্গে কখন private (অন্তরালে) দেখা হবে?

শ্রীম—সব সময়ে।

সখীচাঁদ—আপনি এখন স্নান, সন্ধ্যা করবেন?

শ্রীম—না, "কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাবে বন্ধ্যা করেছি।"

মন স্থির করা

সখীচাঁদ—কি করে মন স্থির করা যায়?

শ্রীম—গুরুই বলে দেন। নিরাকারের ধ্যান আলাদা আবার সাকারের ধ্যান আলাদা।

"প্রথম প্রথম তাঁর রূপের—তাঁর কোন অবয়ব বা অলঙ্কারের ধ্যান করতে হয়, তাঁর নাম জপ প্রভৃতি করতে হয়। নিরাকারে মন স্থির করবার আলাদা উপায়।"

সখীচাঁদ—সকলকেই কি ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে?

শ্রীম—না, যার ভোগের ইচ্ছা আছে তাকেই। যেমন অর্জ্জুনকে যেতে হয়েছিল। তাবলে কি নারদ, শুকদেবকে বলবেন?

সখীচাঁদ—তাঁদেরও ত একবার ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে?

শ্রীম—হাঁ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে। কিন্তু এ জন্মে তাঁরা ভগবান বই আর কিছুই জানেন না।

সখীচাঁদ—ভোগের ইচ্ছা ত যায় না।

শ্রীম—ভোগের বীজ ভেতরে রয়েছে, তাই যায় না। তাঁকে দর্শন করলে যায়। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে,' (মুণ্ডক ২।২।৮)। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, "তা বাপু, ওই রকম হয়। ভগবানকে দর্শন না করলে একেবারে কাম যাবে না।"

এইবার সখীচাঁদবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৬৭ ॥

২১শে এপ্রিল, রবিবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

এদেশ ত্যাগের—পাশ্চাত্য ভোগের

সন্ধ্যার পর ধ্যানান্তে শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন।

শ্রীম—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের নাম করলে সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়। এদেশ ত্যাগের দেশ। আমাদের ভাগ্য ভাল যে এমন দেশে জন্মেছি। ওদেশ (পাশ্চাত্য দেশ) ভোগের দেশ। দুই দেশের পরস্পর সংমিশ্রণে উভয়ের উন্নতি হবে।

রাস্তায় একজন বাঁশী বাজাইয়া যাইতেছে। সেই শব্দ শুনিয়া বলিতেছেন, "তিনিই শব্দময়ী। ঠাকুরের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বৃন্দাবনের উদ্দীপন হত। (গদাধরের প্রতি) তোমার বৃন্দাবন যাওয়া হয়েছে?"

গদাধর—না, হয়নি।

শ্রীম—নাই বা হল।

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।" ইত্যাদি

আমাদের ঠাকুরের দর্শন লাভ হয়েছে, তাই জোর করে বলতে পারছি।

গুহ মহাশয়—আমাদের উপায়?

শ্রীম—তাঁকে চিন্তা করা, তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা। কাজ-কর্ম্মও করতে হবে, তাঁকে স্মরণও করতে হবে। "মামনুস্মর যুধ্য চ" (গীতা ৮।৭)। অবতারকে চিন্তা ও তাঁকে দর্শন করলেই ঈশ্বরকে দেখা হল।

ক্রাইষ্ট অবতার

"ক্রাইষ্ট বলছেন, 'আমাকে দেখছ আর আমার পিতাকে দেখছ না? আমাকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল।'

"তাঁর ভাইরা তাঁকে পাগল বলত। একবার তারা তাঁকে একটা পাহাড় থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। তিনি বুঝতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে যান।

"এক জায়গায় শাস্ত্রপাঠ হচ্ছিল। অবতারের (Prophet) প্রসঙ্গ হচ্ছে শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আমিই সেই অবতার।'

"আর এক জায়গায় বলছেন, 'মানুষ-মাছ ধরবে ত আমার সঙ্গে চলে এস।'

"একদিন রাস্তায় যেতে যেতে তাঁর জল-তৃষ্ণা পেয়েছে। একটি স্ত্রীলোক পাতকুয়ো থেকে জল তুলছে। ক্রাইষ্ট তাঁকে দেখে বললেন, 'তুমি আমাকে জল দাও, আমি তোমাকে অমৃত দেব।'

"আমরা ক্রাইষ্টকে (ঠাকুর রূপে) দেখেছি, তার সঙ্গে কথা কয়েছি। আলাপ করেছি। কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। আমরা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছি। তাই যেখানে গলদ, সেটা ধরতে পারি।

"একজন ডাক্তারের বয়স ৯২ হবে। তাঁরা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। এই রাস্তায় (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে) বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সঙ্গে ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হত। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যা না জানি ইনি তা জানেন।' আমরা যে ক্রাইষ্টের সঙ্গ করেছি, তা৺ উনি জানেন না।"

গুহ মহাশয়—আমাদের অনেক জন্ম নিতে হবে।

শ্রীম—সব ঠিকঠাক করে বসে আছেন! (সকলের হাস্য) ব্যাকুল হয়ে ডাকুন, প্রার্থনা করুন, তিনি একটা সুযোগ করে দেবেন।

॥ ৬৮ ॥

২২শে এপ্রিল, সোমবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

সাধুসঙ্গে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায়

সকাল আটটার সময় শ্রীম ছাদের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে জনৈক ভক্ত ও বিশ্বনাথ।

শ্রীম (বিশ্বনাথের প্রতি)—তুমি রোজ বেলুড়ে যাও, তাই তোমার চেহারা অন্য রকম হয়ে গেছে। সাধুদের সঙ্গে আলাপ করবে। তাদের জন্য ফলফুল কিছু নিয়ে যাবে। ফলফুল তাদের সামনে ধরলেই পূজো হয়ে যায়। গুণগ্রাহী হবে। শুয়োর পায়স ছেড়ে যা তা খেয়ে মরে। সেই রকম যারা অপরের দোষ দেখে বেড়ায় তারা কোন উন্নতি করতে পারে না।

"কোন সাথী পাও ত জয়রামবাটী, কামারপুকুর হয়ে এসো। জয়রামবাটী, কামারপুকুর মহাতীর্থ। তোমার চাকরি না করলেও হয়। যা জমিজমা আছে তাতেই চলে যাবে। তবে পড়া ভাল। সাধুসঙ্গ করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায়। জ্ঞান মহারাজের এই বইটি ('সার কথা') রোজ চেঁচিয়ে পড়বে। পড়া হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর হাতে পাঠিয়ে দিও।"

এই সময় অমূল্যচরণ বসু আসিলেন। তিনি সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থ এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

নিষ্কাম কর্ম্ম—ঘুমিয়ে মশা তাড়ানো

শ্রীম (অমূল্যের প্রতি)—ঠাকুর আপনাকে দেখলে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। একজন ভক্ত বৃন্দাবন দর্শন করে এসেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

"তীর্থ দর্শন করে আপনার চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেছে। আপনিই ঈশ্বরীয় কথা শোনবার উপযুক্ত। নির্লিপ্ত হয়ে কাজ করতে হয়। যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় মশা তাড়ানো। যোগীদের এবেলার কাজ ওবেলায় মনে নেই।"

। ৬৯ ।

২৩শে এপ্রিল, মঙ্গলবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

সকাল আটটা। শ্রীম ছাদের বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট। কাছে স্বামী ধর্ম্মানন্দ ও জনৈক ভক্ত।

নিরর্থক কিছু নেই

স্বামী ধর্ম্মানন্দ—যদি মনটা তাঁতে লগ্ন হয় তাহলে সব গোল মিটে যায়। এত দেখছে, রূপ, রস প্রভৃতি অনিত্য, তবু বিষয়ে আসক্তি যায় না।

শ্রীম—তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। সাধুদের দুটি function (কার্য্য)— একটি লোকশিক্ষা, অপরটি ভগবদ্দর্শন। বীজ পড়েছে। ক্রমে অঙ্কুর, ডালপালা, ফুলফল হবে। সন্তান হবার আগে দুঃখ। তিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে পাবার জন্য। পাঁক করেছেন পদ্মফুল ফোটার জন্য। তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই বাদ দেবার জো নেই।

মহাকর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ

"যদি বল আশ্রমের কাজ করতে হয়। নিষ্কাম ভাবে করলে আসক্তি হবে না, আসক্তি চলে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ এত কাজের মধ্যেও মহাযোগী। পাণ্ডবেরা তাঁকে চিনেছিলেন। অশ্বত্থামা যখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, উত্তরা কাঁপতে কাঁপতে আলুলায়িত কেশে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'হে মহাযোগিন্, রক্ষা কর রক্ষা কর!'

আমিটা কেন

"আমরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখেছিলাম একটি বালক ন্যাংটা—অহর্নিশি সমাধিস্থ। চোখ চেয়েও তাঁর সমাধি হত। জগন্মাতার হাতের পুতুল। তাঁর মহামন্ত্র ছিল, 'তুমি কর্ত্তা।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'আমিটা কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'তাঁকে ডাকবার জন্য—দাস ভাবে, বালক ভাবে থাকবার জন্য।'

"অধিকারী দেখলে তাঁর মুখ খুলে যেত। যাঁকে দেখতেন ধারণা করতে

করে যে কোন কর্ম্ম করা যায় সবই ভগবানের কাজ।"

একটু পরে বলিতেছেন, "আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। মার সঙ্গে একজনের বাড়ীতে গিয়েছি, তখন বয়স পাঁচ বছর হবে। তাদের বাড়ীর প্রকাণ্ড ছাদ ও অনন্ত আকাশ দেখে অবাক হয়ে রইলাম।"

॥ ৭২ ॥

১৩ই মে, সোমবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

ভক্ত জন্য শরীর ধারণ

বৈকাল ছয়টা হইবে। শ্রীম স্কুলবাড়ীর চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন। কাছে একটি ভক্ত ও দুইজন সাধু।

শ্রীম—যাদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাদের আর কর্ম্ম করতে হয় না। তাদের কর্ম্মক্ষয় হয়ে গেছে।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥" (গীতা ৩।১৭)

"ঠাকুর বলতেন, 'আমার যখন এই অবস্থা হল, মাকে বললাম—মা, বেহুঁস করে দিও না, জড করে দিও না, জড় সমাধিতে শরীর থাকে না।' গভীর ভাব সমাধিতে তাঁর শরীর এলিয়ে পড়ত। যেই আমিটা মা তাঁকে দিয়ে দিলেন, আবার শরীর চলতে লাগল। জড়বৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ বিচরণ করতেন। তাঁকে নির্জ্জনে, গোপনে যে যত চিন্তা করবে ততই সে বুঝতে পারবে।

বেঁচে থাকা শুদ্ধ সংস্কার বাড়াবার জন্য

সাধু—কোনখানে শরীর গেলে ভাল?

শ্রীম—আরও আপনার চল্লিশ বছর যাক, তখন বুঝবেন। সাধুদেরও সাধু-সঙ্গে থাকতে হয়। সারা জীবন যা যা ভাবে, মরবার সময় সেইগুলিই মনে ওঠে। মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে। গিন্নী বুড়ী এঘর ওঘর করে জিনিষপত্র গোছায়। তাই মৃত্যুকালে সে 'তেজপাতা, তেজপাতা' করে।

সাধু—আর যেন বেশীদিন বাঁচতে না হয়, যেন শীগ্‌গির যেতে পারি।

শ্রীম—ও বলতে আছে! এমন সুন্দর সংসার, এমন সুন্দর তাঁর লীলা, এ ছেড়ে কোথায় যাবেন?

অপর সাধু—এতদিন বাঁচব কি না বাঁচব, সে কথা বলছি না। যেখানে থাকি না কেন, তাঁর পাদপদ্মে যেন মতি থাকে।

শ্রীম—অহল্যা তাই রামচন্দ্রকে বলেছিল, "হে প্রভু, শূকরযোনিতে যদি জন্ম হয় তা হলেও যেন আপনাতে অচলা ভক্তি থাকে।" নারদও রামচন্দ্রকে এই কথা বলেছিলেন, "প্রভু, আপনার কাছে আর কিছু চাই না, যেন আপনার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।"

ব্যাকুলতা

সাধু—ঠাকুরকে পেতে গেলে কি দরকার? দৈব না পুরুষকার?

শ্রীম—ব্যাকুল হলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ব্যাকুলতা এলেই অরুণোদয় হল। তার পর সূর্য্যদর্শন। যারা সংস্কারবান তাদের শীঘ্র শীঘ্র ব্যাকুলতা আসে। তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, পাঁচ বছরের বালক মাকে না দেখলে যেমন করে। তবে অবতার যখন আসেন তখন ইট পাটকেলের মধ্যেও এই ব্যাকুলতা দিয়ে দিতে পারেন। তা না হলে ঠাকুর বলেছেন, "সাধুসঙ্গ করতে করতে আসে", "নির্জ্জনে তাঁকে ডাকতে ডাকতে আসে।"

হয় সাধুসঙ্গ নয় নিঃসঙ্গ

"হয় সাধুসঙ্গ না হয় নিঃসঙ্গ। বিষয়ীদের সঙ্গ করলেই পতন। মুষ্টিভিক্ষা বা চাঁদা আদায় করতে গেলেই বড়লোক ও মেয়েমানুষের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। তাদের মনরক্ষা করে কথা কইতে হয়। তাদের কাছে যাবার কি দরকার? আপনিই আসবে। যে যথার্থ ভক্ত, তার কাছে টাকা আপনি আসবে। নিষ্ঠা থাকলে ভগবান পাঠিয়ে দেন। আশ্রম চালাবার জন্য অভাব হয় না।"

সাধু—আমরা ভিখারীর ছেলে নই, এইটি মনে করতে হবে।

শ্রীম—আমি ভিক্ষা করব না, এ ত অহঙ্কারের কথা! যে নির্জ্জনে বসে তপস্যা করে, সে ভিক্ষা করবে না?

সাধু—হাঁ, মাধুকরী করবে।

শ্রীম—সাধু হয়ত কোন একটা আস্তানা করে বসেছে। যদি অন্য অতিথি সেখানে আসে তাহলে তারও সেবা করতে হবে। আমি হৃষীকেশে দেখে এসেছিলাম দুই সাধুতে ঝগড়া। একটি সাধু এক জায়গায় আসন করে বসেছে। আসন ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্য মুখ হাত ধুতে গিয়েছিল, ইত্যবসরে অপর এক সাধু এসে তার আসন সরিয়ে সেই জায়গায় নিজের আসন করেছে। এই নিয়ে পরস্পর ঝগডা। শেষে পুলিস এসে উভয়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দিলে।

সাধু—মনে বড়ই দুঃখ হয়, বৃথায় এ জীবনটা গেল।

শ্রীম—বালাই, তা কেন?

শঙ্করাচার্য্য

সাধুরা জলযোগ করিয়া চলিয়া গেলেন। একটু পরে ঘনানন্দ স্বামী ও তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন মাদ্রাজী ভক্ত আসিলেন। হাতে কিছু মিষ্টি। মাদ্রাজী ভক্তেরা শ্রীমকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, "ওঁদের দেশে ঐ রকম প্রণাম করে।" তাঁহাদের সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতেছেন। বলিলেন, "আজ শঙ্করাচার্য্যের জন্মদিন। আমাদের দুইজন বন্ধু শঙ্কর মঠে (রামরাজাতলায়) গিয়েছিলেন। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ ও গীতার উপর ভাষ্য রচনা করেছেন। তিনি চারধামে চারটি মঠ স্থাপন করেছেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর মাদ্রাজী ভক্তগণ চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা হইল। নান্তে কথা কহিতেছেন।

গরীবের সেবা

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—এখন খুব কলেরা লেগেছে, না? দেখুন, গরীবদের উপর বিরক্ত হবেন না। তাদের কাছ থেকে টাকা ত নেবেনই না, বরং আপনার পকেট থেকে দেবেন। কর্ম্মক্ষেত্রে থাকতে গেলে ঐ রকম করতে হয়। তা হলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাবেন। গরীবদের আর কে দেখছে? তাদের কত অভাব, কে খোঁজ নেয়?

॥ ৭৩ ॥

১৪ই মে, মঙ্গলবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

বেলা নয়টা হইবে। শ্রীম ছাদের বারান্দায় ব্রহ্মচারী বিভুচৈতন্যের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঠাকুরের কাম-কাঞ্চন ত্যাগ কাব্যকথা নয়

বিভুচৈতন্য—এ সমস্ত দেখে শুনে কেমন মনে হয়?

শ্রীম—তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য। পিসীমা যা বলেছিল তাই ঠিক। ঠাকুরের কথা থেকে বাইরে গেলেই পতন। তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলে গিয়েছিলেন। একি কাব্যকথা? যদি তাঁর কথা না শুনে কেউ অন্য রকম আচরণ করে, তাহতে তার পতন হবে না?

"ঠাকুর কামারপুকুরে মাকে বলেছিলেন, 'এই চালাঘরটি রইল, এই ঘরে বসে তাঁর নাম করা। রেঁধে দুটি শাক ভাত খাওয়া। রাত্রে ভাত না হলেও চলে, দুটি বাতাসা ভিজিয়ে খাওয়া।' কামারপুকুরে লাহাদের চিত্রবিচিত্র বাড়ী দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'এত চিত্রবিচিত্রের দরকার কি। কেবল দেখতে হবে যাতে শেয়াল, কুকুরে হাঁড়ী না মারে।'

"এখন শুনি কেউ কেউ বলে, 'এ বাক্সটা আমার, এ আশ্রমটা আমার।' সাধুদের নিজের বলে কিছু আছে নাকি? স্বামীজী বলেছিলেন, 'সাধুর নিজের কোন সম্পত্তি থাকবে না।' স্বামীজী আমেরিকা থেকে এসে সব টাকাকড়ি রাখাল মহারাজকে দিয়ে দিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করে খেতে লাগলেন। আমাদের কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি এখন ভিক্ষা করে খাচ্ছি। আপনি কিছু ভিক্ষা দেবেন?' আমরা শুনে অবাক।

"শুকুল মহারাজের নিজের একটা বাক্স আর কি কি ছিল। তিনি সেই জিনিষগুলি মঠে দিয়ে ঐ কথাই বলেছিলেন, 'সাধুদের নিজের কোন সম্পত্তি থাকবে না'।"

এইরূপ কথাবার্তার পর ব্রহ্মচারীজী জলযোগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৈকাল ছয়টা। অদ্বৈত আশ্রমের মহাবীর মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মচারী বিবেকচৈতন্য আসিয়াছেন। ইনি অষ্ট্রেলিয়াবাসী সাহেব। সম্প্রতি

নিউমোনিয়া হইয়াছিল, তাই হাসপাতালে ছিলেন। শ্রীম ছাদে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ক্রাইষ্ট ও ঠাকুর অভেদ

শ্রীম—মহাপুরুষ মহারাজ আপনাকে আদেশ করেছেন দেশে যেতে। আপনার এখানকার জল হাওয়া সইছে না। কিছু দিন দেশে যাওয়া ভাল। ভাল হয়ে আবার আসবেন। শরীর ধারণ করলে দেহের সুখ দুঃখ আছেই। দেখুন না যীশুখ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ, এঁরা কত কষ্ট ভোগ করেছেন। ক্রাইষ্ট ধর্ম্মধ্বজী পুরুতদের তীব্রভাবে নিন্দা করেছিলেন। তারা যখন ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্রুশে দিল, তখন তাঁব একটুও ক্রোধের ভাব ছিল না। তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "হে পিতঃ, এরা অজ্ঞান, কিছু জানে না। এদেব তুমি ক্ষমা কর।"*

বিবেকচৈতন্য—শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজ যীশুখ্রীষ্টের দলের লোক ছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "শরৎ মহারাজ পীটার ছিলেন।"

শ্রীম—ঠাকুর কিছু নাম বলেন নি, সেই দলের ছিলেন, এইটুকুই বলেছিলেন। ঠাকুরের কথার সঙ্গে ক্রাইষ্টেব কথা কেমন মিলছে। ঠাকুব বলেছিলেন, "আমাকে ধ্যান করলেই হবে।" যীশুখ্রীষ্টও বলেছিলেন, "আমি সংসার জয় করেছি। আমাকে ধরে থাক। আমি তোমাদের শান্তি দেব।"

ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করতেন না। তাঁর জীবনে অদ্ভুত ত্যাগ দেখিয়ে গেলেন। যীশুখ্রীষ্টও বলেছেন, 'শেয়ালের থাকার গর্ত্ত আছে, পাখীর বাসা আছে, কিন্তু আমার মাথা গোঁজবারও একটু স্থান নেই।'

"ঠাকুর বলতেন, 'ব্যাকুলতা এলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হও, তাঁব কাছে কাঁদ, তাহলেই দেখা পাবে।' যীশু বলেছেন, 'তাঁর কাছে চাও, তা হলেই তিনি দিয়ে দেবেন। খুঁজলেই পাবে। দরজায় ঘা দিলেই দরজা খুলে যাবে।' ঠাকুর বলতেন, 'ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়।' যীশু বলছেন, 'আমাকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হয়।' তিনি আরও বলেছেন, 'সংসারী লোকেরা বিষয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে।' আহার, নিদ্রা, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাম, যশ—এই ত তাদের কাজ। সংসারীরা ভাবে, 'আরও টাকা ও বিষয়-সম্পত্তি হলে বেশ

* St. Luke, 20.

সুখে-স্বচ্ছন্দে বসে ভোগ করব।' কিন্তু তারা জানে না, এ শরীর থাকবে না। এই মুহূর্ত্তে যে মৃত্যু হতে পারে, তা তারা ভাবে না।'* তাই সাধুরা এসব ত্যাগ করে তাঁকে ডাকে—ঈশ্বরকে নিয়ে থাকে। এ শরীর যখন থাকবে না, এসব যখন অনিত্য, তখন তারা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে চায়।

"ক্রাইষ্ট বলছেন, 'যারা জ্ঞানী, পণ্ডিত বলে অহঙ্কার করে তাদের কাছে ভগবান প্রকাশিত হন না। যারা অভিমানশূন্য বালকের মত সরল তাদের কাছে ঈশ্বর প্রকট হয়ে থাকেন।' (St. Mark II)।

"দেখলেন ঠাকুরের কথার সঙ্গে সবই মিলছে। প্রভেদ কেবল তাঁর জন্মস্থানের সঙ্গে। প্রকৃত তত্ত্ব এক। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যিনি রাম, কৃষ্ণ, ক্রাইষ্ট, চৈতন্য, ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ।' অবতার ও গুরু না হলে duty (কর্ত্তব্য) বলে দেবে কে ? পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত কিছু বলতে পারে না। তারাও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। 'কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ' (গীতা ৪।১৬)।"

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম সাধুদের জলযোগ করাইলেন এবং ষ্টীমারে তুলিয়া দিতে হিমাংশুকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন।

॥ ৭৪ ॥

১৫ই মে, বুধবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

বৈকাল প্রায় ছয়টা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। নিকটে তিন চারি জন ভক্ত।

বলি আটকে গেলে আর বলি দিতে নেই

জনৈক ভক্ত—আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল। আপনি তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখেছেন, আপনার কাছ থেকে শুনলে সংশয় যেত। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, আমার এক জায়গায় যেতে হবে।

শ্রীম—একটু কিছু বলুন।

* St. Luke, 12.

ভক্ত—দুর্গাপূজাদিতে গৃহস্থেরা ছাগ বলি দেয়, এটা কি অন্যায় ? আমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি দুর্গাপূজা করে এসেছেন। আমিও করছিলাম। কিন্তু একবার বলি আটকে গিয়েছিল, সেই থেকে বন্ধ করেছি। এটা কি অন্যায় হয়েছে ?

শ্রীম—তিনি (ঠাকুর) বলতেন, "শাস্ত্রে যেমন বিধি-নিষেধ আছে সেই রকম করতে হয়।" মহাষ্টমীর দিনে সন্ধিপূজায় রামলালদাদাকে বলতেন, "এখন বলি হবে রে, সাবধান হয়ে পূজা করিস।" ঠাকুর বলি দেখতে পারতেন না, মহাপ্রসাদও খেতে পারতেন না। মার প্রসাদ বলে কপালে ঠেকাতেন।

"এখন দক্ষিণেশ্বরে বলি হয় না। এখন যাদের পালা, তারা বৈষ্ণব। ভক্তের ভাব নিয়ে কথা। তবে তিনি বলতেন, 'কিসে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয় তার চেষ্টা কর। শূকরের মাংস খেয়েও যদি কারও ভক্তি থাকে, সে ধন্য। হবিষ্যান্ন খেয়ে যাব তাঁতে ভক্তি না থাকে তাকে ধিক।' শাস্ত্রে আছে—বলি আটকে গেলে আর বলি দিতে নেই।"

ভক্তের জাতিভেদ নেই

ভক্ত—ঠাকুর জাত সম্বন্ধে কি বলতেন ?

শ্রীম—ভক্তি হলে জাত উঠে যায়। গানে আছে, "জাতের বিচার করো না ভাই।" চৈতন্যদেবের সময় জাত উঠে গেল। নিত্যানন্দ সকলের সঙ্গে খেতে লাগলেন ও সকলকে নাম বিলুতে লাগলেন। চৈতন্যদেব মহাভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন, বাহিরে হুঁস থাকত না। তাই তিনি প্রচার করতে পারতেন না। নিত্যানন্দ প্রভু প্রচার করতেন। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে লোকে এক সঙ্গে বসে খায়। মঠেও এক সঙ্গে বসে খায়। বক্তৃতা দিয়ে কি কেউ জাত উঠিয়ে দিতে পারে ? ভক্তি না হলে হাজার বক্তৃতা দাও, কিছুই হবে না।

"কাছের এক বাড়ীর বাঙ্গালী-খ্রীষ্টানরা বলে, 'সাহেব-খ্রীষ্টানরা আমাদের নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু নিমন্ত্রণে গিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি, কেউ কিছু খবরই নেয় না—Native (দেশী) বলে পোছে না। সাহেবরা খেয়ে দেয়ে চলে গেল। আমরা বসেই আছি। হয়ত একটা চাকর আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে। যতদূর অশ্রদ্ধা করবার করে।' তার মানে ভক্তি নেই।"

ভক্তটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। এইবার শ্রীম গান গাহিতেছেন—

"হরি নাম নিসরে জীব যদি সুখে থাকবি।" ইত্যাদি

গানের পর বলিতেছেন, "কৃষ্ণকিশোরের কি ভক্তি! তীর্থে গিয়েছেন। একজনকে পাতকুয়ো থেকে জল তুলে দিতে বললেন। সে বললে, 'আমি মুচি।' কৃষ্ণকিশোর এত আচারী তবু বললেন, 'তুই শিব শিব বল, তাহলে শুদ্ধ হয়ে যাবি।' সে শিব শিব বলে জল তুলে দিলে। তিনি সেই জল খেলেন। তাই তাঁর নামই সত্য।"

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম ছাদে ধ্যানান্তে ভক্তদের নিকট আসিয়া বসিলেন। একটি ছেলে, গড়পারে বাড়ী, এইবার ম্যাট্রিক দিয়াছে; সে আসিয়া শ্রীমর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

শ্রীম—(ছাত্রটির প্রতি) কি, scholarship (বৃত্তি) পাবে ত?

ছাত্র—এখনও, ফল বেরোয় নি।

শ্রীম—আহা! তোমার কি ভক্তি!

(ভক্তদের প্রতি) "তাঁর (ঠাকুরের) কথা বলতে বলতে কাঁদে। দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলে?

ছাত্র—হাঁ।

শ্রীম—মঠে গিয়েছিলে?

ছাত্র—হাঁ।

শ্রীম—গীতার সেই শ্লোকটি বলত—"কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্" (গীতা ৮।৯); আর ঐ শ্লোক—'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি' (কঠ ১।২।১৫)।

"দেখ, তাঁকে পাবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করতে হয়। (সাধুদের দেখাইয়া) এঁরা সব যেমন করছেন। এই দেখ, তোমার সাধুসঙ্গ হয়ে গেল। বলত—

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥'

(মোহমুদ্গর)

"সংসারীরা টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহের সুখ নিয়ে রয়েছে। সাধুরা সে সব চায় না। তারা কেবল ভগবানকে চায়। কারও কারও ব্রহ্মচর্য্য হবে শুনলে হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে। মঠে ঠাকুরের জন্মদিনে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দেওয়া হয়। সেইদিনে তাদের দেখতে যেও। দেখবে তাদের মন সেদিন

কেমন অন্তর্মুখ হয়ে থাকে। যারা সংস্কারবান তাদের হৃদয়ে নিত্য উৎসব। ঠাকুরের কাছে কেউ কেউ বলত, 'আপনাকে দেখলে হৃদয় নৃত্য করে।' ঠাকুর বলতেন, 'যারা আপনার লোক তাদের ঐ রকম হয়।' যারা ভোগে মেতে রয়েছে তারা কি বুঝতে পারে? বেগুনওয়ালা কি হীরার দাম দেবে? বলবে 'ন সেরের বেশী আর দিতে পারব না।' জহুরীই কেবল তার মূল্য দিতে পারে।

"শাস্ত্রে অনেক interpolation (প্রক্ষিপ্ত অংশ) আছে। কে বলে দেবে? গুরু কাছে থাকলে তিনি বলে দেন। তোমরা অনেক পড়াশোনা করবে, ঠাকুরের এই কথাগুলি চিন্তা করলে উপকার হবে।"

এই সময় জনৈক সন্ন্যাসী আসিলেন।

শ্রীম—(সন্ন্যাসীর প্রতি ছেলেটিকে দেখাইয়া) একে বলছিলাম, 'অনেক পড়বে টড়বে,' এই সব কথা।

লেখা কাগজে আর লেখা চলে না

সন্ন্যাসী—ঠাকুরের কাছে যারা পাস করে যেত তাদের সঙ্গে তিনি ততটা কথা কইতেন না।

শ্রীম—কারু সঙ্গে কইতেন, আবার কারু সঙ্গে কইতেন না। লোক বিশেষে। লেখা কাগজের ওপর আর লেখা চলে না। সাদা কাগজে লেখা চলে। যারা অনেক পড়েছে, তাদের বিদ্যা খরচ না হয়ে গেলে তাঁতে সম্পূর্ণ মন দিতে পারে না। তাই ঠাকুর তাদের টানতেন না। স্বামীজীকে ঠাকুর বললেন, "তুই (বি, এল,) এগজামিন (পরীক্ষা) দিবি নে?" স্বামীজী বললেন, "যা পড়েছি তা ভুলে গেলে বাঁচি।" সেইদিন তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এত ব্যাকুল যে রাস্তায় পায়ের চটি জুতো কোথায় পড়ে গেছে তার হুঁস নেই।

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন

সন্ন্যাসী—তবে কতকগুলি কথা সাধারণভাবে সকলকে বলা চলে, যেমন হরিনাম করা।

শ্রীম—তাত বললেন। একজন বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে মা কালীকে প্রণাম না করে ঠাকুরকে বললে, "আমি মা কালীকে প্রণাম করলাম না, সঙ্গীরা ঠাট্টা করবে, বলবে—খুব ভক্ত হয়েছে।" ঠাকুর শুনে

বললেন, "বেশ করেছ।" তিনি ভিতরটা দেখেন। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" আর একজন (প্রিয়নাথ) কালো-পেড়ে কাপড় পরা, পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে, লম্বা টেরি, এসেন্স মাখা; ঠাকুর তার গলা ধরে পঞ্চবটী থেকে তাঁর ঘর পর্য্যন্ত বেড়ালেন। আমরা ত দেখে অবাক। যিনি এসব ছুঁতে পারেন না, তিনি কি করে তার সঙ্গে এত মেলামেশা করলেন। সে লোকটির শেষের অবস্থা অদ্ভুত। পূজো করতে বসেছে, ওপর থেকে এক তাড়া বেলপাতা পড়ল। সেই যে আসনে বসল, আর সেখান থেকে উঠল না। মরবার সময় তাঁর নাম করে শরীর গেল।

জনৈক ভক্ত—তাঁর কি নাম?

শ্রীম—সে আর একদিন হবে। সাধারণভাবে কি বলা যায়! তিনি অন্তর বার আগের জন্ম, পরে কি হবে, সব দেখতে পেতেন। একজনকে বললেন, 'আমি ত তোমার সব জানি—পূর্ব্বজন্মে কি ছিলে, ভবিষ্যতে কি হবে। গীতায়ও তাই বলছেন—'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন' ইত্যাদি (গীতা ৪।৫)

লেখাপড়া

সন্ন্যাসী—যারা লেখাপড়া করত না, তাদেরও বকতেন। যেমন খোকা মহারাজকে বকেছি৻ ৻ন।

শ্রীম—হাঁ, লোক বিশেষে। খোকা মহারাজকে 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই' এই গান লিখতে দিয়েছিলেন। সে লিখতে গিয়ে বানান ভুল করেছিল। তাই ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'তুই কিছু শিখিস নি, ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়েছিস।'

সাধুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি

এইবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। শ্রীম বলিতেছেন, "সাধুদের কোন সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। স্বামীজী আমেরিকা থেকে এসে সব টাকাকড়ি প্রেসিডেন্টের (অধ্যক্ষের) কাছে দিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'আমার এ সব ভাল লাগছে না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেমন শেয়ারের গাড়ী করে যেতাম, সেই রকম যেতে ইচ্ছা করে।' কয়েকদিন ঐ রকম দক্ষিণেশ্বরে শেয়ারের গাড়ী করে যেতে লাগলেন। আমাদের কাছে পোষ্টকার্ড এল, 'আমি এখন ভিক্ষা করে খাচ্ছি, আপনি কিছু ভিক্ষা দেবেন?' আমরা

শুনে অবাক।

"মঠে কয়েকজন সাহেব এসেছিলেন। মহারাজকে দেখিয়ে তাদের বলছেন, 'আমাদের ইনি প্রেসিডেণ্ট।' ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে কি তাঁকে অনুসরণ করা হল? তিনি পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী ত্যাগ করলেন, শেষে সঙ্ঘের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন।"

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন

॥ ৭৫ ॥

২৬শে মে, রবিবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

বেলা প্রায় আটটা। শ্রীম ছাদের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে দুইটি ছোকরা ভক্ত।

নূতন ব্রহ্মচারীদের সমাজে মেশা উচিত নয়

শ্রীম বলিতেছেন, "যারা নূতন ব্রহ্মচারী, তাদের কাঁচের আলমারিতে রাখা উচিত।" জনৈক ব্রহ্মচারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ও নূতন ব্রহ্মচর্য্য নিয়েছে, ওর কলকাতায় আসা উচিত নয়। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করা কি একটা তামাসা? 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি' (গীতা ৮।১১)। নির্জ্জনে বসে ধ্যান করতে হয়। শাস্ত্রে আছে, বার বৎসর নিজের দেশে যেতে নেই, জ্ঞাতিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে নেই। ভগবানকে পাওয়া কি এত সহজ?

"বাবুরাম মহারাজ বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকতেন না, ওঁর ভগ্নীপতির বাড়ী কিনা। তাই সকলে ওঁকে ঠাট্টা করত। বলত, 'বাবুরাম মহারাজ মহাপুরুষ লোক, তিনি কি এখানে থাকবেন?'

"আবার অনেকে বলে নির্লিপ্ত হয়ে এ সব করব। তাহলে বাপ মা ত্যাগ করে আসবার কি দরকার ছিল? যারা সবে সাধু হতে এসেছে, তারা যদি বেশী গৃহস্থের সঙ্গে মেশে, বিষয়ীদের কাছে টাকা ভিক্ষে করে, তাহলে কি ভক্তি হয়? যারা পুরনো হয়েছে, অনেক সাধুসঙ্গ তপস্যাদি করেছে, তাদের কামিনী-কাঞ্চনে ততটা কিছু করতে পারে না।"

এই সময় জনৈক সন্ন্যাসী আসিলে শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এত রোদে এলেন কেন?" আবার কথা চলিতে লাগিল—"গানে আছে, 'বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধরে খাই হলাহল।' ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা, চারদিকে কামিনী-কাঞ্চন; এতে আমার শরীর থাকবে না।' মা বললেন, 'না, শুদ্ধ ভক্তেরা আসবে; তাদের জন্য থাক।' তাই তিনি একুশ বৎসর অপেক্ষা করেছিলেন।

(গদাধরের প্রতি) "ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন, কামিনী ও কাঞ্চন। ব্যাকুলতার সাহায্যে পথেব বিঘ্ন দুটি কাটিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায়।"

মেয়েদের সকাম ভক্তি

আগে থাকতেই কি মাতৃভাব? ঈশ্বরকে লাভ করলে তখন সম্পূর্ণ মাতৃ-ভাব আসে। মেয়েদের সকাম ভক্তি, প্রায়ই তাদের জ্ঞান হয় না।

সন্ন্যাসী—মেয়েদের ভক্তি হয়?

শ্রীম—শুদ্ধা ভক্তি হওয়া বড কঠিন, সকাম ভক্তি হয়। যেমন, ছেলে হোক, ব্যারাম ভাল হোক, ধনসম্পত্তি বাড়ুক, এই সব কামনা করে প্রণাম করে। তাহলেও গীতায় ভগবান বলছেন, 'সকলেই উদার, সকলেই আমার ভক্ত' (গীতা ৭।১৮)। সব আলাদা আলাদা থাক করেছেন।

সাধুর থাক

সন্ন্যাসী—সাধুরা ত সকলেব কাছে ভিক্ষা করে, সেও ত একটা obligation (বাধ্যবাধকতা)। সেটা কি অন্যায়?

শ্রীম—সকলেই সংস্কার অনুসারে কাজ করে। যাদের অহঙ্কার আছে, তাদের চাইতে হবে। আর যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁদের কাছে সব এসে পড়ে, তাঁদের চাইতে হয় না।

সন্ন্যাসী—ঠাকুর বলতেন, 'ভিক্ষান্ন খুব শুদ্ধ।'

শ্রীম—অধিকারি ভেদে বলতেন। হাঁ, মুষ্টিভিক্ষা করলে আসক্তি হয় না। কত রকম সাধুর থাক আছে। এক থাক ভিক্ষের জন্য জোর করে। আর এক থাক 'নমো নারায়ণায়' বলে দাঁড়ায়। দিলে ভাল, না দিলে নাই দিলে। অন্য এক থাক, যেখানে লোকজনের যাতায়াত সেইখানে বসে, অথচ চাইবে না। আর এক থাক আছে যেন পাগল। যেমন, 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ' (শুকাষ্টকম্)। যিনি ত্রিগুণাতীত পুরুষ

তিনি যদি নিয়ম মেনে চলেন ত সে কেবল লোকশিক্ষার জন্য।

বৈকাল পাঁচটা, শ্রীম ছাদে পায়চারি করিতেছেন। সঙ্গে একটি ভক্ত। তাহার সহিত ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন। বলিতেছেন, "বিলাতে পার্লামেণ্টে হাত তোলাতুলি করে ভোট দেয়। কোন কিছু করতে হলে resolution (সিদ্ধান্ত) পাশ করে। তোমাদের দেশে হয়?"

ভক্ত—কই, দেখি নি।

রাক্ষসীর গল্প

শ্রীম (হাসিতে হাসিতে)—এক রাক্ষসী চারটে মানুষের মাথা নিয়ে সকলকে দেখিয়ে বললে, 'এর মধ্যে কে জ্ঞানী ছিল? যদি না বলতে পার তবে তোমাদের খেয়ে ফেলব।' কেউ বলতে পারছে না। তখন তাদের মধ্যে একজন উঠে একটা কাঠি এনে একটা মাথার কানের ভেতর ঢোকাবার চেষ্টা করলে। কাঠিটা কিছুতেই গেল না। তখন আর একটা মাথায় চেষ্টা করলে। তাতে কাঠিটা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তৃতীয় মাথাটার মধ্যে দিতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চতুর্থটিতে কাঠিটা অনেকখানি গিয়ে আর গেল না। প্রথমটা কোন ভাল কথাই কানে তোলে নি। দ্বিতীয়টা যা শুনেছে তা এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তৃতীয়টার মুখ দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে। চতুর্থটি যা শুনেছে, সব ধারণা করেছে।

ঠাকুর ও নারায়ণ শাস্ত্রী

ভক্ত—ঠাকুর মন্ত্র দিতেন?

শ্রীম—না। নারায়ণ শাস্ত্রী ঠাকুরকে কত করে ধরেছিল মন্ত্র নেবার জন্য। ঠাকুর বললেন, 'আমার মন্ত্র দেবার জো নেই। আমাকে মা সে অবস্থায় রাখেন নি, বালকের অবস্থায় রেখেছেন।'

ভক্ত—জিভে লিখে দিতেন না?

শ্রীম—হাঁ, নিজের মুখামৃত আঙ্গুলে করে নিয়ে জিবে লিখে দিতেন।

এই সময় আর তিন জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীম চেয়ারে বসিয়া বলিতেছেন, "আহা, আকাশে কেমন মেঘ করেছে! কবি কালিদাস 'মেঘদূতে' বলেছেন, 'আষাঢ় মাসের প্রথম দিন হতে বর্ষারম্ভ। ঋষিদের মেঘ, বিদ্যুৎ আদি দেখলেই ঈশ্বরকে মনে পড়ত।' তাই

কঠোপনিষদে (৬।৩) আছে, 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ' ইত্যাদি।

ভোগ থাকতে ক্রাইষ্টকে বোঝা যায় না

"ঋষিরা জগতের মূল কারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জেনেছিলেন যে তিনিই এই সব হয়ে আছেন। তাই যে কোন বস্তু দেখলেই তাঁদের উদ্দীপন হত। ইউরোপ আমেরিকার লোকে খাওয়া দাওয়া, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ইন্দ্রিয় সুখ, এই সব নিয়ে রয়েছে। যারা সে দেশে গেছে তাদের কাছ থেকে খবর নিয়েছি। ক্রাইষ্টকে যারা বলে পাগল, তারা কত কি বই লিখেছে। সে সব পড়ে কি চৈতন্য হয়? সাধন না থাকলে, ভোগ-বাসনা ত্যাগ না করলে, কি তাঁকে বোঝা যায়?"

সংসার চক্র

ভক্ত—জগতে কোন বস্তু নষ্ট হয় না?

শ্রীম—না, চক্রের মত ঘুরছে। যেমন সারা বছর ধরে রোদে সমুদ্র থেকে জল বাষ্প হয়ে আকাশে জমা হয়। তারই নাম মেঘ। ঠাণ্ডা লাগলে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আবার মেঘ হয়ে জমা হয়, তাই থেকে আবার বৃষ্টি হয়। মানুষে যে জল খায় তা ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়। যে সব জিনিষ শরীরে মিশে রয়েছে, মৃত্যুর পর সেগুলা পঞ্চভূতে মিশে যায়। এই রকম নাগর-দোলার মত ঘুরছে। আবার যোগীরা দেখেন, এই স্থুল শরীরের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম শরীর আছে। সেই সূক্ষ্ম শরীরই ইহলোকে পরলোকে যাতায়াত করে। সেই আবার স্থুল শরীর ধারণ করে।

ভক্ত—যোগীরা এই সব চিন্তা নিয়ে থাকেন?

শ্রীম—তাঁদের অন্য চিন্তা নেই ভগবান ছাড়া। খাওয়া দাওয়া কেবল শরীর ধারণের জন্য।

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম নিজের ঘরে যাইয়া ধ্যান করিতেছেন। ক্রমে অনেক ভক্তেরা আসিলেন। একটু বৃষ্টি হওয়ায় চারতলার ঘরে বসা হইল।

এ-যুগে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগ সোজা

ধ্যানান্তে শ্রীম একটি ভক্তকে বলিতেছেন, "শোক ভোলবার প্রধান উপায় শোকের বিষয়ে দোষ দেখা। যার জন্য শোক হচ্ছে তাতে দোষ

দেখলে শোক কমে যায়, জগতের বেলায়ও তাই। ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্য আনবার জন্য ভগবান দোষদৃষ্টি করতে বলেছেন।

'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥ (গীতা ১৩।৮)

ভক্ত—বেদান্তবাদী সাধুরা বেশ। তাঁদের শোক হয় না। 'সোঽহং' চিন্তা করে করে তাঁদের মনে দৃঢ় সংস্কার হয়ে যায়।

শ্রীম—সে কি হয়? চন্দ্র, সূর্য্য, জল, হাওয়া সব দরকার। এসব ছেড়ে জগৎ ভুল হয়ে গেলেই হল। একটি সাধু পঞ্চবটীতে বসে ছিল। ঠাকুর অন্তর্যামী; তাকে দেখেই বললেন, "ক্যা, 'সোঽহং, সোঽহং করতে হেঁ?' বাজনার বোল সকলেই মুখে বলতে পারে, কিন্তু হাতে আনতে পারে না। বেদান্তবাদী সাধুদের সুখ দুঃখ, রোগ শোক, সব হয়; ভেতরে চেপে রাখে, এরূ একজন মরে যায়, তবু লজ্জায় অসুখের কথা বলে না।

"এ যুগে 'সোঽহং' হবার জো নেই। অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, চারদিকে কামিনী-কাঞ্চন। তাই ভক্তিযোগ। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, 'তুমি কি লাঠি দিয়ে মনকে ওপরে ওঠাবে?' কেউ কেউ ঐরকম জোর করতে গিয়ে পাগল হয়ে যায়। শক্ত ব্যামো হয়ে যায়, হয়ত থাইসিস হয়ে গেল। যে যুগের যেমন। অবতার এসে বলে দেন। তাঁর মত নেয় না বলেই দুর্গতি।

"ঠাকুর হরি মহারাজকে একদিন বললেন, 'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, বাঁধা না দিলে কি পারিস্ বাঁধিতে'?"

রাত্রি সাড়ে নয়টা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৭৬ ॥

২৭শে মে, সোমবার, ১৯২৯। স্কুলবাড়ী

বৈকাল বেলা প্রায় পাঁচটা। শ্রীম ছাদের বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট। কাছে জনৈক ব্রহ্মচারী।

বক্তৃতার পূর্ব্বে নির্জ্জনে বসে চিন্তা

ব্রহ্মচারী—যাবা বক্তৃতা করে ঠাকুর স্বামীজীর কথা লোককে বলে, তাতে কি তাদের চিত্তশুদ্ধি হয় না?

শ্রীম—প্রতাপ মজুমদারকে ঠাকুর বলেছিলেন, "অনেক ত লেকচার টেকচার হল, এখন সমস্ত মন দিয়ে নির্জ্জনে বসে তাঁকে চিন্তা কর। ওপর ওপর ভাসলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিলে তবে পাওয়া যায়।" মজুমদার ভেবেছিলেন, প্রচার করাই ভগবানকে ডাকা। ঠাকুর সেটাকে আমল দিলেন না, একেবারে উড়িয়ে দিলেন। যেমন এক বছর ডাক্তারী পড়ে লাইসেন্স না পেয়ে যদি কেউ চিকিৎসা করে ত তাকে পুলিশে ধরে। এক জোয়ান হিন্দুস্থানীর মস্ত ফোড়া হয়েছিল, একজন অনেক দিন ডাক্তারদের কাটাকুটি দেখেছিল। তাই সে তার ফোড়াতে ছুরি চালিয়েছিল। সে লোকটি 'মারা গেলাম, মারা গেলাম,' বলে চীৎকার করে। হরি মহারাজ তাই শুনে যে অস্ত্র করেছিল তাকে বললেন, "করেছিস কিরে!" যাই হোক, ঈশ্বর কৃপায় রোগীটি সেরে উঠল। কড়া জান বলে বেঁচে গেল, তা না হলে মারা যেত।

ভগবান যোগক্ষেম বহন করেন

ব্রহ্মচারী—আশ্রমে থাকতে হলে কিছু ত করতে হবে?

শ্রীম—তাঁর নামজপ, ধ্যান, তপস্যাদি করবে। আশ্রম চালাবার জন্য যে টাকার দরকার তা আপনা আপনি আসবে। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে" (গীতা ৯।২২), ইত্যাদি। তবে তীর্থে যাচ্ছ, কোথাও হয়ত এক রাত থাকতে হল। সেখানে কিছু বলতে হবে; তাহলে ভাড়াটা দেবে, খেতে দেবে। ঠাকুর নন্দন বাগানে রাখাল মহারাজকে বললেন, 'এত রাত্রে

যাই কোথায় ? তিন টাকা দু আনা ভাড়া কে দেবে ?' (উভয়ের হাস্য)

বুদ্ধের দয়া

এইবার ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—বুদ্ধদেবের মধ্যে দয়া ও সকলের প্রতি ভালবাসা ছিল। তিনি জীবের দুঃখ দেখে মুক্তির জন্য কঠোর সাধনা করে নির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন। তিনি নির্ব্বাণ লাভ করেও দয়া রেখেছিলেন।

নীচেকার অহং

ব্রহ্মচারী—শোক কে করে ?

শ্রীম—নীচেকার অহং (আমি), ওপরকার আমি নয়।

ব্রহ্মচারী—প্রাণটা কি ? লোকে বলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে।

শ্রীম—বায়ু। বায়ুতে প্রাণ আঁটুপাটু করে।

ঠাকুরে ষোল আনা

শ্রীম—(হরিবাবুর প্রতি) বিজয় গোস্বামী এসে ঠাকুরের কাছে বললেন, 'কোথাও কিছু নেই, এইখানেই দেখছি ষোল আনা'। তারাকিশোরবাবু (সন্তদাস বাবাজী) আগে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, এখন সব ছেড়ে ছুড়ে বৈষ্ণব—বৃন্দাবনে মহান্ত। তাঁর কাছে শুনেছিলাম, কাঠিয়া বাবা একবার বলেন, 'কি বলব, সব ভেখ পরে বেড়ায়, ভিতরে ঈর্ষা, দ্বেষ, মান, যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বাইরের চাকচিক্যেই ভুলে যায়। যদি কোথাও ভাণ্ডারা হল, চল্লিশ জনের যাবার কথা, কিন্তু ফর্দ্দ দিলে আশী জনের।' যীশু-খৃষ্টও তাই বলেছিলেন, 'গোরস্থান বাইরে দেখতে সাদা ধপধপে ভিতরে পচা মড়া।' লোককে দেখাবার জন্য সভার মাঝখানে উচ্চাসনে ধ্যান করতে বসল। এই সব আর কি।

"কাশীর প্রকাশানন্দ স্বামী শিষ্যদের কাছে বেদান্ত ব্যাখ্যা করছেন। চৈতন্যদেব অত্যন্ত দীনহীনভাবে এক কোণে বসে শুনছেন। অবতারদের ত মান যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাঁরা অহর্নিশি সচ্চিদানন্দে মগ্ন। বাইরে একটু হুঁস থাকে, তাই ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য

শ্রীম (বেঞ্চিতে বসিয়া পূর্ণেন্দুর প্রতি)—আজ একজন নূতন ব্রহ্মচারী এসেছিল, আমি তাকে বললাম, 'নূতন ব্রহ্মচর্য্য হয়েছে। তোমার জ্ঞাতিদের কাছে থাকাই উচিত নয়।' শাস্ত্রে আছে, বার বৎসর নিজের দেশে আসতে নাই। বাবুরাম মহারাজ বলরামবাবুর বাড়ীতে আসতেন না। নিজের ভগ্নীপতির বাড়ী কি না?

হরিবাবু—একদিন বাবুরাম মহারাজ বলরাম মন্দিরে এসেছিলেন। যে ঘরে ঠাকুর বসতেন, সেই ঘরে বসে তামাক সেজে টানছেন, উদ্দীপন হবে বলে। লাটু মহারাজ দেখে বললেন, 'তোমার লজ্জা করে না নিজের বাড়ীতে আসতে?'

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—ইনি খুব পুরোনো লোক।

কথা বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। ধ্যানান্তে কথা বলিতেছেন—

"অধর সেনের এবং কেশব সেনের যখন শরীর যায় তখন ঠাকুর তিন দিন কারু সঙ্গে কথা কন নাই। তিন দিনের পর তাঁর আর সেভাব রইল না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ভক্তরা সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম-কথা ২য় খণ্ড

॥ ১ ॥

৫ই আগষ্ট, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী। মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌,
৫০নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনন্ত সমুদ্র—অন্ত কোথায়?

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। একে একে ভক্তেরা আসিতেছেন—বড় জিতেন, বলাই, জগবন্ধু, বিনয়, ডাক্তার, ছোট অমূল্য, বড অমূল্য, মনোরঞ্জন, গদাধর, ছোট জিতেন, বিনয়ের ভাই প্রভৃতি আসিয়া টিনের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিলেন। ধ্যানের পর শ্রীম ঘর হইতে আসিয়া ভক্তসঙ্গে চেয়ারে বসিলেন।

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি) আজ আমাদের অন্য এক রাজ্যে যাওয়া হয়েছিল, সেদিকে আর গাঁ নেই। আজ ধ্যানের পর যাই জানালা খুললাম অমনি অবাক হয়ে দেখি—অনন্তলোক অবাক হয়ে দেখছে, অনন্ত সমুদ্র কূল কিনারা নেই। বলছে একি একি! অন্ত কোথা তার! যোগিপুরুষরাই সমাধিস্থ হয়ে ওপারের খবর এনে দিতে পারেন। তিনি একাই আছেন দ্বৈতাদ্বৈতের পার। স°`া দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। তিনি একাই আছেন। সৃষ্টি করবার জন্য পুরুষ ও মেয়ে দুভাগ হয়েছেন।*

"ঠাকুর বলতেন, "জগৎ কি এতটুকু যে উপকার করবে?" সেই মহান, ব্রহ্মযোনি থেকে এ জগৎ বেরুচ্ছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে আবার তাতে লয় হচ্ছে।

"মম যোনি মহদব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দদাম্যহম্‌
সম্ভব সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" [গীতা—১৪।৩

ঠাকুর বলতেন যে মহামায়া ভগবতী রূপধরে একটি ছেলে প্রসব করলেন আবার খানিক পরে তাকে খেয়ে ফেললেন। আবার শিবসঙ্গে আনন্দে মগ্ন। গাহিতেছেন—

---

* আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। স ইমমেবাত্মানং।
দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাভবতাম। (বৃহদারণ্যক—১।৪।৩)

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা মা
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না মা ॥ ইত্যাদি—

গান—চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার
শোভার আগার এ বিশ্ব সংসার ॥ ইত্যাদি।

"যখন শিব প্রাণাপান নিরোধ করে গভীর ধ্যানমগ্ন, তখন নন্দী বেত হাতে করে দাঁড়িয়ে নিজের মুখে একটি আঙ্গুল দিয়ে সকলকে যেন সংকেত করে বলে দিচ্ছিলেন, চুপ চুপ যেন কোনরূপ গোলমাল না হয়। তাঁর শাসনেতে সমস্ত তপোবন নিশ্চল হয়ে রইল।* সেই অক্ষর পুরুষ চিন্তা ছাড়া আর কোনদিকে নজর নেই। মায়াবরণ একটু ফাঁক হলে যোগী মনে করে—ছেঁদার মধ্য দিয়ে ছুঁলাম ছুঁলাম। কিন্তু ছুঁতে পারে না। ঠাকুর বলতেন, 'যাই নরুণ দিয়ে ছেঁদা করি আবার ঢেকে ফেলে।—পারলাম না, ছেঁদা করি আবার পুরে আসে। হঠাৎ একবার এতখানি ছেঁদা হল। খুব শুদ্ধ মনে দর্শন কিরূপ জান? যেমন কাঁচ ব্যবধান থাকিলে লণ্ঠনের আলো ছুঁতে পারা যায় না। সে ব্যবধানও সরে গেলে কি হয় তা মুখে বলা যায় না।

"আমরা যখন গাড়ী চড়ে বেড়াতে যাই, মনে করি এই পৃথিবী না জানি কত বড়। এতটুকু নিয়ে ত পৃথিবী। তাই অবাক হই। যেমন পিঁপড়ে জালার মধ্যে বাস করে মনে করে এখানে বেশ আছি, এর চেয়ে আর কি বড় হতে পারে।' দেখনা এই সূর্য্য, এইরূপ কোটি কোটি সূর্য্য রয়েছে।

গান—কোটি চন্দ্র কোটি তপন লভিয়ে সেই সাগরে জনম।
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন……ইত্যাদি

ডাক্তার—কাঁচ ব্যবধানটা কি?

শ্রীম—তপস্যা চাই তপস্যা চাই। কতকগুলি ছোকরা ঋষি সমিৎপাণি হয়ে কিছু প্রশ্ন করবার জন্য এক বুড়ো ঋষির কাছে গিয়েছিল। বুড়ো ঋষি তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের বললেন, 'আর একবৎসর তপস্যা করে এস। তারপরে বলা যাবে।'

"এই দেখ ভূলোক। এইটুকু দেখে লোকেরা কত আনন্দ করছে।

* অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥
মনোনবদ্বার নিষিদ্ধ বৃত্তি হৃদিব্যবস্থাপ্য সমাধি বশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্র বিদো বিদু স্তমাত্মানমাত্মন্নবলোকযন্তম্ ॥
(কুমারসম্ভব শ্লোক—৫০ ; স্বর্গ তৃতীয়)

তারপর দেখ দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তার ওপর, তার ওপর, তারো বড়ো, তারো বড়ো সব আছে। অনন্ত শক্তি, যে যত বড়ই হোক, তাঁকে ছাড়িয়ে কেউ যেতে পারে না।*

বড় অমূল্য—যে যত বড়ই হোক সব তাঁর underএ (অধীনে)।"

শ্রীম—যা বলেছ। সব তাঁর underএ (অধীনে)। ঠাকুর যে সব কথা বলেছেন। যাদের সময় আছে তারা যদি খুব তপস্যা করে তবে কালে বুঝবে।

ঠাকুর মান অপমানের অতীত

"স্বামীজীকে কেউ কেউ চিঠিতে লিখেছিল 'আপনি তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) ছেড়ে দিন তা হলে আপনার কথা গ্রহণ করবো।' স্বামীজী বললেন, 'বিবেকানন্দ কোথা থেকে হলো? আমার মত কত বিবেকানন্দ তিনি তৈরী করতে পারেন। আমি যদি কিছু ভাল বলে থাকি সব তাঁর; যা কিছু খারাপ তা আমার।'

"ঠাকুর মান টান চাইতেন না। বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'তোমরা জাহাজ, আমরা জেলে ডিঙ্গি।' কেশবকে বললেন, 'তোমরা বাহাদুরী কাঠ, আমরা হাবাতে কাঠ।' এর মানে তিনি সম্মান চান না। তারা মান চায় তাদের দিয়ে এলেন। শুধু তাই নয় গুরুর প্রতি ভক্তি বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ যারা তাঁদের শিষ্য তারা তাঁদের ভক্তি করবে।

ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা বলেন 'এই দেখুন, নিজেই তিনি বলেছেন—আমি হাবাতে কাঠ, কেশব সেন বাহাদুরী কাঠ'।—এইরে গেছে! তাঁর কথা কি সকলে ধরতে পারে?"

অবতারের আসা কেন?

শ্রীম—অবতার আসেন কেন? কতকগুলি লোকের চৈতন্য করবার জন্য। তাঁর ইচ্ছা যে খেলা এইরূপ চলে। বৃষ্টির জল সমানভাবে পৃথিবীতে পড়ল। কিন্তু যার যেমন বীজশক্তি তার গাছ সেইরূপ হলো—কোনটা কাঁঠাল, কোনটা আম, কোনটা নারকেল, এই রকম।

"যদিও সকলে এক জায়গা থেকে আসছে তবুও বীজের অনুযায়ী গাছ

* তদ্ধনাত্যেতি কশ্চন (কঠ ২।৩।৮)

হবে ফল হবে। যাকে তিনি কৃপা করবেন সেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। তিনি কৃপা করে দু একজনকে মুক্তি দিয়ে দেন।

"(ঘুড়ি) লক্ষের দুটো একটা কাটে হেসে দাও মা—হাত চাপড়ি।"

গান—ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী। ইত্যাদি

বাক্য মনাতীত রূপবান হন।

কাশীপুরে ঠাকুর বলেছিলেন···'মা বীণা বাজাচ্ছিলেন আমি দেখেছি।' যিনি বাক্য মনের অগোচর, তিনি রূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন। একজন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে অন্তরে দেখছেন ?" ঠাকুর বললেন, "আমি তাঁকে অন্তরে বাহিরে দেখছি! একজন ঋষি বলেছিলেন, 'উপনিষদং ব্রুহি' উপনিষদ বলুন? বুড়ো ঋষি তাঁকে বললেন—'এই তো উপনিষদেব কথা বলা হলো।' অর্থাৎ ভগবানের বিষয়ক যা কিছু বলা হয় তাই উপনিষদ, সেই বেদ।" স্বামীজী একটি গান গাইতেন—

রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও
করুণাভিখারী আমি করুণা নয়নে চাও। ইত্যাদি

আমরা রাজাধিরাজের ছেলে। আমরা কি কম? আমরা যে এত বড, তাঁর ছেলে বলে। যেমন ছেলে তার বাপের বিষয় সম্পত্তি পায়, পিতাকে ধরে থাকে বলে। ছেলে যদি বাপকে ত্যাগ করে তবে সে সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি একটা গান করুন।

ডাক্তার—গান জানি না।

শ্রীম—যেখানে গান শিখায় সেখানে গিয়ে গান শিখো। তোমাদের এখনও বয়স আছে—আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।

বড জিতেন—আমার সব এইখানে।

এইবারে কাশীপুরের অমূল্য গান করিতেছেন—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম—ইত্যাদি

এ সময় না হলে ত্রিশ জন্মেও হবে না

শ্রীম—শুধু সন্ন্যাস নিলে কি হবে? ঠাকুরের highest ideal (সর্ব্বোচ্চাদর্শ) চিন্তা করতে দেখলে আমার আহ্লাদ হয়। তাঁর মহাবাক্য যেন এখনও মূর্ত্তিমান হয়ে রয়েছে। ঠাকুর এই টাটকা এসেছেন কিনা তাই তাঁর ভাব এখনও সর্ব্বত্র ছড়ান রয়েছে। এ জন্মে যাদের হবে না তাদের

ত্রিশ জন্মেও হবে না।

গান—আমার কি ফলের অভাব
পেয়েছি যে ফল জনম সফল। ইত্যাদি

"আমরা যখন চতুর্থবার ঠাকুরকে দর্শন করি তখন তিনি এই গান গেয়েছিলেন। প্রথম প্রথম যেতেই ত্যাগের ভাব ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যাতে এদের কোন দিকে মন না যায়। হনুমানের এক রাম ছাড়া আর কোনদিকে নজর নেই। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যখন সমস্ত ভোগ ত্যাগ হয়ে যায়, তখন ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা আসে। ব্যাকুলতা এলেই অরুণোদয়। তারপরই সূর্য্য দেখা দেবেন। যে যেখানে আছে সে সেখানেই বসে জেগে থাক। কেননা বর কোন সময় চলে যায় তার কিছু ঠিক নেই।

'Watch therefore for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man Cometh.' রাত্রি প্রায় ১০টা হইয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২৭শে মে, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উদারতা

সকালে শ্রীম স্কুলবাড়ীর দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত, গোপাল, রজনী প্রণাম করিয়া গৌড়ীয় মঠে গেলেন। রাস্তায় ৺পরেশনাথের মন্দির দর্শন ও ঐ মঠে কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া বেলা বারটায় "লালবাড়ীতে" (স্কুলবাড়ী) ফিরিলেন। ওখানকার সাধুরা ইঁহাদের প্রসাদ পাইবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রসাদ না পাইয়াই ফিরিয়াছেন।

গোপাল—তারা প্রসাদ পাবার জন্য ডাকাডাকি করছিলেন, কিন্তু আমরা এখনই চলে এলুম।

শ্রীম—তা করলে কেন? তোমরা যখন সেখানে ভগবানের উদ্দেশ্যে গেছ, তখন আবার মান অপমান কেন? তারা কি আর খাওয়াচ্ছে—ভগবানই দিচ্ছেন।

গোপাল—রঞ্জনী খেল না।

শ্রীম—নাই বা খেল, সে কি তোমার সঙ্গে খাবে? তুমি খেলে না কেন? যতক্ষণ শরীর ততক্ষণ বন্ধুবান্ধব। তারপর?

ভক্ত—তবে বলেন কেন, 'ভক্ত নিত্য, অনন্ত কাল থাকেন।' 'ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।'

শ্রীম—ও সব যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে। তারপর কি যে হয় তা মুখে বলা যায় না। যেমন কতকগুলি লোক পাঁচিল বেয়ে উঠে, পাঁচিলের ওপারে যা আছে তা দেখেই 'হা হা হা' করে ওপারে লাফিয়ে পড়লো। কি যে দেখলো তা আর এসে খবর দিতে পারলে না।

"জনক শুকদেবকে বলেছিলেন, আগে গুরুদক্ষিণা দাও, তারপর উপদেশ। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হলে তখন আর 'গুরু' 'শিষ্য' এমন জ্ঞান থাকে না। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই।' আমরা তাঁর কৃপায় ওপারের খবর পেয়েছি।

ভক্ত—তবে আমাদের নানা জায়গায় পাঠান কেন?

শ্রীম—সব ঘুরে ঘুরে দেখা ভাল। যেটুকু গুরুর সঙ্গে মেলে, শুধু সেইটুকু গ্রহণ করা। যেমন মৌমাছি নানা ফুল থেকে একটু একটু করে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সহস্রদল পদ্মে মধু ভরা। গুরু হলেন সহস্রদল। তবে যেখানে যতটুকু পাওয়া যায় তা সঞ্চয় করে নেওয়া মন্দ কি? যেখানে তাঁর লীলা নাম গুণানুকীর্ত্তন হয় সেখানে গেলে তাঁর আবির্ভাব বোঝা যায়—তাঁর ওপর প্রেম হয়।

দুঃখ ও বৈরাগ্য

বৈকাল বেলা ৪টা। শ্রীম ছাদের ওপর দাঁড়াইয়া একজন ভক্তের সহিত কথা বলিতেছেন।

শ্রীম—দুঃখ পেলে ভগবানকে মনে পড়ে। দুঃখের সৃষ্টি ঐ জন্য; কষ্ট পেলে ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

ভক্ত—কিন্তু কারও কারও কষ্ট না পেলেও তীব্র বৈরাগ্য আসে। যেমন বুদ্ধদেব, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কিছুই অভাব ছিল না। দুঃখ কষ্ট পেতে হয় নি—তবু তাঁর তীব্র বৈরাগ্য।

শ্রীম—তিনি জীবের দুঃখ দেখে কাতর হয়েছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রুর পুত্রেষ্টিযাগে একজন একটি ছাগল কাটতে নিয়ে যাচ্ছিল; তিনি

মহারাজের কাছে গিয়ে বল্লেন, 'মহারাজ! ছাগলটিকে না কেটে আমায় কাটুন।'

"জন্ম, মৃত্যু, জরা, বিরহ, ব্যাধি এই পঞ্চদুঃখ দেখে তাঁর বৈরাগ্য হয়েছিল। নানান্ জায়গায় ঘুরলেন, কিন্তু শান্তি পেলেন না। না খেয়ে বহু বৎসর তপস্যা করেছিলেন। শরীর অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গিয়েছিল। শেষে দৃঢ়সংকল্প হয়ে ধ্যানে বসলেন এবং নির্ব্বাণ লাভ করে তবে শান্তি পেলেন। ঈশ্বরের আদেশ হল, 'তুমি যখন শরীর ধারণ করেছ, জীবের চৈতন্যের জন্য আরও কিছু দিন শরীর রাখ।' তিনি তখন নীচের ধাপে নেমে জীবের জন্য দয়া রাখলেন।

সাধুসঙ্গ

এইসব কথাবার্ত্তা হয়ে যাওয়ার পর বুদ্ধিরাম, রজনী, গদাধর গৌড়ীয় মঠে গেলেন। ডাক্তারের গাড়ীতে শ্রীমও গিয়াছিলেন। শ্রীম সেখানে বেশীক্ষণ ছিলেন না। আন্দাজ পনের মিনিট থাকিয়া ডাক্তারের গাড়ীতে জগবন্ধু ও গদাধরের সহিত পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। স্কুলবাড়ীতে আসিয়া দোতলার পূর্ব্ব বারান্দায় শ্রীম বসিলেন। সেখানে জিতেন্দ্রনাথ সেন, সুধীর বিশ্বাস, অমূল্য, কৃষ্ণ সেন, কৃষ্ণ সরকার, যতীন, গদাধব প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীম—(গদাধরের ৫.তি)—তোমরা ওখানে আগে গিয়ে কি দেখলে ?

গদাধর- ·চৈতন্য চরিতামৃত হতে হরিদাসেব কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যেমন হরিদাস গৌরাঙ্গের খুব প্রিয় ছিলেন—হরিদাস চৈতন্য-দেবকে খুব ভালবাসতেন—এইসব কথা।

শ্রীম—তাই সাধুসঙ্গ করতে হয়। দর্শন করতে হয়ত ওঁদেরই করতে হয়। তা না হলে চোখ বুজে থাকতে হয়। এব; অর্দ্ধেক মাছ—অর্দ্ধেক কচ্ছপ।

জিতেন—ওঁরা কিন্তু অন্য সম্প্রদায়কে বড় নিন্দা কবেন।

শ্রীম—সাধু যা বলে তাই ভাল। তারা ত্যাগী তা নাহলে তাদের প্রতি মন টানে কেন। গৃহীরা ভাল বললেও মন্দ ; সাধুর ভাল কথার মন্দও ভাল। তাঁদের দেখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। সর্ব্বদাই নাম নিয়ে আছে। তাঁরা ভাল জায়গায় উঠেছেন। অল্প চেষ্টায় ভগবান লাভ করতে পারেন।

"সেখানকার কর্ত্তা কেমন বলে উৎসাহের সহিত—রাধাকৃষ্ণ, পরকীয়া প্রীতি এই সব। ঠাকুর এসেচেন বলে এখন অলিতে গলিতে সাধু।"

জিতেন—কিন্তু বড় বড বোম্বাই আম কই—সব ছোট ছোট।

শ্রীম—কিন্তু মিষ্টি ও মধুরও ত হতে পারে। একজন মানসসরোবরে পাখীর যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞে বিভিন্ন জাতের কত চিত্র-বিচিত্র পাখীরা আসবে এবং তার মধ্যে রাজহংসও আসবে এবং তাকে দেখতে পাবে। দেখ, পনের মিনিট সাধুসঙ্গ করে কত ভগবানের কথা স্মরণ হচ্ছে। দেখুন না একটু সাধুসঙ্গ করে কত লাভ।

জিতেন—তা হবে না! সমস্ত রাত মদ খাওয়া (সকলের হাস্য)। (অর্থাৎ আপনি সদাসর্ব্বদা তাইতে মগ্ন হয়ে রয়েছেন)।

শ্রীম—ত্যাগীর মুখে গীতা পাঠ আর পণ্ডিতের মুখে গীতা পাঠ অনেক তফাৎ।

শ্রীম গান গাহিতেছেন—

(১) হরি নাম নিতে অলস হওনা (রসনা)

যা হবার তাই হবে।

দুঃখ পেয়েছ (আমাব মনরে) না হয় পাবে।

ঐহিকের সুখ হল না বলেকি ঢেউ দেখে না ডুবাবে। ইত্যাদি

(২) মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। ইত্যাদি

শ্রীম—৯টা বেজেছে?

অমৃত—৯টা কুড়ি।

শ্রীম—তবে ওঠা যাক্!

গৌড়ীয় মঠ হইতে যে প্রসাদ আনা হইয়াছিল তাহা ভক্তেবা পাইলেন এবং প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় লইলেন।

॥ ৩ ॥

২৮শে আগষ্ট, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

বৈকাল ৪টা। রাখালবাবু আসিয়াছেন। শ্রীম এইবার স্কুলবাড়ীর ছাদে আসিয়া বসিলেন, কাছে গদাধর, গোপাল ও রাখালবাবু।

শ্রীম (রাখালবাবুকে)—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচ ভূতের শরীর। তাই গান আছে—

পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে খেলা করি ধূলি লয়ে
মোদের অভয় দাও ওহে দুর্ব্বল শরণ।

"দেখতে মাটি কিন্তু তার ভেতরে জীবনীশক্তি আছে। বীজ পড়ল আর অমনি তা থেকে অঙ্কুর, গাছ, ফুল, ফল সব দেখা দিল। এ দেশের ঋষিরা ঠিক ধরেছেন যে ভগবানই সব হয়ে রয়েছেন। দেখ মাটি থেকেই গাছ, জীব-জন্তু, মানুষ সব তৈরি হচ্ছে।

একটি বালককে দেখিয়ে বলচেন, "এর অসুখেতে মন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যাই পেটে বেদানার রস, বার্লি পড়ল আর অমনি সব ঠিক হয়ে গেল। আমি তাকে খাওয়াব বলে বাটি ধোয়ার জন্য জল খুঁজছি আর ও আমাকে বলে দিলে, ঐ কোণে আছে। বেদে আছে—

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ [মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১৩

"ব্রহ্ম থেকেই সব। সবই যখন ব্রহ্ম-কারণ, তখন জড় বলে কিছু নেই। এতদিনে বুঝছি বেদ মূর্ত্তিমান ও অনন্তকাল ধরে রয়েছেন। বেদ নিত্য। এঁদের অপর নাম উপনিষৎ। বেদ রক্ষার জন্যই ঠাকুর নিজের শরীরের উপর মন একটু রাখতেন। ভক্তেরা তাঁকে দর্শন করলে বেদময় পুরুষেরই দর্শন হত।" অতঃপর গান গাইতেছেন—

(১) নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার॥

(২) এসেছে এক নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে
(তাঁর) বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি দুই কাঁধে সদাই ঝুলে॥

(৩) কি ছার জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে
যদি চরণ সরোজে পরাণ মধুপ চির মগন না রহে হে॥ ইত্যাদি

॥ ৪ ॥

৩১এ আগষ্ট, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

কেনোপনিষৎ

সকালবেলা শ্রীম তাঁহার নিজের চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। জনৈক ভক্ত গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন।

শ্রীম—মঠের খবর বল।

ভক্ত—মঠে দেখলাম, কোনও কোনও সাধুরা পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়েন। কেউ ন্যায়, কেউ বেদান্ত পড়েন।

শ্রীম—তাই শোনবার জন্য পাঠিয়ে দেই।

ভক্ত—সে সব পড়া না থাকলে ধরা যায় না।

শ্রীম এইবার কেনোপনিষৎ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন, বলিতেছেন, "এর সার প্রথম হল, যিনি দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি করেছেন, তিনি এ সবের অতীত। দ্বিতীয় যে বলে, "তাকে জানি," সে জানে না। যে বলে, "আমি জানি না," সে একটু জানে। তৃতীয়, কোন সময়ে দেবাসুর সংগ্রামে ভগবান দেবতাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন; তাই দেবতারা জয়লাভ করেন, কিন্তু দেবতাদের মনে অহঙ্কার হল যে তাঁরা নিজেদের শক্তিতেই জয় করেছেন। ভগবান যে তাঁদের হয়ে যুদ্ধ করায় তাঁরা জয়লাভ করেছেন, তা তাঁরা ভুলে গেলেন। তাই ভগবান তাঁদের দর্প চূর্ণ করবার জন্য তাঁদের কাছে এক জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা প্রথম অগ্নিকে পাঠালেন, "ইনি কে, তুমি জেনে এস।" অগ্নি তার কাছে গেলে, ঈশ্বর তাকে একগাছি তৃণ দিয়ে বললেন "এইটি দগ্ধ কর," অগ্নি তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সেটিকে দগ্ধ করতে পারলেন না, তিনি ফিরে গেলে দেবতারা তাঁর কাছে বায়ুকে পাঠালেন। বায়ুকেও তিনি ঐ তৃণটি গ্রহণ করতে বললেন। তিনিও তাঁর সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হলেন এবং দেবতাদের কাছে ফিরে গেলেন। তখন ইন্দ্র নিজেই তাঁকে জানবার জন্য তাঁর কাছে গেলে তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন এবং তাঁর জায়গায় ইন্দ্র দেখলেন বহু শোভমানা হৈমবতী উমা। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে? উমা বললেন, "উনি ব্রহ্ম," এইভাবে ঈশ্বর দেবতাদের অহঙ্কার নষ্ট করলেন।

বাঘ এসে ঘাড় মট্‌কে নিয়ে চলে গেল।

"এ সব তাঁর খেলা। মা চান যে এখন ছেলে দৌড়াদৌড়ি করুক। খেলা চললে তাঁর আনন্দ। বুড়ীকে ছুঁয়ে ফেললে বুড়ীর তত আনন্দ হয় না।"

বোম্বাই ও দেশী আম

হরিবাবু—সুধীর মহারাজ বলছিলেন, 'আগে মাষ্টার মশাই খুব সন্ন্যাসের কথা বলতেন। এখন তাঁর কি মত?

শ্রীম—সে যখন ছেলেমানুষ, তখন ঠাকুরের গৃহী শিষ্যদের কাছে যাতায়াত করত। আমি তখন বলেছিলাম, 'ঠাকুরের বিশেষ অধিকারী সন্ন্যাসী শিষ্য দেখতে চাও তো বরাহনগর মঠে যাও। তাঁরা কেমন ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শ নিয়ে রয়েছেন দেখবে।' আমি বলেছিলাম, "বোম্বাই আম দেশী আম কি এক হয়?" 'আজ তেত্রিশ বছর আগের কথা'।

ভক্তেরা অবতারের প্রতীক্ষায় থাকেন

"অনেক মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করেছেন ওড়িশা, বাংলা প্রভৃতি দেশে। অবতার যখন আসেন, তখন তাঁর লীলা আস্বাদন করবার জন্য অনেক মহৎ ব্যক্তি আসেন। যেমন চতুর্দ্দিকে মরুভূমি, সেই মরুভূমির এক জায়গায় গাছ, জলাশয় রয়েছে, লোকে যেখানে এসে বিশ্রাম করে। সেইরূপ তাঁর লীলা আস্বাদন করবার জন্য ম : ব্যক্তিরা আসেন। অবতার আসবেন বলে লোকে হাঁ করে থাকে। যেমন ইহুদীদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তাঁরা হাঁ করেছিলেন ও বলেছিলেন, 'আমাদের উদ্ধার-কর্ত্তা আসছেন'। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা রামচন্দ্র আসবেন বলে প্রতীক্ষা করছিলেন। অদ্বৈত গোস্বামী বলেছিলেন, 'চৈতন্যদেব আসবেন।'

বদ্রীকা পথের—সাধু

"এক সাধু বদ্রীকা যাবার সময় দেখলেন, এক পাহাড় ও ঝরণা দেখে সমস্ত দিন না খেয়ে না দেয়ে অবাক হয়ে দর্শন করতে লাগলেন; মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, 'আহা! কি সুন্দর পাহাড়, স্বচ্ছ ঝরণার জল।' সমস্ত দিনের পরে রাত্রিতে গিয়ে ফলটল খেয়ে রইলেন। দেখ ঐটুকু প্রকৃতির শোভা দেখে সমস্ত দিন অবাক হয়ে রইলেন; আর আমরা উর্দ্ধে এই অনন্ত কাণ্ড দেখে সময় কাটাতে পারি না। কৈলাস ও বদ্রী,—দেবভূমি। সেখানে

মরলে মুক্তি হয়।

"একজন সাধু এই ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের কাছে হালুয়াইয়ের দোকান করেছিল। অনবরত সে গান করত। যারা তার দোকানে কিনতে যেত তাদের খুব বেশী করে হালুয়া দিত। হরি পর্ব্বত, তোমার ত বালতির দোকান আছে, তুমি সস্তা দরে দাও না।" (সকলের হাস্য)।

গুরুই পথ-প্রদর্শক

হরিবাবু—এক সাধু এক গল্প বলেছিলেন। এক পথিক অন্ধকাব বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পথ হারিয়ে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না; চারি-দিকে কেবল ভীষণ নিবিড় অরণ্য। এক জায়গায় এক জলাশয় দেখে সেইখানে বিশ্রাম করতে ল'গল। তারপরে দেখতে পেল, লতাপাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের কিরণ পড়ছে। আর কিছুক্ষণ পরে দেখল, জলাশয়ের উপর দিয়ে কি যেন উড়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখে একটি কাক, কা কা করে উড়ে যাচ্ছে।

শ্রীম—কাকরূপী গুরু এসে পথ নির্দ্দেশ কবে দিয়ে গেলেন। Highest man (আদর্শ পুরুষ) গুরু যদি পাওয়া যায়, তাহলে আর নানা জন্ম নিতে হয় না। সেইজন্য লোকে গুরুবরণ করে। গুরু যে কি জিনিষ, ঠাকুর জানতেন। একসময় তিনি গুরুর পাদুকা মাথায় নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতেন।

"ঠাকুর স্বামীজীকে সন্ন্যাসের উপদেশ দেবার সময় বলেছিলেন, 'সংসারী লোকদের অবসর কোথায়?' আজ এ ছেলেটির অসুখ, কাল ও মেয়েটিব অসুখ, এতেই ব্যতিব্যস্ত থাকে। সেইজন্য সংসারী লোকেরা তাঁতে সমস্ত মন দিতে পারে না। যেমন নীচের গর্ত্তে ধনরত্ন রয়েছে, উপরে ঘাসপাতায় চাপা। সংসারী লোকেরা ঘাসের উপরেই বিচরণ করে; নীচের ধনরত্নের খবর পায় না।"

রাত্রি হইয়াছে। সকল ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৬ ॥

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

জাতবিচার

বৈকাল বেলা, প্রায় তিনটা। শ্রীম নিজের চারতলার ঘরে চৌকির উপর শুইয়া ডায়েরী পড়িয়া শুনাইতেছেন। মণিন্দ্রম গদাধর আশ্রম হইতে আসিয়াছেন। কয়েকজন ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা একাগ্রমনে ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীম—ঠাকুরের কাছে হীরানন্দ এসেছেন। সঙ্গে দুইজন উকীল। তাঁহাবা যুবক, খুব আচারী। সকলের এঁটো (উচ্ছিষ্ট) খাওয়া সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ঠাকুর বলছেন, "যতক্ষণ আত্মদর্শন না হয়, ততক্ষণ জাতবিচার মানতে হয়। কুকুব ত সকলের এঁটো খেয়ে বেড়ায়, তা বলে কি তার চৈতন্য হয়েছে বলতে হবে? আত্মদর্শনের পর জাতবিচার থাকে না।

কচ

"বৃহস্পতিব ছেলে কচ অনেক কাল ধরে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সমাধি ভঙ্গ হবার পব বাইরে হুঁস যখন এল, একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখন কি দেখছেন"! কচ বললেন, 'যাঁকে সমাধিতে বোধে বোধ করেছিলাম, তাঁকেই অন্তরে বাহিরে দেখছি। চারিদিকে আনন্দের কুয়াসা দেখছি। ত্যাজ্য, গ্রাহ্য কিছুই দেখছি না। ঢেঁকিব পাট একদিকে নীচু হয় তো, একদিকে উঁচু হয়'।

এর ভেতরে কেউ আছে

"একজন ভক্ত গরমের সময়ে দিনদুপুরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে এলে?" ভক্ত বললে, 'আলামবাজার পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী করে এসে সেখান থেকে হেঁটে আসছি।' সে ঘরে মণি মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর তাকে বললেন, 'ইংলিশম্যানেরা যে কালে এত কষ্ট করে আসছে, তখন এ আমার বাই নয়; এর ভিতরে কেউ আছে'।

ঠাকুরের আরত্রিক

"আর এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, 'আমার উন্মাদের সময় প্রথম প্রথম মা কালীর আরতির সময় মাকে অনবরত চামর ব্যজন করতাম, আরতি আর শেষ হত না। হৃদু এসে আমার হাত থেকে চামর কেঁড়ে নিত'।

ঠাকুরের বেদান্ত শ্রবণ

'পঞ্চবটীতে তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত শুনতাম। ওর এক এক বিষয় শুনে বাইরে এসে সেগুলি চিন্তা করে আবার তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতাম। তিনিও আমার কথা শুনে খুব খুশী হতেন। তোতাপুরীর কাছে অনবরত ধুনী জ্বালা থাকত। একদিন একজন এসে তাঁর ধুনী থেকে আগুন নিয়ে গেল। তোতাপুরী তাই দেখে রেগে বললেন, 'যা শালা বাঙ্গালী।' আমি বললাম, 'শালা, এত রাগ কেন?' তোতাপুরী বললেন, 'ঠিক হৈ, ঠিক হৈ।' তিনি আমার ভাব দেখে বলতেন, 'ই মায়া হৈ।' তারপরে আমার সমাধি দেখে বলেন, 'ই কেয়ারে, কৈসী দৈবী মায়া হৈ'।

"ঠাকুর রামলালা বিগ্রহকে বলতেন, 'কি বাবা, তোমার শীত করছে?' খই চিনি খাওয়াতেন, তা থেকে নিজেও খেতেন।

মা সব দেখিয়ে দিতেন

"আর এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, সিদ্ধাই চাইবার জো নেই। মা আমাকে দেখিয়েছিলেন সিদ্ধাই বেশ্যার বিষ্ঠা, একমাত্র শুদ্ধাভক্তি মা'র কাছে চেয়েছিলাম। মাকে সব দিয়েছিলাম, কিন্তু সত্য দিতে পারি নি। পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান সব মা'র পাদপদ্মে অর্পণ করেছিলাম। কিন্তু সত্য দিতে পারি নি।

আমি মাকে বলতাম—'মা রামপ্রসাদকে কৃপা করলি, আর আমায় কৃপা করবি না'?

বলতাম—'মা যদি আমাকে স্ত্রীসঙ্গ করাও ত তাহলে গলায় ছুরি দিব'। বটতলায় পড়ে থাকতাম আর মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে বলতাম—'মা শাস্ত্রের মধ্যে কি আছে, আমায় জানিয়ে দে'। তিনি একে একে সব জানিয়ে দিয়েছেন। একদিন মা দেখালেন,—'এক মহান্ অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ।'*

"হরিশ তার পরিবারকে মারত। ঠাকুর ভক্তদের কাছে বললেন, "তাকে

* যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গ। [মুণ্ডক—২।১

বড় জিতেন—হিজিবিজি বডর-বডর বকা কি ভাল? আমরা কিছু বুঝতে পারি না।

কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীম—তাই বল, এসব আছে; না বলবার জো নেই। (একজন ভক্তের প্রতি) তুমি যে মধ্যে মধ্যে সাধুসঙ্গ কর, সেবা কর কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ত্রিলোকে আমার প্রয়োজন নেই, তবু যোগস্থ হয়ে কর্ম্ম করছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমস্ত দিন সারথিগিরি করে আবার রাত্রিতে পরামর্শ করছেন, পাহারা দিচ্ছেন, নিদ্রা নেই। গীতার দুটি করে শ্লোক রোজ মুখস্থ করবে। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, গীতা সর্ব্বশাস্ত্রেব সার, গীতা পড়বে। (ডাক্তারের প্রতি) যাও না গাছতলায়, তখন এসব করতে হবে না; তখন এত কর্ত্তব্য থাকে না। তা যখন যেতে পারছ না, তখন এসব কবা উচিত।

ডাক্তার—ধ্যান পূজা করা ভাল তো?

শ্রীম—ভাল ত, করতে পারছ কোথায়? ঐ সব তো অনিত্য, ঈশ্বরে ভক্তি প্রেম ভালবাসাই সত্য। হাজার বার বলেছেন, "এসব পুতুল নাচের মত," তবু তো সত্য বলে বোধ হচ্ছে। গাছতলায় গেলেও যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ দেহ সত্য এইরূপ ভ্রম তিনি রেখে দিয়েছেন। যতক্ষণ তাঁকে দর্শন না হয়, ভ্রম থেকেই যায়। তাঁকে দর্শন হলে সমাধিস্থ হলে মায়ার এলাকা ছাডিয়ে যায়। তখন জগৎ অসত্য বলে বোধ হয়।

কথা কহিতে কহিতে রাত্রি সাডে নয়টা হইয়াছে। ভক্তেরা শ্রীমকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

॥ ১০ ॥

স্থান—স্কুলবাড়ী

অন্য একদিন বৈকাল বেলা পাঁচটা

শ্রীম চারতলার ঘরের মধ্যে খাটের উপর বসিয়া প্রুফ (Proof) দেখিতেছেন। অনেক ভক্তেরা উপস্থিত।

. .

হাঙ্গামার ভয়ে কর্ম্মত্যাগ

ডাক্তার—সেই কেস বীরেনবাবুকে (এটণা) বলেছিলাম।

শ্রীম—আপনারা কি বলছিলেন যে এ হাঙ্গামায় কে যায়? যে সমস্ত কর্ম্ম আছে সেরে নিতে হয়। "কাজ সেবে বসি ; শত্রু মেরে হাসি।" হিজি-বিজি মনে উঠলে যোগ হয় না। ঠাকুর কাশীপুরে নরেন্দ্রকে বললেন, "আগে বাড়ীর মা-ভাইএর খাবার বন্দোবস্ত কবে আয়, বাড়ীর Partition (ভাগ) ঠিক কর, তার পর সব হবে", ঠাকুর তাঁকে এমন কেন বললেন, "বসে ভাব।" যুদ্ধে জয় হোক, না হোক, যুদ্ধ করতেই হবে। যখন দুর্য্যোধন বললেন যে, তিনি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দেবেন না, তখন যুধিষ্ঠির বললেন, "আমরা তবে বনে যাই। যুদ্ধ করে আর কি হবে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "না, তোমরা ক্ষত্রিয়, তোমাদের যুদ্ধ করতেই হবে।" তিনি তাদের প্রকৃতি দেখেছেন,—মনে যুদ্ধের ভাব রয়েছে। হাঙ্গামার ভয়ে বাইরে দেখাচ্ছে যে তারা রাজ্য চায় না। কে এত হাঙ্গামায় যায়। অর্জ্জুন যখন কর্ণকে বধ করতে পারছেন না, অভিমন্যু বধ হয়ে গেল ; যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে তিরস্কার করে বলছেন, "ধিক্ তোমার গাণ্ডীবকে।" তোমার গাণ্ডীব অস্ত্র থাকতে এই সব দুরবস্থা। এদিকে সর্ব্বনাশ, ছেলেপুলে, জ্ঞাতি, স্বজন, বান্ধব সকলে মরছে, ওদিকে বিধবারা বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে স্নান করছে।

"পাণ্ডবদের ঠিক সন্ন্যাসের অবস্থা হল স্বর্গারোহণের সময়। যুদ্ধ রাজ্যভোগ করবার পর, তাদের সেই অবস্থা হল। তখন পরস্পরকে ফিরেও দেখছে না। তখন তারা দেহবুদ্ধিশূন্য।"

(ডাক্তারের প্রতি) অনেক পরিশ্রম হয়েছে এখন আসুন। ডাক্তার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীম কিছুক্ষণের জন্য নীচে গেলেন।

ভগবানবাবু চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ আরম্ভ করিলেন, ভক্তেরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন। বিষয় বৃন্দাবনে গৌরাঙ্গদেবের ভ্রমণ, ইহাই পাঠ হইতেছিল। চৈতন্যদেব রাধাপ্রেমে বিভোর হইয়া বৃন্দাবন পরিক্রমা করিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন। যেখানে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইত, সেইখানে কাঁদিতেছেন ; কোথাও বা সমাধিস্থ হইতেছেন।

সন্ধ্যা হইল। আজ শুক্লাষ্টমী তিথি, বিমল চন্দ্রকিরণে জগৎ যেন হাসিতেছে। শ্রীম চারতলার ঘরে খাটের উপর বসিয়া ধ্যানমগ্ন। ধ্যানের পর গান গাহিতেছেন।

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তা'ই
কত লোকে কতই বলে শুনে প্রাণে মরে যাই।

গান—গিরি গণেশ আমার শুভকারী।......

এমন সময় হেমেন্দ্র মহারাজ (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) আসিয়া বলিলেন "আমি হেমেন্দ্র"।

শ্রীম—বসুন।

গানান্তে শ্রীম চারিতলার টিনের বারান্দায় আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। অনেক ভক্তেরাও আসিয়াছেন।

হেমেন্দ্র মহারাজের সঙ্গে মিহিজামের কথা হইতেছে। বিদ্যাপীঠ যখন মিহিজামে ছিল, তখন শ্রীম সেখানে গিয়াছিলেন।

শ্রীম—গীতায় বলেছে, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেয়। 'নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ (গীতা, ৩।৮)। যারা কর্ম্ম করছে, যারা এখনও কর্ম্মে রয়েছে, তাদেরকে বলা উচিত নয়, কর্ম্ম ছেড়ে দাও। ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্ম সঙ্গিনাম্ (গীতা, ৩।২৬)। (কাশীপুরের অমূল্য-বাবুকে দেখিয়া) বাড়ীর কি খবর? বাড়ীর সকলে কেমন আছে?

শোকে সান্ত্বনা

কিছুদিন পূর্ব্বে অমূল্যবাবুর একটি ছোট মেয়ে মারা গিয়াছে। তাই তার মা পাগলের মত হইয়াছে। তাই শ্রীম বাড়ীর খবর লইতেছেন।

অমূল্য—কখনো জড়ের মত বসে থাকে, কখনো কাঁদে, খাইয়ে দিলে খায়।

শ্রীম—আহা, মার প্রাণ। পাশের বাড়ীতে দুই বৎসরের ছেলে মারা

গেল। ভাল ছেলে; অসুখ, বিসুখ, তেমন কিছু ছিল না। তা'র কিছুদিন পরে তার জা'এর ছয় বৎসরের মেয়ে তারি কোলে মারা গেল। তার একটু জ্বর হয়েছিল, একদিনের জ্বরে মারা গেল। এই সব তাঁর কাছে বলবেন। তখন ঠাকুর আছেন। একজন ভক্তের পুত্রশোক হয়েছিল। তাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তা শোক হবে না গো। অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুর জন্য কত শোক করেছিলেন; বশিষ্ঠদেব শত পুত্রের শোকে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন। ভাগ্যি, মা আমাকে ছেলে দেন নি।' ছোকরাদের বলতেন, 'এদের (গৃহস্থ ভক্তদের) দুঃখ-কষ্ট তোদের শিক্ষার জন্য।' (ভক্তদের প্রতি) অমূল্যবাবুকে কিছু ভাগবৎ পড়ে শোনাও।

জগবন্ধু ভাগবত পাঠ করিলেন। বিষয়—গজেন্দ্র মোক্ষ। পাঠান্তে একজন ভক্ত—"কাল মঠে লেকচার হবে।"

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি)—আমাদের এঁকে (অমূল্যবাবুকে) সেখানে নিয়ে যেও। তোমার কাছে রাখবে।

সাধু জগদ্‌গুরু

হেমেন্দ্র মঃ—একবার ঢাকাতে তুলসী মহারাজকে অপদস্থ করবার জন্য দুইজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত এসেছিলেন। তুলসী মহারাজ, ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা বলে বুঝাচ্ছেন তা'দের দুইজনের মধ্যে একজন তাঁকে হারাবার জন্য ঘোরতর তর্ক আরম্ভ করেছেন। অন্য এক পণ্ডিত তিরস্কার করে তাকে বলছে, কি করছ, কার সঙ্গে কি কথা বলছ, চুপ কর।

শ্রীম—ঠাকুর ওর মুখ দিয়ে বলালেন। সাধুদের সকলে মানে। ঠাকুর তখন সশরীরে বর্ত্তমান। আমি কামারপুকুরে গিয়েছিলাম। এক বাড়ীতে কালীপূজার দিন, কালীপূজা হবে। পূজক ব্রাহ্মণ, তন্ত্রধারক ও অপরাপর ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত। আমিও সেখানে গেছি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের নিন্দা করছে। গদাই কি জানে, লেখাপড়া কিছু জানে না। আমি তাদের কথা সমস্ত শুনে, ঠাকুরের শেখানো গৎ তাদের কাছে ঝাড়তে আরম্ভ করলাম। 'চিল শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের নজর ভাগাড়ের দিকে।' 'যাদের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তারাই যথার্থ পণ্ডিত।' 'পাঁজিতে লিখেছে বিশআড়া জল, নেংড়ালে, এক ফোঁটাও পড়ে না' ইত্যাদি সব বলতে লাগলাম। উঠে আসবার সময় তারা পরস্পর বলাবলি করছে শুনলাম, 'এ ত ঠিক বলেছে, যথার্থই বলেছে। আমরা একটা ঘড়ার জন্য কি না করি।'

"আশ্রম প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। হরি মহারাজ বলতেন, 'আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নিজের সুখ-সুবিধা নেবার জন্য সেখানে থাকতে নেই। যেই দেখলে সুবিধা হয়ে গেল, সেখান থেকে চলে যাবে। আর এক স্থানের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে, এর নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। তা না হলে আশ্রম হল নিজের একটি ঘর হল; দুধের বাটি হল; চাকরবাকর হল; বেশ এখন সুখে থাক। ঈশ্বর সকলের মঙ্গলের জন্য সাধু তৈরী করেছেন। কম্বলী-বাবা একটি কম্বলের উপর শুয়ে থাকতেন, কিন্তু তাঁর কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে, তা থেকে নিতেন না। সেই টাকাতে সাধুদের জন্য সত্র, বদ্রী-নারায়ণে যাবার পথ তৈয়ার করতেন, নারায়ণ বোধে সকলের সেবা করতেন। ঈশ্বর সকলের মঙ্গলের জন্য সাধু করেছেন।

সংসারীর কর্ত্তব্য

একজন ভক্ত—সংসারীদের কি জন্য করেছেন?

শ্রীম—তারাও এইরকম থাকবে। সংসারে থেকেও ভোগ নেবে না। যা' উপায় করবে তা থেকে অর্দ্ধেক সাধু সেবার জন্য আর অর্দ্ধেক বাড়ীর লোকের জন্য। বাড়ীর লোককে নারায়ণ বোধে সেবা করবে। এমন শোনা যায় কোন কোন গৃহস্থবাড়ীতে, নিজে যা খায়, চাকরদেরও তাই দেয়। তা না হয়ে নিজে ভাল ভা জিনিষ কিনে খেলাম, আর কারোকে দিলাম না, এটা ভাল নয়।

রাত্রি নয়টা হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেবল জগবন্ধু ও গদাধর রহিলেন।

সকলে যাইবার পর ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীম এক ভক্তকে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছ যে, কি খাও?" পরে উপমন্যুর গল্প বলিলেন। পরে আরও বলিলেন, "তোমার যা দরকার হয় এইখান থেকে নেবে। সাধু ছাড়া ওখান থেকে ভিক্ষা নেওয়াও ভাল নয়। ইত্যাদি।"

॥ ১১ ॥

১৯শে অক্টোবর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে অপরাপর ভক্তেরা বসিয়া আছেন। সকাল প্রায় আটটা। এক্ষণে নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সহিত কথা হইতেছে। নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম. এ. পাশ করা কৃতবিদ্য লোক। স্বামীজীর কথা হইতেছে।

স্বামীজীই প্রথম রামকৃষ্ণ-পূজা প্রবর্ত্তন করেন

নরেন্দ্র গাঙ্গুলী—স্বামীজী ঠাকুরকে অবতার বলেছেন। বড় বড় লোকদের অবতার বলা ছাড়া আর কি বলা যায়?

শ্রীম—সে কি! স্বামীজীর কত সাধনভজন ও গুরুভক্তি। কত ভগবানের জন্য কঠোরতা করেছেন। তিনিই মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার প্রবর্ত্তন করলেন। নিজে তাঁর নামে স্তোত্র রচনা করলেন,—"খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্ধন বন্দি তোমায়, নিরঞ্জন নবরূপধর নির্গুণ গুণময়।" ইত্যাদি। সেই স্তোত্র প্রত্যেক আশ্রমে সন্ধ্যা-আরতির সময় গীত হয়ে থাকে। ঠাকুর নিজে বলে গেছেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" গীতাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, "তুমি যেকালে নিজেই বলছ 'আমি অবতার' সেকালে বিশ্বাস করছি।" "স্বয়ং চৈব ব্রবিষি মে।"

তপস্যা না থাকলে রামকৃষ্ণকে বোঝা যায় না

"সাধনভজন ও তপস্যার দরকার তা না হলে বোঝার জো নেই। প্রশ্নোপনিষদে আছে একবার কতকগুলি young (যুবক) ঋষি সমিৎপাণি* হয়ে বৃদ্ধ পিপ্পালাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাহাদিগকে দেখে বৃদ্ধ ঋষি বললেন, "এক বৎসর তপস্যা করে এসো, তা না হলে আবোলতাবোল প্রশ্ন করবে।"

"তাঁকে জানবার অনেক পথ। প্রথমাবস্থায় একটি রাস্তা ধরে উঠতে হয়।

* উপনিষদ যুগে যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে করিয়া শিষ্যকে গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হইত।

ওপরে উঠলে তখন যে কোনও রাস্তায় যাওয়া আসা করা যায়। ঠাকুরের কাছে কতরকম লোক এসেছে। ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি। তিনি কি কাউকে ছেড়েছেন। ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজ দেখলে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। মুসলমানদের মসজিদ দেখলে দাঁড়াতেন—প্রণাম করতেন। (গদাধরের প্রতি) তুমি কিছু উপনিষদ শোনাও।"

গদাধর উপনিষদ হতে শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। কথাবার্তার পর সকলকে তালের মিশ্রি দিলেন এবং তাঁহারা প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকাল বেলা প্রায় ৫টা। শ্রীম বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে গদাধর। আমহার্ষ্ট স্ট্রীট দিয়া হ্যারিসন রোডে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে (গদাধরের প্রতি) আমি কি ভাবছি বল দেখি?

গদাধর—ঠাকুরের বিষয় ভাবছেন।

শ্রীম—হরিদ্বার, স্বর্গাশ্রম প্রভৃতি স্থান জলে ভেসে গেছে, তাই ভাবছি। আমরা বেশ পাকাবাড়ীতে আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি। তাদের অবস্থাটা ভাবতো। কেউবা গাছের উপর বসে আছে, কেউবা শীতে জড়সড় হয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ বেড়াইয়া ব্রাহ্মসমাজে গেলেন। ব্রাহ্মসমাজে গান বক্তৃতা শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীম দোতলার ঘরে বসিলেন। অনেক ভক্তেরাও ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন ; তাঁহারাও ফিরিয়াছেন।

মা কালীর লীলা

শ্রীম—ঠাকুর কেশববাবুকে কালী কতভাবে লীলা করেছিলেন একবার বলেছিলেন। নিত্যকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালীরূপে সৃষ্টি পালন সংহার করছেন। তাঁর সেই কথা কেশববাবু মেনেছিলেন এবং তিনি মার নামও করতেন। বালকের মত বিশ্বাস চাই। মা বলেছে, ঘরে জুজু আছে, বালকের ষোল আনা বিশ্বাস, 'ও ঘরে জুজু আছে'। এই রকম বিশ্বাস হলে তবেতো তাঁর কৃপা হবে।

"একজনকে ঠাকুর বললেন, বল বিচার করবে না। মানুষের বুদ্ধি কিরূপ তিনি জানেন কিনা। আবার মার কাছে বলছেন, 'একবারতো বিচার করে নিতে হয় মা'। ব্যাকুল হলে তার কথা মা শোনেন। ছেলের অসুখ বা স্ত্রীর অসুখ ; সেজন্য তাঁকে (মা কালীকে) পূজা দিচ্ছে, তারকেশ্বরে হত্যা

পর্য্যন্ত দিচ্ছে। তাঁকে ডাকবে না ত কাকে ডাকবে? তিনি সব করেছেন, সব হয়েছেন। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। গানে আছে, দীনতারিণী দুরিতহারিণী সত্ত্বরজস্তম্ ত্রিগুণধারিণী। সৃজনপালন নিধনকারিণী সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী॥' যে ভাবেই ডাকুক না কেন তাঁকেই ডাকছে। কালীপূজা কি বারে?

অমৃত—সোমবারে।

শ্রীম—কথামৃত পাঠ হবে না?

অমৃত কথামৃত তৃতীয়ভাগ দ্বাবিংশ খণ্ড "৺কালীপূজা দিবসে শ্যামপুকুর বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে" প্রসঙ্গ পাঠ করিলেন, পাঠের পর অমৃত গান গাহিতেছেন—

"সীতাপতি রামচন্দ্র" ইত্যাদি।

মন্দিরে মম কে আসিল হে
সকল গগন অমৃতে মগন
দিশি দিশি গেল মিশি
অমানিশি গেল দূরে দূরে॥
সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল বীণা বাজিয়া উঠিল
নব নব সুরে সুরে।

"চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন
কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয় রঞ্জন!" ইত্যাদি

রাত্রি অনেক হওয়ায় ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১২ ॥

২০শে অক্টোবর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম—দোতলার ঘরে ধ্যান করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, অনেক ভক্ত মাদুরে বসিয়া আছেন। ধ্যানান্তে গান গাহিতেছেন—

"বলরে শ্রীদুর্গানাম (ওরে আমার আমার মনরে) ইত্যাদি

গান—জাগমা কুলকুণ্ডলিনী (তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী)

(ওমা) প্রসুপ্তা ভুজগাকারা আধার পদ্ম বাসিনী। ইত্যাদি।

গান— "মন মজরে মজরে শ্যামার রাঙ্গা পায়।
সাধে কি ভোলানাথের মন প্রাণ ভুলে যায়॥
গগনেতে এক চন্দ্র মায়ের পদ নখে কোটি চন্দ্র
ধরিতে সেই পূর্ণচন্দ্র তৃষিতপ্রাণ সদা ধায়।"

গান— "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী। ইত্যাদি।

গান— "সদানন্দময়া কালী মহাকালের মনোমোহিনী
আপন সুখে আপনি নাচ মা, আপনি দাওমা করতালি। ইত্যাদি।

মৃত্যু-চিন্তা

"(বড জিতেনের প্রতি) সেই হৃষিকেশের জলপ্লাবনের ছবি মনের মধ্যে চলেছে। প্রায় দেড়শ সাধু ভগবান চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করেছে। কতক সাধু জল বাড়বে জেনে সেইদিন চলে গিয়েছিলেন।

"আশুতোষ মুখার্জ্জীর শরীর যাবার পরে দিন কতক মৃত্যুচিন্তা চলেছিল। জাপানে ভুমিকম্পে অনেকে মারা গেল। কলকাতায় মুসলমানদের ছাত্রাবাস ভেঙ্গে কত ছেলে মারা গেল। তাদের মৃত্যুচিন্তা কিছুদিন চলল। আবার এমন তাঁর মহামায়া সব ভুলিয়ে দেয়। মায়ের এমন যে পুত্রশোক তা পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। দিন কতক থাকে তারপর আবার কম পড়ে যায়।" আবার গান গাইতেছেন—

গান—"ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী। ইত্যাদি।

গান—"এবার কর এ দীনের উপায়।
এদেহ পঞ্চত্বকালে দেহাত্মা যেন মিশায়॥"

গান—"কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে॥
উপেক্ষিয়ে মহতত্ত্ব ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব।
সর্ব্বতত্ত্বাতীত দেখি আপনি আপনে॥
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে।
তত্ত্বহবে পরতত্ত্বে কুণ্ডলিনী জাগরণে॥"
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ।
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে॥
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ ভূত পঞ্চ ময়তঞ্চ।
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ বঞ্চনা করি কেমনে॥
কবি শিবা শিব যোগ, বিনাশিবে ভবরোগ।
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধারসনে॥
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয় জীবনে।
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইব সমীরণে॥
কহে শ্রীনন্দ কুমার ক্ষমাদে হবি নিস্তার।
পার হবি ব্রহ্মদ্বার, শিব শক্তি আরাধনে॥

ডাক্তার—ঐ গানটা গাইলেন? "অনন্ত রূপিণী কালী"।
শ্রীম সেই গানটি করিতেছেন—

কপিল, সাংখ্য, গুরু

একজন ভক্তকে বৈকালে সাংখ্যপুত্র মূলগুলি পড়াইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে বলিতেছেন 'বলত'। ভক্তটি দুই-চারটি সূত্র বলিলেন।

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, "যেমন বাড়ীর গিন্নী গৃহের যাবতীয় কাজ করে। আর বাড়ীর কর্ত্তা চুপ করে বসে থাকে এবং ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে তামাক টানে। গিন্নী মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে হাত নেড়ে সব বলে যায়—'অমুক জায়গায় তত্ত্ব যাবে, অমুককে এত টাকা দিতে হবে।' সেইরূপ সাংখ্যের

পুরুষ উদাসীন হয়ে বসে থাকেন। তাঁর সান্নিধ্যে প্রকৃতি সব কাজ করে। কপিল প্রভৃতি ঋষিরা ছাদে উঠে কথা বলেছেন, ওপারের এপারের কথা।"

ছোট অমূল্য—ঠাকুর না আসলে ঠিক চলছিল না।

শ্রীম—যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন অবতার আসেন। তিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়ে দেন। তখন শাস্ত্রের অর্থ বোঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ এসে গীতা বলাতে বেদ বোঝা গেল। যাঁরা লোকশিক্ষা দেবেন স্বামিজীর মত লোক তাঁদের পড়া দরকার—পাঁচটা জানা উচিত। নিজেকে মারতে গেলে একটি নরুন দিয়ে মারা যায়। অপরকে বধ করতে ঢাল তরোয়াল চাই। যদি বিশ্বাস হয়ে যায় ত আর পড়বার দরকার নেই। বালকের মত বিশ্বাস। মা বলেছে ও-ঘরে জুজু আছে, বালকের তাতে ষোল আনা বিশ্বাস।

এ যেমন তেমন গুরুগিরি নয়। গুরু হিতোপদেশ দিলে শিষ্য রেগে আগুন হয়ে যায়। এক বিধবার ধনসম্পত্তি একজন চক্রান্ত করে নিয়ে নেয়। সেই বিধবাটি তার গুরুর কাছে সে সব নিবেদন করলে। গুরু এসে তাঁর শিষ্যকে বললেন, "বিধবার ধনসম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দাও।" শিষ্য বললে, "দেখুন এসব কথায় আপনি থাকবেন না। আপনি যেমন গুরুপদে আছেন তেমনি থাকুন। "গুরু বললেন, "তুমি যদি তার ধন ফিরিয়ে না দাও, তাহলে তোমাকে অভিসম্পাৎ করব।" শিষ্যও তেমনি পৈতে ধরে বললে, "আমিও আপনাকে শাপ দেব।" (সকলের হাস্য)

অতঃপর ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৬৩

২১শে অক্টোবর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম স্কুলবাড়ীর চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন ; সকালবেলা একজন ভক্ত শ্রীমকে প্রণাম করিয়া একধারে বসিলেন এবং সেখানে আর একজন বসিয়া আছেন।

ভক্ত—আপনি কিছু কিছু জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষদ) পড়িয়েছেন, বেদের অন্য ভাগে কর্ম্মকাণ্ডে কি বলেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

কর্ম্মকাণ্ড

শ্রীম—দেখছি তুমি বাড়ী বাড়ী পূজা হোম করে বেড়াবে। ব্রাহ্মণের সংস্কার যাবে কোথায়? কর্ম্মকাণ্ড বিশেষ ক'রে বলতে হয় না। জ্ঞান-কাণ্ডই কঠিন। বেদে উপনিষদে কি আছে, একটু একটু বলে দেওয়া হচ্ছে। এরপরে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে শিখবে। দেওয়াল তোলার আগে ভিত্তি যদি শক্ত থাকে তাহলে যে সে এসে দেওয়াল উঠাতে পারে.। ভিত্তি যদি শক্ত না থাকে তো তার ওপর দেওয়াল ওঠানো চলে না। শাস্ত্রে কি আছে কিছু কিছু জানলে। সেই কথাই ঠাকুর অতি সরলভাবে বলে গেছেন, সেগুলো জানলে ঠাকুরের প্রতি আরো ভক্তিবিশ্বাস বেড়ে যাবে। মনে হবে ঠাকুর যা সব বলে গেছেন সে সব বেদ-বেদান্তের কথা। তুমি পড়ে-টড়ে টোল খুলবে নাকি?

ভক্ত—কি করা ভাল?

শ্রীম—সন্ন্যাসীর কোন কিছুতেই দোষ নেই। যেমন যদি কেউ পাখীর বাসা ভেঙ্গে দেয় তখন সে অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়ায়। তেমনি ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস। মঠে যখন সন্ন্যাস হয়, তখন তাদের দেখো কেমন অন্তর্মুখী ভাব। ভাবে এক ভগবান ছাড়া আমার দুনিয়াতে আর কেউ নেই। ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাস মানে বাসা ভেঙ্গে দেওয়া।

গোপাল—যদি কেউ আমাদের বাসা ভেঙ্গে দেয় তাহলে হয়।

শ্রীম—ঠাকুর ভেঙ্গে দেবেন।

ভক্ত—ঠাকুরের কাছে যারা যেত, কতক লোককে রেখে দিয়েছিলেন তাদের বাসা ভাঙ্গেন নি। তাঁর ইচ্ছা, কতক লোককে গৃহে রাখবেন লোক-শিক্ষার জন্য।

বেলা প্রায় ১০টা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জ্যোতিষের মধ্যে অনন্তের ধ্যান

বেলা প্রায় ১টা। শ্রীম চারতলার বারাণ্ডায় কয়েকজন ভক্তকে জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়াচ্ছেন। বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর অনুবাদ সূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থখানি মঠ হইতে আনিয়া পড়াইতেছেন।

শ্রীম—আমি ছেলেবেলায় গণিত জ্যোতিষ পাগলের মত পড়তুম। পূর্ব্বের সংস্কার ছিল, তা না হলে ভাল লাগবে কেন। আজকে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম

এক একটি নক্ষত্রের পেছনে এক একটি জগৎ রয়েছে। অনন্ত লোক, এখানে যেমন মানুষই শ্রেষ্ঠ ; প্রতি লোকে বোধ হয় তেমনি এক জাতীয় শ্রেষ্ঠ জীব আছেন। পৃথিবী-লোকে অবতার এসে বিচরণ করেন। 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি'—ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন তিনি হয়ে রয়েছেন। মন ও অনন্ত Time (কাল) ও অনন্ত। যোগীরা সমাধিস্থ হয়ে সে পারের খবর বলতে পারেন। ঋষিরা বলে গেছেন অনন্তলোককে তিনি ধরে আছেন।

এইবারে নিজহস্তে চিত্র অঙ্কিত করে দেখাচ্ছেন। সূর্য্যকে পরিক্রমা করছে পৃথিবী, পৃথিবীকে চন্দ্র পরিক্রমা করছে। বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল, শনি, শুক্র গ্রহ প্রভৃতি সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গ্রহগুলি কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছুটে পালাতে পারছে না ; সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি টেনে রেখেছে বলে। বারো রাশি যথা—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। ২৭ নক্ষত্র—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী ইত্যাদি। সূর্য্য এক এক রাশিতে সওয়া দুইটি নক্ষত্র করে ভোগ করেন। ইত্যাদি।

জ্যোতিষ পড়াইয়া নিজের ঘরে বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামের পর পাঁচটার সময় ডাক্তারের গাড়ীতে দেবমন্দির দর্শনে গেলেন। ফিরবার সময় ঠাকুর-বাড়ী হইয়া সন্ধ্যার পর লালবাড়ীতে ফিরিলেন। লালবাড়ীতে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

স্বপ্নাদেশে ঘটস্থাপন

শ্রীম—আজকে ঠাকুরবাড়ী হয়ে এলাম। ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে বসেছিলাম। ভাবছিলাম কত দিনের ঠাকুর। সাঁইত্রিশ বছর হলো ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্বপ্নাদেশে এই ঘটস্থাপনা হয়। ঠাকুরের সামনে ঘটস্থাপনা। এই ঠাকুরকে মাঠাকুরাণী স্বামীজী পূজা করেছেন। কত কাণ্ড হয়ে গেল।

একটু পড়া যাক্। শচীন, দেবী ভাগবত পড়িতেছেন, নারদ ঋষি নরনারায়ণ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই জীবজগৎ কোথা হইতে আসিয়াছে ? কোথায় বা লয় হয় ? আমি অজ্ঞ বুঝতে পারছি না।

শ্রীম—দেখছ এতবড় ঋষি হয়েও এমন কথা বলছেন, 'আমি অজ্ঞ' আর অন্য লোকে একটুতেই লেকচার ! আজকে জ্যোতিষী পড়া হচ্ছিল। কত বড় কাণ্ড চলেছে। কোটী ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হচ্ছে লয় হচ্ছে। (ছোট জিতেনের

প্রতি) বলত, 'অশ্বিনী ভরণী'।

তিনি সমস্ত বলিলেন। দেবী ভাগবতের পর কথামৃত ২য় ভাগ ৺কালী-পূজা দিবসে, পাঠ হইতে লাগিল।

শ্রীম—ঠাকুর আমাদেব কত ভালবাসেন। কথামৃত খুলতেই কালী-পূজার দিন বেরিয়ে পডল।

কথামৃত পাঠ শেষ হইল। বাত্রি প্রায় নয়টা হইয়াছে। এইবাব ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ কবিলেন।

॥ ১৪ ॥

২৩শে অক্টোবর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

মৈত্রেয়্যুপনিষদ

সকালবেলা স্কুলবাড়ীব চাবতলাব ঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। একজন ভক্তকে বলিলেন, 'পডবে এস'। কিছুক্ষণ পবে অন্যান্য ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক হইতে উপনিষদের কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পবে ভক্তকে প্রশ্নোপনিষদ ও মৈত্রেয়্যুপনিষদ হইতে কয়টি শ্লোক মুখস্থ কবিবাব জন্য আদেশ করিলেন। ভগবান মৈত্রেয় কৈলাসে গিয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবান। পরমতত্ত্ব রহস্য আপনি আমাকে বলুন।" মহাদেব কহিলেন—

'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ
ত্যজেদজ্ঞানং নির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজযেৎ ॥ ১ ॥
অভেদ দর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ।
স্নানং মনো মলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ॥ ২ ॥
ব্রহ্মামৃতং পিবেৎ ভৈক্ষমাচরেদ্দেহ রক্ষণে
বসেদেকান্তিকো ভূত্বা চৈকান্তে দ্বৈত বর্জ্জিতে
ইত্যেবমাচরেদ্ধী সীমান্ সত্রবং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ ইত্যাদি।

শ্রীম—'ভগবান লাভ হলে এই শরীর দেবালয় হয়ে যায়। অজ্ঞান চলে যায়, সোঽহং ভাবে অবস্থিতি করে। চক্ষু বোঁজাকে ধ্যান বলে না। অভেদ

দর্শনকে জ্ঞান বলে। মন বিষয় রহিত হলে তা'কে ধ্যান বলে। ঠাকুর বলতেন, 'চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়'। দেহে গুচ্ছের জল ঢালাকে স্নান বলে না, মনের ময়লা যাওয়াকে স্নান বলে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করাকে শৌচ বলে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মানন্দ পানের জন্য দেহধারণোপযোগী ভিক্ষাচর্য্যাদি করেন। দ্বৈত-বর্জ্জিত হয়ে একান্তে বাস করেন। ইত্যাদি পাঠান্তে বলিতেছেন—

প্রশংসা সাধনের বিঘ্ন

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—তুমি টোল খুলবে দেখছি।

ভক্ত—যাতে এ ভাব না আসে, ভগবানেতেই লক্ষ্য থাকে তাই করুন।

শ্রীম—বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যার জোর বেশী।

ভক্ত—গুরুর জোর বেশী। গুরুর কৃপার কাছে অবিদ্যাও নত হয়।

উকিল (ভক্তটিকে লক্ষ্য করিয়া)—এই বয়েসে এত জ্ঞান!

শ্রীম—না, সামনে ওসব বলতে নেই। ওতে হানি হয়। গোল্লায় যায়। সংসারীরা ঠাকুরকে অবতার বললেন আর ঠাকুর কৃতার্থ হয়ে গেলেন আর কি? ঠাকুর বলতেন, "পান চিবুতে চিবুতে হাতে (stick) ছড়ি নিয়ে যদি বলে আপনি অবতার, তবে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম।" একদিন ঠাকুর কেশব সেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে।" কেশব সেন কিছুতেই কিছু বলতে চান না। শেষে বললেন, "আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রী করব। আপনার সম্বন্ধে আমি আর কি বলব।" পুনর্ব্বার ঠাকুরের জেদে কেশববাবু বললেন, "আপনার ষোল আনা জ্ঞান হয়েছে।" ঠাকুর শুনে বললেন, "আজ তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হল না। নারদ শুকদেব এঁরা যদি বলতেন তাহলে একটু বিশ্বাস হত। তুমি মানের কাঙ্গাল, যশের কাঙ্গাল, তোমার কথার মূল্য নেই।" যিনি সুহৃৎ তিনি দেখেন সাধনার বিঘ্ন ভূতপ্রেতগুলি। গুরুর উপদেশে এক সাধক মড়া নিয়ে শবসাধনা করবার উদ্যোগ করছিল। শব সাধনাতে ভয় আছে, কখনো কখনো মড়া মুখ হাঁ করে খেতে আসে। শিষ্য ভয় পাচ্ছে দেখে গুরু বললেন, "দেখ আমি আছি তোমার কিছু ভয় নাই। তারপর শিষ্য শব সাধনা করতে বসেছে তখন মড়াটা হাঁ করে খেতে এসেছে। ভয়ে সাধক আড়ষ্ট স্বরে বলছে, গুয়ু (গুরু) মটা ফুঁ ফুঁ (মড়া ফোঁস ফোঁস করছে)। তার ভয় দেখে গুরু গিয়ে মড়ার মুখে মটর টটর দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দিলেন। সংসারীরা প্রশংসা করে সাধুর সর্ব্বনাশ করে দেয়। একজন

ঠাকুরের কাছে যেতেন। তিনি সংসার ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক বৎসর পরে যখন ফিরে এলেন তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে কপ্‌ করে ধরলেন। কাজেই তিনি গৃহস্থাশ্রমে আবার প্রবেশ করিলেন।

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় দশটা হওয়াতে ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম বৈকাল ৫টায় ডাক্তাবের গাড়ীতে করিয়া পটলডাঙ্গার কাছে মহাবোধি সোসাইটিতে গেলেন। আজ সেখানে বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে গান ও বক্তৃতা হইবে। অপরাপর ভক্তেরাও গিয়াছিল। সভা ছয়টায় আরম্ভ হইল। প্রথমে গান হইতেছে—

"অচল ঘন গহন গুণ গাওয়ে তাহাঁবি।" ইত্যাদি।

শ্রীম স্কুলবাড়ীতে আসিয়া ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন

শ্রীম—আজ দিনটা বেশ কাটানো গেল। আমার কেবল যেখানে যেখানে ঈশ্বরীয় কথা হয় সেখানে গিয়ে শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। কথামৃতে যেখানে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুব বুদ্ধদেবের কথা বলছেন সেইখানটা পড়া হোক।

তৃতীয়ভাগ কথামৃত পাঠ হইল। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শবণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—মন্ত্র শিখতে বললেন। পবে গদাধরকে বললেন, 'স্তব বল। "নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়।" এইরূপে মুণ্ডকোপনিষদ, মৈত্রেয়্যুপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, বৃহদাবণ্যকোপনিষদ হইতে কিছু কিছু মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীম (আবৃত্তির পর গদাধরের প্রতি)—তোমার কলেজে পড়তে হলো না। কম সময়ের মধ্যে নিয়ে নাও। কলেজে না পড়লে কি বিদ্যা হয় না? শুনেও হয়। ঠাকুর বলতেন, "আমি কত শুনেছি" যারা ঠাকুরকে চিন্তা করে তারা সহজেই শাস্ত্রের মানে বুঝতে পারবে। (বিনয় ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) গীতা মুখস্থ করা উচিত। রোজ সকালে দুই চারি শ্লোক করে। ঠাকুর বলতেন, 'গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সার'।

এইবার ভক্তেরা প্রণাম কবিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১৫ ॥

২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম আজ সকালে গদাধরকে কঠোপনিষদ পড়াইতেছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত আছেন।

শ্রীম—নচিকেতা কিছুই চায় না। দুইটি পথ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। প্রেয়ঃ (প্রবৃত্তি) পথ লম্বা, চওড়া ও পিছল। শ্রেয়ঃ (নিবৃত্তি) পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম শানিত ক্ষুরের ন্যায়। যারা প্রেয়ঃ চায় তারাই সংসারে আবদ্ধ হয়। নচিকেতা উচ্চাধিকারী, সে আর কিছুই চায় না। যেমন চাতক স্বাতী নক্ষত্রের জল ভিন্ন আর অন্য জল চায় না। তেমনি নচিকেতা না খেতে পেয়ে মরে যাবে তবু অন্য জল খাবে না। তার এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে যম আত্মজ্ঞানের কথা বলিলেন।

সন্ধ্যার সময় চারতলার ছাদে মঠের জনৈক সাধু ও অন্যান্য অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। শ্রীম আসিয়া ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ করিলেন। (ভোলা বাবুর প্রতি) "একটি গান হোক্।" ভোলাবাবু গান গাহিতেছেন—

"কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে আনিয়ে এভবে ভাবালি আমায়।
আমি না জানি সাধন না জানি পূজন বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।
ইত্যাদি।

শরৎ মহারাজ

গানান্তে সাধুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

সাধু—শরৎ মহারাজ একমাস তীর্থ করে ফিরে আসবেন। সাতু মহারাজ সঙ্গে আছেন।

শ্রীম—তাঁর কাজকর্ম্ম বেশী। আবার জয়রামবাটির কালীমামাদের বিষয়-আশয় প্রভৃতি দেখতে হয়। কালীমামাদের অন্যায় অভদ্রতা দেখেও তিনি সমস্ত ঠাণ্ডাভাবে মিটিয়ে দেন। ঠাকুর মন দেখেন। কি জন্য তিনি সহ্য করেন। তাঁর জন্যই ত। আমার জয়রামবাটী কামারপুকুর ঠাকুরের শরীর থাকতে একবার যাওয়া হয়েছিল। আর একবার হয়েছিল ঠাকুরের শরীর যাবার পর, সরস্বতী পূজার দিন (বড় জিতেনের প্রতি) সাধু দর্শন কর—

বাইরে সাধুর শরীর দেখতে একরকম, কিন্তু তাদের অন্তরে সোঽহং ভাব চলেছে।

নিষ্কাম কর্ম্ম

সাধু—তাই বা হচ্ছে কই? কেবল পরের খেয়ে বেড়াচ্ছি। তিনি সব কচ্ছেন। এ ভাব আসে না।

শ্রীম—তাঁর দর্শন হলে তবে এভাব আসে। তা না হলে সব প্রকৃতির বশ। যার প্রকৃতিতে যেমন আছে সে ঠিক তেমনি চলে। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানিঃ গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। (গীতা ৩।২৭) অর্জ্জুন বললেন, 'যুদ্ধ করব না'। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি এরূপ বলছ বটে কিন্তু তা পারবে না। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে না'। তবে ভোগ না নিয়ে কর্ম্ম কর তাহলে আবদ্ধ হবে না। যদি আমার কথা না শোন তবে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

মন্ত্রঃ গুরুঃ প্রার্থনা

"শ্রীশ্রীমা বলতেন—'যদি কথা না শোন কর্ম্মের ফল ভোগ করতে হবে। তবে আমার কাছে যখন এসেছ শরীরান্তে পরকালের ভার নিয়েছি। যদি কথা শোন ইহলোকে সুখ পাবে, পরলোকেও পাবে।' মন্ত্র কি একটা ফ্যাশন, ঝিনুক স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের ফোঁটা পেয়ে অগাধ জলে ডুব দেয়। তাইতে মুক্তা হয়। সেইরূপ গুরুমন্ত্র পেয়ে নির্জ্জনে তপস্যা করতে হয়। এ কি যেমন তেমন গুরু, যিনি ঠাকুরের শক্তি তিনি গুরু হয়েছেন, যাদের এমন গুরুকরণ হয়ে গেছে তাদের ভাবনা কি? তিনিই তপস্যার জন্য ভাবিয়ে নেন। কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিলেও হবে। তবে ভক্তি চাই। ঠাকুর একটি মেয়ের গল্প বলতেন। ভক্তি দ্বারা মেয়েটার নিজেরও ভগবান দর্শন হল গুরুরও হল। ঠাকুর তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলতেন, 'যাঁতে তোমার পথে চলতে পারি তাই করে দাও'। প্রার্থনা করলে ভেতরে যে গলদ আছে সেগুলো বেরিয়ে যাবে। রাত্রদিন প্রার্থনা করা চাই।"

বড় জিতেন—আমাদের ইচ্ছা হয় দেহ থাকতেই যেন জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াই।

শ্রীম—তাহলে তাঁর কথা শোন।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। (বৃউ ১।৩।২৮)
আবিরাবির্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্
(শ্বেতাউ ৪।২.১)

তাঁর কাছে কাঁদতে হয় আমাকে দেখা দাও বলে। ঠাকুর একদিন একজন ভক্তকে বললেন, "মাকে এত বললাম তাকে দেখা দিয়ে কিছু করে দাও, কিন্তু কই আর দিচ্ছে?" মনে করলে তিনি সবই পারেন। তিনি সকলের প্রকৃতি করেছেন এবং তার শুভ সংস্কারও আছে, তবে কিছু খাটিয়ে নেবেন। গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমিই আমার সব পুত্রদের হত্যা করালে।' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'যার যেমন কর্ম্ম সে তেমনি ফল পায়। আমার কর্ম্মফলে হাত নেই।' ঠাকুর তাঁকে এমনি করে বোঝালেন। সাধু বিদায় গ্রহণ করার পর শ্রীম নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন। সেই পুস্তকে উপনিষদের সার সার শ্লোকগুলি দেওয়া আছে। অক্ষর প্রকরণ, যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী সংবাদ পাঠ করিতে করিতে বলিতেছেন, এসব খুব উচ্চ কথা। ঋষিরা যা কিছু বস্তু সামনে দেখছেন তাহাই ব্রহ্মবুদ্ধিতে বর্ণনা করছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে ব্রহ্ম ধারণ করে রয়েছেন ইত্যাদি। জগবন্ধুবাবু স্কুলের ছুটিতে কাশীতে আছেন। তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, হৃষীকেশে যখন জলপ্লাবন হয় তখন সাধুরা উচ্চস্বরে তাঁর নাম করতে করতে শরীর ত্যাগ করলেন। তাই ভক্তদের শুনাইতেছেন। রাত্রি প্রায় ৯টার অধিক হইয়াছে। ভক্তরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১৬ ॥

২রা নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

সন্ধ্যা ৭টা। রবিবার। দুইতলার উত্তরের বারান্দায় শ্রীম ভক্তদের সহিত বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। গদাধর দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীম কুশল সংবাদ লইলেন। ঈশ্বরচিন্তা করিবার ইচ্ছায় বৎসরাবধি তথায় বাস করিতেছেন। মাঝে মাঝে শ্রীম এঁর নিকটও আসেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যারা বিবাহ করে নাই তারা কারো তোয়াক্কা

রাখে না—স্বাধীন; তারা বেশ ঈশ্বরচিন্তায় দিন কাটাতে পারে। খাবার ভাবনা কি? বিদ্যাসাগর মশায় বলতেন, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে চার বাড়ীতে গিয়ে চারমুষ্টি চাল পেলেই যথেষ্ট, তাই ফুটিয়ে খেয়ে জীবন-ধারণ করা যায়। ঋষিরাও ভিক্ষাবৃত্তির কথা বলেছেন 'ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি'। ঠাকুর কাপ্তেনকে বলেছিলেন, "ঈশ্বর বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক তফাৎ।" আর কেশব সেনকে বলেছিলেন, "বিষয়ীদের জ্ঞান যেমন ঘরের চারিদিকে অন্ধকার, ছাদের ঘুলঘুলি দিয়ে একটু আলো আসছে। আর ত্যাগীরা যেন ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদে আছে ঋষিরা করামলকবৎ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করছেন। "তদ্দূরে তদ্বন্তিকে"। যার যেমন সময় আছে তার তেমনি বাস করা ভাল।

স্কুলবাড়ীর পূর্ব্বদিকে অনেক বৈষ্ণবেরা মিলিয়া নিত্য হরিনাম করেন তাহার শব্দ আসিতেছে।

শ্রীম—পাশে হরিনাম হচ্ছে। ব্রাহ্মসমাজেও আজ কিছু ভগবানের নাম হবে, কে যাবে চল, চারিদিকে হরিনাম।

গান গাইতে গাইতে যাইতেছেন, "আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্প-তরু মূলে চারিফল কুড়ায়ে পাবি।" শ্রীমর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্ত ব্রাহ্ম-সমাজে গেলেন। আর কোন কোন ভক্ত শরৎ মিত্রকে দেখিতে গেলেন। তাঁর খুব অসুখ। এই দিনে তাঁহার শরীর যায়।

শ্রীম ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিয়া ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। উভয় জায়গা হইতে ভক্তেরা ফিরিয়াছেন।

শ্রীম—কেশব সেন ঠাকুরের বিষয় প্রচার করেছেন। অবতারের আলো সব জায়গায় সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হয় না। যেমন সূর্য্যের আলো দেওয়ালে, গাছে, জলে, কাচে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। তেমনি ঠাকুরের আলো স্বামীজীর মধ্যে, দেশের লোকের মধ্যে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ হয়েছে। (অমূল্যর প্রতি) "এক বৎসর পর পর তীর্থ করা ভাল।" জগবন্ধু শনিবার কাশী হইতে আসিয়াছেন। (জগবন্ধুকে দেখাইয়া) "ইনি তীর্থ করে এসেছেন, কত লোকের উদ্দীপনা হচ্ছে।" (ভক্তের প্রতি) একটু স্তব বল, "নমস্তে……"

ভক্ত—"নমস্তে সতে তে জগদ কারণায়" ইত্যাদি। "স পর্য্যগাচ্ছুক্রম-কায়ম ব্রণমস্নাবিরম।" ইত্যাদি।

(ভক্তদের প্রতি) "আদি সমাজে যাবেন, সেখানে একশো বৎসর ধরে বেদপাঠ হয়েছে। ঠাকুর সেখানে গিয়েছিলেন। ঠাকুর আসাতে কলিকাতার

কালীতলা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি তীর্থ হয়ে রয়েছে। আবার পাশে হরিনামও হচ্ছে।” (ভক্তটির প্রতি) “একে (গোপালকে) আদিসমাজ দেখিয়ে নিয়ে আসবে, তাদের সঙ্গে আলাপ করবে। যারা ভোগ চায় না কারো কাছে প্রত্যাশা রাখে না তাদের আর লোকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে দোষ কি?”

জগবন্ধু ৺কাশী থেকে ৺বিশ্বনাথের প্রসাদ আনিয়াছেন, তাই সকল ভক্তদের বিতরণ করিতেছেন। তিনি বিন্ধ্যাচল হইতে আমলকীও আমিয়াছেন তাহাও এক একটি দিতেছেন।

শ্রীম—যারা বিবাহ করেন নি তাদের একটি, আর যারা বিবাহ করেছেন তাদের দুটো করে দিও। (সকলের হাস্য)।

রাত্রি প্রায় ৯টা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ১৭ ॥

৩রা নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

স্থিতপ্রজ্ঞ

শ্রীম নিজেব চারতলার ঘবে চেয়ারে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন নিকটে অনেক ভক্তেরা উপস্থিত। সকাল বেলা, গোপালকে গীতা পড়াইতেছেন। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন—“যাদের বুদ্ধি স্থির হয়ে গেছে ভগবানকে অনুভব কবেছে তারা সুখে ও দুঃখে বিচলিত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সমস্ত বাসনা চলে যায়। তাদের ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত থাকে। যেমন কচ্ছপ একবার যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সংকোচ করে তাহলে তাকে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেললেও আর তার হাত পা বেব হয় না। সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয়গুলো তাঁর আয়ত্তে থাকে। বিষয়ীদের মন সদাই চঞ্চল—সদাই বিষয়ের দ্বারা বিচলিত, যেমন নৌকাকে বায়ু যথেচ্ছ বিচলিত করে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অচল গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায়। যেমন নদ, নদী ও বৃষ্টির জল চারিদিক থেকে সমুদ্রে পড়িলেও সমুদ্র তাহাতে বিক্ষুব্ধ হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ রজোগুণ, তমোগুণ, সত্ত্বগুণ এসব অবলম্বন করিলেও তাতে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হন না—নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান করেন। যারা

পৃথিবীতে কিছু ভোগ চায় না তাদের শীঘ্রই হয়। যাদের পাণ্ডিত্যের অভিমান ও টাকা রোজগার করিবার ইচ্ছা আছে তাদের দেরী পড়ে যায়।"

বিদ্যাসাগর

(গদাধর ও গোপালকে লক্ষ্য করিয়া)—"এরা সব দক্ষিণেশ্বরে তপস্যা করে। আচার্য্য এদের পেলে মহা সন্তুষ্ট হন। ঠাকুর এদের পেলে খুব আনন্দ করতেন। এদের কোন দিকে মন নেই। বিদ্যাসাগর মশায় কত কষ্ট করে নিজের চেষ্টায় পড়েছেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁর তিন ভাইকে রেঁধে দিতে হত। পাক করে অবশিষ্ট সময় পড়তেন। পড়াতে ফার্ষ্ট হতেন। তাহাতে সোনার মেডেল ও মাসে মাসে জলপানি পেতেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ছ'টাকা মাইনে পেতেন, তাতে কি সংসার চলে?

প্রকৃতিভেদে উপদেশ

কর্ম্মেতে কি আছে? কর্ম্ম ছোট কি বড় তা আচার্য্যেরা দেখেন না, তাঁরা দেখেন মন কত বড়। আগেকার আচার্য্যেরা কার কেমন প্রকৃতি তাই দেখতেন। সাইনবোর্ড মেরে লেকচার দিতেন না। ঠাকুর বলতেন, 'লেখা কাগজে কি লেখা যায়? যারা তাঁর কাছে আসত তাদের প্রকৃতি দেখে বলতেন, 'তুমি সংসার কর', 'তুমি ভ্রমণ করে এস', 'তোমার ওসব করবার কিছু প্রয়োজন নাই', 'তুমি আমার কাছে থাক।' তাদের আব দোষ কি? যে যেমন প্রকৃতিতে গড়া; তার ত সেই রকম হবে। পরমহংসদেব বলতেন, 'মা এত জাল দিতে পারি না।' দুধে জলে মিশে রয়েছে, দুধ অপেক্ষা জল এত বেশী যে কেবল দুধ পেতে অনেক ফোটাতে হবে। এই যে জজ, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি, যাদের বলেন বড়লোক, তাঁরা মহাপুরুদের দৃষ্টিতে কিছুই নয়। তাই সেকালের রাজা-সম্রাটেরা মুনি-ঋষিদের দেখলে সিংহাসন ছেড়ে তাদের পায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেন। কারণ তারা অনিত্য ভোগ নিয়ে রয়েছে। আর মুনি-ঋষিরা নিত্যবস্তু নিয়ে রয়েছেন। রামচন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে দর্শন করবার জন্য অত্রি, অষ্টবক্র, নারদ প্রভৃতি ঋষিরা গিয়েছেন। রামচন্দ্র ঋষিদের দেখেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন এবং বললেন, 'আপনারা যে এখানে আসেন সে কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্য। অবতার নিজে আচরণ করে দেখাচ্ছেন কি করে তাদের সম্মান করতে হয়।' তাঁর ওপর কতবড় গুরু ভার। তাঁকে দেখে জগৎ শিক্ষা করবে। ঠাকুর

বলতেন, 'লোকমান্যের মুখে ঝাঁটা মারি।' সকলের যাতে মঙ্গল হয় তাই তিনি দেখেন। এই দেখে সংসারীরা সাধুসেবা করতে শিখবে। সংসারীদের সাধুসেবা ছাড়া উপায় নেই।"

যুক্তাহারবিহার

সন্ধ্যার পর অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। চারতলার ছাদে বেঞ্চিতে সকলে উপবিষ্ট। ডাক্তার শ্রাবণের বসুমতী পড়িতেছেন। এইমাসে তাহাতে কথামৃত পঞ্চমভাগের একখণ্ড বাহির হইয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঘরের ভেতরে আসুন।

তাঁহার ঘরে বসা হইল এবং ডাক্তারবাবু পড়িতে লাগিলেন।

শ্রীম (পাঠের পর)—মুকুন্দবাবু বৃন্দাবন থেকে চিঠি দিয়াছেন।

অমূল্যবাবুকে চিঠিটি পড়িতে বলিলেন। চিঠিতে লেখা আছে, 'কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটের ভয়ে এখানে আসিয়াছি, একটু নির্জ্জনে থাকিবার জন্য। আপনার সঙ্গসুখ হতে এখানে অধিক আনন্দ পাচ্ছি না। এসে আপনার কথাই স্মরণ হচ্ছে। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

শ্রীম (সত্যবানের প্রতি)—তুমি লিখে দিও শরীরকে যেন কষ্ট না দেয়। Rest (বিশ্রাম), ঘুমানো, খাওয়া-দাওয়া, বেডানো নিয়মিত চাই। তাহলে শরীব ভাল থাকে, কি বলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীম—বুদ্ধদেব বেশ বলেছেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

"আমার এই সাধের বিনে······" ইত্যাদি গান।

ডাক্তার—শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও ঐ কথাই বলেছেন, 'যুক্তাহারবিহারস্য-যুক্ত-চেষ্টস্য-কর্ম্মসু।' (গীতা ৬।১৭)

শ্রীম—মনকে বেশী পরিশ্রম করাতে নাই।

'নায়েব হওয়া ভাল নয়'

ঠাকুর বলতেন, 'নায়েব হওয়া ভাল নয়।' যত ভাবনা সব নিজের ঘাড়ে পড়ে। সমস্ত বিষয় ভাবতে হয়। তাতে ভগবানের চিন্তা হয় না। বুদ্ধদেবের জীবনীর মধ্যে দেখা যায় তিনিও সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, মহৎ লোকেরা যদি ভার না নেন তবে মহৎ কাজ কি.করে হয়। শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথী হলেন, পাণ্ডবপক্ষের দূত হয়ে কুরুসভায় গেলেন, মথুরায়

উগ্রসেনকে রাজা করলেন ; কিন্তু সব বিষয়ে নির্লিপ্ত। মাথার ওপর বড় একজন বসে থাকা ভাল, তাহলে কাজ বেশ সুশৃঙ্খলে চলে। তা না হলে গোলমাল বাধে। একাকার হয়ে যায়।

(গোপালের প্রতি)—তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়নি বলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

(ডাক্তারবাবুর প্রতি)—গীতা বলুন, 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা।'

তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ও দ্বাদশ অধ্যায় হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং শ্রীম একাগ্রমনে হাতজোড করিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

আবৃত্তির পর শ্রীম শচীন ও গদাধবকে বলিলেন, এইগুলি পড়া হল ; কিন্তু মুখস্থ করে দিতে হবে।" শ্রীম কয়দিন ধরিয়া গীতা উপনিষদ্ পড়াইতেছেন ; তাই তাহাদিগকে ঐ কথা বলিলেন।

॥ ১৮ ॥

৪ঠা নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম দুইতলায় পায়চারি করিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্তেরা সমবেত হইতেছেন। শ্রীম দুইতলার বেঞ্চিতে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের পব গুনগুন করিয়া গান গাইতেছেন—'মা ত্বংহি তারা ইত্যাদি।'

শ্রীম—কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—মা আসছেন। যেখানে যেখানে পূজা হবে সেখানে সেখানে গিয়ে দেখা ভাল। (জনৈক ভক্তের প্রতি) চণ্ডীর স্তব বল।

ভক্তটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, 'শক্রাদয়ঃ সুরগণা'......ইত্যাদি। আবার মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতেও আবৃত্তি কবিলেন।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—আদিসমাজে গেলে বেদের স্বব জানতে পারবে। তারা পণ্ডিত রেখে বেদের স্বর শিখেছে।

বাহির ও ভিতর বাড়ী

"ভগবানকে অনেক রকমে সম্ভোগ করা যায়—ধ্যানের দ্বারা, জপের

দ্বারা, গানের দ্বারা ইত্যাদি। যে কোন উপায় ভিতর বাড়ীতে ঢুকতে পারলেই হল। নির্জ্জনে, গোপনে, মনে, কোণে, বনে তাঁকে চিন্তা করার নাম ভেতরবাড়ী। দশ পাঁচ জনের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কওয়া হল বাহির বাড়ী। ঠাকুর বলতেন, "একলা ব্যাকুল ভাবে গান গাইলে তাঁর দর্শন হয়।" গানেতে মন সহজে একাগ্র হয়।

ভগবান ভক্তির বশ

(গোপালের প্রতি)—"তুমি বেশ জান, মাছ অনেক রকমে রাঁধা যায়। যেমন ঝাল, ঝোল, অম্বল ইত্যাদি। কর্ম্মেতে কি আছে? ঠাকুর ছ'টাকা মাইনেতে মাকালীর বেশকার ছিলেন। লাটু মহারাজ চাকর বেহারা হয়ে এসেছিলেন। এখন তাঁকে কতলোক শ্রদ্ধা করে। কতলোকে তাঁকে পূজা করে (১)। মহাপুরুষরা লোকের অন্তঃকরণটা দেখেন, তাই শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বললেন, 'মা শুচঃ সম্পদং দেবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।" (গীতা ১৬।৫)

"ঠাকুর যদু মল্লিকের বাগানে গেলে সেখানকার দারোয়ান ঠাকুরকে বাতাস করত। তার ভক্তিপূর্ণ সেবা দেখে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যেত। সেই দারোয়ান একদিন ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করলে। ঠাকুর আমাকেও সেখানে খাবার জন্য বললেন। আমার সঙ্গে একটি উৎকলবাসী ষোল বৎসর বয়সের ব্রাহ্মণ ছিল—তাকেও ব...লন, 'তুমি সেখানে যাবে'। দেখ বড়লোকে নিমন্ত্রণ করলে হয়ত নিমন্ত্রণ নিতেন না। রাখাল মহারাজও সঙ্গে ছিলেন। এখন হয়ত সেই ব্রাহ্মণ ছেলেটির বয়স ৪১ হবে। তাকে যেন এখনো দেখছি। [শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বাস করিতেছিলেন, তখন এই ব্রাহ্মণ শ্রীম-র রাঁধুনী হইয়াছিল।

ভবানীপুর হইতে একজন ভক্ত আসিয়াছেন

শ্রীম—কাল গদাধর আশ্রমে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা হবে?

ভক্ত—হবে। পটে পূজা হবে, তবে বিশেষ করে হবে না।

---

(১) ব্যাধস্য আচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্
বংশঃকো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।

শ্রীম (সুধীরবাবুর প্রতি)—দেবী ভাগবত পাঠ করুন।

পাঠান্তে শ্রীম ও অন্যান্য ভক্তেরা পার্শ্বের বাড়ীতে কৃষ্ণমঙ্গল শুনিতে গেলেন।

॥ ১৯ ॥

৫ই নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

আজ শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজা, বুধবার। তাই শ্রীম সকালেই প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত। যাইতে যাইতে এক বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করিলেন। তারপর ৺কালীতলায় আসিয়া মায়ের সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেছেন। পরে মাকে সন্দেশ কিনিয়া ভোগ দিলেন।

একজন ভক্ত—আমার আজ ৺কালীঘাট যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেখানে অনেক লোকের ভিড় হবে। তাই ইচ্ছা হচ্ছে না।

শ্রীম—সে কি? অনেক লোকের ভিড় দেখবার জন্যও যাওয়া উচিত। কতলোক একসঙ্গে মাকে ডাকছে। অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে উদ্দীপনা আসে।

সন্ধ্যার সময় শ্রীম ডাক্তারের গাড়ীতে আদিসমাজে গেলেন। সঙ্গে অন্যান্য ভক্তেরাও গিয়াছিলেন। সেখানে বেদপাঠ শুনিয়া অমৃতবাবুর বাড়ীতে আসিলেন। অমৃতবাবুর বাড়ীতে আজ শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজা। নীচের ঘরে মা যেন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। সকলের মুখে আনন্দ, মা আনন্দময়ীর আগমনে যেন সকলে আনন্দে আপ্লুত। ঘরের বাহিরে একটি ফাঁকা যায়গায় কালীকীর্তন হইতেছে। বহুলোক উপস্থিত, কেউবা দাঁড়াইয়া, কেউবা বসিয়া গান শুনিতেছে। 'এবার আমি ভাল ভেবেছি' ইত্যাদি। শ্রীম যাইতেই অমৃতবাবু অতি বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরে লইয়া আসিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। শ্রীম সেই আসনে কিছুক্ষণ উপবিষ্ট হইয়া মা জগদম্বার ধ্যান করিলেন। পূজার ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি রহিয়াছে। দেওয়ালে অন্যান্য দেবদেবীর পটও আছে।

শ্রীম (ধ্যানান্তে অমৃতের প্রতি)—এখন যাব, প্রসাদ কিছু পাঠিয়ে দিন।

অমৃতবাবু প্রসাদ বাঁধিয়া গাড়ীতে দিলেন। ভক্তরা সকলে সেখানে বসিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ পাইলেন।

॥ ২০ ॥

৬ই নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

আজ সকালে শ্রীম ছাদে বেড়াইতেছেন। নিকটে অপরাপর ভক্তেরা আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণ সন্দিপনী মুনির কাছে বেদ বেদাঙ্গ পড়েছিলেন। তোমাদের পড়া উচিত। সুদামা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। রামেশ্বর, জগন্নাথ, বদ্রিনারায়ণ ও দ্বারকা এই চার ধাম। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামের অধীশ্বর। বদ্রিকাতে নরনারায়ণ ঋষি ও বেদব্যাস তপস্যা করেছিলেন। তাঁর সখা সুদামা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তাঁর বাল্যসখা শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা, ধনী ও যশস্বী হয়েছেন শুনে কিছু ধনের প্রত্যাশায় তাই তাঁর কাছে গেলেন। তিনি অতি গরীব, সখার সহিত দেখা হলে উপহার কি আর দিবেন? শেষে কিছু খুদকণার নাড়ু বেঁধে নিয়ে চললেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাল্যসখা ও সহপাঠী সুদামা এসেছেন শুনে তাঁকে কত কাদর ও আপ্যায়িত করতে লাগলেন। সুদামা মনে মনে ভাবছেন, 'ইনি রাজা, কেমন করে আমার নিতান্ত তুচ্ছ উপহার তাঁকে দেব?' অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণও বুঝতে পেরে তাঁর নাড়ু গ্রহণ করে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। সুদামা কিছুদিন দ্বারকায় বাস করে বাড়ী ফিরিলেন। শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু সুদামাকে কোন ধন দিলেন না বা ধনের কথা উল্লেখও করলেন না। সুদামাও তাঁর ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ধনের কথা মনেই নেই। রাস্তায় এসে মনে পড়ল, কিজন্য এসেছিলেন। যাহোক অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে এই ভেবে রাস্তা চলতে লাগলেন। কিন্তু বাড়ী এসে দেখেন অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে তাঁর কুঁড়েঘর ছিল সেখানে কত দাসদাসী, অট্টালিকা শোভা পাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী এসে কত সমাদরে তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলেন। এইসব

বৃন্দাবনে সুদামার অভিনয় দেখায়। আমি দেখেছিলাম।

"হাঁ, তোমাদের আদিসমাজে নিয়ে গেছিলাম বেদপাঠ শোনাবার জন্য। বেদপাঠ শুনে আনন্দ পেলে তখন পড়তে ইচ্ছা হবে।"

সন্ধ্যার সময় শ্রীম ও কয়েকজন ভক্ত ৺জগদ্ধাত্রীর ভাসান দেখতে গিয়েছিলেন। এক্ষণে দুইতলার বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। কাছে অন্যান্য ভক্তেরাও বসিয়া আছেন।

সিদ্ধাই থাকলে তাঁকে লাভ করা যায় না

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)—এসব দর্শন করা ভাল। ঠাকুর সিংহবাহিনী দর্শন করেছিলেন। বলেছিলেন নমস্কারেতেও তাঁর পূজো হয়। কেউ অনেক ফুল ফল নিয়ে তাঁকে পূজা করে, কেউবা তাঁকে নমস্কার করে পূজা করে। মন নিয়ে কথা। তুমি যে রোগ ভাল করা ছেড়েছ এ খুব ভাল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'সখা! অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধাই থাকলেও তাঁকে লাভ করা যায় না।" কিছু সিদ্ধাই থাকলে অনেক টাকা আসতে পারে, সম্মান হতে পারে। লোকে প্রণাম করবে, ভাল সাধু বলবে, এসব সুবিধা হতে পারে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে না। লোকের বাড়ী বাড়ী পূজা করে বেড়ানো মানে সংসারই করা হল।

জনৈক ভক্ত—সেইজন্য আমি ছেড়েছি।

শিখিধ্বজ ও চূড়ালা

শ্রীম—আমি ছেড়েছি এ ঠিক নয়। তিনি ছাড়িয়েছেন। একদেশের রাজা (শিখিধ্বজ) ও রাণী (চূড়ালা) উভয়ের মধ্যে রাণীই খুব বিদুষী ছিলেন। রোজ রাণীর উপদেশ শুনে রাজার বৈরাগ্য হল এবং তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে বাস করতে লাগলেন। রাণী সর্ব্ব বিষয়ে খুব দক্ষা ছিলেন বলে, রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে গেলেও তিনি খুব সুশৃঙ্খলার সঙ্গে রাজ্য চালাতে লাগলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি রাজার কিরূপ অবস্থা জানবার জন্য যে বনে শিখিধ্বজ তপস্যা করতেন ছদ্মবেশে সেই বনে যেতেন। তিনি রাজাকে একদিন বললেন, 'রাজা তোমার জ্ঞানের এখনও দেরী আছে।' রাজা ভাবলেন, 'বোধ হয় কুটিয়াতে বাস করি বলে, পাত্রে ভোজন করি বলে, আমার ঠিক্ ঠিক্ ত্যাগ হচ্ছে না।' তিনি সেইজন্য কুটিয়া, ভোজনপাত্র, কমণ্ডলু এমন কি তাঁর নিজের শরীর পর্য্যন্ত যখন ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর

হলেন, তখন রাণী চূড়ালা বললেন, 'রাজা রাজ্যত্যাগকে ত্যাগ বলে না, ধন কুটিয়া কমণ্ডলু ত্যাগকেও ত্যাগ বলে না। অহঙ্কার ত্যাগই ত্যাগ। আমিত্ব ত্যাগই ত্যাগ ; যার এরূপ ত্যাগ হয়েছে, তারই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।'

"একজন নির্জ্জনে অনেক কঠোর তপস্যা করে যখন দেশে ফিরে এল তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি যে এতদিন তপস্যা করলে তাতে কি লাভ হল?' সেই তপস্বী বললেন, 'আমি ঐ হাতীটিকে এখুনি মারতে পারি এবং এখুনি বাঁচাতে পারি।' এই সিদ্ধাই দেখাবার জন্য একমুঠো ধুলো মন্ত্রপূত করে হাতীটির উপর যেই দিয়ে দেওয়া আর অমনি হাতীটি মরে গেল, আবার সেইরকম একমুঠো ধুলো নিয়ে তার উপর দিতেই হাতীটি বেঁচে উঠল। তখন সেই লোকটি তপস্বীকে বললেন, 'হাতী মরল কি বাঁচল তোমার তাতে কি হল?' তখন তার কথায় তপস্বীর চৈতন্য হল। দুর্লভ মনুষ্য জন্মে তাঁর দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে কথা হয়। ঠাকুর নিজের জীবনে এসব দেখিয়ে গেলেন।

মানুষ্যদেহে অবতার ছাড়া গতি নাই

"তিনি আসাতে কত সুবিধা হয়ে গেছে। কত বিঘ্ন থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। স্বামীজী ইউরোপে বললেন, 'অবতার পুরুষকে চিন্তা করতে হবে। এছাড়া আমাদের আব গত্যন্তর নেই।' যতক্ষণ এই মনুষ্য শরীরে অভিমান আছে, ততক্ষণ যতই লম্বা লম্বা কথা বল, ঈশ্বরকে মানুষরূপ ছাড়া আর কোন রূপেই চিন্তা করা যায় না। অবতারই ত মানুষরূপী ঈশ্বর।"*

ভক্ত—বিশ্বাস হয় না।

শ্রীম—অবতার পুরুষকে চিন্তা করতে করতে বিশ্বাস আসে। অন্যলোকে কি বলে কি করে দেখবার কি দরকার। তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা করলে দেহমন শুদ্ধ হয়ে যায়! তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হলেই হল। অন্য লোকের সম্বন্ধে, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি বুঝবেন। 'চাচা আপনা বাঁচা'। তিনি কি করে গেছেন তাই আগে বোঝা দরকার।

ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে শ্রীম গান ধরিলেন—

* As long as we are men, we must worship Him in man and as man. Talk as you may, try as you may, you can not think of God except as a man. (Bhakti Yogo).

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,"……ইত্যাদি।

রাত্রি হইয়াছে; ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৮ ॥

৮ই নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

সন্ধ্যার সময়ে দুইতলার বেঞ্চিতে শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীম ধ্যানান্তে গান গাহিতেছেন—"মা ত্বংহি তারা…" ইত্যাদি। আরো কয়েকটি গান গাহিলেন।

গানের পর ঘরে আসিয়া বসিলেন। আদিসমাজে যে গান হইত সেই গান সেই সুরে গাহিতেছেন। "প্রিয় আমার প্রভু আমার"……ইত্যাদি।

শ্রীম (কাশীপুরের অমূল্যের প্রতি)—আমার ঠিক সুর হচ্ছে না। সেই সুরে গান ত। ব্রাহ্মসমাজে আদিসমাজে বেশ বেদপাঠ হয়। আমরা কি সবদিন যেতে পারব? যতদিন ভগবান নিয়ে যান।

অমূল্য—'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।'

শ্রীম—"কে জানেরে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।"—তাঁকে যদি জানবে ত অনন্ত হলেন কেন? তাই আন্দাজে বলে।

যোগাবস্থা

কিন্তু যোগীরা তাঁকে যোগের দ্বারা জেনেছেন। এসব ওপারের কথা। তাঁকে জানলে 'আমি নাই' বোধ হবে। তাঁকে না জানা পর্য্যন্ত কূপমণ্ডুক। জালার মধ্যে পিঁপড়ের মত। কূপমণ্ডুক যেমন সাগরের খবর জানে না। জালার পিঁপড়ে যেমন পৃথিবীর বিরাটত্বের খবর বলতে পারে না; সেইরকম যতক্ষণ তাঁকে না জানা হয় ততক্ষণ নীচেকার জিনিষ দেখে;—গাড়ী, ঘোড়া, সহিস, গাছপালা, বাড়ীঘর ইত্যাদি; তাঁকে কি নিজের গজকাঠি দিয়ে মাপা যায়? বেশী যদি বুঝতে চাও তপস্যা কর। এক বৎসর না হয় আর এক বৎসর, তা না হলে অনেক জন্ম তপস্যা; মোটের ওপর তপস্যা করতে হবে যতদিন না সত্য লাভ হয়। 'অনেক জন্ম সংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্।' (গীতা ৬।৪৫)। কেনোপনিষদে বলেছে, 'যদ্বাচানভ্যুদিতং (১।৪),

যন্মনসানমনুতে (১।৫)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি (২।৪)—তিনি বাক্য মনের অতীত।

॥ ২২ ॥

৯ই নভেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

ভিক্ষাচর্য্য

সকালবেলা শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। নিকটে অনেকে আছেন। আজ গদাধরকে বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ পড়াইতেছেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—তোমাকে পড়াচ্ছি কি জন্য? গোড়া ধরিয়ে দিলে নিজে নিজে পড়তে পারবে। (গোপাল ও গদাধরের প্রতি) দেখ উপনিষদে আছে 'ভিক্ষাচর্য্যম্ চরন্তি' (বৃ-উ ৩।৫।৪।৪) তোমরা যে ভিক্ষা করে খাচ্ছ, এ খুব ভাল। ঋষিরাও সমস্ত ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতেন। সাধুদের দুরকম বৃত্তি আছে—ভিক্ষাবৃত্তি ও অজগরবৃত্তি। খুব উচ্চ অবস্থা হলে অজগর বৃত্তি আসে। যেমন—শুকদেব, ঋষভদেব; এদের বাহ্যজ্ঞান কিছুই নেই। যেখানে বসে আছেন ত আছেনই, চেষ্টা করে কিছুই করতে পারেন না। আর একরকম আছে যেখানে লোকেরা যাতায়াত করে, যেখানে লোকে দেখতে পায়, সেইখানে চোখ বুজে বসলাম, এ ভাল নয়। তার চাইতে দুবার বাড়ী থেকে দুটো ভিক্ষা করে খেয়ে ঈশ্বরচিন্তা কর।

গোপাল—লোকের বাড়ীতে ভিক্ষা করতে গেলে বলে, 'এত বড় গুণ্ডা শরীর ভিক্ষা চাইতে এসেছে।'

শ্রীম—কিছু উপদেশ দেবে। স্বামীজী একবার ভাগলপুরে; তিন দিন খাওয়া হয় নাই। একজন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে খাওয়ালে। খেয়ে আসবার সময় গীতা থেকে কিছু শ্লোক বললেন। স্বামীজী পরে বললেন, "সেইজন্য মঠ করলাম। ঘুরেটুরে কিছুদিন বিশ্রাম করবে।"

গদাধর—আপনি যে পাণ্ডিত্য ত্যাগ করতে বলেন।

শ্রীম—পণ্ডিতদের কাছে ঝাড়বে, যারা কিছু জানে না তাদের কাছে

ঝাড়বে না। বই ছাপা বড় হাঙ্গামা, তবে এতে নিজের মঙ্গল, তাঁর চিন্তা হয়। ভক্তদেরও মঙ্গল। তারাও এর মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা করতে পারবে।

নানাভাবে শুদ্ধি

কতরকম ভাবে শুদ্ধ হওয়া যায়। গঙ্গাস্নান করলে শুদ্ধ হয়। বেদপাঠ করলে, ভগবানের নাম করলে স্নান হয়। আমি তাই বিছানাতে ভগবানের ধ্যান করি ; তিনি সব জায়গায় ওতপ্রোতঃ ভাবে রয়েছেন। ধ্যানেতে শুদ্ধ হয়ে যায়। বিছানা রোদে দিলেও শুদ্ধ হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর শ্রীম ব্রাহ্মসমাজে গেলেন। আজ রবিবার ; রবিবারে সেখানে উপাসনা হয় এবং ঠাকুর কতবার সেখানে এসে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, তাই শ্রীম মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যান ও তাহাদের উপাসনা শুনেন। বলেন, 'কিছু ভাল না থাকলে ঠাকুর তাদের সঙ্গে মিশলেন কেন?'

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা শুনিয়া আসিয়া লালবাড়ীর দুইতলায় বেঞ্চিতে বসিলেন। সেখানে দু-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন।

শ্রীম (গোপালের প্রতি)—তুমি যে গলায় গৌরীশঙ্কর ঝুলিয়ে রেখেছ খুব ভাল। ভাল যারা ভগবানকে রাত্রদিন চিন্তা করে তারা রাখতে পারে। গৃহীরা নয়। ব্রহ্মচারী সাধকেরা পারেন কারণ তারা ভগবানকে অহর্নিশি চিন্তা করেন। যখন তোমার মনে হবে রোগ ভাল করব অমনি খুলে রেখে দেবে। বেশ হয়েছে, সমস্ত বিঘ্ন থেকে ঠাকুর রক্ষা করবেন।

এইবার ঘরে গিয়া বসিলেন।

পরচর্চ্চা

কাশীপুরের অমূল্য—ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের ভাব নিয়ে কেশববাবু হরিনাম কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করলেও ঠিক ঠিক তারা বুঝতে পারে না।

শ্রীম—থাক থাক মশায়, ও কথায় কাজ কি? 'চাচা আপনা বাঁচা।' যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি বুঝবেন। 'মার চেয়ে ব্যথিনী তারে বলে ডাইনী।' নিজের যাতে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয় তার চেষ্টা কর। অপরের কথায় কাজ কি? তাঁকে দর্শনের second dayতে (দ্বিতীয় দিনে) ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকদের ঐ এক হুজুগ লেক্‌চার দেওয়া আর অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া, আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে। তবে তাঁর দর্শন, আদেশ হলে সে এক কথা। যেমন স্বামীজীর মত লোক

তাঁরা পারেন। তাঁরা উপদেশ দিতে পারেন। তাঁর দর্শনই হয় না আবার তার আদেশ। দর্শন এক জন্মে হয় না অনেক জন্ম লাগে। 'অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।' (গীতা ৬।৪৫)। ঠাকুর বলতেন, 'বাবুরা পান চিবুতে চিবুতে মহানন্দে নৌকা কবে যাচ্ছেন। কি জন্য, না যোয়াল কাঁধে নেবার জন্য। কি মহামায়া। সব ভুলিয়ে রেখেছেন। শ্রীশবাবু বেশ লিখেছেন, একজন ভাবত উদ্ধারের জন্য তপস্যা করছিল, মা প্রসন্না হয়ে বললেন, "তুমি কি বর চাও।" ভক্ত বললেন, "ভারত উদ্ধার।" মা বললেন, "তা বেশ চারশ বছবের পর হবে।" তখন সে বললে, "সে কি মা আমি ত তার মধ্যে থাকব না!" মা তখন বললেন, "তোমার সঙ্গে এরকম কোন condition (নিয়ম) ত ছিল না। তুমি চাচ্ছ ভারত উদ্ধার—তা হবে।" যিশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন, "প্রতিবেশীব চক্ষে একটা খড়কুটো দেখতে পাচ্ছ অথচ তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাঠ পড়ে রয়েছে তা দেখতে পাচ্ছ না।* (গদাধরের প্রতি) কি বল? তুমি ইংরাজি শেখ; তা নাইবা শিখলে ঠাকুর, ও লাটুমহারাজ ইংরাজি জানতেন না, তবু তাদের কতলোক পূজা করছে। ক্রাইষ্ট বারো বৎসর বয়সের সময়ে পিতামাতার সঙ্গে জারুজালেমে উৎসবে গিয়েছিলেন।

ক্রাইষ্ট ও চৈতন্যদেব

পণ্ডিতেরা যেখানে শাস্ত্রীয় বিচার করছে সেইখানে গিয়ে গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে তাব উত্তর দিচ্ছেন। পণ্ডিতেরা বালকের অদ্ভুত শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বললেন, "আমরা ত এমন কথা কথা কখনও শুনি নাই।" তবে বেদ পড়লে আনন্দ হয়। ভিতরবাড়ী বাহিরবাড়ী আছে। বাহিরবাড়ী দিয়েও ভিতরে ঢোকা যায়, কেউ আবাব খিড়কী দিয়ে ঢোকে। যাকে তিনি খুলে দেন, তারাও ঢুকতে পারে। চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে তীর্থ-ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন সেই সময় কাশীতে প্রকাশানন্দ স্বামী মস্ত বড় বেদান্তের পণ্ডিত। চৈতন্যদেব কাশীতে যেখানে তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা করছেন সেইখানে একটি কোণে বসে শুনছেন। তারপর তাঁর পায়ে ধরে কান্না।

* And why beholdest thou the mote that is in thy brother eye, but perceivest not the beam that is in their own eye.

কি নিরভিমান। এই নিরভিমানতা তাঁর বাল্যকালেও ছিল। যখন নিমাই ন্যায় অধ্যয়ন করছিলেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার সহপাঠী। তিনি একখানা ন্যায়ের বই লিখছিলেন। রঘুনাথ তাঁর সেই বইখানা দেখে বললেন, "তোমার এ বই দেখলে আমার বই কেউ পড়বে না।" তখন নিমাই তাঁহার পুস্তকখানি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করলেন। কোন আসক্তি নেই। নবদ্বীপে যখন ছিলেন, তখন তিনি এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। পুরীতে সার্ব্বভৌমকে বলেছিলেন, "আপনার শঙ্কর ভাষ্যের ব্যাখ্যা বুঝতে পারছি না।" সার্ব্বভৌম তাঁর মুখে চিনি দিতে চিনি উড়ে গেল। সার্ব্বভৌম দেখে অবাক। "রসবর্জ্জং (গীতা ২।৫৯)। এই বয়সে সমস্ত ইন্দ্রিয় বশ। সব দরজা পাব হয়ে গেছেন। আমাদেব বাইবে শত্রু ও ভিতরে শত্রু, যেমন বাইরে রোগ শোক, ভিতবে কাম ক্রোধ। "ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে।"

ঠাকুরের সমাধি দেখে একজন দয়ানন্দ সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার এই রকম সমাধি হয়?" দয়ানন্দ সরস্বতী বললেন, "নেঁহি হামবা পাণ্ডিত্যাভিমান হৈ।" (গদাধরের প্রতি) স্তব বল।

গদাধর তন্ত্র ও উপনিষদ্ হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আবৃত্তির পর রাত্রি হওয়ায় ভক্তেরা প্রণাম কবিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৩ ॥

১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম সকাল বেলায় চারতলার ঘরে ধ্যানান্তে একজন ভক্তের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

যোগীর অনুভব ও লক্ষণ

শ্রীম—জগতে সর্ব্বদা উৎসব চলেছে। যাঁরা ভগবানকে অন্তরে বাহিরে দেখেন, তাঁদের অন্তরে বাহিরে সদাই উৎসব। আমরা এত বড় জগতে মহানন্দে বেড়াচ্ছি। ঋষিরা ওপারের খবর দিয়ে গেছেন। তাঁরা বলে গেছেন, 'অক্ষয় পুরুষই সূর্য্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক ধরে বর্ত্তমান'। তাঁরা সর্ব্ব বস্তুতে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে প্রত্যক্ষ করতেন। দেখনি, ছাদে ও ঘরে সেইজন্য

নজর। 'দাদার ও ফলার' মানুষেরও সেই অবস্থা।

"চোখ বুজলেই কি যোগী হয়ে গেল? একবার কাশীতে দেখলাম, একজন এক পায় দাঁড়িয়ে আছে। ভেতর শুদ্ধ না হলে, নাক টিপলে কি হবে? তাই ঠাকুর বলতেন, 'এসব কিছু করতে হবে না। ভগবানের জন্য জন্য ব্যাকুলতায় সব হয়ে যাবে'।"

এই সময় তিনজন স্কুলের ছাত্র আসাতে তাহাদের প্রতি বলিতেছেন, "তোমরা অদ্বৈত আশ্রমে গিয়ে সাধুদের দর্শন করে এস। সেখানে সাধুরা থাকেন, তোমরা দেখ নি? যাও এই তালমিছ্রি নিয়ে যাও, তালমিছ্রি দিয়ে খুব ভক্তি করে প্রণাম কররে। সাধুদর্শন কি কম ভাগ্যে ঘটে! এখান থেকে সাধুভক্তি শেখ।"

নলিনবাবু তাহাদের লইয়া গেলেন।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)—সাধুদর্শন করতে যায় কেন?

সাধুরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে থাকেন। সর্ব্বদা তাতে যোগ। লোকে বলে সাধুদর্শন করতে গেলাম, আমার সঙ্গে কথা বললেন না। নাইবা কথা বললেন। দর্শন, প্রণাম করলেই হয়ে গেল।

ভক্ত—তাতেই হৃদয়ে ছবি হয়ে রইল।

শ্রীম—হাঁ, ঠাকুর সেইজন্য বলতেন, "এখানে এলে গেলেই হবে। এ অবস্থা দেখেই চৈতন্য হয়ে যাবে।" সাধুসঙ্গ না হলে উপায় আছে?—

এইবার ছাদ হইতে ঘরে আ, য়া প্রুফ দেখিতেছেন।

ভক্ত—আমার উপনিষদ পড়বার ইচ্ছা হয়।

শ্রীম—পড়ে তুমি লোককে বলতে পার, তাহলে পড়াতে পারি। তা না হলে পড়বার কি প্রয়োজন! সামনে ঠাকুরের ছবি রেখে সমাধিস্থ হয়ে গেলেই হল?

"যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" (গীতা—৬।৩)

বৈকালে শ্রীম ছাদে বসিয়া দুইজন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।

দাস্যভাব নিয়ে থাক

মন্মথ—ক্ষুদিরাম আপনার কথা প্রায়ই বলেন। বলেন, 'তাঁর মতন ঈশ্বরে মন প্রাণ অর্পণ করে থাকা সংসারে অতি অল্প লোককে দেখা যায়। তিনি যেমন ঠাকুরের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েছেন তেমনি তাঁকেও ভালবাসছেন'।

শ্রীম—তা বই কি! সামনে শ্রুতিমধুর করে বলেন নি বলে কি আর ভালবাসতেন না? ঠাকুর গাড়ী করে শশধরের বাড়ীতে গেলেন।* গাড়ীতে বসবার জায়গাও ছিল, ভক্তরা হেঁটে গেলেন কারুকে বললেন না, গাড়ীতে এসো, তার মানে দাস্যভাব নিয়ে থাক। কেশব সেনকে বললেন, "শুকদেব নারদ এঁরা বললে একটু বিশ্বাস হত।" এতে তাঁর Ideal (আদর্শ) বুঝিয়ে দিলেন।

মন্মথ—আজ একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, মাস্টার মশায় কত কঠোর তপস্যার পর কথামৃত প্রকাশ করেছেন। কথামৃত লেখবার সময় হবিষ্যান্ন ভোজন ও তাঁকে চিন্তা করে লিখেছেন। আমাদের দেশে আপনাকে যেতে হবে। গাড়ী করে নিয়ে যাব।

শ্রীম—বৃদ্ধ বয়সে কোথাও নড়তে চড়তে ভয় করে। ছেলেবেলা থেকেই Nervous (ভীতু)।

এইবার তাহাদের সঙ্গে আর্য্যসমাজে চলিলেন এবং যাওয়ার পথে ঠনঠনে ৺কালীবাড়ীতে বসিয়া খানিকক্ষণ জপ করিলেন।

জপান্তে (মন্মথবাবুর প্রতি), "ঠাকুর এখানে বসে মাকে গান শোনাতেন। তাঁর অশেষ কৃপা যে আমরা এ সব স্থান দর্শন করতে পাচ্ছি।"

মন্মথবাবু নিজের স্বপ্নের কথা তাঁহাকে বলিবেন। তাই অপর ভক্তটিকে একটু সরিয়া যাইতে বলিলেন। তারপর আর্য্যসমাজে কিছুক্ষণ বসিয়া আবার স্কুলবাড়ীতে ফিরিলেন এবং দোতলায় বেঞ্চিতে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন। গোপাল পদব্রজে ৺তারকেশ্বর দর্শন করিয়া আসিয়াছেন তাই তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

পদব্রজে তীর্থ

শ্রীম (গোপালের প্রতি)—আহা! এঁরা হেঁটে তীর্থদর্শন করে এলেন। চৈতন্যদেব হেঁটে তীর্থদর্শন করেছিলেন। পদব্রজে একলা তীর্থদর্শন করতে হয়। বাইরে নিঃসম্বল থাকলে ভগবানের হাত দেখতে পাওয়া যায়—যোগী হয়ে যায়। সংস্কার না থাকলে পাবে না। ভগবানের জন্য যারা ভিক্ষা করে থাকতে পারে তারা তো স্বাধীন। যাদের বিষয়-কর্ম্ম নেই খালি ভগবান-

* কথামৃত ১ম ভাগ ১১ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।

চিন্তা নিয়ে থাকে তাদের দেখে ঠাকুরের প্রাণ শীতল হত।

আমাদের চৈতন্যের জন্য, ঠাকুর এঁদের পাঠিয়েছেন।

বড় জিতেন—ত্যাগ হয় কই ?

নানাবস্থায় নানা গান

শ্রীম—ত্যাগ আছে বইকি। কা-তে আকার দিলে কা-ই থাকে। গেলুম গেলুম ভাব ত আছেই। ঠাকুর স্বামীজীকে বললেন, "আনন্দের গান গা।"

"সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ" স্বামীজীর এই গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। রামপ্রসাদ নানা অবস্থায় নানা ভাবে গান গেয়েছেন,—

"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত॥
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত।
মা শব্দ মমতা যুত, কান্দলে কোলে করে সুত॥
দেখি ব্রহ্মাণ্ডের এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত।
এবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, দেখি তোর পদ জন্মের মত॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো॥
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥

গান—"মা ! আমি কি আটাশে ছেলে ?
আমি ভয় করি না চোখ রাঙ্গালে।" ইত্যাদি।

আবার মাকে যখন দর্শন হল তখন অন্যভাবের গান—
"এবার আমি ভাল ভেবেছি
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥" ইত্যাদি।

"তাঁর দর্শন হলে গেলুম গেলুম ভাব থাকে না। তখন সব বস্তুতেই আনন্দ। সব বস্তুই ঈশ্বরের উদ্দীপনা এনে দেয়। যা দেখে তাতেই ভগবানের স্মৃতি। তাই তাঁকে ধরে থাকতে হয়। গুরু করতে হয় তো অবতারকেই করতে হয়। ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, 'I have overcome the world. Hold me.' ঠাকুরই সংসার জয় করেছেন তাঁকে ধরে থাক।"

রাত্রি নয়টা, ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৫ ॥

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম—সকালে চারতলার ঘরে চৌকির উপর বসিয়া কথামৃত চতুর্থ ভাগ পঞ্চবিংশ খণ্ড প্রুফ দেখিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে শবরী ও অহল্যা সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—গোপালকে এইসব গল্প বল।

গদাধর—শবরী কে?

শ্রীম—অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে এক ব্যাধের মেয়ের নাম শবরী। সাধু সেবা করতে করতে তাঁর চৈতন্য হয়। একবার সাধুরা যাবার সময় প্রসন্ন হয়ে তাকে বলে যান, তুমি এইখানে থেকে 'রাম রাম' জপ কর। রামচন্দ্র যখন এই রাস্তা দিয়ে যাবেন সেই সময় তোমার দর্শন হবে'। সেই অবধি সেই গভীর অবণ্যে একটি কুটিরে বসে তাঁরই চিন্তা নিয়ে কাল কাটাতে থাকেন। কেউ কোথাও নেই নিঃশব্দ গভীর রাত্রিতে উঠে তিনি রাম নাম জপ করতেন। (এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীম-র শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল)

"এই পথে রামচন্দ্র আসবেন জেনে বনের যা ভাল ভাল ফলফুল তুলে রাখতেন। রামচন্দ্র অন্তর্য্যামী সব জানতেন; সেই রাস্তায় যাবার সময় তাঁর কুটিয়াতে গিয়ে শবরীর দেওয়া ফল আহার করলেন এবং তাঁকে নবধা ভক্তির উপদেশ করলেন। এইসব কথার পর শবরী বললেন, 'প্রভো, এইবার একটু আমার সামনে দাঁড়ান। আপনাকে দেখতে দেখতে শরীর ত্যাগ করব'। এই বলে তিনি রামচন্দ্রের সামনেই চিতায় শরীর ত্যাগ করলেন।"

"পড়লে কি হবে শুনলে ধারণা বেশী হয়।

(গদাধরের প্রতি) কাশীরাম মহারাজকে বল, আমাকে তুলসীদাস রামায়ণ থেকে শবরী উপাখ্যান শুনাতে।"

গদাধর—আজ্ঞা, বলবো।

শ্রীম (গোপালের প্রতি)—তোমার অযোধ্যা দর্শন হয় নি। সেখানে যাবে। পূজা, পাঠ, তীর্থ, দর্শন, সাধুদর্শন এইসব করতে হয়। জোয়ান বয়সে করতে হয়। আমি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম। অনেক সাধুর মধ্যে

একজনের পরমহংস অবস্থা দেখেছিলাম, কোন কথা বলেন না। কেবল ফিক ফিক করে হাসছেন। আর দেখবে, (যে সাধু খুব গম্ভীর এবং বেশী কথা বলেন না, বুঝবে যে সে সাধুর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। (অর্থাৎ জ্ঞান হয়ে গেছে))।

এই সময় বড জিতেনবাবু কিছু মিষ্টি ও তালমিছরী আনিয়াছেন দেখিয়া শ্রীম বলিতেছেন, "ধন্য, ধন্য, ভগবানের সেবাতে লাগবে।"

জিতেন—আপনি খাবেন।

শ্রীম—আমি খাব বইকি। সাধুসেবার জন্য রাখলাম। আজকে রবিবার এই অদ্বৈত আশ্রমের সাধুরা হয়ত অনেকে মঠে গিয়েছেন কাল তাঁদের দেওয়া হবে।

নিষ্কলঙ্ক শ্রীরামকৃষ্ণ

"আমাদের একজন ব্রাহ্ম বন্ধু বলেছিলেন, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে কিন্তু রামকৃষ্ণ-চন্দ্রে কলঙ্ক নেই। এই কথা শুনে আমি তাঁকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলুম। ঠাকুরের কাছে কত জিনিষপত্র আসতো সেদিকে নজর নেই। ঠাকুরের বিছানাপত্র ময়লা দেখে মাডোয়ারীবাবু তাঁর নামে টাকা দিতে চাইলে বললেন, 'এই টাকার স্থদে চলবে।' শুনেই মূর্চ্ছিত। তারপর মথুর বাবুর ছেলে দ্বারিকাবাবু বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

"যেমন সীতা দেবী : মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা সমস্তই রামেতে, সেই রকম ঠাকুরের মন তাঁতেই মগ্ন হয়ে থাকতো, বাহিরের দিকে হুঁশ থাকতো না। এক একবার লোকের মঙ্গলের জন্য কথা বলতেন। তাঁকে বুঝতে গেলে নির্জ্জনে তপস্যার প্রয়োজন। যারা মঠে দক্ষিণেশ্বরে যায় না, তাদের বুঝতে হবে সংস্কার নেই। ঠাকুব বলতেন, "অর্জ্জুনের আগেকার সংস্কার ছিল তাই শ্রীকৃষ্ণেব সঙ্গ পেয়েছিলেন। সংস্কার না থাকলে অবতার পুরুষের সঙ্গ ভাল লাগবে না।

জিবেনবাবুর ছেলেমেয়েদের আর একটি কৌটা হইতে মিছরি দিতেছেন। বলিতেছেন, "মিছরি খেজুর ধুয়ে তবে ভগবানকে নিবেদন করতে হয়। ধুয়ে খেতে হয়। কারণ তাতে অনেক ময়লা থাকে এবং সেগুলো খেলে অসুখ করে।" তারপর তাদের শবরীর গল্প বলিলেন। আরো বলিতেছেন, তোমরা স্থর করে রাম নাম ক'রো।"

পরে সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকাল প্রায় চারটা হইবে। গদাধর আশ্রম হইতে ললিত মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গে তিনজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম পণ্ডিত অতুলবাবু। শ্রীম স্কুলবাড়ীর দোতলা হইতে আসিয়া চারতলার টিনের বারাণ্ডায় বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অতুলবাবুর সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

আবৃত্তি ও নিবৃত্তি

শ্রীম (অতুলের প্রতি)—আপনার টানের বস্তু চলে গিয়েছে। তবে আর একটি বিবাহ করলেই হল।

ললিত মঃ—শ্রীধর স্বামীর মত করলেই হয়। তিনি সদ্যোজাত পুত্রটিকে রেখে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে চলে যান, বাড়ীর পাশের লোকেরা ছোট ছেলেটির কান্না শুনে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করে।

শ্রীম—তা কেন? রোজ গদাধর আশ্রমে সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ করতে যান ত?

অতুল—বেলা ছোট। সকাল সকাল খেয়ে অফিসে যেতে হয়। আশ্রমে সব দিন যাওয়া হয়ে ওঠে না।

শ্রীম—ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতিকে বলতেন, "ভাল জ্বালায় পড়লাম, কাজকর্ম্ম নেই, তবু সময় হয় না। (ভক্তদের দেখাইয়া) এরা আসে কি করে?" (ললিত মহারাজের প্রতি) আপনি আছেন টেনেটুনে নেবেন।

ললিত মঃ—আমি এঁদের প্রসাদ পেতে বলি, আজ জোর করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

শ্রীম—অমৃত সাগরের এক ফোঁটা খেলেই অমর হয়। কেউ জোর করে অথবা যে কোন প্রকারে হোক খাইয়ে দিলেই হল।

ললিত মঃ—আপনি আবার চলুন না, আশ্রমে থাকবেন। হোমের স্থান নূতন করে করা হয়েছে। শীতকালে সেখানে ভাল থাকবেন।

শ্রীম—সেবারে আশ্রমে বেশ ছিলাম। কাজকর্ম্ম ছিল না। আপনি জীবের আবৃত্তির নিবৃত্তির শ্লোক বলুন ত!

ললিত মঃ—যারা পুণ্যকর্ম্ম করে যেমন যাগ-যজ্ঞ, দান, বাপী, কূপখনন প্রভৃতি, তারা মৃত্যুপর পিতৃযান পথে যায়। তাদের সূক্ষ্ম শরীর প্রথম অতি বাহ্যিক দেবতা ধূমকে আশ্রয় করে, ধূম থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষ, পক্ষ থেকে দক্ষিণায়ণ, দক্ষিণায়ণ থেকে সংবৎসর, সংবৎসর থেকে পিতৃলোক,

পিতৃলোক থেকে আকাশ, আকাশ থেকে চন্দ্রলোকে যায়। সেই চন্দ্রলোকে যতদিন তাদের পুণ্যফল থাকে ততদিন ভোগ করে। পুণ্যফল ক্ষয় হলে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। আসবার সময় আকাশকে আশ্রয় করে, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে ধূম, ধূম থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টিকে আশ্রয় করে। সেই বৃষ্টি থেকে ধান, ব্রীহি রূপে জন্মায়; সেখান থেকে পুরুষ-শরীরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে মায়ের গর্ভে গিয়ে ফের নূতন শরীর ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হয়।

তাঁরা বনে জঙ্গলে গিয়ে শ্রদ্ধার সহিত তপস্যাদি করেন তাঁদের মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর চিতার শিখা অর্চিকে আশ্রয় করে, অর্চি থেকে দিন, দিন থেকে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ থেকে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ থেকে সংবৎসর, সংবৎসর থেকে চন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক থেকে বিদ্যুৎ, সেখান থেকে এক অমানব পুরুষ এসে উপাসককে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। একে বলে দেবযান। এখান থেকে দুই একজন ছাড়া সকলের ক্রমমুক্তি হয়, আর ফেরে না।

শ্রীম—শাস্ত্র পড়ে একরকম ধারণা হয়; ধ্যান ভজন করে সে-গুলোই আর একরকম ভাবে জানা যায়। যখন তিনি দেখিয়ে দেন তখন আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

ঠাকুর বলতেন, "এগিয়ে যাও, যত এগিয়ে যাবে ততই দেখতে পাবে রূপোর খনি, সোনার খনি, হীরা মাণিক এই সব"। আরো বলতেন, "আমার সঙ্গে কথা কয়েছে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতাম, 'শাস্ত্রে কি আছে জানিয়ে দে' বলে। তিনি একে একে জানিয়ে দিয়েছেন। যিনি বাক্য-মনের অগোচর অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই রূপধারণ করে কথা কয়েছেন। সমাধির পর যখন নামি বেদ-বেদান্ত সব খড়কুটো বলে বোধ হয়।"

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্ত আসিতেছেন, শ্রীম হাতজোড় করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন। ললিত মহারাজ স্তবপাঠ করিতেছেন।

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পায় ধৃত বিগ্রহং বৈ। ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ'।

জগদ্ধাত্রীর স্তব

আধার ভূতে চা ধেয়ে ধৃতি রূপে ধুরন্ধরেঃ
ধ্রুবে ধ্রুব পদে নিত্যে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তি বিগ্রহে
শক্তাচার প্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে
জয় সর্ব্ব গতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥ ইত্যাদি

স্তব-পাঠান্তে জনৈক ভক্ত গান গাহিতেছেন।
"শ্যামা মা কি আমার কালোরে,
কালোরূপে দিগম্বরী হৃৎপদ্ম করে আলোরে ॥ ইত্যাদি।

তাঁহার গানের পর শ্রীম গান গাহিতেছেন, "মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।" ইত্যাদি। এই গান শেষ হইলে ললিত মহারাজ বলিতেছেন, "যশোদা নাচত গো মা বলে নীলমণি" এই গানটা গান।

শ্রীম— যশোদা নাচত গো মা বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালে কোথা করাল বদনী ॥
(একবার নাচগো শ্যামা) (অসি ফেলে বাঁশী লয়ে)
(মুক্তমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক্)
(তেমনি তেমনি করে নাচগো শ্যামা) (যে রূপে ব্রজমাঝে নেচেছিলি)
{ (একবার বাজাগো মা তোর মোহন বেণু)
(যে বেণুর রবে গোপীর মন ভুলিত) } ইত্যাদি

শ্রীম—শ্রীযুক্ত কেশব সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীন সেনের কলুটোলার বাড়ীতে ঠাকুর এই গান আধ ঘণ্টা ধরে গেয়ে নেচেছিলেন। এই গান বৈষ্ণবদের ব্রহ্মাস্ত্র, এই গানে দেখানো হয়েছে, যিনি কৃষ্ণ যিনি গৌরাঙ্গ তিনিই কালী এক, অভেদ।

"আমরা কেশব সেনের বক্তৃতা শোনবার জন্য আধ ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকতাম। যাই ঠাকুরের দর্শন হল সব উল্টে গেল। আমরা তাঁকে দেখে অবাক। ভাবলাম এই গরীব ব্রাহ্মণ, কাপড়ের ঠিক নেই, এসব তত্ত্ব কি করে জানলেন।

"ব্রাহ্মদের দেখতাম আকাশের দিকে চেয়ে ভগবানকে উপাসনা করেন। ভাবতাম হয়ত বা আকাশের দিকে চাইলে ভগবানকে দেখা যায়। ওমা! ঠাকুরের কাছে গিয়ে দেখি মায়ের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছেন আর

"ঠাকুর বলেছেন, 'একদিন মায়া দেখালে। যাকে তিনি কৃপা করেন তাকে একটু দেখিয়ে দেন। তা না হলে লেকচার, মান, যশ দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন।'

"ঠাকুর আবার বলছেন, 'যারা অন্তরঙ্গ তাদের মুক্তি হবে না।' তার মানে সমাধি হবে না। কর্ম্ম নিয়ে থাকবে।

গদাধর—সমাধি হয়; তবে সমাধি থেকে ফিরে আসেন। তাঁদের সমাধি কেউ দেখতে পায় না। তাঁদের সমাধি হয় কিনা বলুন না?

শ্রীম (হাসিতে হাসিতে)—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁদের সমাধি অপরকে দেখতে দেবে কেন।

বেলা সাড়ে আটটা, ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে

শ্রীম (দুইজন ভক্তের প্রতি)—তোমরা দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছ, যাও এইবার আদি ব্রাহ্মসমাজে, সেখানে ঠাকুর গিয়েছিলেন। বেদপাঠ শুনবে। বুধবার বুধবার সেখানে উপাসনা হয়। তাহারা ফিরিলে শ্রীম আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কথা পাড়িলেন।

শ্রীম—আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যটি বেশ। বালক স্বভাব। সেখানে তিরিশ বছর ধরে উপাসনা হচ্ছে।

"বেদপাঠ হয়। ঋষিদের বাক্যই মন্ত্র। সঙ্গীতও হয়। বেদ, সঙ্গীত ও প্রার্থনা এ না শুনলে আর কি শুনবে? কেউ ইংরাজি জানা লোক হাত নেড়ে নেড়ে লেকচার দিক তখনই শুনতে যাবে। লোকে লেকচার ভালবাসে, বলে, বেদপাঠ ও আর কি শুনবে। সেইজন্য লোকে ওখানে বেশী ঘেঁষে না।

"আচার্য্য বেশ বলেন। যেমন গামছা কাচলে কি আর পুরোন হয়। তেমনি বেদ নিত্য নূতন। ঋষিদের কথা কাটবার যো নেই। আচার্য্য এই গানটি গান—

> "প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে।
> চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে॥
> তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার বন্ধন ডোর।
> দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে॥

আমার সকল গতির মাঝে পরমগতি হে।
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম জ্যোতি হে॥
ওগো সবার ওগো আমার বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার।
অন্তবিহীন লালা তোমার, নূতন নূতন হে॥

"কথা এই সচ্চিদানন্দে প্রেম। সেইজন্য সাধন ভজন। এই লীলা নিয়ে থাকা। একজন ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, 'এত লীলা?' ঠাকুর বললেন, 'লীলাও সত্য।' তার ইচ্ছা যে এই নিয়ে থাকুক। 'আমি' 'তুমি' যতক্ষণ আছে ততক্ষণ লীলা ছাড়বার উপায় নেই। আমি তুলে নিলে, সমাধি হলে কি হয় মুখে বলা যায় না। অবতার যখন আসেন তাদের সমাধি হয় এবং দেখা যায় নির্ব্বিকল্প সমাধির পরও তারা ফেরেন।

কর্ম্মের ভয়ে বৈরাগ্য

"বৈরাগ্য হবার জন্য বেশী খাটিয়ে নেন। যে খাটে সে বুঝতে পারে না। বলে যে, বড় অশান্তি। একদিন একটি ছেলে এসে বলে যে বাড়ী ছেড়ে পালাব। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? বেশী খাটুনি পড়েছে? তার ভাল হবে। ভগবান খাটিয়ে নেন বৈরাগ্যের জন্য।"

একজন ভক্ত—আপনি বলেন যে কর্ম্মের ভয়ে বৈরাগ্য সে বৈরাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

শ্রীম—মন্দ বৈরাগ্য থেকে ভাল হতে পারে। যদি তার সাধুসঙ্গ জুটে যায়, তাহলে তীব্র বৈরাগ্য আসতে পারে, যেমন ধ্রুব কাঁচ কুড়ুতে এসে রত্ন পেলে। আজ পড়া হচ্ছিল বৈরাগ্য মানে কি?—বিষয়ে বিরাগ ভগবানে অনুরাগ। যার বিষয়-সম্পত্তি নেই, দরিদ্র, তার কি বৈরাগ্য হয় না? হয়, ভগবানে অনুরাগরূপ বৈরাগ্য।

"তবে অপরের দেখাদেখি অনুকরণ করতে যাওয়া খারাপ। এক চাষা ক্ষেতে লাঙ্গল দেবার জন্য দুটো বলদ জুড়ত। তার একটা কিছুতেই বাগ মানে না। খানিকটা গিয়ে শুয়ে পড়ে। পা ছোঁড়ে। কর্ত্তা অগত্যা তাকে বেঁধে রেখে একটা লাঙ্গলে জোড়ে। আগের বলদটা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রাত্রে ঘোড়ার সঙ্গে কথা কইছে, 'আমিও কাল থেকে ওর মতন করব, তাহলে আর আমায় জুড়বে না।' ঘোড়া বললে, 'ভাই ও রকম করতে

যেও না। তাহলে কসাইএর হাতে দেবে।' "

রাত্রি প্রায় নয়টা ভক্তরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ২৮ ॥

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—বেলুড় মঠ।

বৃদ্ধ সাধুদের সঙ্গে

বৈকালে চারিটার সময় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর উৎসব দর্শন করিবার জন্য শ্রীম ডাক্তারের গাড়ীতে বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত। শ্রীম ঠাকুরের ও মায়ের মন্দিরাদি, একে একে তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন, পরিক্রমা, প্রণাম, চরণামৃত গ্রহণ করিয়া তুলসী মহারাজের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কিছুদিন হইল তুলসী মহাবাজ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া মঠে বাস কবিতেছেন। মঠের নীচের তলায় বারাণ্ডায় কথা হইতেছে।

শ্রীম—তোমার শরীর বেশ আছে দেখছি। অনেকদিন হল তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। এই উৎসব উপলক্ষে দেখা হয়ে গেল।

তুলসী মঃ—ঠাকুরের ইচ্ছায় আপনাকে এখানে বসে বসেই পেয়ে গেলুম। আপনার কাছে যাব বলে ভাবছিলাম। আপনার শরীর জীবন্ত মন্দির। আমি যে দেশে থাকি তারা দেব-দেবীও মানে, আবার সাধুদের জীবন্ত বিগ্রহ বলে পূজা করে।

শ্রীম—তোমাদের চিন্তা করলে মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। আমরা যা বলি তা সাধুদের কথাই বলি।

এইবার মঠের দোতলায় স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করিয়া গঙ্গারধারের পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হরিপ্রসন্ন মহারাজের সহিত দেখা করিতে গেলেন। পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ) বসিয়াছিলেন। শ্রীমকে দেখিয়া বলিতেছেন, এই যে মাষ্টার মশায়। আসুন, আসুন। এই বেতের চেয়ারে বসুন।

শ্রীম (চেয়ারে বসিয়া)—ঠাকুরের শরীর যাবার শেষ পর্য্যন্ত ছিলে?

হরিপ্রসন্ন মঃ—ঠাকুরের শরীর রাখার কিছুদিন পূর্ব্বে চলে গিয়েছিলাম।

শ্রীম—শেষের কষ্ট-অবস্থা দেখ নি, ভাল অবস্থা দেখে গিয়েছ।

হরিপ্রসন্ন মঃ—স্বামীজী যখন এই মঠের পোস্তা বাঁধান, সেই সময় ছিলাম। আমার উপর ভার ছিল। পোস্তা বাঁধানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন আমি বললাম যে এইবার আমি যাব। স্বামীজী কিছুতেই ছাড়বেন না। একদিন লুকিয়ে নৌকা করে পালিয়ে গেলাম। স্বামীজী কোথায় গিয়েছিলেন এসে শুনে বললেন, "ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।" তার তিন দিন পরে স্বামীজীর শরীর গেল। অমৃতবাজার পত্রিকায় পড়ে লোকে রাস্তায় বলাবলি করছে শুনলাম।

শ্রীম—আহা! আহা!

অনেক ভক্তগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীম বলিতেছেন —"এই দেখুন, আপনাকে এত লোক দর্শন করছে।"

হরিপ্রসন্ন মঃ—এঁরা সব আপনাকে ভালবাসেন তাই দাঁড়িয়ে আছেন। কথামৃত যে পড়ে, সেই বলে এতে কি এক মোহিনী শক্তি আছে। শাস্ত্রের মধ্যে যত সব জটিল সমস্যা, এতে তার সমাধান করা আছে। তিনি যেন একেবারে নিজে হাতে কলম ধরে করিয়ে নিয়েছেন, নির্ভুল ভাবে। কথামৃত পড়ে অনেকে সাধু হতে আসে। কথামৃত ঠাকুর একজনকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছেন। আর যদি কেউ বলে আমি ঐ রকম লিখব তা অমনটি আর হবে না। আমরা এলাহাবাদে তাঁরই কথামৃত পাঠ কবি।

শ্রীম—আমরা কথামৃতে তাঁর ফটো তোলবার চেষ্টা করেছি। ছেলেবেলা থেকেই ডায়েরী রাখবার অভ্যাস ছিল। ঠাকুর আগেই ঐ অভ্যাসটি করিয়ে রেখেছিলেন। যাই তাঁকে দেখা অমনি ডায়েরীতে লিখতে আরম্ভ করি। আমি কি করেছি? তিনিই করিয়ে নিয়েছেন। এলাহাবাদে ঠাকুর সেবা আছে?

হরিপ্রসন্ন মঃ—একটি ঠাকুর ঘর আছে। ঠাকুরের ফটো আছে, নিত্য সেবার কোনও বন্দোবস্ত নেই। মাঝে মাঝে এক আধ দিন মিষ্টিভোগ দেওয়া হয়।

শ্রীম—সেখানকার লোক কি রকম?

হরিপ্রসন্ন মঃ—সেখানকার ভক্ত অল্প। সেখানকার লোকরা মনে করে বাঙ্গালীরা বোকা, কিছু জানে না।

শ্রীম—কতদিন থাকা হবে?

হরিপ্রসন্ন মঃ—কাল যাব।

শ্রীম—তোমার সূর্য্য সিদ্ধান্ত নিয়ে পড়ছি; ইংরাজীতে আদ্রা নক্ষত্রের নাম কি?

হরিপ্রসন্ন মঃ—আমার মনে নেই। তাইতে আছে।

শ্রীম—জ্যোতিষ শাস্ত্র যা বলে এসব বিশ্বাস হয়?

হরিপ্রসন্ন মঃ—তেমন লোক না পেলে বিশ্বাস হয় না। কিছুদিন আগে আমার মা কাছে ছিলেন। সেই সময় মায়ের মাদুলি ও ইষ্টকবচটা কোথায় হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ায় মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। এসে আমাকে বলাতে, আমি এক পণ্ডিতের কাছে গণনা করি। সেই পণ্ডিত ঠিকঠাক বলেছিলেন। যে স্থান বলে দিয়েছিলেন সেইখানেই মাদুলি ইষ্টকবচ পাওয়া গেল। তাই আগে না দেখে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

শ্রীম—ঠিক দেখা হচ্ছে কিনা তাই বা কি করে জানব?

হরিপ্রসন্ন মঃ—আমি প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম। গণকের কাছে নাম, নক্ষত্র, সময়, ফুলএর একটা নাম করতে হয় তাতে গুণ ভাগ দিয়ে তক্ষুণি বলে দেবে। আমি আপনাকে পাণিনি অফিস থেকে দু অধ্যায় পাঠাব। আপনি ঠিক করে নেবেন। ভুলে না যাই।

শ্রীম—'ব্রহ্ম নাম রূপ বিবর্জ্জিত' এই চিন্তা করতে করতে আর নাম মনে থাকে না। বিশেষতঃ বুড়ো বয়সে। তাহলে এইবারে আসি।

হরিপ্রসন্ন মঃ—আসুন।

সুধীর মহারাজ ঘরে ছিলেন মাষ্টার মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া বলিতেছেন, "আপনাকে অনেকদিন ধরে নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছি, আপনার মুখে ঠাকুরের কথা শুনবো বলে।"

শ্রীম—তুমি রোজ বলছ বটে। বৃদ্ধ বয়স—বড nervous (ভীতু)।

নীচে আসিলে তুলসী মহারাজ কৃষ্ণলাল মহারাজকে দিয়া মাষ্টার মহাশয়ের জন্য প্রসাদ একটা কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন এবং নিজে সঙ্গে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। রাস্তায় অনেক সাধু মাষ্টার মহাশয়ের পদধূলি নেবার জন্য আসিতেছেন দেখিয়া শ্রীম বলিতেছেন, (তুলসী মহারাজের প্রতি) "আমাকে ধরে থাক। তা না হলে ছোকরাদের সঙ্গে জোরে পেরে উঠবো না। ঐ ডাক্তারবাবুকে আশীর্ব্বাদ কর এর জন্য (অর্থাৎ এর গাড়ীর জন্য), আমার মঠ ও সাধুদর্শন হল।"

পুনর্ব্বার মায়ের মন্দির প্রভৃতিতে প্রণামাদি করিয়া ডাক্তারের গাড়ীতে যাত্রা করিলেন।

॥ ২৯ ॥

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল বেলা প্রায় আটটা, শ্রীম চারতলার ছাদে কয়েকজন ভক্ত ও শিবুদার সহিত কথা কহিতেছেন।

শিবুদাদার সঙ্গে

শ্রীম—রামলালদা কেমন আছেন? দক্ষিণেশ্বরের সব কুশল ত? কামারপুকুরে বড় ম্যালেরিয়া। এইখানে (দক্ষিণেশ্বরে) তোমার বাড়ী হয়েছে ভালই হয়েছে।

শিবুদা—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে।

গান গাহিবার অনুরোধ করায় গান গাহিতেছেন—

"তুলেনে রাঙ্গা জবা মায়ের পায়ে সাজবে ভাল।
চল ত্বরা পূজবো তারা মায়ের রূপে জগৎ আলো॥
নাচবে শ্যামা হৃদ কমলে ধোব চরণ নয়ন জলে।
ডাকবো তারে কালী বলে ঘুচে যাবে মনের কালো।"

গান—"ভাগ্যে যা আছে তাই হবে ভাবিতে পারি না আর॥"

এই গান শুনিয়া শ্রীম হাসিতেছেন এবং কাছের উকিল ললিতকে বলিতেছেন এই গানটি তোমার পক্ষে।

শিবুদা (শ্রীমকে দেখাইয়া) (ভক্তদের প্রতি)—ইনি হচ্ছেন ঠাকুরের ভাণ্ডারী। আমরা ভাণ্ডারীর কাছে বসে আছি। "আপনার ভাণ্ডার থেকে কিছু হোক।"

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—দেখ ইনি বলছেন যখন প্রামাণ্য। চৈতন্য চরিতামৃত পড়িয়া শিবুদাকে শুনাইতেছেন চৈতন্যদেব সমুদ্র ধারে বেড়াচ্ছেন, গাছপালা দেখে ভাবে বিভোর হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমরা সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছ? বন দেখে একেবারে উন্মাদ, বন দেখে বৃন্দাবন ভাবছেন, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবছেন, লতা দেখে বলছেন, রে মাধবী আমার মাধব দে, ইত্যাদি।" (শিবুদার প্রতি) আপনার ছেলেবেলায়

ঠাকুরকে মনে পড়ে? কামারপুকুরে রয়েছেন এমন সময়কার কোন ঘটনা?

শিবুদা—একদিন ঠাকুর বুড়োশিব মন্দিরের কাছে বসে আছেন, আর কাছে হেমসুন্দর (যাত্রাওয়ালা)।

আর একদিন ভাত খেতে বসে বললেন, "মাছ না হলে খাব না" বলে পায়চারি করতে লাগলেন।

হৃদে পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে রেঁধে দিলে তারপর খেলেন। আর একটা কথা বলবো বিশ্বাস করবেন?

শ্রীম—হ্যাঁ, বল না।

শিবুদা—দক্ষিণেশ্বর থেকে হৃদয়কে বার করে দিয়েছে। তার পাঁচ-ছয় দিন পব এই ঘটনার কথা বলছি। সেই সময় নূতন কামারপুকুর থেকে এসেছি। চাবজন গুণ্ডা ঠাকুরকে পরীক্ষা করবার জন্য রাত্রে এসেছে। সেইদিন কার্ত্তিক পূর্ণিমা। ঠাকুর তাদেব দেখেই বললেন, আয় আয় জলখাবার খেয়ে যা। এই বলে তাদেব নিয়ে হাঁসপুকুরের ধারে কাঁঠাল গাছ থেকে পঁচিশে সেব আন্দাজ পাকা কাঁঠাল পাডলেন। সেই কাঁঠাল আর ঘরের কিছু সন্দেশ, বসগোল্লা যা ছিল তাদের খাইয়ে বিদায় করলেন। তারাও খেয়েদেয়ে আনন্দ কবে চলে গেল। এ আপনার বিশ্বাস হয়?

শ্রীম—কাজে কাজেই বিশ্বাস করতে হয়। (হাসতে হাসতে) একদিন ঠাকুব গল্প করছেন, 'আমি দাঁড়িয়ে আছি একটি পাথর আস্তে আস্তে গিয়ে ধপাস কবে জলে পড়ল।' তাঁব এই কথা শুনে আমি হো হো করে হাসতে লাগলাম। ঠাকুর বললেন, 'এই ত, বিশ্বাস করলে না। কিন্তু মথুববাবু বলত, বাবা। তুমি যে কালে বলছ আমি বিশ্বাস করি।' এই কথা শুনে আবার গম্ভীর হয়ে গেলাম।

শিবুদা—আর একদিন দাদা পডাশুনার জন্য আমাকে মারছেন, ঠাকুর দেখে বললেন, 'তোর ভয় কি, তর তর করে লিখতে শেখ, রঘুবীরের সেবা করবি।'

শ্রীম—ঠাকুর লক্ষ্মীদিদির বিবাহ হয়ে গেছে শুনে বলেছিলেন, "অ্যাঁ! বিবাহ হয়ে গেছে! রঘুবীরের সেবা কে করবে? হৃদু হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলে। ঠাকুর বললেন, 'আমি কি বলছি, মা আমার মুখ দিয়ে বলালেন।' তার কিছু দিন পরে তাঁর স্বামী মারা যায়।

শিবুদা জলযোগান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩০ ॥

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শ্রীম চারতলার বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। কোন ভক্ত দক্ষিণেশ্বর হইতে মা-কালীব প্রসাদ আনিয়াছেন এবং সকলে গ্রহণ করিতেছেন।

দেহতত্ত্ব আত্মা ও শক্তি

বড় জিতেন—দেহরক্ষার জন্য অবতারকেও খাটতে হয়। দেহেব যত্ন নিতে হয়।

শ্রীম—অনেক জিনিষ জড়িয়ে এই শবীর। মস্তিক, হৃদয়, ফুসফুস, পাকস্থলী, কত নাড়ী-ভুঁড়ি—আবার বাইরে জল, হাওয়া লাইট এইসব জড করে রেখেছেন বলে বলছে, 'আমি আমি।' এই জড়পিণ্ড থেকে একটা 'আমি' বেরুচ্ছে, কি আশ্চর্য্য!

ডাক্তার—আচ্ছা মৃত্যুর পর শরীরে নাড়ি-ভুঁড়ি, জল, হাওয়া সবই থাকে, তখন এই আমি কোথায় যায়?

শ্রীম—বাইরের জিনিষগুলো বাইরেই পড়ে থাকে। বাইরের জড়-পিণ্ড সংমিশ্রণ ছাড়া আর একটি বস্তু আছে। তাঁকে ঋষিরা প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। তাই ওঁরা বলে গেছেন, 'তাইতে মিশে যায়।' যেমন নুনেব পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল আব খবর দিতে পারলে না। এরূপ কারু-কারুর হয়েছে শোনা যায়। খবব দিতে পারেন নি।

"জলের বিম্ব জলে মিশায় জল হয় সে মিশায় জলে।"

"সাধে আর শিব 'আমি কে' বলে নৃত্য করতেন। এই পর্য্যন্ত তাঁবা বলে গিয়েছেন, তাঁর বিষয় আর কি বলব? যা থেকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হচ্ছে তিনিই ঈশ্বর। 'জন্মাদস্য যতঃ সামনে যে জগৎ দেখছেন তাই দিয়ে বলছেন, তাঁরা দেখেছিলেন তিনি যন্ত্রী হয়ে এই দেহকল চালাচ্ছেন। যেমন বাঁশী বাজালে বাজে।

"অবতারদের অহঙ্কার একেবারে চলে যায়, যেমন মূল উপড়ুলে গোড়া-সুদ্ধ চলে আসে। জীব অশথ গাছের মত। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও আবার ফেক্ড়ি বেরুবে। হাজার লম্বা লম্বা কথা বল, ঠাকুর বলতেন, তাঁর underএ

(অধীনে)। ব্রহ্মা, বিষ্ণুও তাঁর অন্ত পাচ্ছেন না। 'দাদারও ফলার।' একজন ঠাকুরকে বললেন, আপনি নিজে ইচ্ছা করে 'আমিটা' রেখেছেন। তখনই বললেন, 'মাই রেখেছেন।' যদি বল ভাবন না, তিনিই ভাবাবেন।

"অর্জ্জুন যখন ধনুঃশর ত্যাগ করে বললেন, 'যুদ্ধ করব না', শ্রীকৃষ্ণ তখন হাসতে লাগলেন। বললেন, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ করাবে। 'অবতার যেন সমুদ্র থেকে এক নালা বেরিয়েছে। সেই নালার যেখানে দাগ বা চিহ্ন তা লোকশিক্ষার জন্য হয়েছে।

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। (গীতা—৬।১০) যতক্ষণ তাঁদের 'আমিটা' থাকে ততক্ষণ তাঁরা পাখী যেমন ডিমে তা দেয় সেই রকম তাঁতে মগ্ন হয়ে থাকেন। বাইরের একটু হুঁস থাকে লোকশিক্ষার জন্য। 'আমি' টেনে নিলে কি হয় মুখে বলা যায় না।

"নীচে আগুন আছে বলে দুধ ফুলে উঠে, আগুন টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। সর্ব্বত্র সেই মহাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই সব সেই মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ* সেই আদ্যাশক্তি মানুষকে জাপটে ধরে রয়েছেন। তাঁরই নাম ঈশ্বর, গড, আল্লা প্রভৃতি।

অবতার চেনা বড় শক্ত

"অবতাব চেনা বড · ক্ত, আমাদেব মত চালচলন, কথাবার্ত্তা; কি করে চিনবে। আবার তাঁদের অভিমান নেই।

"দক্ষিণেশ্বরে জানবাজারের বাবুরা এসেছেন। কে গান করবে? ডাক ছোট ভট্টাচার্য্যকে। তার খুব মিষ্টি গলা। অমনি তাদের কাছে চললেন, গিয়ে বললেন, 'কি গান গাইব।' ছ-টাকা মাইনে কিছু একটু খেলেই পেটের অসুখ।

"আমি আগে মনে করতাম বুঝি আমাদেব লোক। ওঃ! শেষে ভাবতে ভাবতে দেখা গেল তাঁর আর অন্ত পাওয়া যায় না—অনন্ত। ভাগবতে আছে এক পুকুরে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখে মাছেরা মনে করে আমাদের মত কোন এক প্রাণী।† এমন সময় হারমোনিয়মের স্বর কানে আসায়

* তদেতং সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরা দ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥ [মুণ্ডক—২।১

† দুর্ভাগোবতলোকোঽযং যদবো নিতযামপি যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনাইবোড়ুপম। [ভাগবত—৩।২।৮

বলিতেছেন, বা! কি সুর! আহা! তিনি সব হয়ে আছেন! ঠাকুরের রসুনচৌকি শুনতে শুনতে সমাধি হয়ে যেত!"

সমাধির পর তৎস্মৃতি

বড় জিতেন—আচ্ছা, সমাধির পর কিছু নিয়ে আসেন?

শ্রীম—তিনি এই সব হয়ে আছেন এই (স্মৃতি) নিয়ে আসে। শাস্ত্রে আছে বৈকুণ্ঠে ভগবান পার্ষদ নিয়ে বসে আছেন, অনন্ত লীলা চলেছে।

ঠাকুর একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে সমাধির পব বললেন, কোথায় বসে আছি মনে নেই। কিন্তু কতকাল তোমাদের সঙ্গে বসে আছি।

বড জিতেন—যাতায়াত করা যাচ্ছে, ঠিকঠাক দেখিয়ে দেন ব্যাপারটা কি।

শ্রীম—এত সব বোঝবার দরকার কি? তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হলেই হল।

গদাধর—তবে ঠাকুব এক জায়গায় বলেছেন, "তাঁকে না জানলে, কাকে ভক্তি করবে?"

শ্রীম—তাই ত। তাঁকে জানলে, সব জানা হয়ে যায়। দুই থাকের ভক্ত। এক থাক বলছে, 'সংসারের কষ্ট যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ কর।' আর এক থাক বলছে, 'দেহধারণ করলেই দুঃখ কষ্ট আছে।' যাঁরা হাজার দুঃখ কষ্টেও বিচলিত হন না, তাঁরাই মহাপুরুষ।

ভক্তজব

"প্রাচীন বাইবেলে জবের কথা আছে। জব ঈশ্বরের পরম ভক্ত। সারা জীবন ধরে দান, ধ্যান, ঈশ্বরের গুণানুকীর্তন করে দিন কাটাতেন। ঈশ্বরের কৃপায় সন্তান-সন্ততি, ধন-ঐশ্বর্য্যেব অভাব নেই। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর শয়তান দিয়ে একে একে তাঁর ধন ঐশ্বর্য পুত্র কলত্র হরণ করে নিয়ে গেলেন। তাতেও পরমানন্দ। বললেন, ভগবান দিয়েছিলেন, ভগবানই নিয়ে নিলেন। কিন্তু গলিত কুষ্ঠে যখন শরীরের মাংস সব খসে পডতে লাগল, লোকে ঘৃণা করে তাঁর কাছে আসে না, তখন মুহূর্ত্তেব জন্য তার আত্ম গ্লানি এলো, বললে, 'প্রভো তুমি কি ন্যায়পরায়ণ? কোনদিন অন্যায় করি নি তথাপি এইরকম হল, তাহলে তোমাকে কে ডাকবে?' তখন ঈশ্বর দর্শন দিয়ে বললেন, 'দেখ জব! সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলে না প্রলয়ের পর কি হবে তাও

তুমি জান না। যিনি স্থষ্টি প্রলয় করছেন তিনি সব ন্যায় অন্যায় জানেন। নিজের গজকাটি দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যেও না। শরীর ধারণ করেছ, সহ্য কর, সহ্য কর।' এই বলে অন্তর্ধান হলেন।

"লোকশিক্ষার জন্য কষ্ট দেন। পাণ্ডবদের ঐ রকম দুঃখ-কষ্টে না রাখলে লোক শিখবে কি করে? তাই গানে আছে—

"হরি নাম লইতে অলস করনা রসনা
যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে) না আর পাবে।
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে।
রেখ রেখ এ নাম সদা হৃদে ধরি,
অনায়াসে পার হবে ভব বারি।
সচেতনে থেকো (মনরে আমার) দয়াল বলে ডেকো
এ দেহ ত্যজিবে যবে॥"

শ্রীম—একদিন ঠাকুর হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, 'এই মুখ দিয়ে ভগবান কথা ক'ন সেইজন্য অবতার। তা থেকেই বেদ বেরিয়েছে। এইখানেই আনাগোনা করলেই হবে।'

রাত্রি সাড়ে নয়টা, ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩৯

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত। শ্রীম কামারপুকুরের জনৈক লোককে শীতের জন্য একখানা গায়ের কাপড় দিবেন সেই উপলক্ষে কামারপুকুরের কথা হইতেছে।

শ্রীম—কামারপুকুরের লোক কত বড় তা তারা জানে না বলেই এই দশা। সাক্ষাৎ অবতার টাট্‌কা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই ভাব এখনও রয়েছে। তাই কামারপুকুর দর্শন করতে লোকে যায়। স্বামীজী বলেছিলেন, 'যারা ভাগ্যবান তারাই সেইসব দর্শন করতে পায়।'

"বৃন্দাবনে বৃন্দাবনবাসীদের পা পূজা করেছিলাম, তারাও পা বাড়িয়ে দিত। একজন বুড়ো পাণ্ডা আমার যজমান নিয়ে গেল বলে কাঁদতে লাগল। বৃন্দাবনে জগন্নাথে গেলে যার যেমন শক্তি সেখানকার লোকদের তেমনি খাওয়াতে হয়। কামারপুকুরে গেলেও তাই করা উচিত। ঠাকুর গঙ্গাবিষ্ণু ও লাহাবাবুদের কত ভালবাসতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ঠাকুরের যে দেশে জন্ম, সেই দেশের লোকদের সেই বংশের মনে করে আমাদের তাদের পা পূজো করা উচিত।

উপাধ্যায় তাহার সাধনের কথা বলিতেছেন।

উপাধ্যায়—কখনো কখনো গা জ্বালা করে। কাল রাত্রে বসে মায়েব নাম জপ করছিলাম, বেশীক্ষণ করতে পারলাম না। কে যেন গায়ে হাত দিতেই সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠল।

শ্রীম—সাধনের সময় ঐ রকম হয়। ভাল লক্ষণ। ঠাকুর বলতেন, 'কারুকে বলতে নেই।' আপনার ওপর কত কৃপা। ডাবের জল মিছরীব জল খাবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। একে একে ভক্তগণ সমবেত হইয়া দোতলায় বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। শ্রীম আজ ট্রামে কালীঘাটে মা কালী দর্শন করিয়া আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিলেন।

শ্রীম (সুধীরবাবুব প্রতি)—ব্রাহ্মসমাজের খবর কিছু পাওয়া গেল না?

সুধীর—আমি গিয়েছিলাম। আজ সেখানে ক্রাইষ্টের কথা হল, আব কথা হল, সাধুসঙ্গ দবকাব। সাধুসঙ্গ হলে অন্য সাধন ভজনের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীম—বাঃ! বেশ কথা। আমি মা কালী দর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে এক গায়ক গান করে বলছে, "যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ" কিন্তু বৈষ্ণবেরা এমন (বিরোধ) করে কেন, কে জানে। পাশের বাড়ীতে কীর্ত্তন হইতেছে শুনিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, "তোমাদের কীর্ত্তন শুনতে ইচ্ছা হয় না? যাও শুনে এস।" অনেক ভক্ত সেখানে গেলেন।

॥ ৩২ ॥

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

সকালবেলায় শ্রীম চারতলায় নিজের ঘরে চৌকির উপর বসিয়া ধ্যানের পর গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন।

"আনন্দময়ী হয়ে গো মা নিরানন্দ করো না।
ও দুটি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না॥" ইত্যাদি

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

গানান্তে তৈত্তিরীয় উপনিষদ ভৃগুবল্লী পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন। বরুণের পুত্র ভৃগু বাপের কাছে গিয়া বললে, "বাবা, আমাকে ব্রহ্ম বিদ্যার বিষয় বলুন।" তিনি বললেন, "বৎস, তাঁর বিষয় আর কি বলব! যা থেকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হচ্ছে তিনিই ব্রহ্ম। তাঁকে জানবার জন্য তপস্যা কর। তপস্যা ভিন্ন তাঁকে জানবার উপায় নেই।"

ভৃগু পিতার আদেশে তপস্যা করে জানতে পারলেন,—

"অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই প্রাণীগণের সৃষ্টি। অন্নেতেই প্রাণীসকল বেঁচে থাকে। অন্নেতেই সকলে লয়প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ তপস্যা করে জানতে পারলেন, ব্রহ্ম শুধু অন্নমাত্র নয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধিও তিনি। সর্ব্বশেষে জানলেন (সৎ চিৎ) আনন্দ স্বরূপই ব্রহ্ম, তা থেকেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হচ্ছে।" [তৈঃ উ—৩।৯]

শ্রীম—অন্ন মানে ভক্তিজ্ঞানও হতে পারে। মহাপুরুষগণ আপামরে অন্নদান করেন, কারুকে নিরাশ করেন না। সেইজন্য তাঁদের কাছে যেতে হয়। গেলে কিছু না কিছু পাওয়া যায়ই। ঠাকুর বলতেন, 'তিনি অন্তরে বাহিরে। প্রত্যক্ষ দেখছি, বিচার কি করব।' তবে একটা কথা আছে, বেদ বলছেন সেইজন্য প্রামাণ্য।

এমন সময় হেড মাষ্টার হরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বড় জিতেন প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত আসিলেন।

শ্রীম (হেড মাষ্টারের প্রতি)—আসুন, আসুন, চেয়ারে বসুন। আমাদের উপনিষদ পড়া হচ্ছে।

এইবারে বৃহদারণ্যকোপনিষদ হইতে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদ পড়া হইতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করবেন তাই তাঁর দুই পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে মৈত্রেয়ী খুব বিদুষী ছিলেন, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সম্পত্তি দ্বারা কি ভগবানকে পাওয়া যায়?" যাঁর দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় তাই দান করুন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর এই কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বলতে লাগলেন :—"দেখ মৈত্রেয়ী! পতি যে স্ত্রীকে ভালবাসে, এই যে ভালবাসার টান, ভগবান স্ত্রীর মধ্যে আছেন বলে। নইলে মৃত শরীরকে ত কেউ ভালবাসে না!" যদি বল যে, ভগবান আছেন এইরূপ মনে করে ত কেউ ভালবাসে না, তার উত্তর ঠাকুর দিয়েছেন "লঙ্কা জেনে খাও আর না জেনেই খাও, ঝাল লাগবে।" মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা সকলের মধ্যে তাঁকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

যোগী পুরুষ

বড জিতেন—এই যে ঐহিক ভালবাসা, এইটাই মারাত্মক।

শ্রীম—আপনারা কি করছেন! তিনি অজ্ঞান দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। এই দেখ, হাত, পা, চোখ, নাক, কান, হৃদয়, ফুসফুস, কত রকম নাড়িভুঁড়ি, বাইরে জল, হাওয়া, আলো, খাদ্য—নিয়ে এই 'আমি'। এর মধ্যে কোন্‌টা আপনারা তৈরী কবেছেন? আসল কথা, যাকে যে সুরে বেঁধেছেন, তা থেকে সেই সুরই বেরুচ্ছে। তিনি যন্ত্রী আর সব যন্ত্র। যিনি এইরূপ জেনেছেন, ঋষিগণ তাঁকেই পরমহংস বলে গেছেন। তিনিই মৃত্যুঞ্জয়—জন্ম, জরা, ব্যাধি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহশূন্য বলে যোগীপুরুষগণ পরমাত্মাতে লীন হন। তার মানে, তাঁরা তা ছাডা আর কিছু দেখেন না।

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণিতে স্থিতাঃ॥ (গীতা—৫।১৯)

চাতক যেমন বৃষ্টির জল ছাডা খায় না, সেইরূপ যাঁরা পৃথিবীর সমস্ত ভোগ ত্যাগ করেছেন তাঁরাই যোগীপুরুষ। তাঁরা ব্রহ্মবস্তু আস্বাদন করবার জন্য নির্জ্জনে থাকতে ভালবাসেন, তাঁরা আত্মারাম। গানে আছে—

"সুন্দর যোগিজন চিত্তবিমোহন। জীবন বল্লভ হে প্রাণেরি প্রাণ। ইত্যাদি।

"তিনিই কেবল যোগীজনের চিত্ত বিমোহনকারী।"

বড় জিতেন—দেহ-বুদ্ধি কিছুতেই যায় না।

শ্রীম—যতক্ষণ তাঁর দর্শন না হয় ততক্ষণ দেহ বুদ্ধি তিনি রেখেছেন। তালুকে জমিদার না আসা পর্য্যন্ত, নায়েব শাসন করে। যাই জমিদার আসা অমনি তার কাজ শেষ হয়ে গেল। তখন প্রজাদের বলে, "ইনি এখন (জমিদার) হর্ত্তা-কর্ত্তা। আমি কিছু নই।"

"তাঁকে দর্শন হলে আমি তাঁতে লয় হয়ে যায়। আর ওদিককার খবর দিতে পারে না। তন্ত্রে আছে সৃষ্টির জন্য পুরুষ প্রকৃতির যোগ। 'শিব সদারঙ্গে আনন্দ-মগনা।' কারো দোষ নেই, সৃষ্টি করলেও দোষ নেই।"

বেলা প্রায় দশটা হইয়াছে। এইবার সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহারা চলিয়া যাওযার পর, শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া গদাধরকে বলিতেছেন, "কেমন কথা? ঠাকুরের কথা কিনা তাই প্রাণে লাগে। ঠাকুরের কথা কে বুঝবে? যাঁরা ছাদে উঠেছেন, সিদ্ধপুরুষ, তাঁদের কথা এক রকম এবং যাঁরা সিঁড়িতে উঠছেন, তাঁদের এক রকম। Psychology (মনস্তত্ত্ব) নিয়ে বিচার এবং তপস্যা দ্বারা ঋষিরা উপলব্ধি করে যা বলে গেছেন অনেক তফাৎ। প্রথম উপায়ে কতকটা বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে, দ্বিতীয়টিতে বস্তুলাভ হয়। যাও ছাদে গিয়ে এই সব তত্ত্ব চিন্তা কর।"

বৈকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা, শ্রীম দোতলায় বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। একে একে ভক্তেরা আসিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন।

শ্রীম—একজন রামাৎ সাধু রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে যাচ্ছিলেন, "সীতা-পতি রামচন্দ্র।" এত মিষ্টি সুর যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে সেই সুরে গান বেঁধেছিলেন। যখন তাঁর গান শুনি তখন আমার ছ-বৎসর বয়স, এখনও মনে রয়েছে। "সীতপতি রামচন্দ্র" একবার সেই গানটি আপনারা গান। তাঁহার আদেশে ভক্তরা গাহিতেছেন।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুকুল রাই।
ভজলে অযোধ্যানাথ দুসরা ন কোই ইত্যাদি

গোপাল কামারপুকুর হইতে ফিরিয়াছেন, শ্রীম তাহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—কই, সামনে এস। কি দেখলে গল্প কর।

গোপাল—তারকেশ্বর থেকে জাহানাবাদ, সেখান থেকে কামারপুকুর হেঁটে গেলাম। কামারপুকুরে যা কিছু দেখবার, রামলালদার এক সম্বন্ধী আমাকে সঙ্গে করে, ভূতিরখাল, লাহাদের বাড়ী, ধনী কামারণী ও চিনে শাঁখারির বাড়ী প্রভৃতি দেখান। কামারপুকুরে একদিন থেকে সেখান থেকে ৺বিশালাক্ষী দর্শন করে জয়রামবাটি আসি। সেখানকার সব দেখে কিছুদিন থেকে আসবার সময় ডাক্তার প্রভাকরের বাড়ী হয়ে এলাম। যখন তাঁর বাড়ী পৌঁছই তখন রাত্র এগারটা। অনেক রাত হয়ে গেছে বলে তাঁকে আর ডাকলাম না।

শ্রীম (জিতেনের প্রতি)—ভক্ত ভগবানকে চিন্তা করে কিনা। তাই ও ভাবলে তিনি ত সব জায়গায় আছেন, তিনি দেখবেন, ভক্ত তাঁতেই থাকে।

অমৃত—আমি কাল 'মাথা ঘষা' গলির কাছে ৫০ জন সাধু, ধুনিজ্বেলে বসে আছেন, দেখে এলাম। প্রচণ্ড শীত, তাতেও তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ঐরূপ সাধুরা অনেক আসিয়া থাকেন।

বড় জিতেন—ওসব ছাইমাখা সাধু।

শ্রীম—তাহলে কি হবে, আমাদের তাঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। উচ্চ আদর্শের কথা মনে পড়ে। এক ঢিলে দুই পাখী বধ। গৌরাঙ্গদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন।

বড় জিতেন—কিন্তু ওদেধ কি হবে?

শ্রীম—সে ভগবান ভাববেন। যিনি জন্ম মৃত্যু বিধান করেছেন, যিনি সকলের আহারের বন্দোবস্ত করেছেন তিনি দেখবেন। অপরের দেখবার কি দরকার। "চাচা আপনা বাঁচা।" নিজের ভাব আগে ঠিক রাখা।

বড় জিতেন—আজ সকালে যেসব কথা হয়েছিল, সেইসব কথা ভাবছিলাম যে একেবারে অহঙ্কার যায় না।

শ্রীম—ঈশ্বর দর্শনের পর যায়। মূল উপড়ুলে শিকড় সুদ্ধ উঠে আসে। তা না হলে হাজার বিচার কর ঘুরে ফিরে সেই 'আমি'। তাই আচার্য্যেরা তপস্যা করতে বলে গেছেন। ইংরাজি পড়া আচার্য্যদের কথা বলছি না। তাঁরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে লেকচার দিয়ে গেলেন, তুমি বোঝ আর না বোঝ। এসব আচার্য্য নির্জ্জনে বসে তপস্যা করেছিলেন "স তপোঽতপ্যত" (তৈত্তিরীয়—৩।১), নির্জ্জনে গোপনে তপস্যা করলে তিনিই বুঝিয়ে দেবেন।

জনৈক ভক্ত—এইখানে আসা যাওয়াতে যা হয় হবে, এর চেয়ে বেশা

কিছু পারব না। কাল সিদ্ধেশ্বরী মা কালীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে অন্ত এক জায়গায় বসলাম। ভাবলাম এই প্রণামেতে যা হবার হবে।

শ্রীম (হাসিতে হাসিতে)—হাতে Stick (ছড়ি) নিয়ে বসলাম, এইতে কিছু করবে তো কর। এত পরিশ্রম কে করে। আরাম চেয়ারে বসে বসে ভগবান দর্শন হলে ভাল হয়। অথবা ঘুমুতে ঘুমুতে। তবে নিজের মা বাপ বলে যদি বোধ হয় তাহলে এত করবার প্রয়োজন হয় না। আমি ছেলে বেলায় নিজের মা বাপকে প্রণাম করতাম না। মনে হত নিজের মা বাপকে এত কে করে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে শুনলাম "তাঁর কাছে কান্নাকাটি করতে হয়।" এখন আবার পূর্ব্বের অবস্থা আসছে।

রাত্রি পৌনে নয়টা, সকল ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

। ৩৩ ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৪। স্থান—স্কুলবাড়ী

শ্রীম সকালবেলা চাবতলার ঘরে চৌকির উপর বসিয়া আছেন এবং বেঞ্চিতে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ।

মুকুন্দ—আপনি অনেক দিন আগে হাওড়া পুলের উপর দাঁড়িয়ে 'মহা-সিংহাসনে বসি' এই গানটি করেছিলেন। এখন সে গান আপনার মুখে শুনতে পাই না।

শ্রীম গাহিতেছেন—

গান—বিশ্ব সঙ্গীত

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাই চাই দেব কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,

তোমারে শুনাতে গীতি এসেছি তাহারি লাগি,
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত্ত।

শ্রীম—এ সুর ভৈরবী। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আপনা আপনি পূরবী সুর বেরোচ্ছিল। আগে থেকে তিনি সব তৈয়ারী করে রেখেছেন। কোন্ সময় কোন্ রাগিণী সব ঠিক করে রেখেছেন। ঊষাকালে ভৈরব আর একটু বেলা হলে আশাবরী সন্ধ্যার সময় পূরবী, গভীর রাত্রে বাগেশ্রী, বেহাগ প্রভৃতি।

"বিশ্বে একটা গান চলেছে রাত্রে বেশ জানা যায়। যতক্ষণ এই জগতে রেখেছেন ততক্ষণ এই সব জীবজগৎ দেখাচ্ছেন। এসব উদ্দীপনার জন্য। আবার যখন সে শক্তি টেনে নেবেন তখন আর এক রকম। যেমন স্বামীজীর গানে আছে—

'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥'

ঠিক যন্ত্রের মত। ঠিক যেন বাঁশী। যাকে যে রকম দেখাচ্ছেন সে সেই রকম দেখছে। কারু এতে বাহাদুরি নেই। আহা! আহা! ঠাকুরের কি অবস্থা! ঠাকুরের অবস্থা যেন ঢেঁকির পাঠ। একদিক নীচু হয় ত অন্যদিক উঁচু হয়। সমাধির পরও এই সব লীলা নিয়ে থাকতেন। বলতেন, আমার মেয়েলি স্বভাব তাই কখন ঝালে অম্বলে, ঝোলে, নানা ভাবে তাঁকে আস্বাদন করি।"

গোপাল এই সময় আসাতে তাঁহার সঙ্গে কামাপুকুরের গল্প করিতেছেন। কারণ সম্প্রতি সে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন।

গোপাল—জয়রামবাটীতে সিংহবাহিনীর কাছে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলছিল, "আমি মায়ের সঙ্গে কত দৌড়াদৌড়ি খেলা করেছি। তোমাদের মত কি আমার তাঁতে ভক্তি হবে?"

তীর্থ স্বভাব বদলে দেয়

শ্রীম—ঠিক বলেছ। (সুখেন্দুর প্রতি) ইনি টাটকা তীর্থ করে এসেছেন। কেউ তীর্থ করে ফিরে এলে বন্ধুবান্ধবরা তাকে নিয়ে আনন্দ করে। কেন না তাঁর কাছ থেকে তীর্থের কথা শুনলে আট আনা ফল হয়। কারণ তীর্থের

মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং জিহ্বায় প্রসাদ গ্রহণ হয়। যাদের শুদ্ধ মন তাদের এসব touch (স্পর্শ) করে। যাদের মন ময়লা তাদের হয় না। চৈতন্যদেবের গয়া থেকে এসে একবারে স্বভাব পরিবর্ত্তন। ভক্ত হয়ে গেলেন। কোথায় গেল তাঁর আগেকার শাস্ত্রের কূটবিচার, তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন সব পড়ে রইল।

টাকা পড়ে থাকলেও স্পর্শ করতে নাই

গোপাল—তাবকেশ্বর থেকে যাবার সময় এক নদীতে একটি টাকা পেয়েছিলাম। আমার কাছে ছিল ছ আনা। তাই থেকে রঘুবীরের সেবা ও গাড়ী ভাড়া দিয়ে, বাকী পাঁচ ছয় আনা পয়সা যা ছিল তাই দিয়ে খেলুম।

শ্রীম—নিবেদন করে খেয়েছ ত? তা হলে হাঙ্গামা চুকে গেছে। গীতায় আছে,

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" [গীতা—৯।২৭

তবে একটি কথা আছে টাকা পয়সা পড়ে থাকলেও নিতে নেই। সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে তপস্যা করছিলেন। একজন অত্যন্ত দারিদ্র্যতার কষ্টে যমুনায় ডুবে মরতে গিয়েছিল। এমন সময় সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে দেখা। তিনি সব বুঝতে পেরে বললেন, 'দেখ, ঐখানে একটা পরশমণি পোঁতা আছে নিয়ে যাও।' পা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। হাতে স্পর্শ করলেন না। সে লোকটি মণিটি পেয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। ভয়—পাছে কেউ কেড়ে নেয়। খানিক দূর গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল। 'তিনি কী এমন বস্তু পেয়েছেন যে যার জন্য মণি-মাণিকও গ্রাহ্য করেন না!'

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥" [গীতা—৬।২২

তখন তাঁর শরণাগত হয়ে মণিটি জলে ফেলে দিলে। সেইজন্য মহাপুরুষদের চিন্তা করতে হয়। ঠাকুরের ত কথাই নেই। টাকা হাতে দিলে হাত বেঁকে যেত। শ্রেয়ঃ লাভ করতে হলে প্রেয়ঃ সব ত্যাগ করতে হয়।

জগবন্ধু—আচ্ছা, যদি নিয়ে গরীবকে দেওয়া যায়?

শ্রীম—কিন্তু নিজের জন্য নয়, এক পয়সাও নয়। ভগবান চিন্তা করে এমন কোন ভক্ত যদি হাতে দেয় তাহলে অপরের জন্য নেওয়া যায়।

বেলা প্রায় নয়টা, সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে শ্রীম চারতলা ঘরে চৌকির উপর বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। একে একে ভক্তগণ আসিয়া বাহিরের ঘরে সমবেত হইলেন। ধ্যানান্তে শ্রীম মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ নিবিষ্ট মনে উহা শ্রবণ করিতেছেন।

"যশোদা নাচত গো মা বলে নীলমণি।
সেরূপ লুকালে কোথা করাল বদনী।" ইত্যাদি

গান—"ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী।" ইত্যাদি

গান—"গৌরহে আমি সাধন ভজন হীন
পরশে পবিত্র কর আমি অতি দীন হীন॥
চরণ পাবো পাবো বলে হে
(চরণ তো আর পেলাম না গো)
আমার আশায় আশায় গেল দিন।"
"নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস আঙ্গিনায়
ভক্তগণ সঙ্গে করি॥" ইত্যাদি।

গানান্তে ভক্তদের কাছে আসিয়া বসিলেন।

সাধুর নির্জ্জলা একাদশী—এগিয়ে যাও

গোপাল—আচ্ছা, ঐ টাকা থেকে যে খরচ করেছি, কি করব?

শ্রীম—তিন রকম একাদশী আছে—নির্জ্জলা, ফলমূল খেয়ে, অথবা লুচি ছক্কা খেয়ে। তেমনি সাধুরও তিন থাক। প্রথম অজগরবৃত্তি, দ্বিতীয় নমোনারায়ণ বলে দাঁড়ায়, আর তৃতীয় যাবা ভিক্ষা জোর করে আদায় করে। এ সব জেনে রাখা ভাল। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয় যে আমাকে নির্জ্জলা করে দাও।

যেমন প্রথম কোন লোক মাইনে না নিয়ে বাড়ীর কাজ করে দেয় এবং কেবল সেখানে থেকে খায়। আবার এমন লোক আছে যারা মাইনেও নেয় না কিম্বা সেখানে থেকে খায়ও না, কেবল কাজ করে দেয় এবং নিজে ভিক্ষা করে খায়। শেষে হয়ত কিছুই আর করতে হল না। যেমন একেবারে

ছাদে ওঠা যায় না সেই রকম।

• "যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই যে সব হয়ে গেল তা নয়। তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। এক ব্রহ্মচারী এক কাঠুরেকে বলেছিল, 'আরো এগিয়ে যা, আরো দূর বনে যা—চন্দন, রূপা, সোনা, হীরা, মাণিক কত কি আছে'।"

খানিক পরে দক্ষিণেশ্বরের যোগীনবাবুর সহিত কথা হইতেছে।

মা এখানে নেই ?

শ্রীম—আমি কত করে বললাম, কোন জবাব করবেন না। আমাদের এখন বৃদ্ধ বয়স, এখন কর্ত্তব্য, তাঁর চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করা। এত হাঙ্গামায় যাবার কি দরকার। যেখানে দেবালয় ও সম্পত্তি একসঙ্গে সেইখানে এসব গোলমাল থাকবেই। হনুমান বলেছিলেন, আমি তিথি নক্ষত্র কিছুই জানি না, এক রাম চিন্তা করি। আপনার এখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি করে তাঁকে লাভ করা যায়। অত ঘোরা ভাল নয়। দক্ষ প্রজাপতি নারদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তোর ত্রিলোকে স্থান হবে না। কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াবি।'

যোগিন—দক্ষিণেশ্বরেই আমার মন বেশ বসে আর কোথাও তেমন নয়।

শ্রীম—কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁকে বলেছিলাম, "দক্ষিণেশ্বরে মা আছেন, সেখানে গিয়ে আপনি থাকুন।" ঠাকুর বললেন, "কেন, এখানে কি মা নেই ?"

যোগিন—আমার ইচ্ছা যে এখানে অনেকক্ষণ থাকি। কিন্তু কাজ আছে বলে থাকতে পারি না।

এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মশেষই সন্ন্যাস

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ডাক্তারবাবু একেবারে সন্ন্যাসের কথা বলেন। প্রকৃতিতে কর্ম্ম রয়েছে। কর্ম্ম শেষ না হলে, কি করে সন্ন্যাস হবে। অর্জ্জুন বললেন, আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ সে কথায় আমলই দিলেন না। বললেন, "তোমার প্রকৃতিতে এখনও কর্ম্ম রয়েছে।"

প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি। [গীতা—১৮।৫৯

ধীরেন—প্রকৃতিতে যে কর্ম্ম রয়েছে সেগুলি নষ্ট করবার কি কোন উপায় নেই?

শ্রীম—তাঁর কাছে প্রার্থনা, সাধুসঙ্গ, নির্জ্জনবাস ও তপস্যা করতে করতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করবার জন্য রেখে দিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্য রকমও ত করতে পারতেন?

ধীরেন—বিদ্যার মধ্যে কি অবিদ্যা নেই?

শ্রীম—আছে, তবুও বিদ্যার আশ্রয়ে অবিদ্যাকে জয় কবা যায়। এইবার ডাক্তারবাবু চৈতন্য চরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুব সন্ন্যাস হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত পাঠ করিলেন। পাঠান্তে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৪ ॥

৩বা জানুয়ারী, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শনিবার বলিয়া আজ সন্ধ্যায় অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। শ্রীম ছাদে তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

নানক

শ্রীম—আমরা দুদিন বডবাজারে শিখদের উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। ভক্ত নানক শিখদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। তাদের জ্ঞান ও ভক্তিতে মাতিয়ে তুলেছিলেন। কাল মনে হচ্ছিল যেন অমৃতসহরে বেডাচ্ছি। তিনি যে সব কথা বলে গেছেন তা এখন 'গ্রন্থ সাহেব' রূপে গুরুদ্বারে পূজো হয়। গুরুদ্বারে দিনরাত পূজা, পাঠ, গান, আরতি উৎসব চলেছে, অন্তরে বাহিরে উৎসব। গানে আছে—

"আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে।" ইত্যাদি।

ঈশ্বর আনন্দ দিচ্ছেন

"ঈশ্বর কত ভাবে আনন্দ দিচ্ছেন। সে সব ভুলে গিয়ে বলে দুঃখ। মানুষ কেবল দুঃখটাই মনে করে রাখে। শরীর ধারণ করলেই সুখ দুঃখ

থাকবেই। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের হাতে নিহত হলেন। সমস্ত যদুবংশ ধ্বংস হল। রামচন্দ্র সরযুতে ঝাঁপ দিয়ে শরীর রাখলেন। যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হলেন। চৈতন্যদেব সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। পরমহংসদেব দশ মাস কাল ক্যানসারে ভুগলেন। এঁদের যদি এইরকম হয় তাহলে মানুষের আর কা কথা। কেবল সুখ সুবিধার জন্য তাঁকে ডাকা নয়। উদ্দেশ্য অহৈতুকী ভক্তি —তাঁর সঙ্গ। তিনি যে সব তত্ত্ব দিয়ে গেছেন সেইগুলি চিন্তা করা। বেদান্ত বলে ব্রহ্মকে অনুভূতি করা যায়। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, 'শুধু অনুভূতি নয়, রূপ ধারণ করে কথা কয়।' ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলত, এসব মনের ভুল। তিনি বলতেন, 'কি করে ভুল হবে! মা যে সব কথা বলে সে সব মেলে যে।

"একদিন দক্ষিণ-পূর্ব্ব বারাণ্ডায় হাজরা বসে মালা জপ করছিলেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় হাজরার হাত থেকে মালা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, বললেন, 'এখানে আবার মালা নিয়ে জপ করা কি!' অর্থাৎ যাকে দেখবার জন্য এত তপস্যা তাঁকেই যদি দর্শন পাওয়া গেল তবে আর তপস্যার প্রয়োজন কি।"

"তীর্থ, পূজা, মালা জপ এসব কিছু করতে বলতেন না। ইঙ্গিতে বলতেন, তাঁর কাছে এলেই, তাঁকে দর্শন করলেই চৈতন্য হয়ে যাবে।"

"মহেন্দ্র মুখুজ্যে কিছুদিনের জন্য তীর্থে যাবেন, ঠাকুর শুনে বললেন, 'প্রেমের অঙ্কুর হতে না হ ' যাবে।' যেন জোর করে তাঁর কাছে রাখতে চান।"

মহাপুরুষগণের অধ্যবসায়

"মহাপুরুষদের কি রকম অধ্যবসায়। যেমন মাদি পায়রা ও পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার মুখে খাবার গুঁজতে গেলে ঠোঁট ছিনিয়ে নেয়। সেইরকম যোগিপুরুষ, কিছুতেই ভোগের বশ নয়। মান, যশ, দেহসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ কিছুই চান না। তাঁরা কেবল মায়াবরণ ভেদ করে অনন্তকে দেখতে চান। এঁরাই যোগের পাহাড়ে উঠেছেন। যোগানন্দ পুরুষ তাঁদের eternal life (অনন্ত জীবন)! যোগিগণ এই "আমি"কে খুঁজতে খুঁজতে শেষে দেখেন যে তিনিই বসে আছেন। তাঁকেই বেদান্তে সোহং বলেছে। ঠাকুর বলতেন, 'পিঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিছুই থাকে না। এসব ত্যাগ করতে করতে যা থাকে তাই। এ বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

নূতন মানুষ

বড় জিতেন—সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়লে, মানুষ তখন কি হয়?

শ্রীম—আমরা ঠাকুরকে দেখেছি। সাগরে মেশার পর কি হয়। সে আর মানুষ থাকে না। 'বন থেকে বেরুলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।' আবার তিনি রূপধারণ করে কথা কন। তার পারে—"যোগিভিরগম্যম্।" বলতেন, "মা, একেবারে 'আমি' মুছে ফেললেন—এমন অবস্থা করলেন যে ঘরের যত দেবদেবীর ছবি সব ফেলে দিলাম। মন অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লয় হয়ে গেল। এ অবস্থা রূপের পারে শুনেছি, পুরীতে চৈতন্যদেবের এইরূপ অবস্থা হত।

এই সময় ডাক্তারবাবু শিখদের একখানা "সুখমনী" নামক গ্রন্থ শ্রীমকে দেওয়াতে তিনি তাহা হইতে পড়িয়া শুনাইতেছেন, "ঈশ্বর হৃদয়ে এলে সব বেদ, শাস্ত্র কণ্ঠে বিরাজ করে। শাস্ত্র পড়ার চেয়ে তাঁর নাম করা ভাল। তাঁর নাম সর্ব্বদা স্মরণ করতে হয়। তাঁর কৃপা হলে কাম ক্রোধ সব পালিয়ে যায়। ভগবানে যাঁদের চিত্ত তদ্গত, তাঁরাই ভক্ত। ঠাকুর বলতেন, 'যারা ভক্ত, তাদের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' নানকের মতে, 'এক ঈশ্বর।' তাঁকে নানা লোকে নানা ভাবে ডাকছে। কালী, শিব, ঈশ্বব, God প্রভৃতি তাঁরই বিভিন্ন নাম। যিনি এই জগৎকে ধারণ করে আছেন, তিনিই আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তিকেই ঠাকুর মা, মা, বলে ডাকতেন। আর একমতে আছে মনেতেই জগৎ। যতক্ষণ মন ততক্ষণ জগৎ। মন নাশে জগৎ কোথায়? বলিয়া নানকের প্রসিদ্ধ গান গাহিতেছেন—

> গগনময় থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে।
> তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে॥ ইত্যাদি।

বিরাট গগন থালে চন্দ্র সূর্য্য প্রদীপ জ্বলছে। শিখরা এইরূপ বিরাট ভাবে আরতি করে। নানক তাদের ঐরূপ ভাবে তৈরী করে গেছেন। মঠেও এখন অনেক ব্রহ্মচারী তৈরী হয়েছেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে কত বড মনের বল হয়।

ব্রহ্মচর্য্য পালন

"ছেলেবেলা থেকে যাতে ছেলেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করে Guardian (অভিভাবক)দের সে বিষয় দেখা উচিত। কি করবে ভিতরে উপাধি—

বদরস জমে আছে। কয়েকজন পাগলাগারদ দেখতে গিয়েছিল। একজন পাগল তাদের দেখে বললে, 'দেখুন মশায়রা আমার কোন অসুখ নেই তবুও এরা আমাকে গারদে আটকে রেখেছে।' তার কথা শুনে লোকগুলি ভাবলে যে, বাস্তবিক এর মাথার ত কোন বিকার দেখা যাচ্ছে না, দিব্যি ভাল মানুষ, বুদ্ধিমানের মত কথা কইছে। ঠিক সেই সময় আর একটি পাগল নাচছিল। দর্শকেরা তার দিকে চেয়ে দেখছে। তখন প্রথম পাগলটি বলছে, 'মশায়, আপনারা ওর নাচ কি দেখবেন, এই দেখুন আমার নাচ।' এই বলে সে নাচতে লাগল।"

"যোগশাস্ত্রে আছে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে করতে পূর্ব্বের কুসংস্কারগুলি চলে যায় এবং শুভ সংস্কার দৃঢ় হয়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যকথা এই সব তপস্যা এরই নাম সাধন।"

স্বপ্রকাশ শিব

"আবার বলিতেছেন শম্ভু স্বয়ম্ভু। আমার এখন ৺কাশীর কথা মনে পড়ছে। রাত্রি দশটায় পূজা করতে করতে ওখানে 'শিব শিব শম্ভো' এই শব্দ উচ্চারণ করে। শিব স্বপ্রকাশ। তা থেকে অনাহত ধ্বনি বেরোয়। তাতেই লয় হয়। যোগী পুরুষরা শুনতে পায়। পৃথিবীর ভোগ যাঁরা ত্যাগ করেছেন তাঁদের সর্ব্বত্রই উদ্দীপন হয়। তাঁর কথা কি বলে শেষ করা যায়! শিব পঞ্চমুখে, অনন্ত সহস্রমুখে বলেও অন্ত পেলেন না। 'যোগিভিরগম্যম্'।

ধীরেন—এই বললেন গম্য।

শ্রীম—দুইই আছে। গম্য আবার অগম্য। 'আমি' যখন মুছে ফেললেন তখন কি হয় বলা যায় না। আবার রূপধারণ করে কথা কন।

রাত্রি প্রায় নয়টা। সকল ভক্ত প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৫ ॥

৫ই জানুয়ারী, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শ্রীম স্কুল হইতে ফিরিয়া বৈকালে চারতলার ছাদে বসিলেন, জনৈক সন্ন্যাসী এবং অপব ভক্তেরা আসিয়া শ্রীমর সহিত কথা কহিতেছেন ও নিবিষ্টমনে শুনিতেছেন।

যতদিন শরীর ততদিন কর্ম্ম

সাধু—আপনি এখনও কর্ম্ম করেন?

শ্রীম—হ্যাঁ, এখনও কর্ম্ম করতে হচ্ছে। 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং।' (গীতা ৩।৮) যাঁরা আত্মস্থ তাঁদের কর্ম্মের কোন প্রয়োজন হয় না। নইলে যত দিন শরীর ততদিন কর্ম্ম ত্যাগ করবার জো নাই। 'ন হি দেহ ভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। [গীতা—১৮।১১

সাধুর সাধুসঙ্গ

"আপনি কলকাতায় এসেছেন সাধুসঙ্গ করবার জন্য। সাধুসঙ্গ করা উচিত। গৃহীদেরও সাধুসঙ্গ খুবই প্রয়োজন। সাধুরও সাধুসঙ্গ দরকার। সাধু-সঙ্গ না থাকলে মন মলিন হয়ে যায়। এ পথ বড কঠিন পথ। সেইজন্য মহাপুরুষরা এত কঠিন নিয়ম করে গেছেন। কোথাও যেতে গেলে বা থাকতে হলে মঠের মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতি নিয়ে যেতে হয়। গৃহীদের সঙ্গে মিশতে মিশতে সেই ভাব আসে, এ গরীব লোক ও বড লোক এই সব ভাব জাগে। বড লোক দেখলে তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইতে ইচ্ছা হয়। সেইজন্য টাকাওয়ালা লোক দেখা নিষেধ। ভোগীদের দেখলে নিজেদের ভোগ করবার ইচ্ছা হয়। এ জন্মে না হয় পরজন্মে হবে, এইরূপ বাসনা সুপ্তভাবে থেকে যায়। তারপর আশ্রমের নামে টাকা তুলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলল। কত চাকর-বাকর হল। এই রকম বিলেতে খ্রীষ্টানদের চার্চ্চের নামে কোম্পানীর কাগজ হয়ত দশ-বিশ লক্ষ টাকার আছে তার সুদের টাকায় বামুন, চাকর, গাড়ী, ঘোড়ার খরচ বেশ চলে। বেশ সুখে থাকা যায়।

"একজন লর্ড বিশপ তাদের চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যিশুখ্রীষ্ট পথের ভিখারী ছিলেন। তাঁর ভক্ত হয়ে এই রকম গাড়ী ঘোড়া নিয়ে বাবুয়ানি। এই কি তার আদর্শ।' এই রকম আদর্শ নিয়ে থাকতে থাকতে স্বার্থবুদ্ধি এসে পড়ে। তখন একটা কম্বলের জন্য মারামারি লাঠালাঠি।

"আমি হৃষীকেশে দেখেছিলাম একজন সাধু গরমের সময় বলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় আসন করে রেখেছে। অপর একজন সাধু এসে তাইতে বসায়, ঝগড়া বেঁধে গেল। শেষে জমাদারের কাছে নালিশ। ও সব অঞ্চলে সাধারণতঃ সব শান্তশিষ্ট পুলিসদেরই রাখে। সেই জমাদার এসে, 'আপনারা সাধু, ঝগড়া করতে নেই,' এই সব বলে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলে।

"ঠাকুর যে সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি যথাসাধ্য পালন করা উচিত। বলতেন, 'সন্ন্যাসী মেয়েমানুষের চিত্রপট দেখবেন না, মেয়েমানুষের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা কইতে বা আলাপ করতে নেই।' ছোট হরিদাস মেয়েমানুষের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন বলে চৈতন্যদেব তাঁকে বর্জ্জন করলেন। ঠাকুরের ত বাইরের দিকে হুঁশই নেই। নির্লিপ্ত, তথাপি মেয়েদের সঙ্গে বসে বেশীক্ষণ কথা কইতে পারতেন না। তামাক খাবার নাম করে উঠে পড়তেন। এসব করতেন লোকশিক্ষার জন্য।

"কঠোপনিষদে নচিকেতার গল্প আছে। সে গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, যারা শ্রেয়ার্থী, নচিকেতার মত দৃঢ়সঙ্কল্প, সর্ব্বস্ব-ত্যাগী, এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করতে প্রস্তুত, না খেয়ে মরে যাবে তবু প্রেয় গ্রহণ করবে না।"

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। অনেক ভক্ত আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। বলিতেছেন, "সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে সন্ধ্যার সময় ভগবানকে ডাকতে হয়।" বলিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ধ্যানান্তে গান গাহিতেছেন—

"চল গুরু দুজন যাই পারে,
আমার একলা যেতে ভয় করে।
ও পারেতে দাঁড়িয়ে ছজনা,
পথের পরিচয় না দিলে, নৌকাতে তুলে না।
মাঝি বলে পার করিব,
দাঁড়িরা সব গোল করে।"

গান—"হরি কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীন জনে অধম তারণ-চরণ দিয়ে॥
তরণীর এম্‌নি গুণ নাইকো হাল তার নাইকো গুণ।
চলে সে আপনি তরী অধম-তারণ-চরণ পেয়ে" ॥

"আহা, কাল গৌরীমার স্কুলে একজন সাধুকে দেখলাম, পায়ে ধরে বলতে লাগল, 'গুরু, আমি অজ্ঞান, অন্ধকারে পড়ে আছি, কৃপা করুন যাতে তাঁর পাদপদ্মে অচিরে ভক্তিলাভ হয়।' তার কথা শুনে আমার কান্না পেতে লাগল। তাকে ভুলতে পারব না। যেমনি ভাব, তেমনি তার গান।"

গতকল্য বৈকালে পাঁচটার সময় বীরেনবাবু মোটরে করিয়া গৌরীমার স্কুলে নদের নিমাই কীর্ত্তন শুনিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া আসিবার সময় স্কুলের দরজার সামনে এই সাধুটি শ্রীমর পা ধরিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পুনর্ব্বার গান গাহিতেছেন—

"গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই।
গৌর চাঁদের প্রেম কুমীরে গিলেছে গো সই।
এমন ব্যথার ব্যথি কে আর আছে,
হাত ধরে টেনে তোলায়॥"

গান—"কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে।
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি
দু নয়নে প্রেম বহে শত ধারে॥" ইত্যাদি

গান—"কে হরি বোল, হরি বোল বলিয়ে যায়।
যারে মাধাই জেনে আয়॥
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে।
যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গাপায়,
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথারে,
যেন দেখি পাগলের প্রায়॥"

গান—"গোরা নাচে সংকীর্ত্তনে শ্রীবাস অঙ্গনে
ভক্তগণ সঙ্গে করি ॥ ইত্যাদি

গান—"শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপ্ত কাঞ্চন কায়।
ক'রে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকায়ে চিহ্ন অবতীর্ণ নদিয়ায়।" ইত্যাদি

গানান্তে শ্রীম চৈতন্য চরিতামৃত হইতে মহাপ্রভুর দিব্য-উন্মাদ পড়িতেছেন। ভক্তেরা তাঁহার ভাবপূর্ণ মধুর বাক্যগুলি অবাক হইয়া শুনিতেছেন। পাঠান্তে সকল ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি নয়টা।

॥ ৩৬ ॥

৪ঠা জুলাই, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী

গাছের উপরের ফল ও নীচের ফল

বেলা ২টার পর শ্রীম চারতলার ঘরে শুইয়া গদাধর ও গোপালের সহিত কথা কহিতেছেন। শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—তুমি বই বই করছিলে, বই নিয়ে কি হবে? চিঠিতে লেখা আছে, 'পাঁচ সের সন্দেশ আর দুখানা কাপড় আনবে।' এইটুকু জেনে নিয়ে চিঠি ফেলে দাও। আর চিঠির প্রয়োজন কি? ঠাকুর কেশব সেনের অসুখের সময় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে কৌচ, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিষ ছিল। সেগুলি দেখে ঠাকুর বললেন, 'এগুলির যখন দরকার ছিল তখন ছিল, এখন আর কি দরকার?' জানতে পেরেছেন কিনা যে কেশবের শরীর থাকবে না। পড়, সর্ব্বদা সমাধিস্থ হয়ে ত থাকা যায় না। কলিকালে দেহের দিকে মন যায়। ঠাকুরের নূতন কথা বেরুচ্ছে, পড়তে পারবে। গাছের উপরের ফলও খাও, নীচের ফলও খাও। নীচের ফল স্তোত্রপাঠ, গান, পূজা, প্রভৃতি। উপরের ফল ধ্যান, জপ, ভাব, সমাধি এইসব। ঢেঁকি দেখেছ? একদিক উঁচু হয়ত আর একদিক নীচু। সমাধির পরেও মুক্তপুরুষ লীলা নিয়ে থাকেন।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে আম খাওয়াইলেন

এবং চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত ঠাকুরের কথা দিনলিপি হইতে কিছু কিছু শুনাইতেছেন।

"ঠাকুর বলতেন, 'ভার্য্যাই সংসারের কারণ। বিষ্ণু তার মার জ্বালায় জ্বলে গলায় ছুরি দিলে। ঠাকুর পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে আসছেন। উপরে নূতন মেঘ, দুই একজন ভক্ত তাই দর্শন করছে।"*

"হাজরার কাছে একটি ছেলে আসে, জামার বুকে বোতাম দেওয়া, সে খুব লেকচার দেয়। ঠাকুর দেখে বললেন, 'এরি মধ্যে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, বার্দ্ধক্য সব হয়ে গিয়েছে। নিজের কিছু না হতেই লেকচার। আমার বক্তৃতা ভাল লাগে না।' আর একদিন নরেন্দ্র একটি ছোকরাকে এনেছিল, ঘোর কামী, বাঁকা টেরী কাটা। তাতে ঠাকুর বললেন, 'এমন লোক সঙ্গে করে আনিস নি।'

"আমরা সেদিন ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা শুনে কিছুই সার খুঁজে পেলাম না। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'তিনি (ঠাকুর) একটা বক্তৃতা দিতে পারেন না'।

সমাধ্যায়ী ও ঠাকুর

"সমাধ্যায়ীর একদিন ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে ১১টা হয়ে গেছে। ৮টার সময় যাবার কথা ছিল। ঠাকুর বললেন, 'যাবে না?' সমাধ্যায়ী বললেন, 'এতেও খুশী আছি।' কতরকম প্রকৃতির লোক আছে।"

কথামৃতের মণি

সন্ধ্যা হইল। ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং অপর কয়েকজন আসিলেন। জনৈক ভদ্রলোক সম্প্রতি পুরীতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীম পুরীর গল্প করিতেছেন।

শ্রীম (ভদ্রলোকটির প্রতি)—পুরীর কথা বলুন। দুবেলা মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করতে যেতেন?

ভদ্রলোক—কখনও একবেলা, কখনও দুইবেলা যেতুম। সাধুরাই সব ব্যবস্থা করতেন। শরৎ মহারাজ সেখানে কিছুদিন থাকবেন। লক্ষ্মীদিদি এসেছিলেন। তিনি ঠাকুরের কথা কিছু বললেন।

* সেই ছবি মাষ্টার মহাশয় আঁকাইয়া ছিলেন। এবং ভক্তগণকে তাই দেখাইতেছেন

শ্রীম—পুরী এমন জায়গা যে ঠাকুর বলেছিলেন, 'সেখানে গেলে আমার শরীর থাকবে না।' সমুদ্রে চাঁদের আলো পড়ে দেখেছেন? চৈতন্যদেব জ্যোৎস্না রাত্রে সমুদ্রের ধারে ভক্তসঙ্গে বিচরণ করিতেন। সমুদ্রের জ্যোৎস্না-মাখা তরঙ্গ দেখে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও লীলা তাঁর স্মরণ হত। কখন কখন পার্ষদদের সঙ্গে ভগবানের কথা কইতে কইতে তিনি বিরহে শুয়ে পড়তেন।

ভদ্রলোক—'কথামৃতে' মণি বলে যে ভদ্রলোকের কথা আছে তাঁর শেষ অবস্থা কি হল?

শ্রীম—বলতে পারিনে কি হবে।

উত্তর শুনিয়া কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোক—হাজরার কি হল?

শ্রীম—ঠাকুরের নাম করতে করতে তাঁর শরীর যায়। আমি যখন কামারপুকুর যাই তাঁদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়েছিলাম। ঠাকুর আবার সেই কথা হাজরার কাছে গল্প করেন।

এইবার ভদ্রলোকটি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মুড়ি মিছরির একদর

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পুরীর কথা বেশ শোনা গেল। তারপর বলিতেছেন, "মুড়ি মিছরি এক করতে নেই। গুরু তাঁর এক সাধু শিষ্যকে বললেন, 'যেখানে মুড়ি মিছরির একদর সেখানে থেকো না।' শিষ্য ঘুরতে ঘুরতে যেখানে মুড়ি মিছরির একদর সেইখানেই এসে পড়েছে। সে ভাবলে, 'খুব রোগা হয়ে গেছি। এখানে দিনকতক থেকে খেয়ে দেয়ে মোটা হয়ে চলে যাব।' ইতিমধ্যে সেই রাজ্যে এক চোরকে ধরে, তাকে শূলে দেবার কথা হল। কিন্তু শূলটা ছিল তার পক্ষে মোটা। তাই মন্ত্রীসভা পরামর্শ করে ঠিক করলেন, খুব মোটাসোটা যে কোন লোককে এনে শূলে দিতে হবে। রাজার চরেরা খুঁজতে খুঁজতে সেই সাধুকে ধরলে, বললে, 'তোমাকে রাজার আদেশে শূলে যেতে হবে।' সাধু বললে, 'আমার কি অপরাধ?' তারা বললে, 'যে চোরটি ধরা হয়েছে তার পক্ষে শূলটা মোটা। তুমি মোটাসোটা, সেইজন্য তোমাকেই শূলে যেতে হবে। এ রাজ্যে এই রকম নিয়ম।' সাধু তখন ভাবলে, 'গুরুদেবের কথা না শুনে কি অন্যায়ই করেছি।' তখন সে আকুল হয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগল। ইত্যবসরে

তার গুরু তাকে খুঁজতে খুঁজতে হৈ চৈ শুনে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে শিষ্যকে গায়ের কাপড় খুলতে বললেন। খুললে দেখা গেল গায়ে একটি ঘা রয়েছে। তখন তিনি বললেন, 'শাস্ত্রে আছে, শরীরে কোন রকম ক্ষত থাকলে সে শরীর বলি দেওয়া যায় না। অতএব বিধি অনুযায়ী একে শূলে দেওয়া উচিত নয়।' রাজকর্মচারীরা তখন তাকে ছেড়ে অন্য নাদুসনুদুস একজনকে ধরে শূলে চড়িয়ে দিলে।

"সিদ্ধ পুরুষেরা সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন, তাদের পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নেই। ঠাকুর বলতেন, 'ছাদে উঠে ধেই ধেই করে নাচা যায়। কিন্তু যারা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে তাদের অতি সন্তর্পণে যেতে হয়।' সাধারণ লোককে ভাল মন্দ বিচার করে চলতে হয়, তা না হলে পতনের সম্ভাবনা।"

এরপর ভক্তেরা ছাদে খোল করতাল লইয়া কীর্তন করিতেছেন—

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুই ভাই এসেছে রে।"

॥ ৩৭ ॥

৫ই জুলাই, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল ৭টা। শ্রীম নিজের ঘরে বসিয়া গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিতেছেন। কয়েকজন ভক্ত প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

সমাধিবান পুরুষের লক্ষণ—হৃদয় ও ঠাকুর

শ্রীম—যার সমাধি হয়েছে তার লক্ষণ কি?

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানপমানয়োঃ॥ [গীতা—৬।৭]

সুখ, দুঃখ, মান, অপমান তাঁর কাছে সমান। হৃদয় ঠাকুরকে গালাগাল দিচ্ছে, ঠাকুর নিজের বটুয়া থেকে কাবাব চিনি নিয়ে মুখে ফেলছেন। একদিন হৃদয় খড়ের ব্যবসা করবার জন্য খড় কিনতে গেছে। কালীবাড়ীতে লোকের কাছে বলে গেছে, 'মামা আছে মা কালীর পূজো করবে।' ঠাকুর দেখলেন অনেক বেলা হয়েছে অথচ মা কালীর পূজা হয়নি। তাই তাড়াতাড়ি

রামলালদাদাকে নিয়ে মায়ের পূজো করলেন। হৃদয় এলে ঠাকুর তাকে খুব মারলেন। বললেন, 'শালা, আমি পূজা করব!' হৃদয় বললে, 'মারো মামা আরো মারো।' ঠাকুর বললেন, 'দেখ, আমি যখন রাগব, তুই কিছু বলবিনি। আর তুই যখন রাগবি, আমি কিছু বলব না।' আর একদিন হৃদয় ঠাকুরকে খুব বকেছে। ঠাকুর পোস্তায় দাঁড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের ঘরে অনেক জিনিষপত্র পড়েছিল। তা থেকে কিছু নহবতে গিয়েছিল, তাতে হৃদয় বললে, 'স্ত্রীকে নহবতে রেখে এখান থেকে সব জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছেন।' মা ঠাকুরাণী ঐ কথা শুনে সব ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

বৈকালে শ্রীম একটি ভক্তকে বলিতেছেন, "এখন নড়তে পারিনে। ঠাকুর একে (গোকুলকে) পাঠিয়ে দিলেন, তাই ঘরের গোছগাছ এবং বই বার করা হচ্ছে। ডায়েরী দশ বৎসর ধরে পড়েছিল। 'বসুমতী'র সতীশবাবুর চেষ্টাতে হল। কেবল এসে তাগাদা দিতে লাগলেন, কবে 'কথামৃত' বার করবেন? দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য, তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে নিজ বাড়ীতে লইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীম—আপনি বাড়ীতে নিয়ে সাধুসেবা করেছেন, বেশ করেছেন। ঠাকুর বুড়ো গোপালকে বলেছিলেন, 'এদের একজনকে খাওয়ালে পাঁচশ সাধুকে খাওয়ানো হয়।' তাদের মধ্যে একজনকে সেবা করলেন। অবতারকে কি সকলে ধরতে পারে? বেগুনওয়ালা হীরের দাম ন'সের বেগুনের চেয়ে বেশী দিতে পারে না। জহুরী কেবল ঠিক দাম দিতে পারে। তেমনি সাধুরাই ভগবানের মূল্য বুঝতে পারে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—তুমি উপনিষদ বল ত?

গদাধর উপনিষদ (বৃহদারণ্যক) হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন।
"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত।"
ইত্যাদি।

শ্রীম ভাবে বিভোর হইয়া (শান্তির প্রতি) বলিতেছেন,—"আর ডাক্তারী কেন? ভাবছ এমন দিন হবে?" কেউ বেদ পাঠ কচ্ছে, কেউ পূজাধ্যান কচ্ছে, তাঁর নাম করলে কালপাশ কেটে যায়। সবদিনই যে কষ্ট করতে হবে তা নয়। ঠাকুর বলতেন, 'ভাব পরিপক্ক হলে, তখন মনন করলেই

হয়।' এইবারে শ্রীম গান গাহিতেছেন—

"নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশী দেঁতোর হাসি লোকাচার॥" ইত্যাদি।

॥ ৩৮ ॥

৮ই জুলাই, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

বৈকাল বেলা চারটা। শ্রীম চারতলার ঘরে চৌকির উপর শুইয়া গদাধরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—ঠাকুর আজকে জানিয়ে দিয়েছেন, এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই বৈকুণ্ঠ। ভগবান দর্শন হলে সবই এইখানেই।* ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও ফক্কার। তারাও তাঁকে জানতে পারে না। তাঁকে জানবার জো নেই। সনকাদি ঋষি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের আপনি কিছু ভগবানের বিষয় বলুন এবং কি করে বিষয়াসক্তি যায়? ব্রহ্মা নানা কার্য্যে ব্যস্ত বলে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় তিনি ধ্যান করতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে ভগবান হংসরূপে তাদের কাছে এসে শঙ্কার সমাধান করলেন। দেবতারা মানুষ হতে চায়, কারণ মানুষ-জন্মে মুক্তি হয়।

এইবার পরমহংস উপনিষদ্ হইতে শুনাইতেছেন—"যারা কেবল পেটের জন্য ভিক্ষা করে তাদের পাপ হয়।

কাষ্ঠদণ্ডোধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ
তিতিক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্য শমাদি গুণ বর্জ্জিতঃ
ভিক্ষামাত্রেণ যো জীবেৎ স পাপী যতিবৃত্তিহা
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরব সংজ্ঞকান্" ॥

বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামি ব্রাহ্মণ হইতে বলিতেছেন—

* হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্ব হৃদি প্রাণা প্রতিষ্ঠিতাঃ
হৃদি প্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রং তদ্বিদুর্বিতি। [ব্রহ্মোপনিষদ

তিনি সকলের মধ্যে আছেন, সকলকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানতে পারে না। যেমন চিকের আড়ালে লোক থাকে তারা সকলকে দেখতে পায়, তাদের কেউ দেখতে পায় না। সেইরূপ পরমাত্মা সকলের অন্তরে এবং সব দেখেন কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই সব জানেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

সন্ধ্যা হইল। একে একে ভক্তগণ আসিয়া ছাদে সমবেত হইয়াছেন। এইবার মানিক খোল লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণও তাহাতে যোগ দিলেন। কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে
তাবা তারা দুভাই এসেছেরে।

গান—"গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরমদয়াল হে। ইত্যাদি।

"হৃদি কমলে মঞ্চেদোলে করালবদনী (শ্যামা)।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী—(ওমা)

গান—"ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকবের অগাধ জলে।
রত্নাকব নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে॥
দম সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলীনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝেরে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে॥
তুমি ভক্তি কোরে কুড়ায়ে পাবে, শিব যুক্তি মত চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে॥
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে
প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে বতন ফলে ফলে।

কীর্ত্তন শেষ হইল। শ্রীম গানের অর্থ করিতেছেন—

"শিব যুক্তি মত চাইলে মানে—গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে সাধন ভজন করলে অনায়াসে সাকার নিরাকার দর্শন পাওয়া যায়। 'ঝম্পদিলে' মানে—সন্ন্যাস-সবত্যাগ-সবমনটা কুড়িয়ে তাঁকে দেওয়া। যেমন কাপড় কিনতে গেছ পয়সা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে ষোল আনা না দিলে কাপড় দেবে না, একটা পয়সা কম হলেও দেবে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলেছিলেন—সর্ব্বধর্ম্মান্

পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। (গীতা—১৮।৬৬) আমাকে স্মরণ কর যুদ্ধ কর। যদি না শোন তাহলে বিনাশ হবে। অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। (গীতা—১৮।৫৮) অর্থাৎ তিনি যন্ত্রী যেমন চালাবেন তেমনি চলতে হবে। ভীষ্মকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে নিলেন কিন্তু এদিকে তিনি জিতেন্দ্রিয়, অষ্টবসুর এক বসু।”

এইবার ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৯ ॥

১ই জুলাই, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকালবেলা প্রায় ৭টা হইবে। শ্রীম চারতলার ঘরে চৌকিব উপর বসিয়া ধ্যান কবিতেছেন। অনেক ভক্তবৃন্দও উপস্থিত। ধ্যানান্তে দ্বিতীয় ভাগ কথামৃতের প্রুফ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন—“সুরেন্দ্রর কি ভালবাসা। সব টাকা দিয়ে আলমবাজার মঠ চালালেন। স্বামীজী বিলাত থেকে এসে পূর্ব্বের পাইপইসার টানা (শিয়াগাডী) গাড়ীতে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। বললেন, ‘আমার এসব ভাল লাগছে না। আমেরিকার টাকা থেকে খাব না’। ভিক্ষা করে খেলেন।

ওমারকে যখন রাজপোষাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, খানিকক্ষণ পরে সেই পোষাক থু থু করে ফেলে দিলেন। তালপাতা শেলাই করা চাটাইতে শয়ন করতেন। গরমের জন্য শেলাই করা একটি জামা এবং শীতকালেব জন্য অন্য একটি জামা ব্যবহার করতেন।* তিমিই মহম্মদকে মারতে গিয়েছিলেন। মহম্মদকে দেখে তাঁব স্বভাব বদলে গেল।”

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম দুইতলার বারাণ্ডাব বেঞ্চিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

* Omer has food consisted of barley bread and dates or olive ; His drink was pure water. His bed padding of palm leaves. He owned only two coats—one for summer and other for winter and both were conspicuous dy Intensive patch work. [A History of the Islamic people.

ভক্তেরাও অনেক সমবেত হইয়াছেন। ভক্তেরা ছাদে যাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

কালীনাম সাধনা করে এবার আমি কাল কাটাব

গুরুপদ ভরসা কর। গুরু গুরু বলে সংসার সাগর তর॥ ইত্যাদি।

শ্রীম ছাদে আসিয়া উৎসাহভরে বলিতেছেন—"কীর্ত্তন হোক্ হোক্। গুরুই কর্ণধার। হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। নারদ দক্ষরাজার দশ হাজার ছেলেকে উপদেশ দেওয়াতে তারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে শরীর ত্যাগ করে ফেললে। গুরু উত্তম অধিকারী দেখলে ডেকে মন্ত্র দেন। ভোগান্ত হলে ব্যাকুলতা আসে। যাদের সংস্কার নেই তারা বলে হাঁ হাঁ। ছেলে হল ত তাকেও ঐ রকম শিখালে; ঘর-সংসার দেখা, চাকরি করানো, বিয়ে দেওয়া প্রভৃতি। যেমন মেথর ছেলেকে গুয়ের ভার বহা শিখাচ্ছে। যদি কেউ বলে তোমরা আপনার লোক নও তাহলে ওরা বলবে পাগল হয়ে গেছে। এর নাম মায়া। একজন লোক বৈরাগ্য করে ঘর বাড়ী ছেড়ে গেরুয়া পরে দশবছর কাশীতে ছিল। বাড়ীর লোকেরা কাশীতে বাড়ী ভাড়া করেছিল তাকে ধরবার জন্য। একদিন শালী গিয়ে তার কাছে বললে, এই জন্য কি রাগ করতে আছে? এই নাও কাপড় পর, পরিবার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। গেরুয়া ছেড়ে পুনরায় সংসারী হতে হল।"

রাত্রি হইয়াছে, ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪০ ॥

১১ই জুলাই, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল ৭টা। কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। শ্রীম চারতলার ঘরে আছেন ও কথা কহিতেছেন।

শিক্ষকতা

(ভক্তদের প্রতি)—গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া—"ইনি কাল এই স্কুলে পণ্ডিতগিরি করেছিলেন, শেষে ছেলেরা গোলমাল করায় হাল ছেড়ে দিয়ে

বসে রইলেন। একজন খেতে বসেছে, উপরে দুখানা লুচি, তলায় তৈলপক। তেমনি তোমায় বুঝেছি। বিদ্যাসাগর মশায় আগে স্কুলে মাষ্টারদের বসিয়ে দিতেন, দেখতেন ছেলেরা গোলমাল করে কিনা।

"একজন ঠাকুরের কাছে কামারপুকুরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে 'আমি যাতে হাত দিচ্ছি তাই খারাপ হয়ে যায়।' ঠাকুর শুনে নাচতে লাগলেন। বললেন, 'প্রবৃত্তির চেয়ে নিবৃত্তি ভাল'। দেখছি সব তাতে সিদ্ধপুরুষের দরকার। তা না হলে সাধারণ লোক কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, বুঝতে পারে না। নিজের যে বিষয়ে আসক্তি আছে, সেইটে বাদ দিয়ে বলে। শাস্ত্র কে বুঝাবে? যে সে গুরু হলে হয় না, যেমন—শ্রীকৃষ্ণ, পবমহংসদেব। তা না হলে নিজেকে প্রচার কবে। যারা ঐরূপ কবে তাদের মহাবৌবব কুণ্ড। লোকে Highest man চায়, তাদের Low Ideal দিয়ে নীচু করে দিচ্ছ ত পাপ হবে না?

মহৎ লোক

"স্বামীজী যখন খেতে পাচ্ছেন না তখন তাঁকে বিদ্যাসাগব স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পডাতে ছেলেরা কূট করে বললে 'ভাল পডাতে পাবেন না'। বিদ্যাসাগর মশায আমাদের বললেন, আমরা আবাব স্বামীজীকে সেই কথা বলি। যিনি এত বডলোক, পরে যাঁর লেক্‌চার শুনে সারা জগৎ মুগ্ধ হয়েছিল। আর একদিন একজন স্বামীজীকে বললে, বহুবাজারে একজনের বাডীতে ছেলে পডাবার কর্ম্ম আছে; ছেলে পডাতে যেতে হবে। তাব সঙ্গে সিমুলিয়া থেকে বহুবাজার পর্য্যন্ত এসে রাস্তায় বললেন, 'আপনি আসুন আমি যাব না। এতটা রাস্তা ধরে তাঁর হৃদয় মধ্যে আন্দোলন চলছিল। 'আবার লোকের বাড়ী গিয়ে পডান আমার দ্বারা হবে না।' মহৎ লোক কিনা! আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'ঈশ্বর নেই।' ঠাকুর শুনে বললেন 'অস্তি নাস্তি দুটো আছে, তুমি অস্তিটা নাও না'। বিলাত থেকে যখন স্বামীজী ফিরলেন, বললেন, যারা দুঃখ কষ্ট না পেয়েছে তারা ত কচি-খোকা, তাদেব সঙ্গে কি কথা কব। দুঃখ কষ্ট না পেলে কি মহৎ লোক হয়?

"এখন দেখি ছোট ছোট মেয়ে, শাশুড়ী হয়ত একটা কথা বলেছে, কেরোসিন ধরিয়ে আত্মহত্যা করলে। এই রকম লোক মরাই ভাল। ঠাকুরের কাছে কষ্টের কথা উঠলে পাণ্ডবদের কথা বলতেন। ঠাকুর গলায়

অসুখে দশমাস ভুগলেন। আচ্ছা গর্ভের কষ্ট শাস্ত্রে এত বলেছে কেন? কিছুই মনে নাই। এক যদি বল মায়ের গর্ভে যোগে ছিলাম, আর যদি বল শরীরটা মাংসের ডেলা, দুইদিক দিয়ে দেখলে কষ্টের কথা উঠে না। জন্ম হয়ে যদি বল দুঃখ, ঠাকুর তার উত্তরে বলতেন, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, তিনি সব হয়ে রয়েছেন। সব ভেসে গেল। তাঁর কথা যদি মনে রাখা যায়, তাহলে আর কোন গোলমাল থাকে না।"

বেলা ৯টা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম নিজের চারতলার ঘরে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্তেরা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। ধ্যানান্তে শ্রীম ছাদে আসিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন।

বরাহনগর মঠে ব্যাকুলতা

শ্রীম—আজকে কথামৃতের প্রুফ পড়ছিলাম. নরেন্দ্র কি কথাই বলেছেন। বরাহনগর মঠে টাটকা এসেছেন কিনা। হালে ঠাকুরের শরীর গিয়াছে। গুরুভাইদের কুমার বৈরাগ্য। তাদের লক্ষ্য করে নরেন্দ্র বলছেন—'পড়ে থাক্ তুই কি বুঝবি কীটস্য কীট।' বরাহনগর মঠে তাদের কি ব্যাকুলতা দেখেছিলাম! কেবল কিসে ভগবানকে পাব, এই চিন্তা। বলছে পঞ্চতপা করলে হয় না; কেউ বলছে নর্মদা তীরে গিয়ে তপস্যা করব। তাঁর জন্য তাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ হচ্চে। যেমন চাতক বৃষ্টির জল ছাড়া আর কিছু খাবে না। আরাম চেয়ারে বসে সিগারেট মুখে দিয়ে বললে কি আর ভগবান লাভ হয়? কেউ কেউ বলে কি করব? কেন তার নাম কর। 'নামেরি ভরসা কেবল শ্যামাগো তোমার।' ঠাকুরের সে ব্যাকুলতা হয়েছিল, আর চৈতন্যদেবের হয়েছিল। শচীদেবী শ্রীবাসকে বলছেন, 'আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়, আঁখিনীরে বুক ভেসে যায়. বল বল এভাব কেমনে যাবে?' নিমাই—'কিবা হেতু কিছু নাহি জানি, প্রাণ টানে কি করি, সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকুল পাথারে।' আপনারা এই (পদ্য) কেউ জানেন? এরূপ আকুলতা আসলে ভগবান দর্শন হয়। কোথায়, আজ নাম হল না?"

মানিক খোল লইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীম—আজ বড় জিতেনবাবু অমৃতবাবু আছেন এঁরা নৃত্য করবেন।

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—

(১) যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে তারা তারা দুভাই এসেছেরে।

(২) গৌরনিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে।

(৩) হৃদি কমলে মঞ্চেদোলে করালবদনী।

(৪) এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে।

ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। কীর্ত্তন থামিল। শ্রীম আবার কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগ হইতে নিমাই চরিত শুনাইতে লাগিলেন। রাত দশটা। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪৮ ॥

১৪ই জুলাই, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শ্রীম সকালে ছাদে বসিয়া আছেন। কয়েকজন ছাত্র Student's Home হইতে শ্রীমকে লইয়া যাবার জন্য এসেছেন। কারণ তাদের সেখানে (বহুবাজারে) গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মাঠের সাধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। পূজা, পাঠাদি হইবে এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ও খোকা মহারাজ আসিবেন।

শ্রীম—আমার শরীর তত ভাল নয়, আমার প্রণাম তাঁদের জানাবেন।

অনেক ভক্তেরা সেখানে (Student's Home) গেলেন। বেলা দুইটার সময় ভোলাবাবু শ্রীম-র জন্য (Student's Home) হইতে প্রসাদ আনিয়াছেন। শ্রীম ঘরে শুইয়া আছেন বলিয়া তিনি ৪টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বসিয়াছিলেন। চারটার পর শ্রীম দরজা খুলিলেন ও ভোলাবাবুর নিকট হইতে ছাত্রাবাসের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভোলাবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

প্রসাদ মাহাত্ম্য

টিনের বারাণ্ডায় বসিয়া শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—Student's Home-এ কেমন দেখলে ?

গদাধর—খানিকক্ষণ দেখে ফিরে এসেছিলাম। আবার রাস্তায় ভাবলাম এ ছেড়ে কোথায় যাব! আবার গেলাম।

শ্রীম—দেখলে সাধুসঙ্গে আনন্দ হয়। সাধু সর্ব্বত্যাগী কতবড় আশ্রম। সাধুসঙ্গ করা, তাদের প্রণাম করা, যে সেবা করছে তাদের সেবা করা তাদের দর্শন করা। যেখানে সাধুরা এসেছেন শুনবে সেখানে যাবে। না গেলে অপরাধ হয়। যেখানে তাঁর নামগুণগান হচ্ছে সেখানেও যাবে। আমি বুড়ো হয়েছি যেতে পারলাম না। সাধুদের আগমন হয়েছিল, বুড়ো বলে সবাই মাপ করেন। শুনলাম সেই ভদ্রলোকটি প্রসাদ নিয়ে আড়াই ঘণ্টা কাল বসে ছিল। তা কি করতে আছে? ধাক্কা মেরে উঠাতে হয়। প্রসাদ মানে কি? ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আবার সাধুরা। তার জন্য প্রসাদ আগে মাথায় ঠেকাই। প্রসাদ মানে এই সংসারে যিনি রেখেছেন তিনি আমাদের ভুলেন নাই। তোমাদের দক্ষিণেশ্বরে রেখেছেন তাঁর অপার করুণা। তাই জন্য মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে লুকিয়ে পালাই। 'মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাই দেখে।' পাছে গাড়ীতে অনেক লোক উঠে সে জন্য একলা যাই। সেই দক্ষিণেশ্বরের ভাব এখনও রয়েছে, বুঝেছ?

গদাধর—আজ্ঞে হাঁ।

এই সময় অন্য একজন ছাত্র আসিলেন—

শ্রীম (ছাত্রটির প্রতি)—তুমি আজ Student's Home-এ যাও নি?

ছাত্র—না। আজকে ভোলানাথ আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দজীর বক্তৃতা হইবে।

শ্রীম (গদাধর ও শচীনের প্রতি)—যাও দেখে এস।

শচীন—আসতে দেরী হবে, ভাত জুড়িয়ে যাবে, মেসেতে খাই।

শ্রীম—একদিন ঠাণ্ডা ভাত খেতে পার না?

ডাক্তারের গাড়ীতে শ্রীম বহুবাজারে Students Homeএ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভক্তেরা আসিয়াছেন।

শ্রীম (শচীনের প্রতি)—কি শুনলে?

শচীন—একজন বাবু লেকচার দিয়েছিলেন।

শ্রীম—বাবু কি লেকচার দেবে, সাধুসঙ্গ নেই। 'বল দেখি ভাই কি হয় মলে, জলের বিম্ব জলে মিশায় জল হয় সে মিশায় জলে'। ব্যাকুলতা হলে তবে বুঝিয়ে দেবেন। প্রাণ ছট্‌ফট্ হওয়া যাই। যেমন চাতক সাতসমুদ্র ভরপুর রয়েছে, খাবে না বৃষ্টিজল ছাড়া।

রাত দশটা। Student's Home হইতে যে প্রসাদ আসিয়াছিল সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৫ই আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে একমাস থাকিয়া তথা হইতে বেলা ৩টার সময় মা কালীর প্রসাদ হস্তে স্কুলবাড়ী আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহার নিজের ঘরে চাবতলায় ছিলেন। গদাধর প্রণাম করিয়া মায়ের প্রসাদ দেওয়ায় তিনি হাতে করিয়া একটু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন সকল ভক্তদের দিতে।

ঠাকুরের শেষ অবস্থা

একজন ছেলের Typhoid জ্বর, তাই বলিতেছেন "তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিও। ও ভক্ত। ও ঠাকুরের ছবি দেখবে বলে চেয়েছিল। এখন তার বিপদেব সময়। ওর এখন দুর্দ্দিন পড়েছে, জন্ম মৃত্যু পথে আনাগোনা করছে। এখন যে তাকে ভগবানকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ত সুহৃদ্। ঠাকুব দশমাস ধবে ভুগেছিলেন। গলায় ঘা হয়ে গিয়েছিল। গলার ক্ষতস্থান থেকে এক সের দু সের রক্ত পড়ত। ভক্তেরা সেবা করে পরিশ্রান্ত। ডাক্তাবেব হাত ধরে কাঁদতেন, ভাল করে দাও বলে। যাই একটু বল পেতেন অমনি ভগবানের কথা কইতেন।"

ঠাকুরের কথা কহিতে কহিতে শ্রীম-র চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। আবার কথা কহিতেছেন—

"তাঁর চরিত্রের দ্বারা দেখিয়ে গেলেন, শরীরধারণ করলে রোগশোক আছে। তা বলে ভগবানকে ভুলো না। (ভক্তের প্রতি) তুমি তাস খেলা জান? চার বকম রঙ্গ আছে, হরতন, রুহিতন, চিড়িতন, ইস্কাবন, ইত্যাদি। ভাগ ভাগ করে রেখে আবাব মিশিয়ে দেয়। সেইরূপ মানুষের বিকারের সময় রূপরসাদি মিশে এক হয়ে থাকে। (ভক্তের প্রতি) দক্ষিণেশ্বরের খবর বল।

ভক্ত—সব ভাল। একদিন মঠের সাধুরা সেখানে সব গিয়েছিলেন। তাঁরা পঞ্চবটী ও বেলতলায় বসে ধ্যান জপ করলেন। একজন সাধু আমাদের কালীবাড়ীতে প্রসাদ পাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন এবং আমাকে বলেছেন মার জন্য কিছু কিছু ফুল তুলবার জন্য।

সেবা—রসিক মেথর

শ্রীম—বেশ করছে, মা আহ্বান করে কাজ দিলেন। তিনি কি জানেন না কার কি দরকার। তোমরা তপস্যা করছ সকলের মঙ্গল হবে। (ভক্তদের প্রতি) একে বলেছিলাম 'যেবা ভক্তি পায় সেবে সেবা পায়।' খোসামুদ করে কাজ করতে হয়। রসিক বলে এক মেথর কালীবাড়ীতে ঝাড়ুর কাজ করত। একদিন ঠাকুরের পায়ে পড়ে বলতে লাগল, 'প্রভো আমার কি কিছু হবে না?' ঠাকুর বললেন, 'সেকি তুই মায়ের কাজ কচ্ছিস, ভয় কি?' সত্যি তাই হল। তার যখন অন্তিম অবস্থা তুলসী গাছের গোড়ায় তাঁর নাম করতে করিতে শরীর যায়। যারা তাঁকে (ঠাকুরকে) না মানতো তাদের সরিয়ে দিলেন, হাজরা আর দুজনকে। যে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকছে তার কাছে ঠাকুর দৌড়ে যেতেন। মা কি তার জন্য ভাবছেন না!

সন্ধ্যা আগত। শ্রীম ঘরে ধ্যান করিতে গেলেন, ভক্তগণও ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানের পর শ্রীম ভক্তদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন কোরাণ ও অন্যান্য উর্দ্দু ভাষা গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁর বাঙ্গলা অনুবাদ লইয়া মুসলমানেরা পড়িয়া থাকেন। তাঁর (গিরিশচন্দ্র সেনের) শরীর গিয়াছে। সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে তথায় বক্তৃতাদি হইল।

॥ ৪৩ ॥

১৬ই আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল ৭টা। চারতলার ঘরে শ্রীম চৌকির উপর বসিয়া আছেন। নিকটে কয়েকজন ভক্ত। কল্যকার ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদি সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম—গিরিশচন্দ্র সেন কি কাজ করেছেন! এদেশের মুসলমানেরা উর্দ্দু ভাষা জানে না। তাঁর বাঙ্গলা অনুবাদ পড়ে তারা তাদের শাস্ত্র বুঝতে পারছে।

ভক্ত—আমরা দক্ষিণেশ্বরে মহরম ও ঝোলন দেখলাম।

শ্রীম—তোমরা যা যা দেখবে একটা পোস্টকার্ডে সেইগুলি সব আমাকে লিখবে।

ভক্ত—কৃষ্ণা জন্মাষ্টমীর দিন মঠে গিয়েছিলুম। সেদিন রাত্রে ছিলাম। মঠে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আছেন, তিনি আমাদের বললেন, আজ রাত্রে থাক, কাল বিকেলে যেও। তোমরা ঠাকুরের স্থানে রয়েছ তাঁর খুব কৃপা।

সদ্‌গুরু, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য

জনৈক ভক্ত—আপনি আমাদের ব্রহ্মচর্য্য দিন।

শ্রীম—তোমরা ঠাকুরের কাছ থেকে নাও। এই সব প্রতিজ্ঞা আছে—সত্যকথা, ভগবান বই অন্য কথা নয়, ভিক্ষাবৃত্তি, মেয়েমানুষের কাছে বসে কথা না কওয়া। নিয়মে জপধ্যান করা ইত্যাদি।

ভক্ত—সন্ন্যাসীর কি নিয়ম?

শ্রীম—সন্ন্যাসীর এত নিয়ম করতে হয় না। মেয়েমানুষের চিত্রপট দেখবে না। টাকা স্পর্শ করবে না।

ভক্ত—শুনতে পাই ঠাকুর সব্বাইকে মন্ত্র দিতেন। অনেককে সন্ন্যাস দিয়েছেন, ছুঁলে সমাধি হয়ে যেত।

শ্রীম—ওসব কথার দরকার কি?

ভক্ত—এসব কথা সত্য কি না?

শ্রীম—যে যেমন চশমা পরেছে সে সেই রকম দেখছে। একজন ঠাকুরকে বলেছিল, আপনাকে বুঝা বড় শক্ত।

ঠাকুর শুনে হাসতে লাগলেন। বললেন, অচিনে গাছ দেখেছ! সকলে কি তাঁর কথা নিতে পারে! যে যেমন ধাপে উঠেছে সে তার নীচের ধাপের কথা বলতে পারে। যে ছাদে উঠেছে সে সব খবর বলতে পারে। সদ্‌গুরু কে? যিনি সব ভোগ ত্যাগ করেছেন। সে ত নিজের দিকে টেনে কিছু বলবে না। ঠাকুরকে দেখতাম ভোলানাথ। সেবা করবার জন্য বলা নাই। যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় করত, বলতেন, 'মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।' শেষকালে বললেন, 'মা আমার শরীর রাখবেন না'। ভক্তেরা সেবা করে, পরিশ্রান্ত, পারে না। সহস্র জন্ম ধরে চিন্তা করলে বুঝা যায় না।

বেলা হইয়াছে, সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

॥ ৪৪ ॥

১৭ই আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শরীরের অবস্থা—যন্ত্রী

বৈকালবেলা পাঁচটা। শ্রীম চারতলার বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। কাছে অনেকগুলি ভক্ত। রাখালবাবুও আসিয়াছেন।

রাখালবাবু—আমি এতদিন আসতে পারিনি, শরীর অসুখ, কোথাও যেতে সাহস করছি না। আপনি বলেছিলেন সাধুসঙ্গ, তীর্থ, নামজপ করতে, তাও করতে পারছি না। এখন বসে আছি মন দুর্ব্বল।

শ্রীম—তা বই কি, তিনি যেমন করাবেন। জন্মের আগেও খবর নাই মৃত্যুর পরেও খবর নাই। ঠাকুর বলতেন, যতক্ষণ এই আমিটা রয়েছে, ততক্ষণ ভক্তি প্রার্থনা নিয়ে থাকা।

এই শরীরকে শোয়ান, খাওয়ান, আবার স্বপ্ন, প্রলাপ, জাগ্রত, সুষুপ্তি সব তাঁর হাতে। যারা মুক্তি চায় তারা জ্বালায় বৈরাগ্য করে পালিয়ে যায়। কোথায় পালাবে? যেখানে পালাবে সেখানেও তাঁর হাত। যাই একটু কষ্ট দেখলে অমনি good morning করে চললেন, আর একটু বেদান্ত পড়ল হয়ে গেল। ঠাকুর বলতেন, 'এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও'। ঠাকুর বলতেন—'আমার মুক্তি হবে না'।

ভক্ত—মুক্তি মানে কি পালানো, না জন্ম দিও না?

শ্রীম—ওই কষ্টের ভয়ে। যারা ঈশ্বরকোটি তাদের মা যেমন করান, মার কোলে থাকলেই হল। 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ'।

ভক্ত—কেউ কেউ বলে জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে গেলে আর অংশ, কলা, থাকে না।

শ্রীম—তপস্যা কর, তপস্যা বিজিজ্ঞাস্ব। ঠাকুর স্বামীজীকে বললেন, 'ওরে, তোর সোঽহংএর দিক দিয়ে নয়'। স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন, বলরামবাবুর বাড়ীর ছাদে আমার সাথে কথা হল, স্বামীজী বললেন, ঠাকুরের সেই কথা এখনও বুঝতে পারছি না। অবতার তত্ত্ব বুঝা বড় শক্ত।

তিনি যদি বুঝিয়ে দেন তবে হয়। শ্রীম গান গাইতে লাগিলেন—

(১) "মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই। ইত্যাদি—

(২) "শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার,
দুর্গমে শ্রীদুর্গাবিনা কে করে নিস্তার। ইত্যাদি—

'তাঁর শরণাগত'। (গোকুলের প্রতি) ঐইটে, লক্ষ্মণের উক্তি বল ত।

গোকুল—আয়মন গাঁথি আয় দুইজনে চিকন মালিকা।
রঘুবীর বসিবেন রাজ সিংহাসনে,
পরাব যতনে নিজ করে এই মনোমত মালা। ইত্যাদি—

সাধুদের আচরণ

স্তব পাঠের পর শ্রীম বলিতেছেন—(ভক্তদের প্রতি) "একজন ছেলে বয়স ১৬।১৭ হইবে। বৈরাগ্য করে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিছল। পরিব্রাজক অবস্থাতে কি কি দেখেছে, তার অভিজ্ঞতা কি হয়েছে, সেইগুলি বসুমতী মাসিক পত্রিকাতে লিখেছে। এইটে তোমরা দুজনে (গদাধর ও গোকুলের প্রতি) মুখস্থ করতে পার। নিজে বলিতেছেন—

অস্থির হইয়া আমি সংসার জ্বালায়,
পলাইনু ঘর ছাড়ি গভীর নিশায়।
বৈরাগ্যের ঝুলি আর হরিনাম মালা,
এগুলি লইনু সঙ্গে ভুলিবারে জ্বালা।
কত তীর্থ হেরিলাম ভূধর কানন,
ভাবিলাম হয়ে গেছি সাধু একজন।
বিস্ময়ে হেরিলাম শেষে বৈরাগ্যের ঝুলি,
হয়ে গেছে মস্ত এক বাসনার থলি।

অন্য একজন সাধু সেই ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অনেক জায়গা বেড়িয়ে কোথায় কেমন সাধু দেখলে? ও ছেলেটি বললে, কেবল গেরুয়া, মালা, পেটের চিন্তা। যেখানে ভাণ্ডারা হবে সেখানে যাওয়া। ১০ জন নিমন্ত্রণ স্থলে ৩০ জন উপস্থিত এই রকম. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের কাছে

এসে বললেন, 'কোথাও কোথাও দেখলাম দু আনা, এক আনা, এখানে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা'।

শ্রীম (রাখালবাবুর প্রতি)—মাঝে মাঝে আসবেন।

রাখালবাবু—সে ত আমার ভাগ্য।

তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীম ছাদে বেড়াচ্ছেন। গোপাল ধ্যান করছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। এমন সময় খোকামহারাজ, উপেন মহারাজ আসিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীম তাঁহাদের জলযোগ করাইয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। সঙ্গে অনেক ভক্ত।

প্রথমে লালসেনের বক্তৃতা হইল। তিনি বললেন, 'ঠাকুরের সঙ্গে হীরানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঠাকুর তাঁকে খুব ভালবাসতেন। আমরাও কখন তাঁকে দর্শন করতে যেতাম। বেলঘরে ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে দেখেন এবং কেশবের অসুখে, তাঁকে দেখতে গিয়াছিলেন। জগতের হিতের জন্য পরমহংসদেব, চৈতন্যদেব, ও ক্রাইষ্ট এসেছিলেন ইত্যাদি'।

শ্রীম সেখান হইতে আসিয়া দুতলায় ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন—"লালসেন পরমহংসদেব ও ক্রাইষ্টকে এক class করেছেন। যত দিন যাবে ততই লোক ঠাকুরকে বুঝবে। ঠাকুর ব্রাহ্মদেব বলেছিলেন 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম করলে, এখন দিন কতক মাব নাম হরিনাম কর।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। ভক্তরা প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

॥ ৪৫ ॥

১৮ই আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকালবেলা আটটা। শ্রীম চরতলায় নিজের ঘরে চৌকির উপর উপবিষ্ট। কাছে কয়েকজন ভক্ত। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে ঠাকুরের কথা বাহির হইয়াছে তাহাই শ্রীম শুনাইতেছেন—'ভার্য্যাই সংসারের কারণ'। (মনোরঞ্জনের প্রতি) আমি বড় সেয়ানা বলবার যো নাই। আবার হাবুডুবু খাইয়ে দেবেন। তাই তাঁর শরণাগত। সদা তাঁর কাছে মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, দেহসুখাদি দিও না, এই বলে প্রার্থনা করতে হয়। কারণ আমাদের প্রকৃতিতে সেইগুলি আছে কিনা। ঐরূপ

প্রার্থনা করলে তিনি ব্যাঘাত দিয়ে দেবেন। ঠাকুর বলতেন, 'দেহসুখ চাই না'। তিনি বলতে পারেন।

ওঃ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি। প্রমথবাবুর কাছে ঠাকুরের সময়কার খবরের কাগজ আছে, ৫০ বৎসরের কথা। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনারা যান, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা শুনে সেই খবরের কাগজ নিয়ে আসবেন।

অন্তরঙ্গ—অহৈতুকী কৃপা

বেলা প্রায় তিনটা। ব্রাহ্মসাজের কথা হইতেছে।

রজনী—ঠাকুরকে তাঁরা দেখেছেন, কেন যে ওরা ওই রকম হয়ে গেল।

শ্রীম—ভালই হয়েছে, মঙ্গল হবে। ঠাকুর সকলের সঙ্গে মিশতেন। আবার যখন একলা থাকতেন সমাধিস্থ, তখন কারও সঙ্গে মিলত না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বেদান্তী তিনি সব করেছেন। যে যেমন ধাপে রয়েছে তাকে সেইরূপ উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মদের বলতেন, 'তোমরা নিরাকার নিরাকার কর, তাই কর, টানটুকু নাও। তাঁকে কি সবাই ধরতে পারে। ৫০ বার দেখলে কি হবে? কতকগুলি অন্ধ হাতীকে স্পর্শ করেছিল, যে হাতীর পা ছুঁয়েছিল সে বললে হাতী স্তম্ভের মত, যে কান ছুঁয়েছিল সে বললে কুলোর মত ইত্যাদি ভাবে বলেছিল।' তিনি যাকে কৃপা করে বুঝিয়ে দেন সেই বুঝতে পারে। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। (কঠোপনিষদ্)। এক একজন কুড়ি বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে ছিল বুঝতে পারে নি; বলত, একটা পাগলা বামুন। অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন বিশ্বরূপ দেখবার জন্য। কি গুণে যে আমাদের এত কৃপা করেছেন মনে করলে শরীর রোমাঞ্চ হয় অশ্রু ঝরে। বলতেন, 'যারা আপনার লোক বকলেও তারা আসবে'। আরও বলতেন, 'এইখানেই আসবে, জানতেন কিনা এইখানে সব পাবে। ঠাকুরের অসুখের সময় অমৃতকে বললেন, 'এইখান থেকে গাড়ী ভাড়া নিও'। বালিতে চিনিতে মিশেল আছে বালিটুকু বাদ দিয়ে চিনিটুকু নেওয়া। দুধে জলে মিশে আছে। জল বাদ দিয়ে হাঁস দুধ খায়। যারা পরমহংস তারা নিতে পারে।

এই সময়ে একজন শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তমত জিজ্ঞাসা করায় বলিতেছেন —নাম করা আসল। যিনি নিজে শঙ্করাচার্য্য তিনিই বেদান্তের তত্ত্ব বুঝতে পারেন। এখন কত লোক নিজের মত তাতে ঢুকিয়েছে। সেই তত্ত্ব

বুঝবার জন্য গুরু চাই। Dispensaryতে (ঔষধালয়ে) কত label মারা ভাল ভাল ঔষধ আছে। নিজে একটা নিয়ে খাও না তাহলে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। 'যদি ছিল রোগী বসে, বদ্দীতে শোয়ালে এসে'। বুঝিয়ে দাও বলে তাঁকে প্রার্থনা কর। বাহিরের লোকের মিশেল আছে ওসব বাদ দিতে হয়। সিদ্ধ-পুরুষ সব বুঝতে পারেন। ঠাকুরের অসুখের সময় না বুঝে কত লোক পালিয়ে গেল।

আবার ভাবে বলিতেছেন—

যং লব্ধা চাপবং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। গীতা, ৬।২২
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একনিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষী ভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ,
গুকবেব পবম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।
অজ্ঞান তিমিবান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মালিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ।

যিনি জানিয়ে দেন বালি, চিনি, বিদ্যা, অবিদ্যা, সাধু, অসাধু, তিনিই গুরু। ঠাকুব রাতদিন ভগবানের সঙ্গে কথা কইতেন। যারা সংস্কারবান তাবা তাঁকে ছাডত না। যেমন বোজার কাছে জাত সাপ ফণা ধরে থাকে। ঢোঁডা সাপ তেমন হবে কি? পালাবে। তাদের ভাল লাগবে না। বলবে, ওই একটা কথা বলতে পারলে না। ব্যাকুলতা কিসে হয়? ভোগান্ত হলে। আমাকে দুচার বার ব্রাহ্মসমাজে বলেছিল কিছু বলতে। আমি বললাম, মাপ করুন বন্ধুবিচ্ছেদ হবে। ঠাকুর বলতে পারতেন না। বলতেন, ওতে অহঙ্কার হয়। 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্'। পণ্ডিতগুলো উঁচুতে উঠে ভাগাড়ের দিকে নজর। (রজনীর প্রতি) যাও ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের কথা শোনগে। শুনে আমাকে বলতে হবে।"

রজনী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করলেন। অন্য একজন বসিয়াছিলেন নাম রাধাগোবিন্দ। তিনি এই সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন, 'আহা কি মধুর'।

শ্রীম—(হাসিতে হাসিতে) ঠাকুরের কাছে একজন ছিলেন তার নাম সমাধ্যায়ী তিনি প্রায়ই বলতেন—'ওতে খুসী আছি। বেলা আটটার সময় যাবার কথা, বেলা এগারটা হয়ে গেছে, যাবে না বালে 'ওতে খুসী আছি'।

স্বামী অভেদানন্দ রাখাল মহারাজ

কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা হইল। শ্রীম দুতলার বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। ভক্তগণও উপস্থিত।

শ্রীম—ঠাকুর ভালবেসে একজনকে বললেন, 'এইখান থেকে গাড়ী ভাড়া নিও'। জানেন কিনা গরীব, প্রচারক। আমাকে দেখলে চৈতন্য হবে। English manরা (ইংরাজী শিক্ষিত) সেবা করতে জানত না। তাদেব এই বলে সেবা করিয়ে নিতেন, 'পা-টা কামড়াচ্ছে হাত বুলিয়ে দাও ত। যদি কিছু এর মধ্যে থাকে মঙ্গল হবে'।

কাশীপুরে ঠাকুরকে অভেদানন্দ স্বামী প্রভৃতি কত সেবা করেছেন। যুবকরা দশমাস ধরে করেছে, ও ত যাবার নয়। আমেরিকায় ২৫ বৎসব ছিল। ডাক্তারেরা বললেন, ঠাণ্ডা স্থানে থাকলে আরও অসুখ বাড়বে। ঠাকুর তাকে ধরে রয়েছেন। অনেক কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিবেন। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেবা তার কাছে যাবে।

"যারা কাছের লোক তাবা সেবা পায়। তবে ত হাগা-মোতা ফেলবে। ঠাকুর রেলিংএর ধারে পড়ে হাত ভেঙ্গেছিল, সঙ্গে রাখাল ছিল না, তাই মার কাছে বলছেন, 'ওর এতদূর যাবার কথা ছিল না ত, মা ওর দোষ নিও না'। মা যেমন ছেলেদের রক্ষা করে, পাখী যেমন শাবকদের রক্ষা কবে তেমনি ঠাকুর রক্ষা করতেন।"

বীরভূমের ভক্ত—আমার তখন ১১ বৎসর বয়স; একজনের বাড়ীব বউ শাশুড়ীর কাছে সেবা করতে যেত না। শাশুড়ী অসুখে পড়েছে হেগেছে সেজন্য ছুঁত না। শাশুড়ী বউএব হাত ধরে সেই সব পরিষ্কার করালে। আব বললে, না করলে তাদের অমঙ্গল হবে।

শ্রীম—আহা! আহা! আপনারা বীরভূমের লোক, কীর্ত্তন করে পরিচয় দিন। বি. এ. পাশ বললে কি হবে। ইংরাজী পড়ে শুষ্ক হয়ে গেছে। অবশেষে নিজে গাইলেন।

স্বামীজীর কীর্ত্তন

বীরভূমের ভক্ত—স্বামিজী তাতে চটা ছিলেন।

শ্রীম—না, তিনি আমেরিকা থেকে এসে (রামকৃষ্ণপুর) নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত নিজে খোল নিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে গেলেন। ভগবানেতে যাদের মন নাই অথচ বাহিরে ঢঙ্গ দেখায় তাদের উপর চটা ছিলেন।

এইবার তাহারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন শ্রীম তাদের বলিতেছেন—দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ হয়ে আবার আসবেন।

মুসলমান ভক্তসঙ্গে

বসুমতী অফিসের কাছে মুসলমান ভক্তটি থাকেন, তিনি এসেছেন তাহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

মুসলমান ভক্ত—আমি কোথায় যাই না, একলা থাকি।

শ্রীম—আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক কার ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

মুসলমান ভক্তটি ওস্তাদের মত সুর করে গাহিতেছেন—'মা দুঃখহরা' ইত্যাদি।

শ্রীম—আপনার ওস্তাদের মতন সুর।

মুসলমান ভক্ত—আমার বাবা গায়ক ছিলেন। আমি ছেলেবেলায় রঘুবংশ, কাদম্বরী পড়তুম। আমার ১১ বৎসর বয়সের সময় পিতার বিয়োগ হয়।

তার গানের সুর শুনিয়া ভক্তরা হাসিতেছেন। এমন সময় আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়ল।

মুসলমান ভক্ত—ঐ দেখুন, তারাটা পড়ে গেল। আমার কাছে গেলে ইহার তত্ত্ব সব বলব, তারা (নক্ষত্র) কি করে চলে, কি করে পড়ে যায়।

জিতেন—এত জানবার দরকার কি?

শ্রীম নিজে গান গাহিতে লাগিলেন—

(১) "মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।

(২) "কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। ইত্যাদি।

রাত প্রায় নয়টা হইয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

॥ ৪৬ ॥

১৯শে আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল সাতটা। শ্রীম স্কুলবাড়ীর তিনতলায় বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত। রোগীদের সম্বন্ধে কথা হইতেছে—

শ্রীম—ডাক্তার কখন বলে ওষুধ দাও, আবার বলে দিও না। আমাদের যত্র তাদের তত্র। তবে ডাক্তাররা অনেক দেখেছে শুনেছে। অন্তরে জানে ওষুধ না দিলেও চলে। ওর পর এই হবে, এর পর এই হবে সব জানে, তাই তারা অবাক হয় না। আমরা ভয় পাই বলে বলে, ওষুধ দাও। তবে জানবে চিকিৎসা হয়েছে।

"আমি উপরে (চারতলায়) উঠতে পারছি না, নীচে স্নান করতে যেতে পারছি না। ত্রিশঙ্কুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছি।

নীচে কলের কাছে একজন ভৃত্য কাপড কাচিতেছে দেখিয়া বলিতেছেন—"আমাদের প্রতিনিধি হয়ে নীচে কাপড় কাচছে। তা নয় আমাদের কাচবার কথা"। এই বলিয়া দ্বিতলায় নামিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন।

সমাধিতত্ত্ব লোকান্তর

শ্রীম—উপরে উঠা বড় শক্ত। তাই ঠাকুর বলতেন 'লীলা নিয়ে থাক'। মুখে বল না আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সমাধি হয়েছে। নিজে ঠকবে, সমাধি কি জিনিষ বুঝলে না। সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ আছে। ভগবান বৈ কথা নাই। ভক্তসঙ্গ। ঠাকুর বলতেন 'চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছাড়িয়ে গেলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হলে সমাধি হয়।' (গদাধরের প্রতি) আজকাল অনেকে বলে আমার সমাধি হয়। না? শাস্ত্রে কেউ কেউ বলে গেছেন, এই স্থূল শরীর গেলে আর একটি সূক্ষ্ম শরীর থাকে। আর কেউ কেউ বলেন কিছুই থাকে না, অহং পর্য্যন্ত নয়। আবার কেউ বলেন, কারণ (বীজ) থাকে। সেই বীজগুলি মা আবার ছড়িয়ে দেন।

"শাস্ত্রে আছে রোগী আতুর এদের কাছে ভগবান বর্ত্তমান। আমি দেখি মানুষ ভাল অবস্থায় যেমন ছিল, বিকারের অবস্থায় একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে। যেমন তাস আলাদা থাকে রুইতন, চিড়িতন প্রভৃতি ভাগ ভাগ থাকে, আবার মিশিয়ে দেয়। food (খাদ্য) খেতে পারছে না, নিদ্রা নাই, মাথার ঠিক নাই। তবে বীজ আছে। এই শরীরটা দেখলেই মনে হয় লীলার জন্য করেছেন। এই দেখ ইন্দ্রিয়গুলো, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কত রকম ভিন্ন ভিন্ন করেছেন।

গৌরবাবুর (মর্টন স্কুলের মাষ্টার) অসুখ। তাঁহার ভাগনা, বয়স ৮।১০ বৎসর হইবে চিঠি লইয়া স্কুলে আসিয়াছে।

বালক—তিনি আসতে পারবেন না। জ্বর হয়েছে।

শ্রীম—জ্বর সারলে বলো, গরম দুধভাত খেতে। তোমাদের বাড়ীতে ঠাকুরসেবা আছে?

বালক—হাঁ, আছে।

শ্রীম—তোমার দাদামশায়ের বাড়ীতে ঠাকুর গিয়েছিলেন। ওর রক্ত এসেছে।

বালক যাবার সময় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিল।

শ্রীম (গদাধরেব প্রতি)—দেখ, ভক্তি আছে। ফল দেখলে গাছ বুঝা যায়।

এই সময় অন্য একটি বালক খাবার হাতে করিয়া এধার ওধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তা থেকে একটু একটু খাচ্ছে।

শ্রীম (বালকের প্রতি)—কি জিলিপি খাচ্ছ? দু পয়সায় দুখানা? আমি কাশীতে একজনের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম। বড় বড় জিলিপি খাইয়েছিল। আর এক জায়গায় আম, অন্য এক জায়গায় নানাবিধ মিষ্টি খাইয়েছিল। বয়স তখন ১৮ হবে। সেই সংস্কার মনে আছে।

ধ্যান মানে কি? শুকদেব

"ধ্যান মানে কি? যা মাটি জমেছে তাকে পরিষ্কার করা। একজন বেলতলায় ধ্যান করছিল, ঠাকুরের কাছে দুইজন তার নামে সুখ্যাতি করছিল। ঠাকুর শুনে বললেন, 'দাঁড়াও, মাটিগুলো পরিষ্কার হোক্, আগে থেকে সুখ্যাতি।' একজন ভক্ত ঠাকুরের কাছে একমাস ধরে রয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য বাড়ী যাবার ইচ্ছা। ঠাকুর শুনে বললেন, 'আবার বাড়ী

যাবে।' জানেন কিনা সংস্কারগুলা আবার না জমে। যেমন ছেলে প্রদীপে হাত পোড়াতে যাচ্ছে, মা তাকে টেনে টেনে রাখে। ওটা জানে না যে হাত পুড়ে যাবে। আবার গুরুর কথা শোনে না। বাসনা প্রবল, যেদিকে টানে সেই দিকে যায়। আবার বলে ওটা করলে হয় না? নিজের মনের মতন চায়। ও কেবল প্রেয়ের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু গুরু শ্রেয় দেবার চেষ্টা করছেন। শুকদেব গোদোহন পর্য্যন্ত দাঁড়াতেন। কোথাও বা খেয়ে পলায়ন। আবার সংস্কার রূপ মাটি জমলে কোদাল দিয়ে কাটলেও উঠবে না। স্বামীজীকে ঠাকুর বললেন, 'একটু গা না', বলরামবাবুর বাড়ীতে। কেবল টেনে রাখছেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মফল, কমললোচন

রাত্রি প্রায় নয়টা। স্কুলবাড়ীর ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন। কাছে গদাধর।

গদাধর—ঠাকুরবাড়ীর পাশে একটি পাগল কেবল হাত-পা নাড়ে। ও কি কর্ম্মফল?

শ্রীম—তা বইকি।

গদাধর—সে না জানলেও কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে।

শ্রীম—হাঁ, কেউ তাকে জানিয়ে দেয় ত আর করবে না। একটি সাধু পেটের অসুখে ভুগছিল। পাশে ছিল নদী। নদীতে শৌচ করত না, তাই দু-শ বার করে নদীর জল ঘটি করে এনে শৌচ করত। তার কষ্ট দেখে কমললোচন বলে একজন তার জল এনে দিতে লাগল। দুই তিন দিনের পর সাধুর পেটের অসুখ সেরে যাওয়াতে সেই লোককে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতে লাগল, 'আপনি কি দয়া করলেন, না খেয়ে না দেয়ে আমার সেবা করেছেন। আপনি কে, আপনার নাম কি?' সেই লোকটি বলতে লাগল, 'যাকে তুমি ডাক সেই আমি কমললোচন।' সাধু বললে, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এত কষ্ট করে জল এনে দিতেন, সারিয়ে দিলেই ত হত।' কমললোচন বললেন, 'না কর্ম্মফল ভোগ করতে হবে'। 'যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্'। আমার জল এনে দেওয়া ভাল।

"আমার বনে যাওয়া উচিত ছিল। শাস্ত্রে আছে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনংব্রজেৎ। যাওনি কেন, কর্ম্মফল ভোগ।"

ভক্ত—আপনার কথা ছেড়ে দিন, শাস্ত্রে আছে যোগী-পুরুষ নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম্ম করেন।

শ্রীম (হাসিতে হাসিতে)—আহা! আহা! তাঁকে দর্শন করলে কর্ম্মফল চলে যায়।

ভক্ত—আপনি ক্রাইষ্টের কথা বলেছিলেন। একজন স্ত্রীলোক (বেশ্যা) দামী সুগন্ধি তেল এনে ক্রাইষ্টের পায়ে ঢেলে দিয়ে পাদচুম্বন ও তার মাথার চুল দিয়ে পা পুঁছে দিয়েছিল। তাঁর পায়ের কাছে বসে কান্দতে কান্দতে চক্ষের জলে পা ধুয়ে দিয়েছিল। কেউ কেউ তাতে পরিহাস করায় ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, 'সে আমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে বলে আমি তার সমস্ত পাপ বহন করলাম।'

শ্রীম—অন্তরঙ্গদের আলাদা কথা। যেমন বিড়াল তার ছানাকে ধরলে লাগে না, আর ইঁন্দুরকে ধরলে পঞ্চত্ব পাইয়ে দেয়। তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গ দিগকে তিনি রক্ষা করেন। এসব কথা কারুকে বলো না।

ভক্ত—আপনি যার যেমন অবস্থা তার সামনে সেইরূপ দেখিয়ে দেন।

শ্রীম—ছেলেবেলা থেকে এসব ভাব ভিতরে ছিল বলে ঠাকুরের কথা (কথামৃত) ছবির মতন লেখা হয়েছে।

কথাবার্ত্তার পর (ভক্তের প্রতি) "খাবার জল আনতে পার?"

ভক্তটি নীচ হইতে গ্লাসে করিয়া জল আনিয়া দিলেন। রাত্রি দশটা।

॥ ৪৭ ॥

২১শে আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকালে চারতলার ঘরে শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানের পর চর্পট পঞ্জিকা হইতে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন।

'দিনমপি রজনী সায়ংপ্রাতঃ, শিশির বসন্তৌপুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।

'ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে'। ইত্যাদি এইবারে গীতামাহাত্ম্য পাঠ করিতেছেন। ঋষিরুবাচ—

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবদ্ সূতমে বদ্
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্। ইত্যাদি

এইবারে গীতা পাঠ করিতেছেন—যে যোগীর মধ্যে ভক্তি আছে সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি, শ্রদ্ধা মানে—ভক্তি।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥ [গীতা—৬।৪৭

এইবার ভাগবত হইতে এক একটি সার সার কথা বলিতেছেন। "তপস্যাই হচ্ছে সার। তাঁকে মানুষ জানে না বলে এত কষ্ট। এই শরীর কেন? তাঁর পূজা করবার জন্য। সর্ব্বভূতে সমভাবে দর্শন করবে। শ্রদ্ধার মানে ও ভক্তি। যে সব বস্তুর রূপ দেখবে নারায়ণের রূপ বলে মনে মনে পূজা করবে। মনকে কখনো বিশ্বাস করবে না। যদি কেউ উপদেশ না শুনে তার উপর রাগ করবে না।

ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ

অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ। সচেতন পদার্থ থেকে প্রাণ বৃত্তিমান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানবান জীব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান জীব অপেক্ষা ইন্দ্রিয় বৃত্তিশালী স্পর্শবেদী জীব পাদপাদি, উহা অপেক্ষা রসবেদী মৎস্যাদি, ঐ মৎস্যাদি অপেক্ষা ভ্রমরাদি, উহাপেক্ষা সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। সর্পাদি অপেক্ষা কাকাদি, তাহা অপেক্ষা বহুপদজীব, বহুপদ অপেক্ষা চতুষ্পদ, উহা অপেক্ষা দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা ভূত, তা হতে গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্ব হতে সিদ্ধ, সিদ্ধ হতে কিন্নর, আবার উহা হতে অসুর, অসুর হতে দেবতা, দেবতা হতে শিব, শিব হতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এই সকল অপেক্ষা ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।

("ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কেন? তার ভিতর সত্ত্বগুণ আছে বলে। শম, দম, তিতিক্ষা, তপস্যাদি আছে বলে। আর একটি তার মধ্যে আছে নিষ্কাম-কামনা শূন্যতা। ঈশ্বরের কাছে সে কিছু চায় না।) ছেলেবেলায় আমাদের

পুরোহিতকে দেখেছিমাম, তাঁর নাম জগন্নাথ পঞ্চানন। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে রকে বসেছিলেন। আমি মহাভারতে পড়েছিলাম গুরুকে ভক্তি করতে হয়। তাই আসন, পা ধুবার জল, তামাক এনে দিলাম। তা কিছু গ্রহণ করলেন না।

ঋষভদেব

আবার ঋষভদেবের কথা বলিতেছেন—ঋষভদেব প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছেন। কখনো জড় কখনো বা মূক, অন্ধ, বধির পিশাচ ও উন্মত্তের ন্যায় অবস্থা। তিনি মৌনাবলম্বন করেছিলেন। কাহারও সহিত আলাপ করতেন না। তিনি পুর, গ্রাম, গোস্থান, আভির পল্লী, পর্ব্বত, বন, আশ্রম প্রভৃতি যে যে স্থানে গমন করেন সেই পথে মক্ষিকাগণ যেমন বন্যগজকে ব্যস্ত করে তদ্রূপ দুষ্ট লোকেরা তাঁকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করত। তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। এইরূপ যখন দুষ্ট লোকেরা তাঁহার যোগানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে লাগল তখন তিনি উহাব প্রতিকার নিতান্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে অজগরব্রত অবলম্বন করলেন। তাতে একই স্থানে বসেই অশন, পান, চর্ব্বণ, মলমূত্র পরিত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি কখনো কখনো বিষ্ঠার উপর বিলুণ্ঠিত হতে লাগলেন। "শরীর যাবে কিনা, আর শরীর রক্ষা করতে পারছেন না।" ঐ বিষ্ঠার দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। তাহার সৌগন্ধে চারদিক সুগন্ধ করে তুলে·ন।

"এত বাড়িয়ে বলবার কি দরকার। বললেই হয় এ সমস্ত শরীরের ধর্ম্ম।

"সেই সময় বায়ুবেগে বেণু পরস্পর সংঘর্ষণে দাবানল উদ্ভূত হয়ে ঐ বনকে দগ্ধ করে, এবং সেই দাবানলে ঋষভদেবের শরীর দগ্ধ হয়ে যায়।

"কলিযুগে পাপাচরণ বেশী। কলিযুগের কুবুদ্ধি মানবগণ দেবমায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজের আচার পরিত্যাগ করবে, দেবতাদের অবজ্ঞা করবে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের দেখে উপহাস করবে। এইরূপ অশাস্ত্রীয় আচরণের ফলে তাদের নরক হবে।

"তারা নরকে যাবে ভয় দেখাচ্ছে। তাঁর লীলা তিনি সব করেছেন। বাবুদের মধ্যে নাম হবে, এত বড় রায়বাহাদুর উপাধি হবে সেইজন্য কতক কাঙ্গাল খাইয়ে দিলে। এই রকম করে পালন করছেন, সংহার তদ্রূপ। রোজ সকালে এই রাস্তা দিয়ে কত ছাগল কেটে নিয়ে যায়। জাপানে

(Japan) জলপ্লাবন হয়ে তিনলক্ষ লোক মারা গেল। গত যুদ্ধেতে কত লোক (৪ কোটি) মারা গেল। আমি শুনেছি এক দেশে রোজ এক লক্ষ শোর কাটা হয়, আবার বিক্রী করে। আপ্তপুরুষেরা বলে গেছেন এ তার লীলা।"

ভক্ত—তবে কষ্টবোধ দেন কেন?

শ্রীম—তপস্যার জন্য। (বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে) কত বড বড মহৎ লোক কোথায় গেল! মৃত্যু সময় সব অনিত্য। আর একটি একটি জীবন থাকতেও বলে সব অসত্য। তবে ঠাকুর বলে গেছেন তিনি সব করেছেন, তবে কখনো জ্ঞানে রাখছেন, কখনো অজ্ঞানে রাখছেন। যারা যোগের পাহাড়ে উঠেছে তাবা কিছু চায় না।

পূর্ব্ব সংস্কার

অন্য এক ভক্ত—কেউ কেউ বলে সাধুরা মাছ খায় কেন?

শ্রীম—কতকগুলি সাঁওতাল খ্রীষ্টান হয়েছিল। তাদের সাহেব বলে দিয়েছিল, 'প্রতিমা পূজা কবো না'। কিন্তু তারা আজন্ম মাংস খেয়ে এসেছে, গাছের তলায় পঞ্চানন দেবতার পূজা করে ছাগবলি দেয়। তারা খ্রীষ্টান হয়েও পূর্ব্বের সংস্কাব ত্যাগ কবতে পারে নি। সেই জন্য তারা পূর্ব্বের মত পঞ্চানন দেবতা পূজা ও ছাগ বলি দিত। একদিন সাহেব এসে দেখে বললে, 'এ যে পুত্তলিকা পূজা'। সেইরূপ পূর্ব্বেকার সংস্কার ছাডতে পারে না, তা ভাল। যার যা বাসনা ফুরিয়ে নেওয়া ভাল। ঠাকুর বলতেন, 'গোমাংস খেয়ে ঈশ্বরে যদি ভক্তি থাকে সে ধন্য। হবিষ্য করে যার ঈশ্ববে ভক্তি নাই তাকে ধিক্"।

বেলা হইয়াছে সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৈকাল প্রায় চারটা। শ্রীম বিশ্রামের পব (হাসিতে হাসিতে) পায়চারি করিতেছেন। সঙ্গে গদাধব, তাকে বলিতেছেন—"একেবারে যন্ত্রবোধ করিয়ে দিচ্ছে, প্রার্থনা করবার জো নেই। যেদিকে লয়ে যায়"।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ঘরে ধ্যান করিতে গেলেন। ভক্তগণ পাশের বড় ঘবে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তেরা কেহ আসিয়াছেন কেহ আসিতেছেন। ক্রমে বলাই, সুখলাল, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, যতীন প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত হইলেন। শ্রীম ধ্যানের পর গান গাহিতেছেন—

"ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।"
"এস মা এস মা ও হৃদয় রমা পরাণ পুতলী গো।"
"দয়াময়ী কে বলে তোমায়
তুইত পাষাণের মেয়ে পাষাণ তোমার হিয়ে
গিয়েছিলি রাবণ মন্দিরে।
এমন ভক্ত দশাননে, সবংশে বধিলি প্রাণে
কালকেতুর বন্ধন ভয়ে ধনদিলি তার ঘরে বেয়ে
গজের মুণ্ড দিলে গজাননে।"
"যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি ইত্যাদি"
"হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ
পাদপদ্মে দিয়ে যদি সে পদ্ম প্রকাশ—ইত্যাদি"

ধ্যানের পর শ্রীম (ভক্তদেব প্রতি) —ভাগবত পড়া হোক্। ভাগবতে এমন কথা আছে যে ওর ওদিকে গা নেই।

আজ ঝড় হইতেছে বলিয়া ঘরে বসা হইল। রজনীবাবু ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় মহাপুরুষ সংস্থান বর্ণন। ভাগবত পাঠের পর বলিতেছেন—

শ্রীম—মহাপুরুষদের ব্রহ্মজ্ঞান হলেও তাবা ভক্তি নিয়ে থাকেন।

প্রায়েণ মুনয় রাজন্নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তেস্ম গুণানু কথনে হরেঃ॥
আত্মরামশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপ্যরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকী ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ।'

আত্মারাম মুনিঋষিগণ বিধিনিষেধের অতীত হয়েও সেই প্রচুর পরাক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪৮ ॥

২২শে আগষ্ট, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকালে শ্রীম ব্রাহ্মসমাজে ভক্তসঙ্গে উপাসনা দর্শনে গেলেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা প্রথমে গান গাহিয়া উদ্বোধন করিলেন। তারপরে বেদীতে আচার্য্য বসিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যথা—'ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' ইত্যাদি। পাঠান্তে আবার গান করিয়া উপসংহার করিলেন।

শ্রীম ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া স্কুলবাড়ীর দুতলায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বেশ তারা নাম কীর্ত্তন করে।"

গদাধর—তাদের গানগুলি বেশ ভাল।

শ্রীম—না, সবই ভাল। যে যেমন চশমা পরেছে, সে সেইরকম দেখছে। যাদের কামনা রেখে দিয়েছেন তারা একরকম দেখে, যারা পূর্ণকাম হয়ে আছেন তারা একরকম দেখেন। তাঁদের কথা আলাদা। ঠাকুর সকলের সঙ্গে মিশতেন। সকলের মধ্যে সেই ব্রহ্ম দেখতেন। 'মা তোকে খ্রীষ্টানরা কি করে ডাকে দেখব'।

বেলা প্রায় আটটা। Student's Home হইতে দুইজন ছাত্র ও অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীম চারতলায় বসিয়া অসুখের কথা কহিতেছেন।

বৈদ্যরূপে ভগবান

শ্রীম—তিনি যেমন রোগ করেছেন, তেমনি ওষুধ করেছেন, ডাক্তার-বদ্যিও করেছেন। ডাক্তার রূপে কখনো ভাল করেন, কখনো বা বিনাশ করেন। প্রাণ-ধন ডাক্তার বলতেন 'তোমাদের জন্য ওষুধ। তা নাহলে কিছুর দরকার নাই। ঠাকুরের অসুখের সময়কার Reports (তালিকা) আছে। রোজ মহেন্দ্র সরকারের কাছে যেতাম।' ঠাকুর বলতেন, 'গলা টন্ টন্ করছে, নিদ্রা হয় নাই, রক্ত পড়ছে' ইত্যাদি। ডাক্তারের হাত ধরে কাঁদতেন সাধারণ লোকের ন্যায়। নিজের জীবনে রোগ, শোক, দারিদ্র্য সব দেখিয়ে গিয়েছেন। ভোলাবাবুর প্রতি ওই গানটা গান ত। ভোলাবাবু গান গাইতেছেন—

"কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে,
ভবেরে আনিয়ে ভাবালি আমায়।
না জানি সাধন না জানি পূজন
বিষয় বিষভোজন করে প্রাণ যায়।

গানের পর শ্রীম বলিতেছেন।

শ্রীম—এ শরীর জলবিম্বের ন্যায়। যোগীরা বলে গেছেন সুখ-দুঃখের অতীত আর একটি আত্মা আছে। শরীর থাকলে সুখ-দুঃখ এসব হয়।

এমন সময় অল্পবয়স্ক একজন সন্ন্যাসী আসিয়া শ্রীমর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম—থাক্ থাক্। আবার সেই গানটি তাঁহাকে বলিতেছেন—'রসিকের এ দেহ জলবিম্ব প্রায়'। পিতা-প্রপিতামহেরা সব গেল কোথায়! দেখছে সব অনিত্য। মানুষ নিজে সুখে থাকবার জন্য কত রকম ফন্দি কল্পনা করেছে।

অনিত্যতা বোধে ত্যাগবুদ্ধি

"Beshop (বিশপ) লিখেছিলেন—ক্রাইষ্ট পথের ভিখারী ছিলেন, তাঁর মাথা গোঁজবার স্থান ছিল না। Jesus sayeth unto him—Oho foxes have holes and oh, bird of the air have nest, but son of man hath nor where to lay his head. তাঁর নামে এখন বড় বড় গীর্জ্জা, গাড়ী ঘোড়া মোটর হয়েছে। এ বেশ, হক্ কথা বলতে হয়, ভোগের পথে কাঁটা দিলেই মহান্ রাগ। দোষ থাকলেও টাকাওয়ালা লোককে ভালবাসবে। যারা এই রকম করে তাদের এদিকে দেরী পড়ে যায়। নিজে ভোগ না নিয়ে করে সে এক, যেমন কমলিবাবা। তাঁর কাছে হাজার হাজার টাকা আসছে, কিন্তু তিনি একটি কম্বল গায়ে দিয়ে ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করতেন। সেই টাকায় বদরিকা যাবার রাস্তা, নানা স্থানে মঠ, ধর্ম্মশালা করে দিলেন। নিজে ভোগ না নিলে করতে ইচ্ছা হয় না, বলে এসব অনিত্য। কলিকালে ভিক্ষা করতে পারে না, অন্নগত প্রাণ।"

তীর্থে সত্ত্বগুণ

সাধু—এক জায়গায় সাধুরা অনেকদিন থাকে না কেন?

শ্রীম—ঝগড়া, কোঁদল, আসক্তি আসে বলে। তবে তুতীর্থস্থানে সত্ত্বগুণ

বেশী। আমি পুরীতে দেখেছি, দোকানে দুইজনে ঝগড়া করে আবার সেই দুইজন জগন্নাথের কাছে গিয়ে স্তব পাঠ করলে।

সাধু—অনেকে জিজ্ঞাসা করে তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি কোথায় থাক কি বলব?

শ্রীম—আমি তাঁর দাস, তাঁকে (ঈশ্বরকে,) দেখিনি, দেখবার ইচ্ছা ছিল, হয়ে উঠেনি, (সকলের হাস্য)। ছেলেমানুষ কিনা, তাই সকলে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে, মেয়েরা পর্য্যন্ত। সাধুদর্শন করলে ভেতরে শুভ সংস্কারের বীজ পড়ে, সেই বীজ ক্রমে অঙ্কুর হয়ে গাছ হয়। একেবারে হয় না।

সাধু—ভাল লোক হয় তবে তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়।

শ্রীম—বাবুরাম মহারাজ বুঝতেন—একদল টেরীকাটা ছোকরা নৌকায় করে মঠে এসেছে। ঠাকুর দর্শন করে চলে যাচ্ছিল। বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'ওরে ওদের প্রসাদ দে, প্রসাদ দে।' অন্য সাধু এসে বললে, 'আপনি যেমন, ওদের আবার প্রসাদ দেয়।' বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'ওরে এই প্রসাদ খেলে, সংসারের ঘা যখন খাবে তখন স্মরণ হবে। তখন ভগবানের দিকে মন যাবে।'

কথাবার্ত্তার পর সাধুকে জলযোগ করাইলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া স্কুলবাড়ীতে দুতলায় বসিয়া কথা কহিতেছেন—

শ্রীম—ভক্তদের কথা আলাদা। তাঁকে ডাকলে তাদের কর্ম্মফল কমিয়ে দেন। 'কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে। জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে কেন ডাকা তবে'। শিব গুরু বলেছেন তাঁকে ডাক। এ তাঁর লীলা। ডাক্তাররা জানেন শরীরের খেলা কেমন চলেছে। (ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া) এদের কাছে রোগীরা আসে দেখতে পায়।

ডাক্তার—রোজ এই কর্ম্মফল ভোগ করতে হচ্ছে—রোগীদের দেখতেই অনেক সময় যায়। ভগবান চিন্তা করবার সময় থাকে কই?

রাত হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৪৯ ॥

২৩শে আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

গত বৃহস্পতিবারে নাগমহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাদি হইয়া গিয়াছে। আজকে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব করিতেছেন। তাই বেলুড় মঠের অনেক সাধুরা আসিয়াছেন এবং অনেক ভক্তগণ উপস্থিত আছেন। সেই উপলক্ষে শ্রীমও আসিয়াছেন।

নাগমহাশয় চরিত

স্বামী ধর্ম্মানন্দ—আপনি ঠাকুরের কাছে নাগমহাশয়কে যেতে দেখেছিলেন?

শ্রীম—হরিশবাবু ঠাকুরের কাছে রাতদিন থাকতেন, তিনি বলেছিলেন, নাগমশায় নির্জ্জন সময় যখন ঠাকুরের কাছে কেউ থাকত না তখন ঠাকুরের কাছে যেতেন। চুপ করে বসে থাকতেন। চোখ দিয়ে যে জল পড়ত কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় নাগমশায়ের জীবন চরিত বেরিয়েছে। তাই আমি পড়ছিলাম, তাতে লিখেছেন—নাগমশায় বাজার করতে যেতেন, জিনিষের মূল্য যে যা বলত তিনি তাই দাম দিতেন। যে জিনিষের মূল্য দু আনা তাঁর কাছ থেকে ঠকিয়ে চার আনা নিত। সেই লোক পরে বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইত। তাতে নাগমশায় বলতেন—না না এতে আপনার ক্ষতি হবে। মুটে দিয়ে জিনিষপত্র বাড়ীতে নিয়ে গেছেন, সেই মুটেকে হাওয়া করা, জল দেওয়া, তামাক সেজে দিতেন। বলতেন, আহা আপনার কত কষ্ট হচ্ছে। সর্ব্বভূতে ভগবান দর্শন করছেন। তাঁতে (ঈশ্বরেতে) সর্ব্বদা যোগ। পিঁপড়েগুলি লাইন ভেঙ্গে যাচ্ছে, দেখে বলতেন, আহা এদের কষ্ট হয়েছে।

ধর্ম্মানন্দ—বাবুরাম মহারাজ বলতেন, 'ওঃ কি ভক্ত! উহার ভক্তির তুলনা নাই। বিল্বপত্র গাছ থেকে পাড়তেন না। যে সব গাছ থেকে পড়ে গেছে তার মধ্যে নিখুঁত পাতা খুঁজে নিয়ে পূজা করতেন। তিনি যেখানে থাকতেন সেই বাড়ীর পাশে একটি পুকুর ছিল। তাতে অনেকগুলি কচ্ছপ বাস করত। কচ্ছপগুলি যখন আড়ায় উঠত, তখন বলতেন 'আসুন

আসুন।' একজন লোক সাধুনিন্দা করেছিল। সেই নিন্দার কথা শুনে তাকে জুতা প্রহার করেছিলেন।

কথাবার্ত্তার পর শ্রীম বিদায় লইতেছেন এবং গৃহকর্ত্তাদের বলিতেছেন—"বেশ হল, সাধু ও ভক্তদর্শন হল, আমি এর গাড়ীতে এসেছি।"

পার্ব্বতীবাবুর ছেলে—আপনি একটু প্রসাদ পেয়ে যান।

শ্রীম—পাঠিয়ে দেবেন।

সেখান থেকে আসিয়া শ্রীম ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন, সঙ্গে অনেক ভক্তও গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর আদি সমাজে গেলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় মা কালী দর্শন, চরণামৃত গ্রহণ, জপ প্রভৃতি করিলেন। শ্রীম রাস্তায় আসিতে আসিতে দোকানপাট দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইতেছেন। বলিতেছেন—"আহা কি সুন্দর, আহা কি খাবার সাজিয়েছে। দর্শন কর দর্শন কর 'দৃষ্টা তৃপ্যতাম', দেবতারা দেখেই সন্তুষ্ট হন।"

৮০ ॥

৩০শে আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

অমৃতের অধিকারী

সকাল সাতটা ; শ্রীম চারতলার বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। কাছে সুখেন্দু, বিনয়, বুদ্ধিরাম, রজনী ও গদাধর। গিয়া শুনিলেন, ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন। "একদিন ক্রাইষ্ট শিষ্যদের সঙ্গে বসে আছেন, একজন ধনীলোক গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হে মঙ্গলময় প্রভু কি করে সেই অমৃতত্ব লাভ করতে পারি তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।' ক্রাইষ্ট শুনে বললেন, 'শাস্ত্রে যেমন আদেশ আছে তাই তুমি পালন কর।' তখন সেই লোকটি বললেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই শাস্ত্রের নিয়মগুলি যথাযথ-ভাবে পালন করে আসছি। হে প্রভু! তা ছাড়া আমার আর কিছু করবার আছে কি না?' তখন ক্রাইষ্ট তাহাকে বললেন, 'যদি তুমি পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তা হলে তোমার যা ধনসম্পত্তি আছে সমস্ত গরীবদের বিলিয়ে দিয়ে আমার অনুসরণ কর।'

Jesus said unto him, If thou will be perfect, go and sell all thou hast, give to the poor ; and thou shall have treasure in heaven ; and come and follow me. [St. Mathew.

"তখন সেই যুবকটি এই কথা শুনে চলে গেল কারণ বহু টাকার মালিক ছিল বলে আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে না ! তখন ক্রাইষ্ট শিষ্যদের বললেন, তোমাদিগকে সত্য সত্য বলছি। সূচের মধ্যে উটের প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু ধনী লোকদের ঈশ্বরের পথে যাওয়া তার চাইতে কঠিন।

"And again I say unto you. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God."

গুরু অসম্ভবকে সম্ভব করান

"তাঁর শিষ্যেরা এই কথা শুনে, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন, 'আমাদের যদি ঐরূপ টাকা থাকত তাহলে আমরা কি ত্যাগ করতে পারতাম।' তখন যীশু তাদের বললেন, 'মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব বটে কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর শরণাগত হলে, তিনি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন।' 'যেমন হাজার গাঁটওয়ালা দড়ি', ঠাকুর বলতেন, 'কেউ খুলতে পারছে না।' কিন্তু যাদুকর সেই দড়িকে নাড়তেই সমস্ত খুলে গেল।' এই জন্য [illegible]রো হাসা উচিত নয়। 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে', তাই তাঁর শরণাগত হওয়া (গদাধরের প্রতি), তুমি সেইটা বল ত, 'অস্থির হইয়া আমি সংসার জ্বালায়, পলাইনু ঘর ছাড়ি গভীর নিশায়।'

প্রতাপ রুদ্র

"আগে যাদের দানটান করা আছে তাদের এসব ভাল লাগে। প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবকে এই শ্লোকটি শুনিয়েছিলেন—

'তব কথামৃতং তপ্ত জীবনম্ কবিভিরীড়িতম্
কল্মষাপহম্ শ্রবণ মঙ্গলম্ শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃহ্নন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।' [ভাগবত—১০

এই শ্লোক শুনে প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করেছিলেন।"

চৈতন্যদেবের কথা কহিতে কহিতে উদ্দীপন হইয়াছে তাই শ্রীম গান গাহিতেছেন।

প্রেম বিলায় গৌর রায়
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়

গান গাহিতে গাহিতে শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষে প্রেমাশ্রুধারা। আবার কথা কহিতেছেন, "দান তিন রকম, অন্নদান, বিদ্যাদান, ভক্তিদান। সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিদানই শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীম তিনতলায় বসিয়া আছেন। কাছে পার্ব্বতীচরণ মিত্র, জগবন্ধু।

মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ

শ্রীম (পার্ব্বতীবাবুর প্রতি)—ঠাকুর বলতেন, মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ। গতকল্য রাজা রামমোহন লাইব্রেরীতে পরমহংসদেবের উৎসব উপলক্ষে সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেই সভাতে শুদ্ধানন্দ স্বামী, বাসুদেবানন্দ স্বামী, কৃষ্ণলাল মহারাজ প্রভৃতি গিয়াছিলেন এবং শ্রীমও কিছুক্ষণের জন্য গিয়াছিলেন। কাল একটি মহিলা সেই সভাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

"কাশীপুর বাগানে ঠাকুর যখন থাকতেন; এক ভক্তের দুটি ছোট ছোট মেয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিল এবং ঠাকুরকে গান শুনিয়েছিল। পরে নীচের ঘরে যেখানে ভক্তেরা ছিলেন তাদের কাছেও তারা গান গেয়েছিল। তখন ঠাকুর তাদের বাপকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখ, এদের আর গান শিখিও না, নিজে নিজে শেখে সে এক। আমাকে গান শুনায় সে আলাদা কিন্তু সকলের কাছে কি গান গাইতে আছে? তা হলে মেয়েদের লজ্জা ভেঙে যায়। মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ—লজ্জা গেল ত সব গেল।"

আগে নিজে মানুষ হওয়া: আগে তাঁর পূজো

পার্ব্বতী—ছেলেরা নাগ মহাশয়ের মিটিং করবে বলছে আবার পিছুচ্ছে। আমি বলি আগে নিজে তলিয়ে যাও।

শ্রীম—ঠিক বলেছেন। কালকে একজন বক্তা বলছিলেন, 'নিজে তৈরী হও। নিজে মানুষ হও। বাদবাকি সমস্ত আপনাআপনি হবে। পরমহংসদেবকে আগে ভাল করে পূজা করা উচিত, যার কাছ থেকে নাগ

মহাশয় মানুষ হলেন। স্বামীজী বলতেন, 'ঠাকুর থাকলে আমার ভক্তি জ্ঞান সবই আছে ; আর তিনি না থাকলে কিছুই নেই। যেমন ছেলে যদি বাপকে ছেড়ে দেয় তা হলে সে বাপের বিষয় কি করে পাবে।'

এরূপ কথাবার্ত্তার পর পার্ব্বতী মিত্র প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকাল বেলা ৭টা। শ্রীম চারতলায় টিনের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। কাছে ডাক্তার ও একজন ভক্ত এবং ময়মনসিং হইতেও একজন আসিয়াছেন।

কৌতূহল

শ্রীম (হাসতে হাসতে ভক্তের প্রতি)—তুমি ওদের আশ্রমে তিন মাস থাক, মঙ্গল হবে। তুমি চৈতন্যদেবের ঘরে শোবে।

"একবার একজন বৈষ্ণবদের আশ্রমে গিয়েছিল। তাঁকে ঠাকুরঘরে শুতে দেয়, রাত্রে অন্ধকারে সে তার মশারি চৈতন্যদেবের হাতে বেঁধে শুয়েছিল। সকালে আশ্রমের লোকেরা যখন দেখলে তখন সেই লোকটি হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'প্রভু! আপনার ভক্তের ওপর কি কৃপা! মশারি আপনি নিজে হাতে করে ধরে আছেন।' (হাস্য)

"বিদূষক দুষ্মন্তকে বলেছিল, 'কাহাতক পারা যায় না খেয়ে না দেয়ে। এর পাল্লায় পড়ে, না খাওয়া না দাওয়া ; আমি গরীব ব্রাহ্মণ আর এ ক্ষত্রিয়, এর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে প্রাণটা গেল।" (হাস্য)

আবার বলিতেছেন, "কৌতূহল মনে দেখতে নেই। একজন লোক ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা বাড়ীতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখে, নানা উপাদেয় খাদ্য শয্যা আসন সব প্রস্তুত। দেখে লোকটির খুব আনন্দ হল। কিন্তু শেষে দেখলে একটা বাক্সর ওপর লেখা আছে, 'এ বাক্সটা খুলিবে না।' কিন্তু সে কৌতূহলবশতঃ বাক্সতে কি আছে জানবার জন্য যেই খুলেছে অমনি ভূতে তাড়া করলে। তখন সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য দৌড়ে দৌড়ে শেষে একটা নদী পার হয়ে তবে প্রাণে রক্ষা পায়।

"আজকে কালীপ্রসাদ দত্ত লেনে নির্ম্মলানন্দ স্বামী বক্তৃতা দিবেন। তোমরা যাও শুনে এস।"

রমেশ, গদাধর, ডাক্তারবাবু সকলেই গেলেন।

অবতার অধিকারী হিসাবে বলেন

শ্রীম চারতলায় বসিয়া আছেন (গদাধরের প্রতি)—"কি শুনলে?"

গদাধর—তিনি বললেন, 'ঠাকুর পরমহংসদেব অবতার। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জগতের প্রধান অভাব ঈশ্বরদর্শন; সেই অভাব দূর করবার জন্য, তাঁকে কি করে দর্শন করা যায় তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেলেন। যে যেমন অধিকারী তাকে তেমনি বলেছেন। মা যেমন কোন ছেলের জন্য পোলাও কোন ছেলের জন্য ঝোল করেছেন। বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, তার স্বরূপ মুখে বলা যায় না। সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে; ব্রহ্মকে কেউ উচ্ছিষ্ট করতে পাবে না।

শ্রীম—বাঃ! বেশ বলেছেন!

॥ ৫৯ ॥

৩১শে আগষ্ট, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকালবেলা শ্রীম ছাদে বেড়াইতেছেন। গদাধর যাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম কালকের বক্তৃতার কথা বলিতেছেন। "সাধুটি বেশ বলেছেন, বেশ বুঝিয়েছেন। একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ কবে এলে হয়। যাদের পূর্ব্বজন্মের অনেক কর্ম্ম করা আছে তারা ধবতে পারে।"

শ্রীম ছাদে ছিলেন জনৈক ভক্তকে দেখিয়া গৌড়ীয় মঠেব সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—সেখানে কি রকম হল।

ভক্ত—সেখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। ভাগবত পাঠের পর বজনীর সঙ্গে তাদের কিছু কিছু তর্ক হয়েছিল। চৈতন্যদেব বলেছেন, 'মুই সেই'।

বুদ্ধিবাম—ওরা একঘেয়ে।

শ্রীম—সবাই কি অবতাবকে ধরতে পারে; তোমাদের সুবিধা হোক না; তোমাদেবও প্রেয়র দিকে নজর যাবে। সকলে শ্রেয়ঃ চায় না।

স্বাধীনতা

একটি পোষা কুকুরের সঙ্গে, অন্য একটি ছাড়া কুকুরের দেখা হয়েছিল। পোষা কুকুরটা খুব হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। অন্যটির শরীর কৃশ। সে পোষা কুকুরটিকে দেখে বললে, 'ভাই! তুমি এত হৃষ্টপুষ্ট হয়েছ কি করে?' পোষা

কুকুর বললে, 'আমি গেরস্তর বাড়ীতে থাকি, তারা আমাকে খুব খেতে দেয়। তখন ছাড়া কুকুরটি জিজ্ঞেস করলে, 'ভাই তোমার গলায় ও দাগটা কিসের?' পোষা কুকুর বললে, 'আমাকে গেরস্থরা সমস্ত দিন বেঁধে রাখে কেবল রাত্রে খুলে দেয়।' ছাড়া কুকুরটি শুনে বললে, 'ভাই, ও রকম হৃষ্টপুষ্ট হওয়ায় আমার কাজ নেই। আমার পাতলা শরীরই ভাল।'

ভক্ত—বুঝেছি তিনিই মহামায়া হয়েছেন।

শ্রীম—বুঝেছ ; বেশ ভাল।

ভক্ত—দেখেশুনে বোঝবার জো নেই।

শ্রীম—'আমরা গোবার সঙ্গী হয়ে বুঝতে নারলাম'। (ভক্তের প্রতি) টেবিলের ওপর চণ্ডী উপনিষদ বাঁধানো বইখানি আন ত।

কঠোপনিষৎ শ্রেয়ের পথ

শ্রীম ছাদে বেঞ্চির উপর আর মেজেতে রজনী ও বুদ্ধিরাম বসিয়া আছেন। এবারে গীতা, চণ্ডী ও কঠোপনিষদ হইতে শ্লোক পড়িয়া শুনাইতেছেন। "যারা শ্রেয়ঃ চায় তাদের কঠোপনিষদ পাঠ করা উচিত। ঠাকুর বলতেন, 'যাদের আজন্ম কিছুতে মন নাই কেবল ভগবানকে চায় তারাই সিদ্ধ। যেমন চাতক বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল খায় না। তা না হলে অন্য জল খেয়ে ফেলে। যেমন অশ্বথের ঘর খণ্ড হয়ে গেল।'

"ঠাকুর বলতেন, 'এখানেই এস।' জানতেন কিনা এখানে এলে সব পাবে। তীর্থ পর্য্যন্ত নয়! কামারপুকুর যাব, ঠাকুর শুনে বললেন, 'আমি ভাল হই একসঙ্গে যাব।'

"নচিকেতা তিন দিন না খেয়ে উপবাস করে রইল, বললে, 'মরি তবু ভাল, প্রেয়ঃ নিয়ে কি হবে। **ভোগেতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে।** আর ভোগই বা কি করব? এ শরীরই থাকবে না। আর তুমি বলছ—ব্রহ্মপদ গ্রহণ কর ; তাও অনিত্য, ব্রহ্মাদি দেবতারাও কালগ্রাসে পতিত হয়ে থাকে। ভোগের দ্বারা মানুষ কখনও সুখলাভ করতে পারে না। অতএব তোমার ভোগ তোমাতেই থাক, আমার একমাত্র কাম্য, আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্বোভাবা মর্ত্তস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবেব বাহাস্তব নৃত্তগীতে।

নবিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ সএব।

[কঠ—১।১।২৬।২৭

যখন যম দেখলে এ উত্তম অধিকারী কেবল শ্রেয়ঃ ভিন্ন অন্য কিছু চায় না তখন আত্মজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

[কঠ—১।৩।১৪

উঠো জাগো শ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে লাভ করে তাঁকে অবগত হও। তীক্ষ্ণ শাণিত ক্ষুরের ধারের পথ, বড়ই দুর্গম, পণ্ডিতেরা বলে গেছেন।

সেইজন্য সদ্‌গুরু চাই তিনি সোজা পথ বলে দেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো নমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমে বৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।

[কঠ—১।২।২২

পাণ্ডিত্যের দ্বারা মেধা দ্বারা আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কেবল তাঁর কৃপায় তাঁকে লাভ করা যায়।"

সন্ধ্যা হইল সন্ধ্যার পর অনেক ভক্তেরাই উপস্থিত। ডাক্তার, বিনয়, অমৃতলাল গুপ্ত, সুধীর বিশ্বাস, জগবন্ধু, যতীন, বলাই, গদাধর ও অমূল্যকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি।

শ্রীম চারতলার ছাদে আসিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন।

অহিংসা

ডাক্তার—আপনি বলেছেন ছারপোকা মারতে নেই।

শ্রীম—নিয়ম থাকে না, রাত্রে হয়ত মেরে ফেললাম।

ডাক্তার—সাপ না মারলে চলে না।

অমৃত—একটি বাড়ীতে সাপ বেরিয়েছিল, ওঝাকে ডেকে সে সাপটাকে ধরে।

শ্রীম—সাপকে মারবে না? তবে চলে যাচ্ছে মারতে নেই। এইরূপ শোনা যায় বনের বাঘ, সাপ, বন্যজন্তুরাও ঋষিদের কোনও অনিষ্ট করত না। চৈতন্যদেব বন দিয়ে যাচ্ছেন, কাছে বাঘ, সিংহ তবু তারা হিংসা করত না। তিনি আবার তাদের গায়ে হাত বুলোতেন। রামনাম শুনোতেন। নেপোলিয়ানকে যখন ধরবে তখন আটজন সৈনিক গিয়েছিল। তিনি এক পর্ব্বতগুহায় লুকিয়েছিলেন; তারা তার কাছ থেকে তরোয়াল চাইতে সাহস করলে না। একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতে সব সৈন্যরা পালিয়ে গেল। সাপকে সর্ত্ত, বাঘকে বন এই সব বিধান করেছেন।

কথা কহিতে কহিতে রাত প্রায় দশটা হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫২ ॥

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল সাড়ে ৭টায় চারতলার বারাণ্ডায় শ্রীম বসিয়া আছেন। কাছে মুকুন্দ, ছোট জিতেন, বিনয়, বুদ্ধিরাম, রজনী, গদাধর উপস্থিত। ছোট জিতেনবাবুর বাড়ীতে ছেলেদের অসুখ সেই সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

স্ত্রীর জন্য সন্তানে টান

শ্রীম—ছেলেদের উপর টান কেবল পরিবার আছে বলে। (ঠাকুরের ভাগ্নে) হৃদয়ের ভাইয়ের ছেলের পরিবারের যেদিন মৃত্যু হয় সেই দিন সকালে সে চম্পট দিলে। তার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ছিল। ছেলেদের যতদূর দুরাবস্থা হবার হল। কন্যা অপাত্রে দান; তার বড় ছেলেটি একটি দোকানে পাকের কার্য্য করত। একজন বাবু (শ্রীম) গড়ের মাঠে বেড়াতে যেত: তার সঙ্গে সেই বড় ছেলেটির দেখা হয় এবং তার কাছে সমস্ত দুরবস্থার কথা জানায়। তার কাছে বলে, আমার খুব পড়বার ইচ্ছে, আপনি একটু সাহায্য করুন; শেষে এই (মর্টন) স্কুলে Free ভর্ত্তি করানো হল। এইরূপে B. A. পাশ করে, একজনের বাড়ীতে ছেলে পড়াত। সেই আবার দেড়শো টাকা মাইনেতে চাকরি পায়। এখন দুই হাজার টাকা

জমিয়েছে। সেদিন এখানে এসেছিল। দু হাজার টাকা জমিয়েছে শুনে আবার তার বাপ কাছে এসেছে, হুকা হাতে করে। পরিব্রাজক জীবন ত্যাগ করে সেবা নিতে এসেছেন। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর বলতেন, ছেলে হলে বড় মুশকিল ; তাদের পড়ানো মানুষ করানো ইত্যাদি কর্ম্ম বেড়ে যায়।

টাকা থাকলেই অনর্থ

ছোট জিতেন—কালকে গৌড়ীয় মঠে বললে, গৃহস্থরা সাধুসঙ্গ করতে আসে আবার ইন্দ্রিয়সুখে আবদ্ধও হয়। কালকে বেশ বলেছে। কিন্তু আবার ভক্তদের কাছে টাকাও চাই।

শ্রীম—আশ্রম থাকলে ও চাইই। ওরই জন্য নবদ্বীপে মারামারি হয়েছিল। আবার দেখ অত বড় লোকটাকে ওরই জন্য বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে। জানি না শুনা যায়। ঠাকুর ওধার দিয়েই নয়। বড়লোক হাতে থাকলেও গোলমাল, হুকুম করলেই যেতে হবে। অমনি পাঁচ হাজার টাকা উপস্থিত। ঠাকুর বলতেন, আমার হাতে না থেকে ব্যাঙ্কে থাকলেও থাকাই। (তিনি ত টাকা স্পর্শ করতে পারতেন না) কেন ওঁর কাছে বড় বড় গাড়ী দাঁড়াত না? তিনি এক শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু চাইতেন না। অন্য সাধু বলে, তোমার টাকা হবে, রোগ সেরে যাবে ইত্যাদি।

ঠাকুরের নামে মাড়োয়ারী টাকা লিখে দিতে চাইলে ; শুনেই মূর্চ্ছিত। যেন মাথায় লাঠি মারলে। মথুরবাবু তালুক লিখে দিতে চাইলে ; ঠাকুর বললেন, 'ওরূপ বুদ্ধি করলে আমার অনিষ্ট হবে।' টাকা হাতে দিলে হাত বেঁকে যেত। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত যতক্ষণ না টাকা হাত থেকে সরানো হত। নরেন্দ্রের মা, ভাইরা যখন খেতে পাচ্ছেন না, নরেন্দ্র ঠাকুরকে একদিন বললেন, 'আপনি মাকে এ বিষয় একটু জানান।' তখন ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের ডাল-ভাতের অভাব হবে না।'

এমন সময় তিনজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত, হাতে কিছু ফল, তাহারা প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ওদিকে ডাকাতি হচ্ছে না?

ভক্ত—একজন ডাক্তার বৈদ্যনাথে গিয়েছিল, তার বাড়ীয় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে।

"মুকুন্দ স্কুলের ইনস্পেক্টর বলেছেন, 'হেড মাষ্টারদের বিলাতে গিয়ে দু

বৎসর training (শিক্ষা সম্বন্ধে) পড়তে হবে।”

• শ্রীম—যাও, যাও, দেখে এস স্বামীজী গিয়েছিলেন। সেখানে সীতাপতি মহারাজ তপস্যা করছেন।

বেলা হইয়াছে এইবারে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুকুন্দবাবুর আনীত ফলগুলি অদ্বৈত আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

বৈকাল বেলা ৪টা। চারতলার ঘরে খাটের উপর শ্রীম বসিয়া আছেন। কাছে ডাক্তার, গোপাল ও গদাধর। গৌড়ীয় মঠ থেকে বুদ্ধিরাম প্রসাদ আনিয়াছিলেন।

শ্রীম—এইখানে রাখ ভক্তেরা পাবেন।

দেবমন্দিরে প্রণামী

জনৈকা স্ত্রী ভক্ত ডাক্তারবাবুর মোটরে গৌড়ীয় মঠে যাইবেন তাই সেখানে প্রণামী দেবার জন্য বলিয়া দিতেছেন।

(ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর আমাকে চার জায়গায় প্রণামী দেওয়াইয়াছিলেন। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর নিকট, নবদ্বীপের চৈতন্যদেবের কাছে ; কাশীপুরের সিংহবাহিনীর কাছে ও দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর কাছে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর বলে দিলেন, ‘ষোলটা কাঁচাগোল্লা মা-কালীর কাছে ভোগ দিতে।’ সিংহবাহিনীর কাছে অধরকে বললেন, ‘তুমি প্রণামী দিলে না ?’

অধরবাবু বললেন, ‘প্রণামী দিতে হয় আমি ত জানি না।’ সেই কথা ঠাকুর আবার ভক্তদের কাছে গল্প করেছিলেন, ‘অধর বলে—আমি জানি না।’

আমি কালীঘাটে যাবার সময় খানিকক্ষণের জন্য বাড়ী যেতে চেয়েছিলাম। ঠাকুর বললেন, ‘আবার যাবে, এখানে বেশ আছ’। আবার কোন ভক্তের সম্বন্ধে বলতেন, ‘ওর সঙ্গে আর তিন দিন দেখা হলে তবে প্রাণটা শীতল হবে।’ ইচ্ছা তার সঙ্গে দেখা হলে ভিতরে কিছু আধ্যাত্মিক ভাব ঢুকিয়ে দিবেন তবে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে।

রাত্রি প্রায় ৮টা। চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন। কাছে জিতেন্দ্র, সুধীর, যতীন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিনয় প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা উপস্থিত হইলেন। ছাদে বৃষ্টি হওয়াতে টিনের বারাণ্ডায় বসা হইল। অমূল্যবাবু দেবী ভাগবত পাঠ করিতে লাগিলেন। ‘শুকদেবের বৈরাগ্য কথন—শুকদেবের

বৈরাগ্য হইয়াছে, ব্যাসদেব তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য জনকের কাছে পাঠাইতেছেন। কারণ ব্যাসদেব নিজে তাঁকে উপদেশ দিলে তাঁর বিশ্বাস হইবে না।

শ্রীম—ব্যাস যাঁকে ভাগবতে অবতার বলেছেন, তিনি এরূপ কথা কি বলতে পারেন? এসব গৃহীদের ভাব শাস্ত্রেতে ঢুকিয়েছে। সিদ্ধপুরুষরা সব জানতে পারেন।

আবার কিয়ৎক্ষণ পাঠ হইয়া বন্ধ হইল। ছোট জিতেন কালীঘাটের মা-কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন।

প্রসাদ দেখিয়া শ্রীম বলিতেছেন, "মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতগুলি ভক্ত স্মরণ করছে কি না।"

রাত হইয়াছে। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫৩ ॥

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

রাত্রি সাড়ে ৭টা। গদাধর দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রসাদ হস্তে আসিলেন। শ্রীম দুতলায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, কাছে ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ সেন, দুর্গাপদ মিত্র, সুখলাল রায়, কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট জিতেন, রমেশ, যতীন প্রভৃতি আসিলেন।

দীনতার প্রতিমূর্ত্তি নাগমশায়

শ্রীম নাগ মহাশয়ের কথা বলিতেছেন, "তাঁর কথা, উপদেশ, একটা যদি কেউ পালন করে তাহলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। বাড়ীতে মুটেকে নিয়ে গেছেন, তার কষ্ট দেখে হাওয়া করছেন, ভাল খাবার দিচ্ছেন।

বাজারে গিয়েছেন, যে-যা দাম বলে তাই দিচ্ছেন। পাশের লোক দেখে বলে, 'করলি কি, ও যে সাধু নাগ মহাশয় রে।' সে তখন পয়সা ফিরিয়ে দিত। তখন নাগ মহাশয় বলতেন, 'না না আপনার ওতে লোকসান হবে।' গৃহের সামনে বাঁশ গাছ আছে কাটতেন না। সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখতেন।

হরি মহারাজ আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন। সাধুদের জন্য আলাদা

লেপ, তোষক তুলে রেখে দিয়েছেন। সাধুরা গেলে সে সব পেতে দিতেন। নিজে কিন্তু চাটাইতে শুতেন। পরিবার আর এক চাটাইতে শুতেন। আমরা গিয়েছি, আমাদের খাবার দিয়ে বাহিরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক যেমন ঠাকুরসেবা করে।

"অন্য লোক জমক করে বলে, আমি কামিনী ত্যাগ করেছি কিন্তু তিনি দীনতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। গ্রাম থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে ইস্কুল, সেখানে ছেলেবেলায় হেঁটে যেতেন।"

ডাক্তার—তাঁদের তেমনি শক্তি ছিল।

দুর্গাপদ—ঠাকুরই কেবল নিজের পরিবারকে কাছে রেখেছিলেন। আর কেউ পারে না।

শ্রীম—কেন, তিনি যদি কৃপা করেন, 'পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি।'

ডাক্তার—আর সব পারা যায়। আমিও স্কুলে চার ক্রোশ দূরে হেঁটে যেতুম।

শ্রীম—আপনি কি সেদিন রাত্রে সেখানে থাকতেন?

ডাক্তার—সেইদিন, না, ফিরে আসতাম। এইরূপ হপ্তাখানেক করে ছিলাম।

শ্রীম—সেইজন্য ভাল হচ্ছে। আপনারা কি কম! চাটাইতে শুতে পারেন নি। আর সব পেরেছেন।

"তিনি বড় পিতৃভক্ত ছিলেন। একদিন তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, 'তুই কবিরাজী করলি না।'

"নাগ মহাশয়ের ভাইঝি, পার্ব্বতীবাবুর স্ত্রী; তিনিও খুব ভক্তিমতী। সেই রক্ত রয়েছে কি না।

"পার্ব্বতীবাবুরা মিটিং (সভা) করতে চাইছে। কি যে লাভ বোঝা যায় না; publicরা (সাধারণে) এসে বলবে একটা পাগল। হলের ভাড়া ৬০৲ টাকা নেবে, যারা আসবে তাদের মোটর ভাড়া দিতে হবে। আবার ইংরাজীতে লেকচার হবে।

"ঠাকুর বলতেন, 'আমি মনে করেছিলাম, নারায়ণ শাস্ত্রী এখানকার সম্বন্ধে পুঁথি লিখে রেখেছিল প্রকাশ করবে। তা দেখলুম কেশবই করলে।' ওরা যে সব স্বামীজীকে মানে, সে কেবল ওঁর ভেতর খুব মান, যশ, বিদ্যা, পাণ্ডিত্যের প্রকাশ দেখে কি না, তাই।

"সেদিনে রামোহন লাইব্রেরীতে সভা হয়েছিল। সাধুরাও অনেকে

উপস্থিত ছিলেন। এক বৃদ্ধা মহিলা বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ওহে সভ্যগণ, পুরুষদিগের জন্য কত আশ্রম প্রতিষ্ঠান করছেন, আমাদের জন্য কিছু করুন।'

"সাধুদের উদ্দেশ করে ঐরূপ কথন বলে? সাধুরা গঙ্গার ওপারে আছেন। ওদের নিয়ে কেন টানাটানি। ওদের গুরুদেব আছেন। তিনি রক্ষা করবেন। সিদ্ধপুরুষ ছাড়া এইজন্য শহরে আসতে নেই। আজকাল গান্ধী বেশ বক্তৃতা দিচ্ছেন। ইউরোপীয়দের সঙ্গে বন্ধুভাব কর, চরকা কাট ইত্যাদি। ঠাকুর বলতেন, 'আগে ঈশ্বর তারপর আর সব।'

"বসুমতীতে বেশ ছবি দিয়েছে। নিত্যগোপাল, শিবানন্দ স্বামী, অধরবাবু প্রভৃতির ছবি দিয়েছে।"

বড় জিতেন—সকলের ছবি দিয়েছে, আপনার ছবি দিলে না?

শ্রীম—তোমার আমার একসঙ্গে।

বড জিতেন—আমি ত রাজী আছি। আপনার পাদমূলে বসে থাকব।

গদাধর দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রসাদ আনিয়াছিলেন; সেই প্রসাদ শ্রীমকে দেওয়াতে শ্রীম বলিলেন, কখন এলে?

গদাধর—এক ঘণ্টা হবে।

দক্ষিণেশ্বরের সমস্ত সংবাদ লইলেন। রাত্রি প্রায় দশটা হইয়াছে। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫৪ ॥

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। স্থান—স্কুলবাড়ী।

বৈকাল ৪টা, চারতলার টিনের বারাণ্ডায় শ্রীম বসিয়া আছেন কাছে গোপাল ও গদাধর।

অর্থ—সার্থক সদ্ব্যয়ে

গোপাল—আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের কাছে একজন মাড়োয়ারী খুব বড় হাসপাতাল করেছে। হাসপাতালের মধ্যে সত্যনারায়ণের মন্দির আছে। কর্ত্তাটির খুব দীনহীন ভাব। টাকাগুলি ব্যাঙ্কে জমা আছে, তার সুদেতে হাসপাতাল চলে।

শ্রীম—তার টাকাগুলি সার্থক হল, নিজেও ধন্য হল। ভগবানই করলেন কিন্তু আমরা মনে করি, আমরা করলাম।

"ঠাকুর বলতেন, 'সকলে বলে রাণী রাসমণির কালীবাড়ী, কেউ বলে না; ঈশ্বরের কালীবাড়ী।'

মহামায়াঃ তপঃ

"তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করেছেন। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। সবই আশ্চর্য্য। এ যেন জলের ভুড়ভুড়ি।"

শ্রীম আবার গান গাহিতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসি। ইত্যাদি

গদাধর—তাঁকেই মহামায়া বলেছে?

শ্রীম—হ্যাঁ।

গদাধর—তবে যিনি নিত্য, যিনি শুদ্ধ স্বরূপ, তারই লীলা কি করে বলছেন?

শ্রীম—একটু নীচের 'আমি' থাকে, তাকে 'বিদ্যার-আমি' বলে। 'বিদ্যার আমি' যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ লীলা, ততক্ষণ সত্য। মহাসমুদ্র হতে ব্রহ্মার প্রতি এক দৈববাণী হলো—'তপস্যা কর', 'তপস্যা কর', 'তবে বুঝতে পারবে।'

"ভাগবতে এই রকম আছে। জগতের আদি কবি ব্রহ্মা আধার পদ্মে উপবেশন করে ঐ পদ্মের মূল কোথায় অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলেন। কিন্তু কোনও কিছুর সন্ধানই করে উঠতে পারলেন না। তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ সেই অপার কারণ সমুদ্র হতে একটি শব্দ উঠল, 'তপঃ'। এই অক্ষর দুটি বিত্তহীন তপস্বীদের একমাত্র বিত্ত।"

"কমল যোনি ব্রহ্মা ঐ শব্দটি শুনে, কোথা থেকে শব্দটি উঠল জানবার জন্য চারিদিকে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই আধার পদ্মে বসে ইন্দ্রিয়সকল নিরোধ করে দিব্য এক হাজার বছর তপস্যা করলেন। নারায়ণ তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে দেখা দিলেন এবং বললেন, 'তপঃ শব্দের দ্বারা আমিই তোমাকে উপদেশ করেছিলাম।' হে অনঘ! তপস্যাই আমার হৃদয় এবং আত্মা। আমি তপঃ বলেই এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহার করি।" [ভাঃ—২।৯]

উপলব্ধির তর-তম

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন, 'গুরুর উপদেশে একরকম জানা যায়, শাস্ত্র পড়ে একরকম জানা যায়, ধ্যান করে আর একরকম জানা যায়, আবার তিনি যখন নিজে দেখিয়ে দেন সে আর এক রকম।' জানতে গেলে তার কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

শ্রীম ছাদে আসিলেন ; সঙ্গে গদাধর ও গোপাল।

গোপাল—তাঁর রূপ দর্শন হয় ?

শ্রীম—হ্যাঁ, ঠাকুর বলতেন, 'তপস্যা করতে করতে আর একটি চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।'

গদাধর—আপনার ঐ এক কথা।

শ্রীম—হক কথা বলব না। শুনে রাখ শেষে যদি হয়।

গদাধর—দক্ষিণেশ্বর কি জায়গা! সকলে বলে ওখানে থাকলেই সব হয়ে যায়, অন্য কিছুর দরকার হয় না। তিনি যে অবতার, আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যদি কৃপা করে সেখানে রাখেন।

শ্রীম—হ্যাঁ, যা বলেছিলাম মিলছে ? আমি হলে যেটুকু পারতাম সেবা নিয়ে থাকতাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে শ্রীম দ্বিতলায় ধ্যান করিতে লাগিলেন। কাছে ডাক্তার, বিনয়, মনোরঞ্জন, গদাধর, গোপাল। ধ্যানের পর শ্রীম ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। ভক্তেরাও তাহার সঙ্গে গেলেন। ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তন বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া আবার স্কুলবাড়ীতে ফিরিলেন। আবার কথা আরম্ভ হইল—

নিত্যানন্দ প্রচারক

শ্রীম—গৌরাঙ্গকে নিত্যানন্দ প্রচার করলেন। গৌরাঙ্গ ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন না। তাই গান গেয়ে বলতেন, 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে।'

"সেই জন্য নিত্যানন্দকে পূজো করে। নবদ্বীপে চৈতন্যদেব আনন্দের হাট বসিয়ে আবার সব ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাই একে বলে বিষ্ণু মায়া। ঠাকুর গাড়ী করে পেনেটিতে যাচ্ছিলেন সঙ্গে ভক্তেরাও ছিলেন। ঠাকুর গাড়ী থেকে নেমে কাউকে সঙ্গে না নিয়ে তীরবেগে ছুটে কীর্ত্তনে যোগ

দিলেন। ভক্তেরা এদিকে খুঁজছে কোথা গেলেন; শেষে দেখলে, ঠাকুর কীর্ত্তনেতে নৃত্য করছেন।

"মহাপুরুষ ভগবানকে কত ভাবে আস্বাদন করেন, ঠাকুর সর্ব্বদাই বাহ্য-শূন্য হয়ে থাকতেন, sense world (ইন্দ্রিয় জগৎ) এর connection (সম্বন্ধ) নেই, আমি Disappeared (অন্তর্দ্ধান) তাই বলেছিলেন, কলিকালে অন্নগত প্রাণ, তপস্যা করতে পারবে না। অবতারাদি সব পারেন। সাধারণ লোক পারে না। যার যা পেটে সয় বেশী সইবে না।"

বুদ্ধিরাম মা-কালীর প্রসাদ ভক্তদের দিলেন। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫৮ ॥

১লা নভেম্বর, ১৯২৫। স্থান—৺পুরীধাম শশীনিকেতন।

একজন ব্রহ্মচারী সৈকতালয়ে সিদ্ধানন্দ মহারাজের কাছে থাকেন, শ্রীম তাঁকে বলে দিয়েছেন, সাধুসঙ্গে থাকলে সাধুবৃত্তি বজায় থাকে। গৃহী গৃহস্থের সঙ্গে থাকে। সাধুরা ভিক্ষা করে, জপ-ধ্যান করে, তাদের দেখে নিজের কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।

ব্রহ্মচারী সৈকতালয় হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া শ্রীম শশীনিকেতনে যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে যে ঠাকুরের ছবি ও মায়ের ছবি আছে তাহাতে সেই ফুলগুলি সাজাইয়া দিলেন।

আজ শ্রীমর শরীর অসুস্থ, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। রাত্রে কাশি হইয়াছিল। তথাপি তৈত্তীরীয় উপনিষদ হইতে সার সার উপদেশগুলি পড়িয়া শুনাইতেছেন, যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারীরা ভগবানকে লাভ করিতে পারে।

শ্রীম—ঋষিরা উপদেশ দিয়েছেন, ব্রহ্মচারীরা আচার্য্য সেবা, মাতাপিতা সেবা, অতিথি সেবা, সত্যকথা, স্বাধ্যায় এইগুলি পালন করবে।

"আবার ঋষিরা হোম করছেন তাতে বলছেন যেমন চতুর্দ্দিক থেকে নদনদী এসে সাগরে মিলিত হয় সেইরূপ নানাদিক থেকে ব্রহ্মচারীগণ আমার কাছে আসুক, তার মানে ভক্ত, ব্রহ্মচারী এলে ঈশ্বরীয় কথা ঈশ্বর ভাবের

উদ্দীপন হয় তাই ঋষিরা প্রর্থনা করছেন।

"আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। * * * যথাপঃ প্রবতার্যন্তি যথামাসা অহর্জরম এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। (তৈত্তীরীয় ১।৪র্থ অনুরাগ)। ব্রহ্মচর্য্য পালনের এইগুলি সোপান। (সত্যকথা মেয়েদের সঙ্গে বসে বেশীক্ষণ কথা কইতে নেই। ঠাকুর তামাক খাবার নাম করে অল্পক্ষণ পরে উঠে পড়তেন।)

("বড় লোকের পেছনে ঘুরবে না। বিষয়ীদের হাওয়া যাতে না লাগে সেইজন্য ঠাকুর মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বেড়াতেন। সঞ্চয় করবে না। ঘড়ি যেমন সর্ব্বদা টিক টিক করে তেমনি ঈশ্বরের নাম করবে। অর্হনিশি ব্রহ্মণি যে রমন্তুঃ কৌপিনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।) (শঙ্কর কৃত কৌপিন পঞ্চক)।

"ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন। যা কিছু গোপনীয় সেগুলি ত্যাগ করবে। দেখ আজ থেকে কিছুদিন মৌনী থাক। ঠাকুর মাঝে মাঝে করতেন। এসব প্রথম প্রথম করতে হয়। পুরানো সাধুর কিছু দরকার নেই। সে বেদ বিধির পার। সব নিয়মের পার। যেমন শুকদেবের কোন চিহ্ন নেই। অব্যক্ত লিঙ্গ। এখন এই যে করছ পরে আবার করতে ইচ্ছা হবে। আনন্দের আস্বাদ পেলে আপনি করতে ইচ্ছা হয়। সপ্তাহের পর পর গৌর বাট সাহি দর্শন কর।। সেইখানে চৈতন্যদেবের গোপীপ্রেম হয়েছিল। চটক পর্ব্বত, টোটার গোপীনাথ স্থানে তাহার স্মৃতি জড়িত রয়েছে। তিনি গম্ভীরা থেকে সমুদ্রে স্নান করে টোটার গোপীনাথে গদাধরের ভাগবত পাঠ শুনতেন।

"সমুদ্র উপকূলের বৃক্ষগুলি দেখে বৃন্দাবনের স্মৃতি স্মরণ হত। কখনো কখনো এমন বিরহ হত যে রাস্তায় শুয়ে পড়তেন। ভক্তেরা প্রভুর অঙ্গে চন্দন লেপন, চামর ব্যজন, পাদ সম্বাহন করে শ্রান্তি দূর করতেন। কখনো কখনো চাঁদনি রাতে টোটার গোপীনাথ রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতেন, কৃষ্ণ-বিরহে পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকতেন। সেই রাস্তাকে গৌরবাটসাহি বলে।

"বাট মানে রাস্তা। আমি যেতে পাচ্ছি না, মনটা ছটফট করছে। গোপীরা ঐশ্বর্য্য চায় না তারা মাধুর্য্য চাইত। গোপীরা প্রভাস ক্ষেত্রে কৃষ্ণকে রাজবেশে দেখে চিনতে পারে নি। বলেছিল, 'একি! সেই পীতধড়া বংশী হাতে গরু চরাত, আমাদের রাখাল কোথায়।' কখনো কখনো জগন্নাথ স্বর্ণাদি অলঙ্কারে ভূষিত হন। রাজবেশ পরিধান করেন। যাদের রজোগুণ প্রধান তারা ঐ বেশ দেখে ভক্তি করে। বলে, 'ওঃ খুব দর্শন হল।' হাতীর

বাহিরের দাঁত ভিতরের দাঁত আছে। সেই রকম বাহিরের দাঁত কি পাঁচজন ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কওয়া। ভিতরের দাঁত অর্থাৎ নির্জ্জনে বসে তাঁকে চিন্তা করা তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া। স্বামীজী বলতেন, 'ঐশ্বর্য্যই সকলে ভালবাসে।' লোকে স্বামীজীর পাণ্ডিত্য যশ মানই দেখে। তিনি কি নিজেব কথা কিছু বলেছেন। তাঁর অদ্ভুত ভক্তি, ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, কত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন, কত ভাব। কে খবর রাখে। কে বা বুঝে!"

॥ ৫৬ ॥

২রা নভেম্বর, ১৯২৫। স্থান—৺পুরীধাম। শশীনিকেতন।

শ্রীম ভোববেলা নিজেব ঘরে বেড়াচ্ছেন। ব্রহ্মচারী সৈকতালয় হইতে ফুল আনিয়াছেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—ফুলগুলি নিয়ে ঠাকুরকে সাজিয়ে দাও।

ব্রহ্মচারীটি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সৈকতালযে সিদ্ধানন্দ মহারাজের কাছে থাকেন।

শ্রীম—সিদ্ধানন্দের বড মুস্কিল হয়েছে। আজ এ মৌনী, কাল ও মৌনী তাকে সব ভাবতে হয়। আবার হলঘরের বারাণ্ডায় এলেন।

"মৌনী হওয়া কত বড ব্রত। সন্ন্যাসের সময় হাতে দণ্ড দেয় শাস্ত্রে আছে কায়িক, মানসিক, বাচিক দণ্ড। শরীর দ্বারা কারোকে হিংসা না করা (মেরে না ফেলা) মনেতে যে কাম, ক্রোধ আছে সেগুলি দমন করা।

শ্রীরূপ গোঁসাই তাহাব স্তবমালাতে লিখিযাছেন—

পয়োরাশেস্তীবে স্ফুবদুপবনালী কলনযা,
মুহুর্বৃন্দাবনস্মবণ জনিত প্রেম বিবশঃ।
কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তি বসিকঃ,
সচৈতন্যঃ কিংমে পুনবপি দৃষোবাস্ততি পদম্।

সমুদ্র উপকূলে উপবন দর্শন কবিয়া বৃন্দাবনেব স্মৃতি হওয়ায় পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কখন কখন কৃষ্ণনামোচ্চারণে যাঁহাব রসনা চপল হইয়া পড়িত, যিনি গূঢ় প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন করিতেন সেই চৈতন্য প্রভু কি আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন।

বাক্যদণ্ড যথার্থ সত্য কথা বলা। তা নয় বাজে কথা কইছি প্রলাপ বকছি, হয়ত একটা মিথ্যা কথা বলে ফেললাম। ভিতরে কোন প্রকার সত্যের আঁট নেই। মনে করে একটা মিথ্যা কথা কয়েছি বইত নয়। এইতে লোককে চেনা যায় ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা নেই। তা যার যেমন ভাব তার সেই রকম লাভ। কারু হয়ত জীবনে যশ, মান, আশীর্ব্বাদ করা এই পর্য্যন্ত। এ জন্মে আর ভগবান লাভ হলো না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীম সমুদ্র ধারে বেড়াইতে গেলেন। শশীনিকেতন হইতে সমুদ্রের ধারে যাইতে রাস্তায় সুখেন্দু, সুরেশ, সিদ্ধানন্দ স্বামী, গদাধর আসিয়া জুটিলেন।

একজন ভদ্রলোক রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীম (ভদ্রলোককে বলিতেছেন)—গাছের ছায়াতে আসুন, 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা' (চণ্ডী ৫।১৭) শরীর রক্ষা করবার জন্য ক্ষুধা নিদ্রা দিয়েছেন লজ্জারূপে আবার বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে হয়ে আছেন। তিনি প্রবৃত্তি দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। তোমরা কি করছ।'

তিনি মনে করলে ঘর ভেদ করে light (আলো) আনতে পারেন।

শ্রীম (সিদ্ধানন্দের প্রতি)—আজকে মুক্তি মহারাজ ও শচীন সাক্ষীগোপাল গেছে। শচীনকে বলে দিয়েছি স্বপাক করে যেন সাধুকে খাওয়ায়। সাধুসেবা কত বড় জিনিস। নিজে পাক করে খাওয়ালে অনেকদিন মনে থাকবে। সাধুসঙ্গে দেবদর্শন দুর্ল্লভ।

"কয়টা বেজেছে?"

সিদ্ধানন্দ মঃ—নয়টা

শ্রীম—উঠা যাক।

তখন সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৩৭ ॥

২২শে নভেম্বর, ১৯২৫। স্থান—৺পুরীধাম। শশীনিকেতন।

শ্রীম সকাল বেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বেড়াইয়া শশী-নিকেতনের হলঘরের বারাণ্ডায় চেয়ারে বসিয়া আছেন। কাছে গদাধর, নির্গুণানন্দ (মুক্তি মহারাজ) বেলা প্রায় আটটা নয়টা হইবে।

মুক্তি মহারাজ—মানুষের হাতে পড়লে অবতারকে ভূত বানিয়ে ছেড়ে দেয়।

শ্রীম (হাস্য)—হাঁ! হাঁ!

"তবে ঠাকুর ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন। যদি বল তিনি তার সঙ্গে কথা কইতেন তার প্রমাণ কি? তিনি যা বলেছেন সে সব মিলেছে। কোনটা অমিল নয়। আর একরকম হচ্ছে বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ অবস্থা। ঠাকুরের এসব অবস্থা হত। যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন, তাঁর বালকের মত অবস্থা হয়, গুণাতীত হয়ে যান—কোন গুণের আঁট থাকে না।"

মুক্তি মহারাজ—যার গর্ভ হয়েছে, সেই জানতে পারে অপরে জানতে পারে না।

শ্রীম—Higher man (উচ্চতর লোকেরা) জানতে পারেন। ঠাকুর বলতেন, 'ছাদে যেতে পঞ্চাশটা ধাপ, যে পাঁচ ধাপে উঠেছে সে নীচেকার কথা বলতে পারে। উপরের কথা বলতে পারে না।

মুক্তি মহারাজ—কুণ্ডলিনী জাগা মানে কি?

শ্রীম—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হওয়া। কুণ্ডলিনীকে দেখতে পাচ্ছি না বলে আকুল ক্রন্দন। ঠাকুর বলতেন, 'যেমন ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছ তোমার অবশ্য কুণ্ডলিনী জেগেছে।'

মুক্তি মহারাজ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—তোমার সঙ্গে মহারাজের কিছু কথা হয়?

গদাধর—হ্যাঁ হয়। তিনি বলেন, 'লেখাপড়া না করলে কিছু হয় না। আমি বললাম, 'কেন শবরী, গোপীরা, হনুমান, ঠাকুর এঁরাও তেমন লেখাপড়া জানতেন না। তবু এদের যা হয়েছে……ইত্যাদি।

শ্রীম ভোজনের পর সমুদ্রের ধারে যাইতেছেন। সমুদ্রে যাইতে রাস্তায় একটি ক্লাব আছে সেইখানে বসিলেন। সেইখান থেকে সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছে। এখন লোক চলাচল কম। রৌদ্রের কিরণে চতুর্দ্দিক ঝিকমিক করিতেছে। ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ, সমুদ্রের মেঘগম্ভীর ধ্বনি শুনা যাইতেছে। একজন ভক্ত সঙ্গে।

শ্রীম (সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া)—চুপ করিয়া বসে আছেন। কি যেন ধ্যান করিতেছেন, আবার কথা কহিতেছেন বেশ অনাহত শব্দের ন্যায় শুনাচ্ছে।

"এই যে সামনে অনন্ত, মহামায়া দেখতে দিচ্ছে না। মানুষকে অনন্ত উপলব্ধি করবার শক্তি দিয়েছেন পশুদের চার পা দিয়েছেন তারা উপরে চাইতে পারে না। এই পৃথিবী ফুটবলের মত। আমরা সমুদ্র দেখেই অবাক্! এর চাইতে যে কত বড় একজন অনন্ত অসীম আছেন ধারণা করবার জো নাই। সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া আবার যেখানে আদালতের কাছে কতকগুলি বড় বড় ঝাউগাছ আছে সেখানে বসিলেন, সেখান থেকে লোকজন দেখা যায় না।

"গাছতলায় বসলে ঋষিদের উদ্দীপন হয়। এই শব্দ শুনে (ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ) ভগবানকে মনে পড়ে।

এমন সময় বুদ্ধিরাম এলেন।

শ্রীম (বুদ্ধিরামের প্রতি)—ভগবান এই পা দিয়াছেন তীর্থ দর্শন করবার জন্য। চক্ষু দিয়ে তার মূর্ত্তি দর্শন, কর্ণ তাঁর কথা শ্রবণে, মন তাঁকে চিন্তা করবার জন্য। হস্ত তাঁর সেবার জন্য।

* সবৈ মনঃ কৃষ্ণ পদার বিন্দয়ো
বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানু কীর্ত্তনে
করৌ হরে মন্দির মার্জ্জনমাদিষু
শ্রুতিংচকারাচ্যুত সৎ কথোদয়ে। ১৮
মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ
তদ ভৃত্য গাত্রস্পরশেংঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎ পাদ সরোজ সৌরভে
শ্রীমত্ত লক্ষ্যা রসনাং তদর্পিতে। ১৯

২৪শে নভেম্বর, ১৯২৫। স্থান—৺পুরীধাম। শশীনিকেতন।

দেশিকানন্দ স্বামী বাঙ্গালোরে অনেকদিন ছিলেন। তুলসী মহারাজের কাছে থাকিতেন। কিছুদিন তীর্থ করিবার জন্য অবসর লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম পুরীধামে শশীনিকেতনে আছেন শুনিয়া দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন। শ্রীম দেশিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে যাইতেছেন। সঙ্গে সুখেন্দু ও গদাধর।

শ্রীম (সমুদ্র দেখিয়া দেশিকানন্দকে)—'সরসামস্মি সাগরঃ' (গীতা ১০।২৪) তিনি সাগর হয়ে রয়েছেন। এই বলিয়া সাগরের জল স্পর্শ করিলেন। এইবার সমুদ্রের ধার দিয়া কুলদা ব্রহ্মচারীর আশ্রম যাইতেছেন। সমুদ্রের ধারে স্বর্গদ্বারের কাছে। কুলদা ব্রহ্মচারী বসিয়া তামাক খাইতেছেন। শ্রীম তাহাকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন। অন্য সকলেও নমস্কার করিয়া একধারে বসিলেন।

শ্রীম (কুলদা ব্রহ্মচারীর প্রতি)—আপনাকে দর্শন করতে এলাম। গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুরের কাছে যেতুম। পরমহংসদেব গোস্বামীকে ভাল-বাসতেন। বিজয় বিজয় করতেন। ঠাকুরের সময়কার লোক।

কুলদা ব্রহ্মচারী—আপনার নাম?

শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ।

কুলদা ব্রহ্মচারী—ও! নমস্কার। আপনাদের দেখলে খুব আনন্দ হয়। পুরানো লোক। আপনার শরীর থাকলে কত লোকের উপকার হবে। আপনি কি changeএ (হাওয়া বদলাতে) এসেছেন?

শ্রীম—হ্যাঁ। কলিকাতায় কাজকর্ম্মের ভীড় থাকে। তাই মাঝে মাঝে নিরিবিলি জায়গায় চলে আসি। এখানে এসে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। পেটের অসুখ করে।

কুলদা ব্রহ্মচারী—আপনি ভুবনেশ্বরে থাকলে ভাল হত।

শ্রীম—সেখানে এ সময় বড় ঠাণ্ডা।

কুলদা ব্রহ্মচারী—এখানকার রোদ লাগাবেন না। সমুদ্রের জলে স্নান করবেন না। মাঝে মাঝে করতে পারেন। সকালে বিকালে বেড়াবেন।

বেলা নয়টা থেকে রোদ খারাপ। রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা পর্য্যন্ত ভাল হওয়া বয় বলে সেই হাওয়াতে Ozone (ওজন) থাকে। আপনি সমুদ্র থেকে অনেক দূরে আছেন। আমাকে সকলে বললে, এই দিকটায় থাকতে, এদিকে থাকলে ভাল হবে। সেইজন্য এই দিকে রয়েছি।

শ্রীম—যেখানে থাকলে তাঁর (ঈশ্বরের) উদ্দীপন হয়, সেইখানে থাকা উচিত। গীতাতে বলেছে, সমুদ্র তাঁর একটি রূপ। আচ্ছা চৈতন্য মহাপ্রভু কি ৺জগন্নাথ দর্শন করে চক্রতীর্থ দর্শন করতে আসতেন? একজন বলেছেন, 'মন্দিরে শ্রীমহাপ্রভু করি দরশন, চক্রতীর্থ বুলি যায় শচীর নন্দন। সাধারণ লোক ৺জগন্নাথকে একপ্রকার দেখে। তাঁরা আর এক চক্ষে দেখতেন। তাঁদের মন শুকনো দেশলাই একটু ঘসলেই জ্বলে ওঠে। তাঁদের একটু কিছুতেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। পরমহংসদেব আমাদের শ্রীক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতেন বলে দিতেন ৺জগন্নাথকে দর্শন করে আলিঙ্গন করবে। আমি গেলে (পুরীধামে) শরীর থাকবে না চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব উদ্দীপন হয়ে শরীর চলে যাবে। পরমহংসদেব বলতেন, **যিনি চৈতন্যদেব তিনিই আমি।**'

কুলদা ব্রহ্মচারী—তাঁদের চেনা বড শক্ত।

শ্রীম—তিনি বলেছেন বলে তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করা। তাছাড়া উপায় নাই।

"স্বয়ংচৈব ব্রবীষি মে।" (গীতা, ১০।১৩) তুমি যেকালে বলছ, সেই হেতু নিশ্চয় বিশ্বাস করি। আপনি কবে তাঁর (বিজয় গোস্বামীর) সঙ্গে Join করলেন (মিলিত হলেন)?

কুলদা ব্রহ্মচারী—১৮৮৪তে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীম—আমরা ১৮৮২তে তাঁকে দর্শন করি। আপনার কি মনে পড়ে গোস্বামীর কি এক পেটের অসুখ ছিল তাই দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে করে ওষুধ নিয়ে গেছিলেন। পরমহংসদেবের ঘরে ওষুধ সেবন করলেন।

কুলদা ব্রহ্মচারী—হ্যাঁ! হ্যাঁ!

কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

* পাদৌহরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে। শিরোহৃষীকেশ
পদাভি বন্দনে, কামঞ্চ দাস্তেন তুকাম কাম্যয়া;
যথোত্তমঃশ্লোক জনাশ্রয়ারতিঃ। [শ্রীমদ্ভাগবত—৯।১৮।২০

শ্রীম—আস্তি। আপনার লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার কাছে আসব আসব বলে ভাবছিলাম। আজ দর্শন হয়ে গেল।

নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শুক্ল পক্ষ তাই জ্যোৎস্নায় সাগরের জল ঝকমক করিতেছে।

শ্রীম (সমুদ্রধার দিয়ে আসিতে আসিতে গদাধরের প্রতি)—দেখছ কি অনন্ত কাণ্ড চলছে। অসীম সচ্চিদানন্দ সাগরে কত চন্দ্র সূর্য্য উদয় অস্ত হচ্ছে।

দেশিকানন্দ ও গদাধর শ্রীমন্দিরে প্রভুকে দর্শন করিতে গেলেন। দর্শন করিয়া আসিয়া দেখেন শ্রীম শশী নিকেতনে রাস্তার দিকের ঘরটিতে বসিয়া গান গাহিতেছেন—

প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে
চির সঙ্গের সাথী আমার চির জীবন হে।
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর মুক্তি আমার বন্ধন ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবনমরণ হে।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে;
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে;
ওগো সবার ওগো আমার বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার;
অন্ত বিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।

আমাদের দেখিয়া বলিতেছেন এই প্রেমের জন্য সাধন ভজন। তাঁর প্রতি ভালবাসা হল ত সব হয়ে গেল। এই প্রেম হলে সব কোমল হয়ে যায়।

তারপর নিমাইচরিত পাঠ হইল। পাঠান্তে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫৯ ॥

১১ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

আজ সকাল বেলা আকাশ একটু মেঘলা। শ্রীম ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন। কাছে কয়েকজন ভক্ত।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি)—বল ত "প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"—সেই কঠোপনিষদের শ্লোকটা?

ব্রহ্মচারী—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"* [কঠ—২।৩।২

শ্রীম—এ শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।

ব্রহ্মচারী—আপনি করুন।

শ্রীম একটু চুপ করিয়া আছেন।

ব্রহ্মচারী—শাস্ত্রকরগণ কত উচ্চ স্তরের কথা বলেছেন।

শ্রীম—তা কি আর বলেছেন? সমাধিবান পুরুষ প্রত্যক্ষ করে ঐ সব বলে থাকবেন। কেউ হয়ত সেগুলি মুখস্থ করেছিল।

ব্রহ্মচারী—শাস্ত্রকারগণ পরোক্ষজ্ঞান থেকে অর্থাৎ শুনে লিখেছেন, আর ঋষিদের অপরোক্ষ জ্ঞান, অনেক তফাৎ।

শ্রীম—হ্যাঁ, তাঁরা অনুভূতির সঙ্গে যেটি না মেলে সেটি বাদ দেন। তাঁরা বুঝতে পারেন শাস্ত্রে এইগুলি পরে কেউ হয়ত ঢুকিয়েছে। তাই তাঁরা সেগুলি গ্রহণ করেন না।

এইবার ডাক্তার কার্ত্তিকবাবুর কথা হইতেছে। চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে তাঁহার শরীর গিয়াছে। তিনি ঠাকুরের খুব ভক্ত ছিলেন।

অবতারের দুঃখ

শ্রীম তাঁহার জন্য শোক করিয়া বলিতেছেন, "দশ বছর ধরে এখানে

---

* প্রাণরূপী মহৎভয়, উদ্যতবজ্র পরমাত্মার সত্তাতেই এই দৃশ্যমান জগৎ নিঃসৃত ও স্পন্দিত হইতেছে। যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

আসতেন। কিন্তু ভগবানের জন্য সমানে ব্যাকুলতা ছিল। একজন তাঁর সম্বন্ধে লিখেছে, 'তাঁর সকলের উপর ভালবাসা ছিল। ভক্তের বাড়ীর লোকটিকেও ভালবাসতেন। গরীবদের মা-বাপ ছিলেন।' এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিককে ঈশ্বর দুঃখময় সংসারে রাখবেন কেন? তাই তাঁকে কোলে টেনে নিলেন।"

বাড়ীর লোকেরা শ্রাদ্ধাদির কথা বলছিল। শ্রীম বলিলেন, "তা করা উচিত বৈ কি?" ঠাকুরের শেষ অসুখের সময়, তাঁর জ্ঞাতিরা বললে, "এ হচ্ছে মহাব্যাধি, এ রোগের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার।" ঠাকুর শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, কর', বলরামবাবুর পুরোহিত "অপরাধ ভঞ্জন স্তব" পাঠ করলেন। ঠাকুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের ও সব কিছু করবার দরকার নাই। অবতারদের কোন অররাধ হয় না। যাদের অহঙ্কার আছে তারা করুক।'

"অধর সেনের যখন ঘোড়া থেকে পড়ে শরীর গেল, তখন ঠাকুর তা শুনে কেঁদে মার কাছে বলেছিলেন, 'মা, তোর জন্যই এত দুঃখ। তুই বলেছিলি ভক্তদের নিয়ে থাক। তাই ওদের জন্য শোক পেতে হচ্ছে।' তিন দিন তাঁর জন্য শোক করেছিলেন। কেশব সেনের যখন শরীর যায়, তখনও ঠাকুর তিন দিন কারও সঙ্গে কথা কন নি। তারপর আর কোথাও কিছু নেই।"

অবতার আমড়াগাছকে আমগাছ করতে পারেন

শ্রীম বলিতে লাগিলেন, "অপর কতকগুলি লোকের চৈতন্য হবার জন্য ভক্তেরা নিজেদের বলি দেয়। ভগবানের সৃষ্টি কি এতটুকু? অনন্ত জগৎ —কত তাঁর ভক্ত। তিনি কাকে দিয়ে কি কাজ করান বোঝা বড় শক্ত। তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষকে জীবন্মুক্ত করে দিতে পারেন, তাঁর ভক্ত করে নিতে পারেন। আমড়াগাছকেও আমগাছ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে এত আমগাছ (ভক্ত) যে আমড়াগাছকে আমগাছ করবার বড় একটা দরকার হয় না।

"পাশ্চাত্য দেশের একজন দার্শনিক এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, মাছ ডিম প্রসব করে। সেই ডিমগুলির বেশীর ভাগ অন্য জলজন্তুতে খেয়ে ফেলে। যা বাকী থাকে সেইগুলি মাছ হয়। তেমনি তাঁর ভক্তদের তিনি (ঈশ্বর) কপ্ কপ্ করে খেয়ে ফেলেন।

অবতার কালভেদে অনেক

"অবতারই অসংখ্য। দশাবতার, চব্বিশ অবতার, অসংখ্য অবতার। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কালের উপযোগী করে তাঁকে শেখাতে হয়। ইসলাম ও খ্রীষ্টানদের কাছে মাথায় তিলক কেটে, কাঁধে পৈতা ফেলে গেলে হবে? তাদের মতন বেশভূষা নিয়ে যেতে হবে।"

ব্রহ্মচারী—এসব দেবলীলা।

শ্রীম—এইবার বুঝেছ!

অতিন্দ্রিয় লোক

ব্রহ্মচারী—ঋষিরা এসব সূক্ষ্ম তত্ত্ব কি প্রত্যক্ষ দেখতে পেতেন?

শ্রীম—কতকগুলি দেখেছেন, কতক ঈশ্বর তাঁদের কাছে বলেছেন। এ সব অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নেবার শক্তি কৈ? কর্ম্মক্ষয় না হলে ধারণাই হয় না। সাধারণে শুনতেই চায় না। ঠাকুর সকলের কাছে সব কথা বলতেন না। বলতেন, 'মা আমার মুখ চেপে ধরেছে, বলতে দিচ্ছে না।' অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ঘটী, কেউ কলসী, কেউ জালা। আকাশে যতই উপরে উঠ, তার উপরে, তার উপরে আছে। এর শেষ নেই।

ব্রহ্মচারী—কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না।

শ্রীম একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, "শুনেছি, যাঁদের বাসনা নেই, তাঁরা মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গে, দেবযান পথে গমন করেন। অর্চ্চিরাদি থেকে পক্ষ, মাস, সংবৎসর, এবং তা থেকে আদিত্য লোকে যায়। আদিত্য লোক থেকে চন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোক এবং সেখান থেকে তাঁদের এক অমানব পুরুষ এসে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করিয়ে দেয়।" (ছান্দোগ্য ৫।১০।২)

ব্রহ্মচারী—তাঁর সঙ্গে মিশে যায়?

শ্রীম—তা জানি না। আর যাদের ভোগের বাসনা রয়েছে, তাদের আবার জন্ম হয়। 'কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।' (গীতা ২।৪৩)। অবতারাদি মায়াকে আশ্রয় করে জন্ম পরিগ্রহ কচ্ছেন। কিন্তু মায়া তাঁদের কিছু করতে পারে না। তাঁরা একেবারে নির্লিপ্ত। মানুষের মত তাঁদের অজ্ঞান বলে বোধ হয়। যেমন স্ফটিকের কাছে কয়লা থাকলে স্ফটিক কাল

দেখায় সেইরকম। বাস্তবিক তাতে কোন অবিদ্যা বা আসক্তি নেই। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পতি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।" [গীতা—৪।১৪

ব্রহ্মচারী—কেউ কেউ বলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবিদ্যার একটু লেশ থাকে।

শ্রীম—হয়ত তাঁরা অধিকারিবিশেষে ও কথা বলেছেন। এ সব অবতার-পুরুষ বলে গেছেন। শ্রুতি অধিকারী ভেদে কত রকম বলেছেন। কোথাও বলেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ উঃ)। আবার বলছেন, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'।—(তৈত্তিরীয় ২।৪)।

॥ ৬০ ॥

১২ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শ্রীম ছাদের বারান্দায় হরিবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

অবতার

শ্রীম—ঠাকুরের শরীর আজ ৪৩ বৎসর হল গিয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সেদিনকার ঘটনা। এখনও সেই চিত্রগুলি চোখের সামনে ভাসছে। ঠাকুরের অসুখের সময়ের রিপোর্ট আমার কাছে আছে। প্রত্যেক দিন কত রক্ত পড়ল, কি রকম যন্ত্রণা, কি খেলেন, এই সব রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের কাছে যেতুম।

হরিবাবু—ঠাকুর কি ডাক্তারবাবুকে বলতে বলেছিলেন,—"আমাকে চিন্তা করলেই হবে, আমি সেই অবতার?"

শ্রীম—হ্যাঁ, ডাক্তার সরকারে কাছে বললে তিনি হয়তো চটেমটে উঠবেন, সেই জন্য আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন। তাতে উভয়েরই শিক্ষা হল।

বাবুরাম মহারাজ—অহৈতুকী ভালবাসা

হরিবাবু—মঠের দক্ষিণ দিকের জমির জন্য দুজন মুসলমানকে বাবুরাম মহারাজ কত করে বোঝালেন, 'তোমাদের ঐ জমির জন্য ডবল দাম নাও, ঐ জমিটা ছেড়ে দাও।' সে ত দিলই না, আবার অপর লোককে বারণ

করল। সেই লোক আবার মঠে এসে তাঁর কাছে আব্দার করত, 'আমাকে কাপড় দিতে হবে। একখানাতে হবে না, দুখানা দেন।' এই রকম করে আলাত। তা বাবুরাম মহারাজ তার দুষ্টুমি জেনেও বলতেন, 'একে কাপড় দে রে, কাপড় দে!' যা চাইত তা দিয়ে দিতেন।

শ্রীম—আপনি এতেই অবাক হচ্ছেন! চণ্ডীর গান শুনেছেন? কালকেতু অত্যন্ত গরীব ও মায়ের খুব ভক্ত ছিল। একদিন মাকে প্রার্থনা করে বললে, 'মা আমাকে কিছু ধন দাও।' মা তাঁর কাতরোক্তি শুনে বললেন, 'এইখানে সাত কলসী মোহর পোঁতা আছে, নিয়ে যাও।' কালকেতু সেইগুলি বার করে একত্র রেখে মাকে বললে, 'মা, দেখো, কেউ যেন এই মোহর না নেয়, তুমি এখানে পাহারা দিও।' এই বলে বাঁকে করে এক এক বারে দু কলসী করে মোহর নিয়ে যেতে লাগল। শেষে রইল এক কলসী। ও ভাবছে, মা যদি এ ঘড়াটা নিয়ে পালায়! সেই জন্য তাঁকে বললে, 'মা, কাঁখে করে এ ঘড়াটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস।' তার কথা শুনে মা হাসতে লাগলেন। আবার বলছে, 'কাউকে বিশ্বাস নেই।' মায়ের নূপুর শুনতে শুনতে চলল। আবার মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে।

॥ ৬১ ॥

১২ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

বৈকাল সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন। কাছে ভূতনাথ, বরাহনগরের কার্ত্তিক মহারাজ প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

আগে ঠাকুরের ধ্যান

ভূতনাথ—আচ্ছা, মাষ্টার মশায়, স্বামীজীকে ধ্যান করব, না ঠাকুরকে ধ্যান করব?

শ্রীম—স্বামীজী ঠাকুরকে ধ্যান করতে বলে গেছেন। আগে তাঁকে ধ্যান করে পরে স্বামীজীকে করো।

ভূতনাথ—স্বামীজীর কেমন তেজপুঞ্জ বীরের চেহারা—মাথায় পাগড়িবাঁধা, আর ঠাকুরের কি রকম চেহারা।

শ্রীম—কেন, স্বামীজীরও কৌপীন পরা, গায়ে আলখাল্লা, হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু-মূর্ত্তি আছে। যার যেমন ভাল লাগে সে সেইরূপ ধ্যান করে।

এইরূপ কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভূতনাথবাবু বলিলেন, 'আজ যাই আর একদিন আসব।'

শ্রীম—আর একটু বস। আর একদিন আসবে বললে কি আমরা ছাড়ি? (কার্ত্তিক মহারাজের প্রতি) আপনারা যখন এদিকে আসবেন, এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন।

কার্ত্তিক মঃ—আমরা আপনার কাছে কৃতার্থ হতে আসি। আপনাকে দর্শন করা মহা সৌভাগ্য। একবার কৃপা করে বরাহনগর আশ্রমে আপনি পায়ের ধূলো দিবেন।

আশ্রম মানুষের জন্য, মানুষ আশ্রমের জন্য নয়

শ্রীম—আমি যা বলেছি, আগে তাই করুন। আশ্রমে এত জায়গা পড়ে রয়েছে, যখন কাজ থাকবে না, একলা একটা গাছের তলায় বসে ধ্যান করবেন। তারপর এসে বললে পায়ের ধূলো পড়বে। কর্ম্ম কি বরাবর করতে হবে? কর্ম্ম করা কেন? ভক্তি আসবে বলে। কেবল কি কর্ম্মের মধ্যে থাকতে হয়? মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করতে হয়। তবে ত মনের কোন্‌খানে গলদ আছে ধরা যায়। প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম মানুষের জন্য, মানুষ ত আর আশ্রমের জন্য নয়? 'The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath., (St. mark 2.)

তাঁহারা দুইজন জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইল। শ্রীম তাঁহার চারতলার ঘরে ধ্যান করিতে গেলেন। ভক্তেরা ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বিপিনবাবু

ধ্যানান্তে শ্রীম ছাদে আসিয়া ভক্তদের কাছে বসিলেন। অমৃতলাল গুপ্ত ও অন্য অনেকে উপস্থিত।

অমৃত—বিপিনবাবুর বাড়ীর ছেলেরা এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে আপনাকে।

শ্রীম—আমাকে সেই সময় ডেকে দিতে হয়। আমিও একেবারে সমাধিস্থ ছিলাম না। সমাধি অবস্থায় লোক বাহ্যশূন্য হয়ে যায়, সমস্ত

ইন্দ্রিয়াদির কাজ বন্ধ হয়ে যায়, মাথায় পাখী বসলেও টের পায় না। তাদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের বাড়ীর সব খবর নিতাম। এমন শক্তি নেই যে নিজে গিয়ে খবর নিয়ে আসব। বিপিনবাবু কত বড় ভক্ত। চল্লিশ বছর ধরে মায়ের সেবা করেছেন। মঠের সাধুরা গেলে কি যত্ন। সাধু ও ভক্তদের নিয়ে বাড়ীতে উৎসব লেগেই রয়েছে। আমি একবার সাধুদের সঙ্গে নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাড়ীর কাছে তাঁর বাড়ী। বাবুরাম মহারাজ আর ইনি খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। একবার মায়ের সঙ্গে জয়রামবাটী যাবার সময় আঁটপুরে থাকা হয়েছিল। সে আজ একচল্লিশ বছরের কথা। সেই সঙ্গে স্বামীজীও ছিলেন। আঁটপুরে স্বামীজীর একটু অসুখের মত হওয়ায় তাঁর আর যাওয়া হল না। আমাদের আঁটপুর থেকে যাবার দুদিন পরেই তিনি মৌনব্রত নিলেন। আমি এখনও সেই চিত্রটি দেখছি—মা গরুর গাড়ী করে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছি।

"আজ আমার কাছে এক প্রতিষ্ঠান থেকে দুজন মেম্বর এসেছিল। ডাক্তারবাবুর শরীর গিয়েছে, তাই তারা তাঁর বই ও ডাক্তারির যন্ত্রপাতিগুলি নেবার জন্য তাঁর বাড়ীর মেয়েদের কাছে গিয়েছিল। তাঁরা বলেছেন, 'মাষ্টার মহাশয় যদি দিতে বলেন তা হলে আমরা আপনাদের আশ্রমে দিতে পারি।'

"কে বাবা তাতে হাত দিতে যায়? আমার ইচ্ছা তাঁর স্ত্রী সেই বইগুলি একটা ভাল কাপড়ে বেঁধে ফুল দিয়ে পূজা করুন। তা হলে তাঁকে (স্বামীকে) মনে পড়বে। এখন ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন, স্বামীকে পূজা করুন। ঠাকুরকে ফুল দেবার সময় এতেও ফুল দেবেন। তাতে তাঁর মঙ্গল হবে। ইনি (ডাক্তারবাবু) অন্য স্বামীর মত ছিলেন না। দিবারাত্র ভগবানকে চিন্তা করতেন। এ রকম স্বামী অনেক তপস্যায়ও লাভ করা যায় না। একবার ডাক্তারি ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাশীতে গিয়ে একটা বাগানে দু তিন মাস পড়ে রইলেন। ঠাকুরের কথা শোনবার জন্য দিনকতক এখানে চিৎপুর থেকে দুবেলা আসতেন। আবার দিনকতক রাত্রে এইখানেই বাস করতে লাগলেন। শোবার কোন বিছানা-পত্র নেই, বেঞ্চিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতেন।

"আমরা বললাম, 'করেন কি! এ রকম করে এখানে থাকলে বাড়ী আগলাবে কে? বাড়ীর মেয়েদের কে দেখবে!' একবার বাড়ীতে শরৎ

মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠের সাধুদের এনে উৎসব করলেন। আবার রাত এগারটার সময় গাড়ীভাড়া করে সব রকম প্রসাদ ভক্তদের খাওয়াবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে কলাপাতা পর্য্যন্ত। ছাদের উপর আপনাদের দিলেন, মনে নেই? আমরা বললাম, এত রাত্রে আনতে হয়? তখন হাতজোড় করে, কত দীন ভাবে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত হয়ে গেছে।' তখন কি আমরা জানি যে এত শীঘ্র চলে যাবেন!

সুরেশ মিত্র

"সুরেশ মিত্রকে ঠাকুর বড ভালবাসতেন। ছুটে ছুটে প্রায় তাঁর বাড়ী যেতেন। একদিন সুরেশবাবু কম্বল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকবার জন্য গিয়েছিলেন। ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললে, 'দেখ, দিনের বেলা যেখানে ইচ্ছা থাক, রাত্রে কোথাও থাকতে পারবে না।' আর, সুরেশবাবু দক্ষিণেশ্বরে থাকতে সাহস করলেন না। তারাই (পরিবার) টেনে নিলে। এঁকে (ডাক্তারবাবুকে) কিন্তু বাড়ীর লোকে টানতে পারলে না।

কলির ব্যবসা

"ঠাকুর একটি গল্প কবতেন। 'একজন লোক কিছু সোনা নিয়ে সেকরার কাছে গেছে, ইচ্ছা যে ও নিয়ে কিছু গহনা-পত্র গড়াবে। সেকরাও ছিল তেমনি সেয়ানা। তার স্ত্রীকে বলে রেখেছে, দেখ, আমি যখন সোনাতে পেতল মেশাব, তুই তখন সেজেগুজে দরজাটা ঝনাৎ করে খুলবি। তখন, খদ্দের তোকে হাঁ করে দেখতে থাকবে, আর আমি সেই ফাঁকে সোনাটা সরিয়ে ফেলব।'

(হাসিতে হাসিতে) "আর একদিন ঠাকুর ভক্তদের বললেন, 'পঞ্চবটীতে একজন যুবতী মেয়ে এসেছে। সাধিকা ও ভক্তিমতী। যাও, যাও তাকে দেখে এস।' অনেকেই তাকে দেখবার জন্য ছুটলেন। তার মধ্যে একজন ছোকরা-ভক্ত ছিল। সে ফিরে আসতে ঠাকুর তাকে বললেন, 'তুই গিয়েছিলি কেন? ওরা ওই ভাবের লোক।' ভক্তটি বললে, 'আপনি যে বললেন, দেখে আসতে।' ঠাকুর বললেন, 'আমি দেখছিলাম—এরা কোন্ থাকের লোক।' কেউ কেউ ঠাকুর বললেও যায় নি। যারা গিয়েছিল তাদের একজনকে পরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন দেখলে? সে বললে,

'ঠাকুরের চেয়েও বড়।' আমি ভাবলাম গোল্লায় গেছে রে। সামনে ভগবান, দেখতে চায় না, বলে, ওঁর চাইতেও বড়।"

॥ ৬২ ॥

১৩ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল প্রায় সাতটা। শ্রীম চারতলার ছাদে ছাতি মাথায় দিয়া বেড়াইতেছেন। কাছে জনৈক ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া বলিলেন।

জীবন্মুক্ত

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাম সাম্যে স্থিতং মনঃ
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ ব্রহ্মণিতে স্থিতাঃ [গীতা—৫।১৯

যাঁদের মন ব্রহ্মে লীন হয়েছে শরীর থাকলেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। তাঁরা এই শরীরে থেকেই সংসার জয় করেছেন। সংসার তাঁদের আর কিছু করতে পারে না। ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ এই সব দ্বন্দ্ব থেকে তাঁরা মুক্ত নির্লিপ্ত। সব সমান দেখেন। কিন্তু গৌতম বলেছেন, ব্যবহারিক রাজ্যে সকলকে এক করলে চলবে না। দুষ্ট লোকদের জব্দ করতে বলেছেন তা না হলে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটবে।

অবতারকে দর্শন না করলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোঝা যায় না। তাঁরা জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে দিয়ে যান, কি রকম অধিকারী কোন জায়গায় কিরকম আচরণ করবে। তাঁরা যা আচরণ করে দেখিয়ে দিয়ে যান সেইগুলিই শাস্ত্র। আরসীতে ছায়ার মত তাঁরা লোকের ভিতরটা দেখতে পান। দেখুন না অর্জ্জুন কিছুতেই যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ছাড়লেন না, বললেন—"তুমি মুখে বললে কি হবে যে তোমার যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম তোমার প্রকৃতিতে গজ গজ করছে। মহাভারতে আছে—তাঁরা যখন বনে বিচরণ করতেন, ভিক্ষান্নই যখন তাদের সম্বল, সেই সময়ও তাঁরা বনে শিকার করতেন। মৃগ, পশু মেরে নিয়ে আসতেন। কেন এ সব করতেন? যদি তাদের রাজ্য পাবার আশা যুদ্ধ বিগ্রহ করবার ইচ্ছা মোটেই না থাকত, তা হলে তাঁরা নির্জ্জন প্রান্তর, বন,

উপবন এসব জায়গা পেয়েও একাগ্রমনে ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন না কেন?

দার্জ্জিলিঙে

আবার বলছেন, "এই ত অরণ্য। গাছপালা থাকলেই হল। এখানেও সারি সারি ফুলের গাছ আছে।

ব্রহ্মচারী—এই ছাদটি হিমালয়ের মত। উপরে অনন্ত আকাশ, এখানে বসলে শহরের অন্য কিছু জিনিষ দেখা যায় না।

শ্রীম—একবার দার্জ্জিলিঙ গিয়েছিলাম। সেখানে হিমালয় দর্শন করে আপনা আপনি চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে। সকল বস্তুতেই আনন্দ পরিপূর্ণ রয়েছে। তাঁর (ব্রহ্মের) আনন্দের কণা পেয়ে সকলে বেঁচে রয়েছে—জীবজন্তু গাছপালা পর্য্যন্ত। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যমি ভুতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। [বৃহদারণ্যক—৪।৩।৩২

এই সময় চারু মহারাজ আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। অনেকে উপস্থিত।

ব্রহ্মচারীদের বেড়া দিয়ে রাখতে হয়

শ্রীম—আসুন, আসুন, এইখানে বসুন। ছাদের বারান্দায় বসা হইল। যারা নুতন ব্রহ্মচারী, যারা ভগবানকে পাওয়ার জন্য আসে তাদের অতি সাবধানে মঠে কাঁচের আলমারীতে জিনিষ রাখার মত রাখা উচিত। (পনের বছর রেখে সাধুসেবা, গুরুসেবা, পূজা, ধ্যান, জপ, এই সব শিখিয়ে অন্যখানে পাঠালে তবে ত তাঁরা ভালভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারবে। সত্যনিষ্ঠা, বিষয়ে অনাশক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, গুরুভক্তি—এইগুলি যদি অন্তরে দৃঢ় না হয় তবে তাঁকে লাভ করবে কি করে?) চারা গাছকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। গাছের গুঁড়ি মোটা হলে আর বেড়া দরকার করে না। তখন সেই গুঁড়িতে ছাগল গরু বেঁধে রাখা যায়। আবার বলে, 'যতটুকু জানি ততটুকু লোককে বলব' যেমন ডাক্তারী না শিখে যদি রোগীকে ঔষধ দেয় তা হলে রোগীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। "জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া। শুধু ভাবে দর্শন নয় যে বলবে আমার দর্শন হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, 'আমার সঙ্গে কথা কয়'। দর্শন হয়েছে কিনা তার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আলাপ।

নবদ্বীপে গিয়ে দেখুন এক একজনের ভাব আর ধরে না, দুজনে চেপে রাখতে পারে না, কিন্তু তার পরদিন দেখবেন, কাগজ, তমসুক, পুঁথিপাথী বগলে করে মকদ্দমা করতে ছুটল। কেউ কেউ আবার মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তীর্থে যায়। কেন, তাদের দেখবার কি আর কেউ নেই? মেয়েদে সঙ্গে বেশী থাকতে নেই। ওরা সাধারণতঃ "আমার ছেলের অসুখ", "ভাল চাকরি নেই টাকা নেই" এই সব কামনা নিয়ে সাধুর কাছে আসে।

সকলেই মহামায়ার বশ

সকলেই মহামায়ার ফাঁদে পড়ে। রাজা প্রজা সাধু পর্য্যন্ত। সম্রাট আলেকজাণ্ডার যাঁর নামে সকল রাজরাজড়া ভয় পেত, দিন কতক দেশ জয় করলেন, শেষকালে পারস্যে মদ ও স্ত্রীলোকের বশীভূত হয়ে তাইতে প্রাণ হারালেন। নেপোলিয়নও সেই রকম। তাঁর নামে সমস্ত ইউরোপ কাঁপত। এদিকে যুদ্ধ হচ্ছে। কত সব সেনাপতি পরিদর্শক ইত্যাদি চারিদিকে রেখে দিয়েছেন। আবার তিনি নিজেও সব তদারক করতেন, একদিন তিনি একজনকে বললেন "আমি যে কাল রাত্রে তোমায় অমুক শিবিরে দেখলাম", সে বললে, আমিও কাল একজনকে দেখলাম, বেঁটে পানা, তাঁর তাঁবুতে স্ত্রীলোক ঢুকল। তখন নেপোলিয়ন হাসতে হাসতে ও শিশ দিতে দিতে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর নামে পৃথিবী কাঁপে। এমনও দেখেছি, কেউ পনের বছর, কেউ কুড়ি বছর ধরে গেরুয়া পরে রয়েছে। তারপর আবার গেরুয়া ছেড়ে বিবাহ করলে, সংসারী হল! কামিনী কাঞ্চনের সংস্রবে থাকলেই ভিতরে আসক্তি রয়ে যায়। মহামায়া সংসারে টেনে নেন। তাই ঠাকুরের মহামন্ত্র ছিল "কামিনী কাঞ্চনই মায়া, মা তাতে যেন মুগ্ধ না হই।" তাঁর এক একটি বাক্য মহামন্ত্র। তাঁর কথা যাবার নয়। "Heaven and earth shall pass away but my word shall never pass away."

লোকশিক্ষার পূর্ব্বে কঠোর তপস্যা

ব্রঃ ধী—আমি বিদ্যাপীঠে থাকি, ভাবছি ছেড়ে দেব।

শ্রীম—গুরু যা বলেন তাই করতে হবে।

ব্রঃ ধী—গুরু বলেছেন, সেখানে ছোট ছোট ছেলেরা থাকে। তাদের নারায়ণ বোধে সেবা করবে, আমরা সব সময় সেই আদর্শ রক্ষা করতে

পারি নে।

শ্রীম—তোমার দোষ কি। তুমি কি কর্ম্মে যথার্থ অধিকারী হয়েছ? আলমোরা বা বেলুড় মঠের মত স্থানে পনের বছর তপস্যা করতে হয়। তার পর কেউ কর্ম্মের যথার্থ অধিকারী হতে পারে।

জপ

ঠাকুর একজনকে বললেন, "বৈধী ভক্তি উত্তম ভক্তি নয়।" একজন ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে কিছু ছোলা নিয়ে গেছে। সেখানে বসে জপ করবে এবং ছোলাতে জপের সংখ্যা রাখবে। ঠাকুর দেখে বললেন, "নাম জপ করবি ত গোনা আবার কেন? মনে হবে আমি এতো জপ করেছি দে ছোলাগুলি আমাকে আমি সব খাব।" ঠাকুর জপেতে সংখ্যা রাখার উপর জোর দিতেন না। একজনকে বললেন, 'একবার তাঁর নাম করলে মানুষ শুদ্ধ হয়ে যায়, রোজ আবার জপ কি? এত তাঁর নামে বিশ্বাস ছিল। প্রেমভক্তি যাতে আসে তার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁতে ভালবাসা হলে অন্তরের যা কিছু মলিনতা সব নষ্ট হয়ে যায়।' বেলা প্রায় নয়টা, সাধুরা জলযোগ করিয়া বিদায় লইলেন।

বৈকাল প্রায় ছয়টা শ্রীম স্কুলবাড়ীর ছাদে চেয়ারে বসিয়া আছেন. আরও অনেকে তথায় আছেন। কামারপুকুরে ৺রঘুবীরের সেবার জন্য শ্রীম টাকা পাঠাইয়াছিলেন তাহার রসিদ আসিয়াছে। সেই রসিদ নিজের মাথায় ঠেকাইলেন। সকল ভক্তগণকেও সেইরূপ করিতে বলিলেন।

মৃত্যুর পর

শ্রীম—তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হয়ে বলে গেছেন, মৃত্যুর পর সকল ভক্তই আমার কাছে যাবে। তবে যাদের ভগবান দর্শন হয় নি তারা আবার ফিরে আসবে। ভগবান আবার তাদের কিছু কর্ম্ম করিয়ে শুদ্ধ করে নেবেন।

নন্দনবাগানে ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়।' তিনি কুমোরের কাঁচা হাড়ি ও পাকা হাড়ির দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমি এইরকম শুনেছি।' আরও বললেন 'আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। অন্য সব খবরে কাজ কি?' এই সব বিষয়ে জোর দিতেন না।

ঠাকুরের একখানি ছবি

আকাশে উত্তর পশ্চিম কোণে কালো মেঘ উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়া শ্রীম'র ঠাকুরকে মনে পড়িয়াছে। তাই বলিতেছেন—

"আমার মনে পড়ছে, একদিন ঠাকুর ঝাউতলা থেকে আসছেন। সেই সময় আকাশে কালো মেঘ করে রয়েছে, গঙ্গার উত্তর পশ্চিম দিকে। ঝাউতলা থেকে ঠাকুর দক্ষিণ মুখ করে চলে আসছেন। এখনও ভক্তদের হৃদয়ে ছবিটি গাঁথা রয়েছে।"

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম তুলসীগাছের নিকট বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ধ্যানান্তে পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

দেবাসুর ও ঋষিদের লক্ষ্য

শ্রীম—দেবাসুর যুদ্ধ করে ভোগের জন্য। সমুদ্রমন্থনের পর অমৃতের কলসী নিয়ে টানাটানি। তার মানে শরীরটা কিসে অমর হয় সেই দিকে নজর। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ। তারা তপস্যা করে ভোগ বজায় রাখবার জন্য, ঋষিরা কিন্তু অন্য থাকের লোক। তাঁরা পৃথিবীর কোন ভোগ চান না। বনে গিয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন। তাদের এক কথা—

'তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেব নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়' (শ্বেতাশ্বক ৩।৮) তাঁকে জানলে তবে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

জগৎপালন কর্ম্মফলানুযায়ী

ঈশ্বর ত্যাগী, ভোগী, এবং হিংস্র জন্তুও করেছেন, বাঘকে নখ ও দাঁত দিয়ে আলাদা থাকবার জায়গা করে দিয়েছেন। যদি বল বাঘে মানুষ খায় কেন? মানুষ তাদের থেকে সাবধান হবে বলে। বিচার করে দেখ তিনি যেকালে সব করেছেন তখন তাদের আর দেখবেন না?

এদিকে ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য বলির দ্বারে দ্বারী হলেন। কালকেতু খুব মায়ের ভক্ত। মায়ের প্রসাদে ধন পেলে। তাতে রাজ্য স্থাপন করলে। শেষে কলিঙ্গ রাজার কর না দেওয়ায় তার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। কালকেতু সেই যুদ্ধে হেরে গেলে কলিঙ্গরাজ তার বুকে পাথর চাপা দিয়ে বন্দী করে রাখলে। মা ভক্তের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখে তার কাছে এলেন এবং বললেন, "বাবা,

তুমি অনেক পশুবধ করেছিলে। তাই তোমার এই কর্ম্মফল ভোগ করতে হচ্ছে।" তার পর রাজাকে স্বপ্ন দিতেই সে কালকেতুকে মুক্তি দেয়।

নবঋষি মণ্ডল

ঠাকুর ঋষিদের মত সর্ব্বত্যাগী একদল লোক তৈরী করেছিলেন। যাতে কামিনী-কাঞ্চনের আঁচ তাদের গায়ে না লাগে, তিনি মেয়েদের কথা ছোকরাদের কাছে বলতেন না। পুরুষদের কথাও মেয়েদের কাছে বলতেন না। একবার এক ধর্ম্মসভায় মেয়েরা রয়েছে দেখে ঐ সম্বন্ধে বলেছিলেন। এইবার বুঝি এরা নাচবে। (সকলের হাস্য)। তা দেখলাম পুরুষদের সঙ্গে উপাসনা করতে লাগল। কাছে মেয়েমানুষ থাকলে কি ধ্যান হয়? বারো আনা মন টেনে বেখে দেয়।' বাবুরা কেউ কেউ বলেন, 'আমি বাড়ীর উপরতলায় বসে ধ্যান চিন্তা করি।' প্রথমে নির্জ্জনে যেতে হয়। তা না হলে আসক্তি যায় না। বাড়ীর উপব তলায় বসে আর গঙ্গার ধারে বসে দেখ কত তফাৎ।

যাঁরা সিদ্ধপুরুষ তাঁরা পারেন। কামিনী-কাঞ্চন তাঁদের কিছু করতে পারে না। নির্ম্মানমোহা জিত সঙ্গ দোষাঃ। (গীতা—১৫।৫)

শ্রীকৃষ্ণ এত কাজের মধ্যে থেকেও প্রেমে পরিপূর্ণ—সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। 'ন মাং কর্ম্মানি লিম্পন্তি।' (গীতা—১৩।৪)

অবতারেরা ঋষিদের নাম করেছেন। ঋষিভির্বহুধাগীতম্। (গীতা—১০।৪)

রাত্রি প্রায় নয়টা হইয়াছে ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৬৩ ॥

১৪ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল প্রায় নয়টা। শ্রীম ছাদের বারান্দায় বসিয়া আছেন, কাছে জনৈক ভক্ত ও গদাধর।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্

ভক্ত—আপনি বলেছিলেন সকালে খেতে। তাই খাচ্ছি।

শ্রীম—হ্যাঁ, শরীর আগে। তা না হলে একটা ফল খেয়ে থাকলেই হত। শরীরে এতগুলি যন্ত্র দিবার কি প্রয়োজন ছিল? শরীরের যে যত্ন নেবে না তাকে কর্ম্মফল ভুগতে হবে। সকাল সকাল খাবে।

আবার বলিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্য অতি দুরূহ, 'মনে কর সেদিন বড় ভয়ঙ্কর' অতি সন্তর্পণে থাকতে হয়। গায়ে যাতে কামিনী-কাঞ্চনের আঁচ না লাগে।

গুরুই সচ্চিদানন্দ

যাই মন খারাপ হবে, গুরুর কাছে গিয়ে বলবে। "তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" (গীতা—৪।৩৪)। গুরুর কাছে বলবার আমাদের অধিকার আছে। গুরু হয়ে বসেছেন কেন? শিষ্যদের জন্য ভাবুন। যাই দীক্ষা হয়ে গেল অমনি গুরুকে সচ্চিদানন্দ ভাবতে হয়। তখন মনে করলে চলবে না ওর গুরু ভাল; তাঁকে গুরু করলে হত। গুরু করণের আগে সে সব ভাবতে হয়। অনেক দেখে শুনে গুরু করা উচিত।

ভক্ত—ঈশ্বরের নাম করে তাঁর উপর শিষ্যের ভার দিলেই তিনিই দেখবেন।

শ্রীম—না, ঈশ্বরের আদেশ পাওয়া চাই। ও ত সকলেই কচ্ছে। আর ঐরকম সকলে বলে থাকে। ভাল ভাল সাধু তাঁর আদেশ না পেয়ে মন্ত্র দিচ্ছেন, এ সব ভাববে কেন? তাঁর আদেশ পেয়ে তবে দিচ্ছেন, এই রকম ভাববে। অনাথ আশ্রম থেকে একজন এসেছিল। সে বললে, "মাঝে মাঝে আমার অশান্তি হয়।"

আশ্রমের কাজ শেষে নির্জ্জনে ঈশ্বরের চিন্তা

"আমি বললাম আশ্রমের মধ্যে ক বিঘে জমি"? সে বললে "ন বিঘে"। বললাম, 'এত জায়গার মধ্যে একটা নির্জ্জন স্থান দেখে গাছতলায় বসবে। আশ্রমের কাজকর্ম্ম সেরে যাই সময় পাবে, সেই গাছতলায় গিয়ে বসবে। কটা ছেলে পড়াবার জন্যই কি সংসার ত্যাগ করে এসেছ? অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে থাকতে থাকতে মনে করছ যেন তুমিও ওদেরই একজন। মনে করবে "আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ঈশ্বরের ছেলে। ছেলে যেমন বাপের সম্পত্তি পায়, যুবরাজ যেমন রাজার রাজ্য পায়, তেমনি আমিও পাব।" ঠাকুর বাঘের গল্প বলতেন, 'মেষপালের সঙ্গে বাচ্চা লালিত পালিত হওয়ার দরুণ মনে করত সেও মেষ। তা নয়, বাঘের বাচ্চা।'

(ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া) আর তুমি অমন জায়গায় থাক। সেখানে গাছ পাহাড় মাঠ কত নির্জ্জন স্থান রয়েছে। যাই কাজ শেষ হয়ে যাবে, অমনি সে সব জায়গায় চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করবে। তা নয় নাক ডেকে ঘুমুতে লাগলাম। লজ্জা করে না। আশ্রমের যদি কিছু কাজ থাকে বন্ধুকে বলে যাবে একটু দেখতে। 'সা চাতুবী চাতুবী' এত কর্মের মধ্যে থেকে সকলকে শান্ত কবে যে ভগবানেব চিন্তা করতে পারে সে ধন্য।

গুরুভক্তি ও উপমন্যু

গুরুভক্তি খুব দবকাব। গুরুভক্তি থেকেই সব হয়। মহাভারতে আছে উপমন্যুব কথা। উপমন্যু গুরুগৃহে বাস কবতেন। গুরুব আদেশে গোচাবণ কবতেন। গরুগুলিকে চরিয়ে এনে সন্ধ্যাবেলা গুরুব কাছে হাত জোড কবে থাকতেন। একদিন গুরু জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তোমাকে এত মোটা সোটা দেখছি, কি খাও?' উপমন্যু বললে, 'ভিক্ষা কবে খাই।' শুনে গুরু বললেন, 'সে কি, ভিক্ষা কবে আগে গুরুকে দিতে হয়।' 'যে আজ্ঞা' বলে সেইদিন থেকে যা কিছু ভিক্ষা কবে পেতেন সব গুরুব কাছে এনে দিতে লাগলেন। আবাব একদিন ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তোমাকে এখনও স্থূলকায় দেখছি, তুমি কি খাও?' উপমন্যু বললে, 'প্রভু আমি গরুর দুধ খেয়ে থাকি।' ঋষি বললেন, 'তা কি কবতে আছে? দুধ দেবতাকে দিতে হয়, বাকী বাছুরেব জন্য বাখতে হয়'। 'যে আজ্ঞা' বলে সেই দিন হতে তিনি আব দুধ খেতেন না। আবাব কয়েকদিন পরে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'উপমন্যু, ভিক্ষা কবে খাও না, দুধও খাও না, তবু তোমায় এত মোটা দেখছি কেন? এখন কি খেয়ে থাক?' উপমন্যু বললে, 'প্রভু মায়েব দুধ খাবার সময় বাছুবেব মুখে যে দুধেব ফেনা লেগে থাকে তাই খেয়ে থাকি।' তখন গুরু বললেন, 'ও বকম কবতে নেই, ওতে বাছুবের কষ্ট হয়। ওবা আনন্দ কবতে কবতে মায়েব দুধ খায়, তাইতে তাদের মুখ থেকে ফেনা বেবোয়। পবে সেগুলো ওরা চেটে চেটে খায়। বাকী যেটুকু মাটিতে পড়ে কীটপতঙ্গ তা খেয়ে বাঁচে।' 'যে আজ্ঞা' বলে, উপমন্যু সেই দিন থেকে তাও ছেডে দিলেন। শবীব ধারণ কববার যতগুলি উপায় সব বন্ধ হয়ে গেল। তখন অন্য কিছু খেতে না পেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আকন্দপাতার রস খেয়ে ফেললেন। সে সময় হঠাৎ আঠা লেগে তাঁর চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। পরে রাস্তা না বুঝতে পেরে তিনি এক

পাতকুয়াতে পড়ে গেলেন।

এদিকে ফেরবার সময় বয়ে যাওয়াতে গুরু চিন্তিত হলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে 'উপমন্যু' বলে ডাকতে ডাকতে চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন। কারণ গুরুর সব মনটা তাঁর ওপর পড়ে রয়েছে—শিষ্য আজ্ঞানুবর্ত্তী কিনা! তার ভার যে তিনি নিয়েছেন। যারা গুরুর কথা মেনে চলে তাদের ভার গুরুকে নিতে হয়। শুধু দেখেন একা কি করে। তিনি কি আর জানেন না যে ভিক্ষার অভাবে শিষ্যের কষ্ট হচ্ছে। উপমন্যুকে খুঁজতে খুঁজতে গুরু শেষে এক পাতকুয়ো থেকে শব্দ শুনতে পেলেন 'প্রভু, আমি এইখানে পড়ে গেছি।' তখন গুরু কাঁদতে লাগলেন এবং ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনায় উপমন্যুর চোখ ভাল হয়ে গেল, তবু তাই নয় গুরুর কৃপায় তাঁর জ্ঞানচক্ষুও খুলে গেল।

বেলা প্রায় দশটা, ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকাল প্রায় ছয়টা। শ্রীম স্কুলবাড়ীর ছাদে বসিয়াছেন। কাছে অনেকে উপস্থিত আছেন। তন্মধ্যে ষ্টুডেণ্টস্ হোম হইতে আগত দুইজন বিদ্যার্থীও আছেন। আজ মহরম। শ্রীম ছাদ হইতে তাজিয়া দেখিতেছেন। শত শত মুসলমান, 'হোসেন হোসেন' করিতে করিতে রাস্তায় যাইতেছে।

মহম্মদের প্রেম

শ্রীম—আমি যাই এই লোকদের দেখি অমনি আরবের চিত্রটি সামনে দিয়ে চলে যায়। সেই সময়েও ঐ রকম লোক। মহম্মদের প্রতি মদিনাবাসীদের কি ভালবাসা। (ছাত্র দুজনের প্রতি) তোমরা মহম্মদের জীবনী পড়নি ?

ছাত্র—বাঙলায় পড়েছি।

শ্রীম—আরব মরুভূমি থেকে লোকদের চৈতন্য হয়েছে। তারা সেখানে ভগবানকে দর্শন করেছে। মদিনায় যখন মস্‌জিদ তৈরী হল তখন ভক্তদের নিয়ে মহম্মদ নমাজ পড়তে যেতেন। তিনি দিনে পাঁচবার করে নমাজের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে ঈশ্বরকে সদাসর্ব্বদা মানুষের স্মরণ থাকে। শেষ অবস্থায় মহম্মদ দুইদিন নমাজ পড়তে পারেন নি। তাইতে ভক্তেরা তাঁর কোন অসুখ হয়েছে মনে করে কেঁদেছিলেন। এত চেঁচিয়ে কেঁদেছিলেন যে সেই আওয়াজ মহম্মদ শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। লাঠিতে ভর

দিয়ে ভক্তদের কাছে এলেন। তাঁকে দেখে ভক্তেরা শান্ত হল। তার দু-চার দিন পরেই তাঁর শরীর গেল।

অবতার হয়ে অসংখ্য জগতের খবর নিচ্ছেন

"ঈশ্বর কি এইটুকু। পৃথিবী একটা মাটির ঢেলা। এই পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে। এই রকম কত সৌরজগৎ রয়েছে। তাতে কত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতির মত গ্রহাদি রয়েছে। আবার কতক দেখা যায় না। তিনি অবতার হয়ে এই অনন্ত জগতের খবর নিচ্ছেন। আবার এই পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির খবর নিচ্ছেন।"

এই সময় জিতেন মহারাজ প্রমুখ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মঠের অনেক সাধু আসিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে বলিতেছেন। "বসুন, বসুন।" ছাদে টবে সারি সারি গাছ দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই দেখুন অরণ্য।" বাহিরে তাজিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই দেখুন মহরম।"

জনৈক ভক্ত—কিছু গোলমাল না হলেই ভাল।

অবতারের পথ সরল পথ

শ্রীম—না আজকের দিনে হবে না। অবতার যখন আসেন, সোজা পথ দেখিয়ে দেন। তখন বাঁকা পথ দিয়ে যেতে হয় না। কর্ম্ম কমিয়ে দেন। "শব্দজালং মহারণ্যম" (বিবেক চূড়ামণি) শব্দজাল থেকে রক্ষা করেন। শাস্ত্রের মানেগুলি সরলভাষায় বুঝিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবার পূর্ব্বে বেদের অর্থ নানাভাবে বিকৃত হয়েছিল। তিনি এসে বুঝিয়ে দিলেন ; তবে ত ঠিক ঠিক বোঝা গেল। সোজা রাস্তা পেলে কি লোকে ঘুরে যায়? আমি গদাধর আশ্রমে ছ'মাস ছিলাম। আশ্রমের কিছু দূরে এক পার্ক ছিল। সেখানে প্রথম প্রথম ঘুররাস্তা দিয়ে যেতাম। একদিন সোজা রাস্তা পেয়ে গেলাম। সেইদিন থেকে সেই রাস্তা ধরে যেতে আরম্ভ করলাম। গন্তব্য স্থানে পৌঁছান নিয়ে কথা। আর একদিন ঠাকুরকে বলেছিলাম যে অবতার গরুর বাঁটের কাছে মুখ লাগিয়ে দেন।

শরদিন্দু মহারাজ শ্রীমকে গান শুনাইবেন। তাই নীচে মাদুর পাতা হইল। সকলে তাহাতে বসিলেন। শরদিন্দু মহারাজ হারমোনিয়ম লইয়া সুর আলাপ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, "বোধ হয় ইমন কল্যাণ।" এইবার গান হইতেছে—

(১)—"এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা, পরাণ পুতলী গো।" ইত্যাদি

(২)—"তুমি কাঙ্গাল বেশে এসেছ হরি কাঙ্গালে করুণা করিতে
প্রেম বিতরিতে মরুসম চিতে পতিত জনে তারিতে হে।" ইত্যাদি

(৩)—"বঙ্গহৃদয় গোমুখী হইতে করুণা গঙ্গা বহিয়া যায়,
এস ছুটে এস কে আছ মানব, শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়।
ব্যর্থ বাসনা অনল দহন সহিলে কত না জনম মরণ,
আলেয়ার সাথে ছুটিতে ছুটিতে শ্রমজ সলিল সিক্তকায়।" ইত্যাদি

(৪)"—আছে কার মা এমন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি যেমন,
তুমি সঙ্গে থাক দিবানিশি চোখের আড় কর না কখন।" ইত্যাদি

অতুলনীয় প্রেম, পরনিন্দা, অসহিষ্ণুতা

গান শেষ হইলে শ্রীম বলিতেছেন, "এই গানটি একবার মুখে বলুন।"

শ্রীম—তিনি যেমন আমাদের ভালবাসেন। আমরা তাঁকে তেমন ভালবাসি না। কাপ্তেন ঠাকুরকে দেখিয়ে বলতেন, কাছে মাণিক রয়েছে, চিনতে পারলেন না। বাঙ্গালীরা বোকা।

কানাই মঃ—কথামৃতে কাপ্তেনের স্ত্রীর কথা আছে। সব টাকাকড়ি তাঁর হাতে থাকত।

শ্রীম (হাসতে হাসতে)—হ্যাঁ, ঠাকুর বলেছিলেন গাড়ীভাড়ার জন্য বলতে লাগল "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া"। ঠাকুর কাপ্তেন, প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে এবং কেশব সেনের গুণ-দোষের কথা বলেছেন। যেমন মা-বাপ ছেলেদের গুণ-দোষ নিয়ে বলে থাকে, সেইরকম তিনি আনন্দ করতে করতে আমাদের কাছে গল্প করে ছিলেন। কাপ্তেনের দোষের উল্লেখ করে তারপর আবার তাঁর গুণের কথা বলতে লাগলেন—পাছে ভক্তেরা কাপ্তেনের উপর কটাক্ষ করে। কেউ কারু নামে নিন্দা করলে ঠাকুর শুনতে পারতেন না। অপরের নিন্দা তাঁর কাছে আমরা কখনো শুনিনি। একদিন গোপালের মা বলে-ছিলেন, 'ভক্তদের জন্য বলরামবাবুর যে বন্দোবস্ত আছে তা ততটা ভাল নয়।' ঠাকুর বললেন—'তোমার একটি রসগোল্লা নয় ত যে বলবে গোপাল খাও, তার কত জায়গায় সেবা রয়েছে, সেই সব তাকে দেখতে হয়। মাসে কেবল তিনশ টাকা মাসোহারা পায়। তাইতে সংসার ও ভক্তদের সেবা

করে। কেবল আমাকে দেখবার জন্য কলকাতায় থাকে, কোঠারে যায় না।' রামবাবু একদিন ঠাকুরকে বললেন, 'কেশব সেন বেশ বাগিয়ে নিলে। রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে' ইত্যাদি। ঠাকুর নিন্দা করলেন না, বললেন, 'যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকে তার ভার তিনি নেন।'

কানাই মঃ—'ঘরের ভিতর চোরকুঠরী ভোর হলে সে লুকাবে রে,' এর মানে কি?

শ্রীম—আমিও এর মানে ভাল বুঝতে পারিনে। বোধ হয়—চোর আছে, সাবধান হও। 'ভোর হলে' মানে শরীর গেলে watch and pray (সাবধানে থেকে উপাসনা করা)।

মায়ার পারের খবর তর্কাতীত

জনৈক ভক্ত—রামপ্রসাদের গানে অনেক ভুল আছে।

শ্রীম—হ্যাঁ, আজকালকার বাবুরা হাতে ছড়ি মুখে সিগারেট ধরিয়ে এই রকম বলে বটে। যেটা real (সত্য) তাকে বলে unreal (অসত্য)। মায়ার definition (সংজ্ঞা) হচ্ছে—তার জন্য ভালকে মন্দ এবং সত্যকে অসত্য বলে বোধ হয়। ওদিককার খবর কি পাবার জো আছে? তাদের (পাশ্চাত্যদের) মধ্যে একজন বলেছেন, 'দার্শনিকরা ওদিককার খবর পায় না। কেবল phenomenal sideএর (ত্রিগুণের দিকের) খবর দিতে পারে। বাক্যই যে শুধু তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, তা নয়, মনও পারে না। 'যতো বাচোঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিরীয়—২।৪)। যোগীরা সমাধিস্থ হয়ে একটু একটু সেপারের খবর জানতে পারেন। ঠাকুর বলতেন, শরীর একটি, জগৎ একটি, এর পারে তিনি। "সর্ব্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।" Intellect (বুদ্ধি) দিয়ে জানবার জো আছে? হরি মহারাজকে ঠাকুর বললেন, 'শুধু বিচারে কি তাঁকে পাওয়া যায়? লাঠি মেরে কি মনকে উঠতে পারা যায়? তাঁর কাছে প্রার্থনা কর তাঁর কৃপায় তাকে বুঝা যায়।'

বিচার ও হরিমহারাজ

কানাই মঃ—হরি মহারাজ প্রায়ই এই কথা বলতেন। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানকে থ্যাক্ থু করতেন।

শ্রীম—না বিচারকে ঐরূপ করতেম। ব্রহ্মজ্ঞান কি বস্তু তিনিই বুঝে ছিলেন। বলতেন 'জড় সমাধিতে শরীর ত্যাগ হতে পারে। মা ভক্তদের

জন্য একটু নীচের ধাপে মন রেখেছেন। মা যদি অবস্থা বদলে দেন তাহলে কাউকে ভাল লাগবে না। তখন ভক্তি ভক্ত নিয়ে এত মেলামেশা হবে না।

ঠাকুর যখন অধর সেনের শরীর যাবার খবর পেলেন, তখন আমি সেই ঘরে! কিছুক্ষণ পরে তাঁর সমাধি হয়ে গেল। সমাধির পর কেঁদে কেঁদে মাকে বলতে লাগলেন, 'মা তুই ত বললি ভক্তিভক্ত নিয়ে থাকা তাই আমার এত দুঃখ।' ছাতি বোঁজান দেখলেই ঠাকুরের মন গুটিয়ে গিয়ে সমাধি হত। তুমি ত তাঁর (হরি মহারাজের) সঙ্গে অনেক দিন ছিলে।

কানাই মঃ—কাশীতে যখন তিনি ছিলেন তখন এক একবার মিশতাম। হরিদ্বারে তিনি যখন ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেই সময় আপনিও ছিলেন। আপনার হাতে কি এক বেদনা হল।

শ্রীম—হ্যাঁ হরিমহারাজ আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। আমি বৃন্দাবন থেকে এসে ছ'মাস কি তারও বেশী ছিলাম। গঙ্গার উপর একটি বাড়ীতে থাকতাম।

কানাই মঃ—বৃন্দাবনে যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীতে এখনও অনেকে গিয়ে বসে। বলেন এ বাড়ীতে মাষ্টার মশায় ছিলেন।

শ্রীম—আহা, আহা, এখনও সেই বাড়ী আছে?

কানাই মঃ—আমি দেখে এসেছিলাম, এখন আছে কিনা জানি না।

শ্রীম (শরদিন্দু মহারাজের প্রতি)—আপনার কি মিষ্টি গলা, কি মধুর গান। আপনার গান শুনে বেশ আনন্দ হল।

এইবার সাধুদের জলযোগ করাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—আপনারা এইখানে বসে খান, আমরা দর্শন করি। বলরামবাবুর বাড়ীতে ঠাকুর নরেন্দ্রকে হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা গান গা না।' এখনও দেখছি সেই হাসি মুখ। যেন কাল সেই ঘটনা হয়েছে এইরকম মনে হচ্ছে। (শরদিন্দু মহারাজের প্রতি) আপনি চন্দ্রবাবার বৃন্দাবনে যাবার সঙ্গী ছিলেন? আপনি যেখানে যাবেন সেই-খানেই আনন্দ। আপনি গান জানেন কি না।

শরদিন্দু মঃ—হ্যাঁ আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। টাঙ্গা করে বংশীবট, গোবিন্দজি, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি দেখানো হয়েছিল।

শ্রীম—চন্দ্রবাবার খুব মনে বল। কারো কারো শরীরই মনকে চালায়। আবার কারো কারো মন শরীরকে চালায়। বীর পুরুষ। মনে অযুত হস্তীর বল থাকলে ঐরকম খোঁড়া পা নিয়ে ভ্রমণ করতে পারে।

॥ ৬৪ ॥

১৫ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম স্কুলবাড়ীর ছাদে বসিয়া আছেন।

তীর্থমাহাত্ম্য

শ্রীম (বৈরাগ্যানন্দকে দেখাইয়া)—ইনি টাটকা কেদার বদরিনারায়ণ দর্শন করে এসেছেন। First (উত্তম) হল প্রত্যক্ষ, Second (মধ্যম) হল যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার কাছ থেকে শ্রবণ, Third (অধম) হচ্ছে শাস্ত্র পড়ে জানা। ওঁর মুখ থেকে তীর্থের কাহিনী শুনলে আমাদের মধ্যম ফললাভ হবে। কেদারে কত রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলেন?

সন্ন্যাসী—রাত্রিতে থাকি নি। যেতে দেরী হওয়ায় দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাত্রিতে কালিকমলী বাবার মঠে ছিলাম। তার পরদিন সকালে দর্শন করতে যাই।

শ্রীম—সেখানে কি কি গান গেয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী—"তা থেইয়া তা থেইয়া নাচে ভোলা" ইত্যাদি।

"ডমরু হব হব বাজে বাজে" ইত্যাদি।

শ্রীম—আর বদরীতে?

সন্ন্যাসী—"দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছে আলো করে"—আমার ঐ গানটা খুব ভাল লাগে।

শ্রীম—ঠাকুর এসব কথা শুনলে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ছবিতে দ্বারকা দেখে ঠাকুরের সমাধি হত। নিজের ঘর লক্ষ্য করে বলতেন "এইতো অযোধ্যা, যেখানে রাম সেখানেই অযোধ্যা"। ঠাকুরের হৃদয়ে রাম থাকেন কিনা। আধ্যাত্ম রামায়ণে আছে যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই নররূপ ধারণ করে এসেছেন। কেবল বাইরে দেখতে মানুষ। আমি হৃষীকেশ থেকে বদ্রিনারায়ণের পথে অনেকদূর গিয়ে কেদারনাথ ও বদ্রিনারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে এলাম। আমার কেদার বদ্রি এই পর্য্যন্ত। কেউ তীর্থ করে এলে ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস্ করতেন, "কেমন উদ্দীপন হয়েছিল? তাঁকে মনে পড়েছিল?" এই সব। অন্য লোকে রাস্তায় খাবার সুবিধা

হয়েছিল কিনা? কেমন শহর?—এই সব জিজ্ঞাসা করে।

এই সময় একজন কাব্যতীর্থ খানিক বসিয়াই চলিয়া গেলেন।

শ্রীম—দেখলে বসতে পারলে না। সাধুমুখে ঈশ্বরীয় কথা তাঁর ভাল লাগল না। এমনি তাঁর মহামায়া। তাই শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করতে হয়।

সন্ন্যাসী—যার যেমন রুচি।

শ্রীম—যার যেমন রুচি নয়। যাকে যে সুরে তিনি বেঁধেছেন। (পূর্ণেন্দুর প্রতি) এঁকে কিছু জলযোগ করিয়ে দাও। তা হলে তীর্থের অর্দ্ধেক ফল পাবে।

সাধুর জলযোগ হইয়া গেলে বলিতেছেন—

আর কি এখন কাজকর্ম্ম ভাল লাগবে, নির্জ্জনে বসে তাঁর চিন্তাই ভাল লাগবে! এখন আপনাকে দেখে আহ্লাদ হচ্ছে। আবার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে গেলে এভাব চাপা পড়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন গড়িতে কিছু না জমে! (গদাধরের প্রতি) গড়ি মানে কি জান?

গদাধর—পুকুরধারে যে গর্ত্ত থাকে তাকে গড়ি বলে। সেই গর্ত্তে মাছ এসে থাকে। দেখতে হয় তাতে বাঁশ পাতা টাতা পড়ে না ভরে যায়। এই সময় মহেশ মহারাজ (আগমানন্দ) আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন।

শ্রীম—কেমন, এখন মঠে আছ তো। বেশী ঘোরাটোরা ভাল নয়। কোথায়ও যাবে নাকি?

মহেশ মঃ—হ্যাঁ, একবার কাশীর দিকে যাব ভাবছি।

শ্রীম—কেন, মঠে এমন পূজা নিয়ে ছিলে, তাঁদের চোখের সামনে বেশ ভালই ছিলে।

মহেশ মঃ—এই সময়টা ম্যালেরিয়ার ভয় আছে।

শ্রীম—ম্যালেরিয়ার ভয়ে সেখানে কেউ থাকবে না, সকলে ছেড়েছুড়ে চলে যাবে! (সকলের হাস্য)।

মহেশ মঃ—অভয় মহারাজ বলেছেন—'কাজের জন্য আমি যেতে পারি না। তাঁকে বলে একখানা কথামৃত আমার জন্য আনবেন।'

শ্রীম—তাঁকে আসতে বল। অমৃত কি এমনি পাওয়া যায়—আসতে হয়।

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম ছাদে তুলসীগাছের নিকটে প্রণাম করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। জ্যোৎস্না রাত। ধ্যানান্তে ছাদে আবার ভক্তদের কাছে আসিয়া বসিলেন।

কর্ম্ম রহস্য

গুহমহাশয়—আসক্তিতে পড়ে কর্ম্ম করছি এবং এই কর্ম্মই আমাদের জড়ায়েছে।

শ্রীম—আবার এই কর্ম্মই কর্ম্মযোগ হয়ে যায় যদি ফল কিছু গ্রহণ না করা যায়, তা থেকে কোন enjoyment ভোগ না নেওয়া যায়। এই রহস্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন।

গুহমহাশয়—মনে হয় পড়ে গেলাম, পড়ে গেলাম, বুঝি আমাদের আর উপায় নাই।

শ্রীম—ভয় কি তিনি অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। তিনিই দেখবেন আমাদের কিছু ভাবতে হবে না। তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা দ্বারা পুরুষকার আনতে হয়। কর্ম্মের মধ্যে থাকতে হলে অযুত হস্তীর বল চাই। "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।" (গীতা ২)

ভারত পুণ্যভূমি

এই দেশ (ভারত) পুণ্যভূমি। কত ঋষি মুনিরা সব তপস্যা করে গেছেন, আকাশে বাতাসে সেই পবিত্রভাব রয়েছে। নির্ম্মল মহারাজ আমেরিকা থেকে লিখছেন ওখানে শুধু বসে নিশ্বাস নিলেই পবিত্র হয়ে যায়। আমরা যখন স্বর্গাশ্রমে ছিলাম, তখন লছমনঝোলায় পুলের উপর একজন সাধু বসে থাকতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, ক্যা হোতা হৈঁ? আপ হিঁয়া কা কর রহেঁ?" তিনি বললেন, "গঙ্গাজীকী পবিত্র হাবা সেবন করতা হুঁ। ইস্‌সে চিত্ত পবিত্র হো যাতা হ্যায়।" (এই গঙ্গার পবিত্র হাওয়া সেবন করছি তাতেই মন পবিত্র হয়ে যায়)। আমি ছেলেবেলায় মনে করতাম Indiaতে (ভারতে) জন্ম কেন হল। কিছুদিন পরে বুঝলাম, ওঃ, পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা ছিল। তাই এদেশে জন্ম হয়েছে। ওদেশের (পাশ্চাত্যের) দার্শনিক বলেছেন, 'মানুষ যদি কিছু অধ্যাত্মিক অনুভূতি করে থাকে তো, ওদেশের (প্রাচ্যের) লোকেরাই করেছে, আমরা phenomenon (দৃশ্যপ্রপঞ্চ) নিয়েই বিচার করছি।'

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৬৫ ॥

১৬ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

বৈকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা। শ্রীম স্কুলবাড়ীর ছাদে চেয়ারে উপবিষ্ট। ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

জীবনপথের শেষ

কয়েকদিন হইল ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বক্সীর শরীর গিয়াছে। এখন সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

শ্রীম (ধর্ম্মেশানন্দ ও ধীরেনের প্রতি)—বিদ্যাপীঠের রমেশ চারপাতা ভরে চিঠি লিখেছে জবাব দেবার জন্য আবার তার ভেতর খাম। তাকে লিখো আজ ২০ দিন হল ডাক্তার চলে গিয়েছেন। সেইজন্য পত্রের উত্তর দিতে দেরী হল।

ধীরেন—চিঠি দিতে দেরী হলে ভাবে বুঝি মাষ্টার মহাশয়ের কোন অসুখ করেছে।

শ্রীম—তাকে লিখলাম ডাক্তারবাবু চলে যাওয়াতে আমাদের চৈতন্য হয়েছে। এমনি সকলকে যেতে হবে। আবার খানিকটা ইংরেজীতে লিখলাম। Life is eternal (জীবন অনাদি) ব্রহ্মও Infinite (অনন্ত)। সেই infinityতে (অনন্তে) পৌঁছুবার জন্য বর্ত্তমান জীবন যেন একটা stage (অবস্থা)। তাঁর দর্শন হলে তবে এ জীবনপথের শেষ হয়। যেমন ঘরের জানালা দিয়ে অনন্ত দেখা যায় সেইরূপ শুদ্ধমনে তাঁকে দেখা যায়। মানুষকে এমন শক্তি ভগবান দিয়েছেন যে প্রকৃতির আবরণ ভেদ করে সে দেখতে পায়। মৃত্যুই আমাদের সদাসর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে সবই অনিত্য সবই দুদিনের জন্য। ছেলে বুড়ো কাকেও ছাড়ে না। একমাত্র তিনিই সত্য। এখন এস সকলে মিলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—)

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি।" [বৃহদারণ্যক—৩।১৮

চিরজীবী

একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন। কতকাল ধরে এই সৃষ্টি চলেছে। কিন্তু কারো শরীর যে স্থায়ীভাবে রয়েছে এ দেখা গেল না। শুনেছি নাকি বিভীষণ ও হনুমানের আছে।

সুধীর—বলী, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এদেরও বলে শরীর আছে।

শ্রীম—হ্যাঁ তা বটে। তবে আমরা তাদের দেখতে পাই না।

জনৈক ভক্ত—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র এদেরও শরীর আছে।

শ্রীম—যেখানে রামচন্দ্র সেখানে হনুমান। অনেক জায়গায় যদি এক সময় রামচন্দ্রকে পূজা করে তাহলে কি করে যান।

জনৈক ভক্ত—নানা রূপ ধারণ করে দেখা দেন।

শ্রীম—মায়াতে বহু রূপ ধারণ করেন।

ব্রঃ ধীরেন—আমি কাল রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম।

শ্রীম—সীতাপতি মহারাজ কেমন আছেন ?

ধীরেন—ভালই আছেন। আজকে মা কালীর প্রসাদ খেলেন।

শ্রীম—কিছু ঠাকুরের কথা হল ?

ব্রঃ ধীরেন—তিনি নিজে নিজে বলছিলেন, "ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্যোতিস্বরূপ তাকে মনের বিষয় করা যায় না।"

শ্রীম (হাসিতে হাসিতে)—মনে বিষয় হলে খারাপ হয়ে যায় যে।

ধীরেন—আমি বললাম, ঠাকুর বলেছেন—"তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। বেলের খোলা বীচি, শাঁস মিলে একটি। সেইরূপ জীবজগৎ ঈশ্বর মিলে একটি।" তবুও তিনি বললেন "ঠাকুর বোঝাবার জন্য ও সব বলেছেন।"

শ্রীম—আর কেউ দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন ?

ধীরেন—বেলা পাঁচটার সময় স্বামী নির্ব্বেদানন্দ ও শরদিন্দু মহারাজ গিয়েছিলেন। মা কালীর সামনে বসে গান হল।

শ্রীম—পঞ্চবটীর ঘরে কাউকে দেখলে ?

ধীরেন—দুইজন হিন্দুস্থানী সাধু ছিলেন।

শ্রীম—সকলেই ভগবান পাবার জন্য চেষ্টা করছে। গুরু সিধে রাস্তা বলে দেন।

অবতার ও সর্ব্বত্যাগীর দল

সন্ধ্যা হইল। শ্রীম তুলসী গাছের নিকট প্রণাম করিয়া সেখানেই ধ্যানে বসিলেন, ধ্যানান্তে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাক। অবতার এই Message (বাণী) শুনাতে আসেন। তিনি কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে ঘষলে অন্য সব সাধুকে বোঝা যায়। বলতেন বৈধীভক্তি ভক্তিই নয়।

উকিল (জিতেন ঠাকুরের ভক্ত)—যারা মালা জপ করে আবার মনে মনে বিষয় চিন্তা করে তাদের কি হবে?

শ্রীম—একাদশী তিন রকম। সাধুও সেইরূপ। ঠাকুর একটি সর্ব্বত্যাগী Group (দল) তৈয়ারী করেছিলেন। তাঁরা ভগবান ছাড়া অন্য কিছু জানতেন না। সেইরূপ চৈতন্যদেবের ছিল। ক্রাইষ্টের ছিল। জিতেন ঠাকুরের কাছে কি কেউ সর্ব্বত্যাগী হয়েছে?

উকিল—না।

শ্রীম—ঠাকুরের সর্ব্বত্যাগী দল ছিল। যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন, 'শেয়ালের থাকবার গর্ত্ত আছে। পাখীর বাসা আছে কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা গোঁজবার স্থান নেই।' 'দরজায় ঘা দাও খুলে যাবে।' অর্থাৎ ব্যাকুল হও।

অবতার বিষয়বুদ্ধির অগম্য

উকিল—ক্রাইষ্ট ত Indian (ভারতীয়) ছিলেন।

শ্রীম—সে সব কথা হচ্ছে না। তাঁকে কি করে পাওয়া যায় আমাদের এই উদ্দেশ্য। তা নয় তিনি তিব্বতে এসেছিলেন কি'না? Indian (ভারতীয়) ছিলেন কি'না? এই সব History (ইতিহাস) নিয়ে বসে বসে criticism (সমালোচনা) কর। এইরকম করে লোকে উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক অবতারকে চিন্তা করলে অন্য সব অবতারকে বোঝা যায়। হাঁড়ীর একটা ভাত টিপলে অন্য সব ভাত বোঝা যায়। বিষয় বুদ্ধি দিয়ে অবতারকে বোঝা যায় না। ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, "সূচের ছ্যাঁদা দিয়ে উট ঢোকান সহজ কিন্তু বিষয়ীদের ঈশ্বরপথে আনা তার চাইতে কঠিন। চৈতন্যদেব যখন পুরীতে গম্ভীরাতে ছিলেন, তখন প্রতিবৎসর ভক্তেরা রথের সময় তাঁকে দর্শন করতে যেতেন। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা যোষিৎ সঙ্গ করে' কলসীর ছিদ্র দিয়ে সব জল বেরিয়ে যায়। তাই তাদের ধারণা হয়

না। (গুহ মহাশয়ের প্রতি) আপনি পুরী গিয়াছেন ?

গুহ মহাশয়—না।

শ্রীম—একবার দেখে আসবেন।

গেরুয়ার অধিকারী কে ?

উকিল—আমাদের বাড়ীতে পুরুত মশায় গেরুয়া পরে পূজা করতে এসেছিলেন। তাঁকে বললাম ভোগ করছেন আবার গেরুয়া পরে আছেন, একথা শুনে আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হলেন।

শ্রীম—ওঁদের গেরুয়া পরার Right (অধিকার) আছে। নেঁকো আম গাছে নেঁকোই হয়। রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। ওরা সেই ঋষিদের বংশধর, সর্ব্বত্যাগী, আমরা এই রকম শুনেছি।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৬৬ ॥

১৭ই জুন, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকালে শ্রীম ছাদে ছাতি মাথায় দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গদাধরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ভক্তেরা ধীরে ধীরে ছাদের বারান্দার বেঞ্চিতে আসিয়া বসিতে লাগিলেন।

সাধুর কাজ

শ্রীম—যদি সাধুদের মধ্যে গ্লানি হয় তবে সমস্ত humanity (মনুষ্য-জাতির) অকল্যাণ। কারণ সকলে সাধুর পানে হাঁ করে আছে। ঈশ্বর সাধুদের তৈরী করেছেন লোকশিক্ষার জন্য। "পরিত্রাণায় সাধুনাং" (গীতা ৪।৮) সাধুদের উপর গুরুদায়িত্ব রয়েছে। তাই সাধুদের উচিত কামিনী কাঞ্চনের সংস্পর্শে না আসা।

বড় জিতেন—ও ত ব্রহ্মচারীদের কথা হল। আমাদের গৃহীদের কথা কিছু বলুন।

সংসারীর কর্ত্তব্য

শ্রীম—তাদের সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গ করা উচিত। তারা সাধুদের দোষ দেখবে না। যেমন বড়লোকের স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে না। কোন সাধু হয়ত একটি ঘটি চুরি করে নিয়ে গেল, তা সে করুক। সাধুকে পূজা করেছি এর দাম কত।

বড় জিতেন—আপনাআপনি নিঃশ্বাসের সঙ্গে জপ হয়?

শ্রীম—সেটি হয় ঠাকুর যা বলে গেছেন তা যদি কেউ পালন করে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে বাস।

বড় জিতেন—এসব করিয়ে নিন তাতে রাজী আছি। মহামায়া আমাদের সংসারের দিকে টেনে রেখেছেন। তিনি যখন সব করছেন এও তিনি করিয়ে নিন।

গুরুশক্তি

শ্রীম—যা বললেন করিয়ে নিন! গুরু কখন কখন জোর করে কাছে রেখে দিতেন। জানেন সে নিজের শক্তিতে পারবে না। ট্রামগাড়ীর উপরকার তারের সঙ্গে যোগ থাকলে ট্রামগাড়ী চলে। ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, "আমার অন্তর থেকে বেরিয়েছে। তিনি নূতন জন্ম দেন। তাই লোকে বলে আত্মজ দ্বিজ। বাপ মা এই শরীরটা জন্ম দেন। কিন্তু গুরু আর একটি নূতন দেহের জন্ম দেন। অন্তরঙ্গদের কাছে বলতেন, "মায়ের কাছে প্রার্থনা করে এই রোগটা ভাল করতে পারি। তা মা শরীর রাখবেন না।" ঠাকুর গুণাতীত পুরুষ। "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে" (গীতা) অন্যলোক এই সব বিশ্বাস করে না।

গোপী প্রেম

এইবার ভাবে গান গাহিতেছেন :—

"নবভূপতি ব্রজের কুশল কব কি
দেখে এলাম ব্রজে মূর্চ্ছাগত শ্রীমতী।
যমুনা পার হয়ে এলাম, রাই মল রব শুনতে পেলাম,
সবাই বলে রাই হারালাম—নব প্রেমের দুর্গতি।"

(গোপালের প্রতি) তুমি ত বৃন্দাবনে যাবে। এই সব ভাববে, এসে আমাদের কাছে গল্প করতে হবে। বনপরিক্রমা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এইসব দর্শন করবে। গভীর রাত্রে উঠে বেড়াতে হয়, তবে সেই লীলা মনে পড়ে। চৈতন্যদেব বেশ ভক্তসঙ্গে কথা কইছেন। হঠাৎ গোপীভাবে বিহ্বল!

"উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি"

স্বরূপ রামরায়ের হাত ধরে কান্না। তিনি এসেছিলেন বলেই কৃষ্ণলীলা বোঝা যায়। গোপীদের কিরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা হত তা এই মহাপ্রভুর জীবনের মধ্য দিয়া বেশ বোঝা যায়। ঠাকুর বলতেন, "গোপীদের যে প্রেম তার একবিন্দু যদি কারো হয় তা হলে সে জীবন্মুক্ত হয়ে যায়।"

(১)—"আমি প্রেমের ভিখারী, প্রেম বিলায় নদীয়ায়
আসতে প্রাণে (পথে) শুনতে পেলাম,
তাইত আমি হেথায় এলাম,
ভেসে ভেসে আমি ঠেকে গেছি প্রেমের দায়।"
"কর হরিনাম মধুর নাম'! ইত্যাদি—

(২)—"কুঞ্জবনে াই কিশোরী"। ইত্যাদি—

বেলা প্রায় নয়টা। এই সময় চন্দ্র মহারাজ আসিয়াছেন। সঙ্গে পশুপতি মহাবাজ, শরদিন্দু মহারাজ, হিরণ্ময় প্রভৃতি। শ্রীম শুনিয়াই নীচের তলায় গেলেন। চন্দ্র মহারাজকে দেখিয়া বলিতেছেন, আপনার শরীর ভাল আছে দেখছি। শুনলাম এই শরীর নিয়ে আপনি বৃন্দাবনে বেড়িয়ে এলেন।

চন্দ্র মহারাজ—যেখানে গঙ্গামাতার আশ্রম ছিল, সেখানে ঠাকুর গিয়েছিলেন। সেই স্থান দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ভেবেছি সেইখানে একটি আশ্রম স্থাপন করব।

শ্রীম—সেখানে এক ব্রহ্মচারীকে বসিয়ে দিলেই হল। স্বামীজী বলতেন, "কারো শরীর মনকে চালায়, আবার কারো বা মনই শরীরকে চালায়"। আপনি এই শরীর নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন।

চন্দ্র মহারাজ—আপনি যদি উপর থেকে না নামতেন তবে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতাম।

শ্রীম—বটে, তবে ওপর থেকে বড় নামি না।

চন্দ্র মহারাজ—আপনার কষ্ট হল ?

শ্রীম—না, আহ্লাদ হল। কোথায় কাশী। এইখানে বসেই দর্শন হল। বৃন্দাবনে যাবার পর আপনাকে দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল।

সকলে জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বৈকালে গদাধরকে বলিতেছেন—

শ্রীম—ঠাকুর বলতেন "ঘরভূত, বনভূত, ধোপাভাণ্ডারী। অবতার হলেন, ঘরভূত সব তাতে interfere (হস্তক্ষেপ) করেন। বনভূত এক জায়গায় বসে থাকে। ধোপাভাণ্ডারী মানে পরের কাপড় নিয়ে —

॥ ৬৭ ॥

৬ই জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

বেলা প্রায় বারোটা। শ্রীম চারতলায় বসিয়া একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

সাধু কারুর তোয়াক্কা রাখে না

শ্রীম—আমি কারো দোষ দেখি না। যাকে যিনি যে সুরে বেঁধেছেন তার ভেতর থেকে সেই সুর বেরুচ্ছে। ঠাকুর যা আদর্শ দিয়ে গেলেন, কেইবা তার সাক্ষী দেবে। ঠাকুরের লোক যারা ছিল সব ত চলে গেলেন, আর দু-চারজন এখন আছেন। কত রকম গেরুয়া পরা সাধুই দেখলাম। একজন গেরুয়াপরা ব্রাহ্মসমাজের কাছে কচুরী হালুয়া বিক্রী করত। সব ঠিকঠাক দিত, আমি কতদিন তার দোকান থেকে কিনে খেয়েছি।

ব্রহ্মচারী—যারা ভালো সাধু তাদের আবার অভাব কি ?

শ্রীম (গম্ভীরভাবে)—অভাবের জন্য সংসার ত্যাগ করেছে। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলাম। আপনার তখন ছেলেপুলে হয় নি বলে ৫০০৲ টাকার চাকুরি ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। এই কথা শুনে মুখ লাল করে তিনি বলেছিলেন, "আমার আবার ভাবনা কি ? তিন বাড়ী থেকে তিন মুষ্টি চাল হলেই চলে যায়।" আর এঁরা ত সাধু। ঠাকুর কি কোন দুর্ব্বলতার প্রচার করেছেন ! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' তিনি সৃষ্টি

করেছেন, তাকে দেখতে হবে। তিনি নাইবা দেখলেন তাতে কি। ব্যাঙ মুমূর্ষু অবস্থায় বলেছিল—"রাম যখন স্বয়ং মারছেন তখন চুপ করে থাকাই ভাল।" একলা সাধুর জগৎ করতল ন্যস্ত আমলকবৎ বীরদর্পে চলে যায় কারো তোয়াক্কা রাখে না।

অবতারের লোক ব্যবহার—পোড়াদড়ি

অবতারের যে স্নেহ ভালবাসা সে আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশকে কতভাবে রক্ষা করলেন। কতভাবে তাদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি ভালবাসা দেখালেন। শেষে আবার তিনিই ধ্বংস করলেন। ভোগ থাকলেই নষ্ঠ হবে।

গান্ধারী যখন পুত্রশোকে শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিলেন। বললেন, "তোমার বংশ এইরূপ ধ্বংস হবে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি আগে থেকেই জানি নষ্ট হবে। তুমি শাপ দিয়ে তোমার তপস্যা কেন ক্ষয় করছ?" যিনি ত্রিগুণাতীত তাঁকে শাপ দিলে, লজ্জা করে না। মনে করেছিল তিনি তাদেরই মত একজন। (রোগশোকের শরীর ধারণ করে অবতার আসেন। তাই তাঁকে কেউ চিনতে পারে না।) মাঝে মাঝে ঠাকুর বলতেন। রোগশোকের শরীর কেমন করে অবতার হয়? (হাসতে হাসতে) নিজে পূর্ব্বপক্ষ করতেন, মথুরবাবু পণ্ডিত আনিয়ে বললেন, 'ইনি রিপু জয় করছেন।' ঠাকুর বললেন, 'কই এখানে এখনও রিপুর লক্ষণ দেখা দেয়।' মথুরবাবু বললেন, 'তা বাবা অমন ছোট ছোট ছেলেদেরও দেখা দেয়।' একজন ভক্ত তাঁকে বললেন, 'আপনি ক্রোধ জয় করেছেন।' তিনি বললেন, 'কই সেদিন গাড়োয়ান ভাড়ার জন্য গোলমাল করেছিল, তাকে খুব বকলাম।' ভক্ত বললেন, 'সে যেন পোড়াদড়ি (অর্থাৎ দেখতেই দড়ির মত আসলে কিছু না)। গীতা পড়লে ঠাকুরের অবস্থা মনে পড়ে। অথবা শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে। "রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য"। (গীতা ২।৫৯)

॥ ৬৮ ॥

১২ই জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল প্রায় সাতটা। শ্রীম তিনতলার ঘরে চৌকির উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা অনেকে উপস্থিত হইয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা

শ্রীম—মহাত্মা গান্ধী বলেন, অস্পৃশ্যতা উঠিয়ে দাও। তা জোর করে বক্তৃতা দিয়ে উঠান যাবে না। আগে নাম প্রচার করে ওদের শুদ্ধ করে নাও, তারপরে ও হতে পারে।

জনৈক মহারাজ—তিনি (স্বামীজী) বলেন জাতি থাকুক, বর্ণাশ্রম থাকুক, বিধবারা যদি নিজে ইচ্ছে করে বিবাহ করতে চায় তা হলে দাও, কিন্তু জোর করে নয়। ঠাকুর ত এ সম্বন্ধে কোন Remark (মতপ্রকাশ) করেন নি।

বিধবা বিবাহ

শ্রীম—হ্যাঁ, ঠাকুর একবার গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "কেন ওর বাড়ীতে খেতে যাব? ও বিধবাদের বিবাহ দেয়।" কিন্তু আগে বলেছিলেন, "ওর বাড়ীতে খেলে হয়।" (মুসলমানধর্ম উপাসনাকালে) মথুরবাবু বলেছিলেন, "তোমার রাঁধবার জন্য সাবর্ণ চৌধুরীর মেয়ে কোথায় পাব?"

মাধুকরী

মাধুকরীর অন্ন শুদ্ধ। বৃন্দাবনে হৃদুর সঙ্গে ঠাকুর মাধুকরী করেছিলেন। সাধুর কারো বাড়ীতে খাওয়া তত শুদ্ধ নয়। আবার বলতেন, "ভক্তদের জন্য সঞ্চয় করতে পারি। নিজের জন্য নয়।" সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন

॥ ৬৯ ॥

১৯শে জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল বেলা প্রায় ৭টা। তিনতলার ঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। কাছে ভক্তেরা বসিয়া আছেন।

শ্রীম—আমার ইন্টালী যেতে ইচ্ছা করে। বাড়িটি বেশ নির্জ্জন। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।—(গীতা, ৬-২২)। ঠাকুর বলতেন, "মা আমাকে এই অবস্থায় রেখেছেন। তাই ভক্তদের ভাল লাগছে। এ অবস্থা যদি বদলে দেন তা হলে আর কারুকে ভাল লাগবে না। তাই এই অবস্থায় যা বলছি শোনো।"

প্রণবে অধিকার

সন্ন্যাসী—আপনার লেখা ডাইরি থেকে একটু শোনান। আজ ত্রয়োদশী তিথি। তাই ত্রয়োদশী হইতে পড়িয়া শুনাইতেছেন।

শ্রীম—ঠাকুর চুনিকে বলছেন, "অন্য এত ভগবানের নাম রয়েছে। ওঁ নামটি এত বলছ কেন?

সন্ন্যাসী—তা হলে ঠাকুর ওঁকারে শূদ্রের অধিকার নাই বলছেন।

শ্রীম—হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী—এঁরা (সাধুরা) ত বলেন।

শ্রীম—তাঁর মানে ভোগীদের অধিকার নাই। তিন রকম ভক্ত আছে। উত্তম ভক্ত দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ মায়া হয়ে রয়েছেন।

মহাভাব

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে পশ্চিমের গোল বারান্দায় ঠাকুর নিরঞ্জনও মাষ্টার। ঠাকুর মাষ্টারকে বলছেন, তুমি রামকে বলে দিও এখন জীবনী-টিবনী বার করা কেন? বেশী লোক এলে আমার শরীর থাকবে না। রাম ঐ কথা বেঁকিয়ে প্রচার করলে শরীর থাকবে না। ঠাকুর ভাবে গান গাহিতেছেন:—

(১)—"শ্যামাধন কি সবাই পায়, কালীধন কি সবাই পায়
অবোধ মন বোঝে না একি দায়—
শিবের অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়।"

(২)—"(আমি) এবার ভাল ভাব পেয়েছি,
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি,
যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।"

(৩)— "আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো নাকো কারো ঘরে,
যা চা'বি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে। ইত্যাদি

শ্রীম—চারিদিকে মন থাকলে হয় না। গুরু বলে দিলেন গঙ্গার অমুক ঘাটে বাণলিঙ্গ পোঁতা আছে। খুঁজলে পাবি। এই রাস্তা দিয়ে গেলে পাবি। সে যদি অন্য এক গলির রাস্তা দিয়ে যাত্রা দেখে তাহলে দেরী পড়ে যায়। ব্যাকুল হলে একটা সুযোগ হয়ে যায়। ছেলের অসুখ দেখে ডাক্তার বললে, "মড়ার খুলিতে সাপের বিষ, তাতে স্বাতীনক্ষত্রের ফোঁটা, সেই ওষুধ খাওয়ালে রোগ সেরে যাবে। মার ব্যাকুলতার জন্য একে একে সব জুটে গেল। তাঁতে মগ্ন হতে হয়।"

ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে বলছেন, "এখন শালা ছুঁস্‌নি।" নিত্যগোপালকে বলছেন—"এই হুঁকোটা রাখ না ভাই।" নিরঞ্জনের কোলে বসছেন—আবার পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসছেন। আবার ঘরে ছোট খাটে বসছেন। ঠাকুর বলছেন, "বাবুরাম বলে সংসার, ও বাবা, একজন challenge (প্রতিবাদ) করলে বাবুরাম সংসার সম্বন্ধে কি জানে।"

ঠাকুর—তা বটে, তা বটে।

তাদের নাম ক'রে এই সব বলতেন।

ঠাকুর—ভাবে দুর্গা দুর্গা বলে নেচে ছিলেন।

(সীতাপতি মহারাজের প্রতি)—ভক্তেরা সেই অবস্থা অবাক হয়ে দেখেছিল।

Give and take

সন্ন্যাসী—ঠাকুর অশ্বিনীকুমার দত্তের বাবাকে ভালবাসতেন।

শ্রীম—হ্যাঁ, তিন দিন কাছে রেখেছিলেন। না হলে অমন ছেলে জন্মায়, ঠাকুর হাজরাকে বলতেন, "তুমি আমার কাজটা করে দাও। আমি তোমারটা করে দেব। Giving and taking (দেওয়া এবং নেওয়া)।

সন্ন্যাসী—ভক্তদের কাছে নিজেও কখনো কখনো যেতেন?

শ্রীম—হ্যাঁ, ছোট নরেনের কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে আনালেন। এলে বললেন, "এতদিন আসিস নি কেন?

ছোট নরেন বললে, "আমার কি পড়াশুনা কাজকর্ম্ম করতে হবে না? এত ডেকে পাঠান কেন?" তার সেই কথা শুনে সকলে অবাক। ঠাকুর শুনে বললেন, "আচ্ছা যা, তাঁকে ভুলিসনি।" তাঁর কথা না শুনে ভবনাথ, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন বিবাহ করলে। সেই জন্য কত কষ্ট পেল।

সন্ন্যাসী—ঠাকুর যাদের ভালবাসতেন তাদের উঁচু ঘর বলতেন।

শ্রীম—কথা না শুনলে দেরী পড়ে যায়। Too late (অত্যন্ত দেরী)। সকলেই নিস্তব্ধ।

এইবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীম ভোজনের পর ঘরে বসিয়া গদাধরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, বেলা সাড়ে এগারটা।

বিকারের রোগী

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—এইখানে বস, দক্ষিণেশ্বরের খবর বল। কিরণবাবু কয়েক বৎসর দক্ষিণেশ্বরে মাকালীর মন্দিরে রিসিভার ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কিরণবাবুকে ঠাকুর ছাড়িয়ে দিলেন। এখন বয়স হয়েছে, বসে বসে ঈশ্বর-চিন্তা করুক।

গদাধর—ঐ কাজে তিনি বেশ সুখ পেতেন।

শ্রীম—যেমন বিকারের রোগী বলে এক জালা জল খাব। আমার বয়স তখন তিরিশ হবে। শ্যামপুকুরের ভাড়া বাড়ীতে কলেরা হয়েছিল। বাড়ীর লোকেরা আমাকে খাইয়ে—যে নেবু নিংড়ে ফেলে দিয়ে যেত, তারা চলে গেলে—আবার সেগুলো' চুষতাম। মাছের ঝোল খাবার কথা, মাছ খেয়ে ফেললাম। ওরা মুখ থেকে ছিনিয়ে যেত। একটি পথের পথিক দেখে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের বাড়ীতে ঝরণা আছে, সেইখানে নিয়ে যাবে? আর একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করছি—মশায়, আপনার বাড়ী কোথায়? তা বললে সিলেট। আমি বললাম সেখান থেকে দুটো কমলা লেবু পাঠিয়ে

দেবেন? আমার ষোল আনা বিশ্বাস তারা আমাকে নিয়ে যাবে। কমলালেবু পাঠিয়ে দেবে। তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে হেডমাষ্টারী করি। বোঝ মানুষের কি অবস্থা!

একজন কলেজের ছাত্রকে দেখিয়া বলিতেছেন—"আমার ছাত্রদের ভাল লাগে। ছাত্রজীবনটি বেশ"।

॥ ৭০ ॥

২০শে জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল সাতটা। শ্রীম তিনতলার ঘরে চৌকির উপর বসিয়া আছেন। নিকটে অপরাপর ভক্তেরা।

ঈশ্বর কত ভাবে দেখেন .

শ্রীম—সবই ঈশ্বর করছেন। এই দেখ কতরূপে আমাকে দেখছেন। ডাক্তাররূপে, ভক্তরূপে, সাধুরূপে। অসুখ করেছে, ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছেন। দেখাবার জন্য ভক্ত, যেতে পারি না বলে সাধু পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আগে কত কষ্ট করে মঠে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। তখন শরীরে সামর্থ্য ছিল যেতে পারতাম। যখন ছেলে ছোট থাকে তখন মা তাকে চোখের আড়ালে রাখে না। বড় হলে কি মা তেমন করে? যাকে যতটুক শক্তি দিয়েছেন; সে যদি তার সদ্‌ব্যবহার করে তাহলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আরো শক্তি দেন। আমি কি বলছি? যিনি আমার মধ্যে আছেন তিনি বলাচ্ছেন। যেমন বাঘমুখ নল দিয়ে জল পডছে। ছোট ছেলেরা মনে করে বাঘই নিজের মুখ দিয়ে বার করছে। তারা জানে না বৃষ্টির জল বাঘের মুখ দিয়ে পডছে। বৃষ্টি আবার সমুদ্র থেকে আসছে।

সকলের কারণ পরমাত্মা

(হিমাংশুর প্রতি)—বল কি করে সমুদ্র থেকে আসছে?

গদাধর—সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীম—হ্যাঁ, আরো এগিয়ে যাও, সূর্য্য। তারপরে আরও এগিয়ে যাও

পরমাত্মা। গায়ত্রী এসে পড়ল। সূর্য্যের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই পরমাত্মা।

তাই ঠাকুর বলতেন, "বিচার কি করবে? শরণাগতি, প্রার্থনা, সাধুসঙ্গ করো। তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন।"

শরণাগতি মানে তাঁর সঙ্গে যোগ

হিমাংশু—শরণাগতি মানে?

শ্রীম—ধাক্কা খাও তবে বুঝবে। কেবল মা বাপের হাতে মানুষ হলে কি বুঝবে, (রমেশের প্রতি), কেমন? তুমি বুঝছ ত?

রমেশ—হ্যাঁ বুঝছি। ঠাকুর বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন। এর মানে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। সিদ্ধপুরুষ না দেখলে কি চৈতন্য হয়? তিনিই অবতার হয়ে জীবনে দেখিয়ে দিয়ে যান। I live to this life (আমি অবতাররূপে জীবন যাপন করি)। ঠাকুর রাতদিন মার সঙ্গে কথা কইতেন।

বিদ্যাপীঠের রমেশ—সিদ্ধপুরুষ বুঝব কি করে?

শ্রীম—না জেনে লঙ্কা খেলেও ঝাল লাগে। প্রথমে ঠাকুরকে যখন দেখলাম, তখন খুব ভাল লাগল। নেশা লেগে গেল। তিনি দ্বিতীয় দিনে বললেন, "লেকচার দিতে হয় না। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।"

এই সময় ছোট বিনয় আসাতে বলিতেছেন, "তুমি এখান থেকে বই নিয়ে পড়বে।"

ষড় গোস্বামী

হলো ছেলেটিও আসিয়াছে। (হিমাংশুর প্রতি) এরা খুব সদ্বংশ। ঠাকুর কানাইয়ের বংশধর। নিত্যগোপাল গোস্বামীর জ্ঞাতি। এঁরা চৈতন্যদেবের গৃহীভক্ত ছিলেন। রঘুনাথ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। এই ষড় গোস্বামী হচ্ছেন ত্যাগী। যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে গেলেন তখন স্বরূপ সন্ন্যাস নিলেন। বললেন, "প্রভু চলে গেলেন, আর কার জন্য সংসারে থাকব। চৈতন্যদেবের প্রতি কি ভালবাসা! যখন প্রভুর শরীর গিয়াছে শুনলেন তখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন আর কয় ঘণ্টা পরেই সমাধিতে শরীর রাখলেন। শ্রীনিবাস যখন নীলাচলে যান তখন রাস্তায়

শুনলেন প্রভুর শরীর গিয়াছে। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করতেন। চৈতন্য-দেব ভাবে বলতেন, কোথায় বাপ নরহরি পুরুষোত্তম। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়া গোস্বামীর কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। অধ্যয়ন শেষ করে বইপত্র নিয়ে রাস্তায় আসবার সময় বিষ্ণুপুরের কাছে চোরেরা সেইগুলি চুরি করে নেয়। তারপর অনেক কষ্টে রাজার সাহায্যে সেগুলো উদ্ধার হল।

হিমাংশু—আপনি গীতা সুর করে পড়ে শিখিয়ে দিন।

শ্রীম—এ অতি উত্তম কথা।

সুর করিয়া গীতা পড়িতেছেন। পাঠান্তে বলিতেছেন। রজগুণ থাকলে যোগ হয় না। অবতারাদির কথা আলাদা। ত্রিগুণে থেকেও ত্রিগুণাতীত। এইবার সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥ ৭১ ॥

২৬শে জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

আজ নাগ পঞ্চমী। শ্রীম'র জন্মতিথি। ভক্তেরা ঠাকুরের পূজা ও সাধুসেবা করিবেন। ১৮নং Karbala Tank Road দুর্গাপদবাবুর বাড়ীতে ঠাকুরের ভাগ পাকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। সীতাপতি মহারাজ প্রভৃতি তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। পূর্ণেন্দু ফুলের মালা আনিয়া শ্রীম'র ঘরে ঠাকুরের ফটো সাজাইয়া দিয়াছেন। ধূপ দেওয়া হইতেছে। চারতলার ঘরে ভক্তেরা উপস্থিত হইয়াছেন। তখন প্রায় সকাল সাতটা। শ্রীম নীচের তলা হইতে আসিয়া ভক্তদের বলিতেছেন "বসতে আজ্ঞা হউক।" ঠাকুরের ফটো সাজান দেখিয়া প্রণাম করিলেন। এবং আনন্দে বলিতে লাগিলেন "সুন্দর! সুন্দর! কে এমন ভক্ত? কে সাজিয়েছেন? এমন ভক্তের সঙ্গ করাও ভাল। তাঁর কৃপায় তাঁর ভক্তলাভ হয়। ঠাকুর বলতেন, যতক্ষণ এই আমিটা আছে ততক্ষণ দাসভাবে থাকা, এই অহঙ্কার তুলে নিলে তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। যেমন সমুদ্রের জলে বোতল অর্দ্ধেক ডোবালে দু'ভাগ দেখায়। তুলে নাও এক।" সত্যবান মিষ্টি হাতে করিয়া আসিয়াছেন। মিষ্টি যথাস্থানে রাখিয়া প্রণাম করাতে বলিতেছেন, "এ সাধুদের কাছে শিখেছে। ফুল বা

মিষ্টি হাতে করে প্রণাম করতে নাই, তা হলে তার পূজা হয়ে যায়।" এইবার কমলবাবু গান গাহিতেছেন। তাঁহাকে বলিলেন, "মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে" গানটি গাও। গান শেষ হইলে বলিলেন, "ঐটে—শ্যামাধন কি সবাই পায়।"

বৈকাল পাঁচটা। অনেক ভক্ত, সাধুবৃন্দ পরপর আসিতেছেন, সাধুরা আসাতে দোতলার ঘরে খাট তুলিয়া দিয়া মেঝেতে আসন পাতা হইল। তাহাতে সকলে বসিলেন। শ্রীমও আসিলেন।

শ্রীম—যতক্ষণ আমিটা রেখেছেন, ততক্ষণ ভক্তিভক্ত নিয়ে থাকা। তাকে সখ্য বা বাৎসল্যাদি ভাবে ডাকা। তিনি যদি জড় সমাধি করে দেন তাহলে সে এক। শুকদেব কতকাল জড় সমাধিতে ছিলেন। ভগবানের আদেশে নারদ এসে নাম শুনাতে তবে তাঁর সমাধি ভঙ্গ হল। কি প্রেম! কি অদ্ভুত অবস্থা!

এইবার গান গাহিতেছেন। "যশোদা নাচাত গো মা বলে, নীলমণি, সে রূপ লুকালি কোথা করাল বদনি" ইত্যাদি—। আবার বলিতেছেন, ঠাকুর যখন চলে গেলেন ভক্তদের মধ্যে কি ব্যাকুলতা। কেউ বলছে 'প্রায়োপবেশন করব", কেউ বলছে "নর্ম্মদা তীরে গিয়ে তপস্যা করব।" এইবার সুধীরবাবু দ্বিতীয় ভাগ কথামৃত পরিশিষ্ট বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে বরাহনগর মঠ সম্বন্ধে পাঠ করিতেছেন। পাঠান্তে কমলবাবু গান গাহিতেছেন। "শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না একি দায়", "মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে, কালীপদ নীল কমলে, যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো, কামাদি কুসুম সকলে", "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।"

নিখিলানন্দ স্বামী ইংরেজীতে Life of Sri Ramakrishna পুস্তকখানি অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেইখানি শ্রীমকে উপহার দিয়াছেন। মুকুন্দবাবু পুস্তকের সূচী পড়িয়া শুনাইতেছেন। পরে সীতাপতি মহারাজ ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন ও আরত্রিক করিলেন। আরত্রিক ও ভজনাদির পর সাধু ও ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইলেন। রাত্রে অনেক ভক্ত সেখানে ছিলেন।

॥ ৭২ ॥

২৭শে জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

শ্রীম স্কুলবাড়ীর তিন তলার খাটের উপর বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন। অনেক ভক্তেরা উপস্থিত।

শ্রীম—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গল্প করতেন। নবদ্বীপে পাগলদের সেবা শুশ্রূষা করবার জন্য এক প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে বহু পাগল আসত। প্রতিষ্ঠানের যিনি অধ্যক্ষ তিনি প্রকৃত পাগল কে পরীক্ষা করবার জন্য সকলের হাতে একটি করে টাকা দিলেন। সকলেই নিজের নিজের টাকা ট্যাঁকে গুজল। তাদের মধ্যে কেবল একজন টাকাটি হাতে নিয়ে থু থু করে ফেলে দিলে। তাইতে তারা বুঝলেন, এই-ই হচ্ছে যথার্থ পাগল। তখন তাকে রেখে অন্য সকলকে বিদায় করে দিলেন। তারপর কমলকে বললেন, "নিবিড় আধারে মা তোর চমকে" এই গানটি একবার হোক।

কমলবাবু গাহিতে লাগিলেন—

"নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয় গিরিগুহাবাসী"

"শ্যামাধন কি সবাই পায়" ইত্যাদি গান সমাপ্ত হইলে বললেন—শরৎ মহারাজ গাইতেন, "তাই শিবের নয়ন ভুলেছে" তখন কমলবাবু ঐ গানটি গাইতে লাগিলেন—

তাই শিবের নয়ন ভুলেছে,
নিরূপম রূপ চিকন কাল হেরিয়ে;
তা না হলে ত্রিলোচন পরম যতনে কেন,
ও চরণ হৃদে ধরেছে।
চাঁদ প্রেমে চকোরিনী ! ঘনভ্রমে চাতকিনী,
নলিনী ভরমে ভ্রমরিণী এসেছে,
হারাইয়ে নিজমণি ব্যাকুলা হইয়া ফণী,
ও রূপ নেহারি রয়েছে।

হারিয়ে ফুলধনু অভিমানে ত্যজি তনু
বিরহিণী হৃদয়ে শরণ লয়েছে।
ওরূপ আনন্দনিধি কমলাকান্তের হৃদি
সরোজে প্রকাশ করেছে।

(অমূল্যবাবুর প্রতি) আপনার একটা হোক। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। অমূল্যবাবু গাহিতে লাগিলেন—

"এবার আমার উমা এলে আর তারে পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না। ইত্যাদি

শ্রীম—আহা! আপনার কি সুর। আর ঐটে—'কেমন করে পরের ঘরে' —দক্ষিণেশ্বরের পোস্তার উপর ঠাকুরের এই গান শুনে সমাধি হল।

জনৈক মহারাজ—"গৌরহে আমি সাধনভজন হীন" তার পরের লাইনটা কি?

শ্রীম—'পরশে পবিত্র করো আমি দীন হীন"
(চরণ ত আর পেলাম না হে গৌর)
(চরণ পাব পাব বলে হে গৌর আমার আশায় আশায় গেল দিন)।

এই গান শুনে ঠাকুর কেঁদেছিলেন।

স্বামীজীর কথা কাটবার যো নেই

অদ্বৈত আশ্রম হইতে নূতন প্রকাশিত ঠাকুরের জীবনী পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। স্বামীজী বলিতেছেন, "যা কিছু দুর্ব্বল বা কোন লোকের অপকারী কথা বলে থাকি তা আমার। আর যদি কিছু পবিত্র শান্তিপ্রদ বলপ্রদ, লোকের মঙ্গলের জন্য বলে থাকি তা তাঁর।"

এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীম'র শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

শ্রীম—অশ্বিনী দত্ত স্বামীজীকে বলেছিলেন, "আপনি এত থিয়োসফিষ্টদের (theosophist) গালাগালি দিয়াছেন কেন। ঠাকুর ত কারোকে নিন্দা করতেন না। স্বামীজী বললেন, "তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে যেটি মিলবে সেইটি নিবেন। আমি কত কি রাগের মাথায় বলে ফেলেছি।

স্বামীজীর আগে ফল তারপর ফুল। স্বামীজীর যে বাহিরের কাজ তা হাতীর বাহিরের দাঁতের মত। যেমন হাতীর বাহিরের দাঁত ভিতরের দাঁত।

ভিতরের দাঁত দিয়ে চিবোয়। সেইরকম স্বামীজীর ধ্যান তপস্যা, ঈশ্বরে অনুরাগ, গুরুভক্তি, এসব ভিতরের দাঁত।

মহাপুরুষদের বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নাই; বাইরে দেখতে একরকম ভিতরে অন্যরকম। আকাশের মত নির্লিপ্ত। স্বামীজীর কথা কাটবার যো নাই। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হলে ঈশ্বরে প্রেম।

"ন কর্ম্মাণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"। গীতা ৩-৪।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।

তিনি কর্ম্মের কথা বলবেন না! সকলেই ত কর্ম্মী। কর্ম্মের অধিকারী। পাঠান্তে জলযোগের পর ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন।

॥ ৭৩ ॥

২৮শে জুলাই, ১৯২৯। স্থান—স্কুলবাড়ী।

সকাল প্রায় সাতটা। শ্রীম তিনতলায় চৌকিতে বসিয়া আছেন। নিকটে ভক্তেরা।

আগে সাধুসেবা

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—কালকে এখান থেকে ঠাকুরবাড়ীতে আম নিয়ে গিয়েছিলে কেন? সেগুলো আমি সাধুসেবার জন্য রেখেছিলাম। যেখানে ভগবানের বেশী প্রকাশ সেখানে প্রথমে তাঁর সেবা করতে হয়। তারপর সর্ব্বভূতে। (মুকুন্দের প্রতি) কি বলেন! গুরু বলে দিয়েছেন বলে সেবা তা না হলে না করলেও চলে।

ধীরেনের বড় ভাইয়ের কঠিন রোগ হইয়াছে বলিয়া হাসপাতালে আছেন। কয়েকদিন হইল পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই ভাইয়ের স্নেহে ধীরেন "দাদা দাদা" বলিয়া কাঁদিতেছেন। বলিতেছেন, 'আমার ভাই ছাড়া আর কেহ নাই।'

মূর্ত্তি গড়ে কার্য্য সমাধা করলেন। আর আজকাল লোকের একটি স্ত্রী মরে গেল ত আর একটা বিবাহ করলে।

সংহার

ভক্ত—এসব ঈশ্বর করছেন ?

শ্রীম—হ্যাঁ, সংহারও তিনি করছেন। মহাসমরে কত লোক মরে গেল, বেলজিয়াম রাজ্য ত গেলই, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত গেল। জাপানে জলপ্লাবনে কত লোক ভেসে গেল। রোজ সকালবেলা এই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ঝুড়ি ঝুড়ি করে ছাগল কেটে নিয়ে যায়, তাই ঋষিরা প্রার্থনা করতেন—

"রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

কাল শুক্লা ষষ্ঠী তিথি গিয়াছে। আমরা ঠাকুরের সঙ্গে এই দিনে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন—

"মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে, সে যে উন্মত্ত আঁধার ঘরে" সেখানে পণ্ডিতেরা ঘোল খায়। যারা নির্জ্জনে সাধন ভজন করে তারাই মাখন পায়। আজ সাতচল্লিশ বৎসর হল। অনেক দিন হল না ? তবে অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নয়। যোগীরা এই ক্ষুদ্র কালকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না। তাঁরা অনন্তের সঙ্গে যোগ দিয়ে রয়েছেন কি না।

(ছাত্রদের প্রতি) আপনারা B. Sc. পড়েন। Infinite X infinite = O, আবার Philosophyতে Lower ego, Higher ego আছে। যারা দর্শন পড়ে তারা এইসব একটু বুঝতে পারে। আপনাদের মধ্যে কেউ গান জানেন ? গান না করলে আনন্দ হয় না।

ভদ্রলোক—কথামৃতে অনেক গান আছে।

শ্রীম—সে ত আছে।

হরিবাবু—পাঁজীতে লেখা আছে বিশ আড়া জল, টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

শ্রীম—হ্যাঁ (হাস্য)।

শ্রবণের অধিকারী

ভদ্রলোক—আমরা মনে করি ঠাকুরের কথা মঠে শুনতে পাব। কিন্তু কেউ কিছুই বলেন না।

শ্রীম—বার বার গেলে তবে ত। রাখাল মহারাজ যাদের মধ্যে ব্যাকুলতা দেখতেন তাদের আবার আসতে বলতেন। একবার মঠে গিয়ে সাধুদেব কৃতার্থ করে দিলেন। যাদের জল পিপাসা পেয়েছে তারাই জলেব মহিমা বোঝে। মুক্তোকে শূয়োরেব কাছে ছাড়িয়ে দিলে সেকি তার মাহাত্ম্য বুঝে! ব্যাকুল হলে ঠাকুরই সাধুদের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে তাদেব মুখ দিয়ে বলাবেন। যারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল নয় তাদেব বলে ক্যা ফায়েদা। (গদাধরের প্রতি) কি বল? দেখ সীতাপতি মহারাজের জন্য মন কেমন করছে। প্রায়ই আসতেন। অনেকদিন আসেন নি। সেইজন্য মনটা কেমন করছে। বলে, "এলে গেলে জ্ঞাতি।"

সমাপ্ত